সেরা
শুকতারা
(১৩৫৪-১৩৭৯)
সেরা
শুকতারা
(১৩৫৪-১৩৭৯)
দেব সাহিত্য কুটীর
SK
priyobanglaboi.blogspot.com
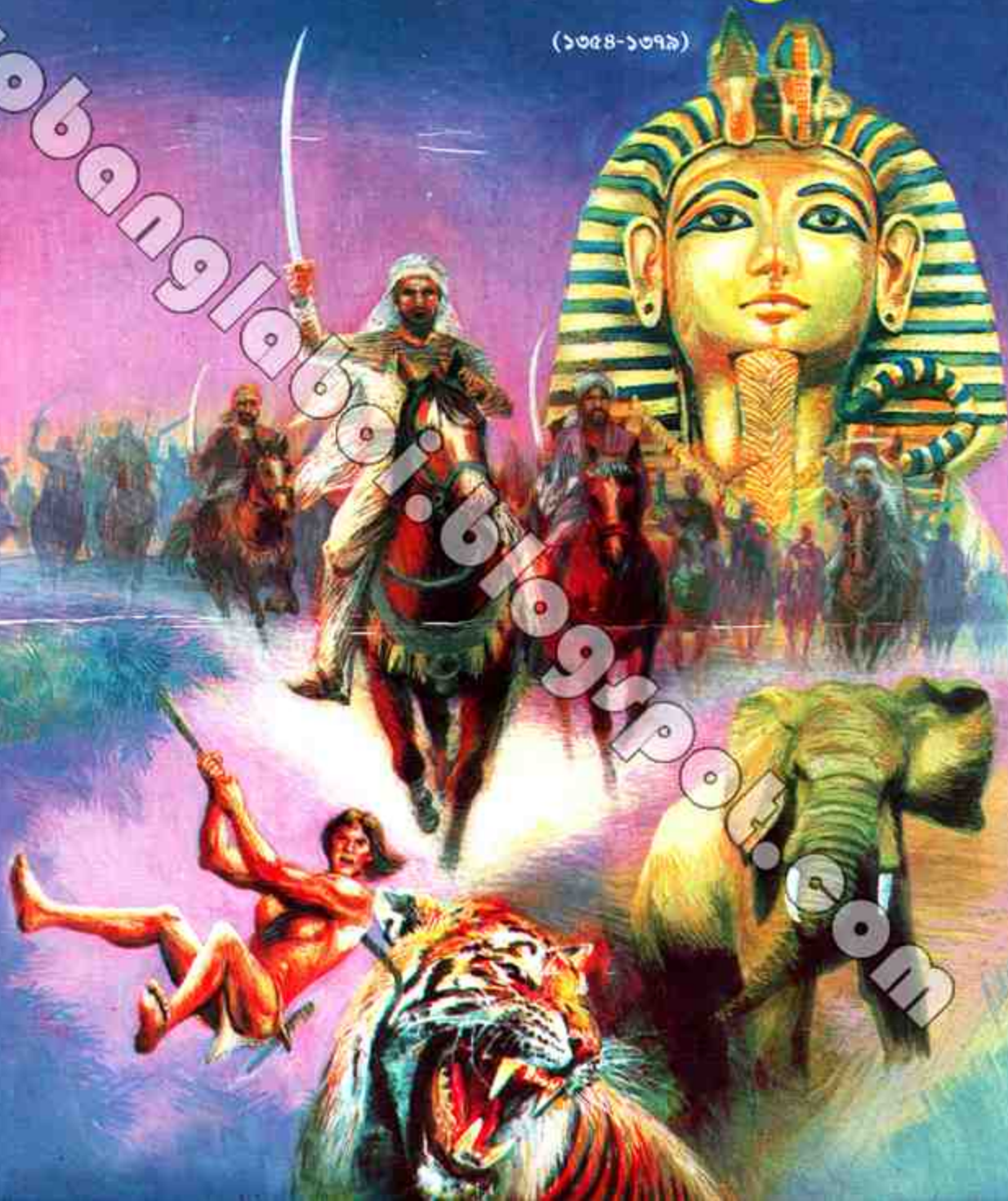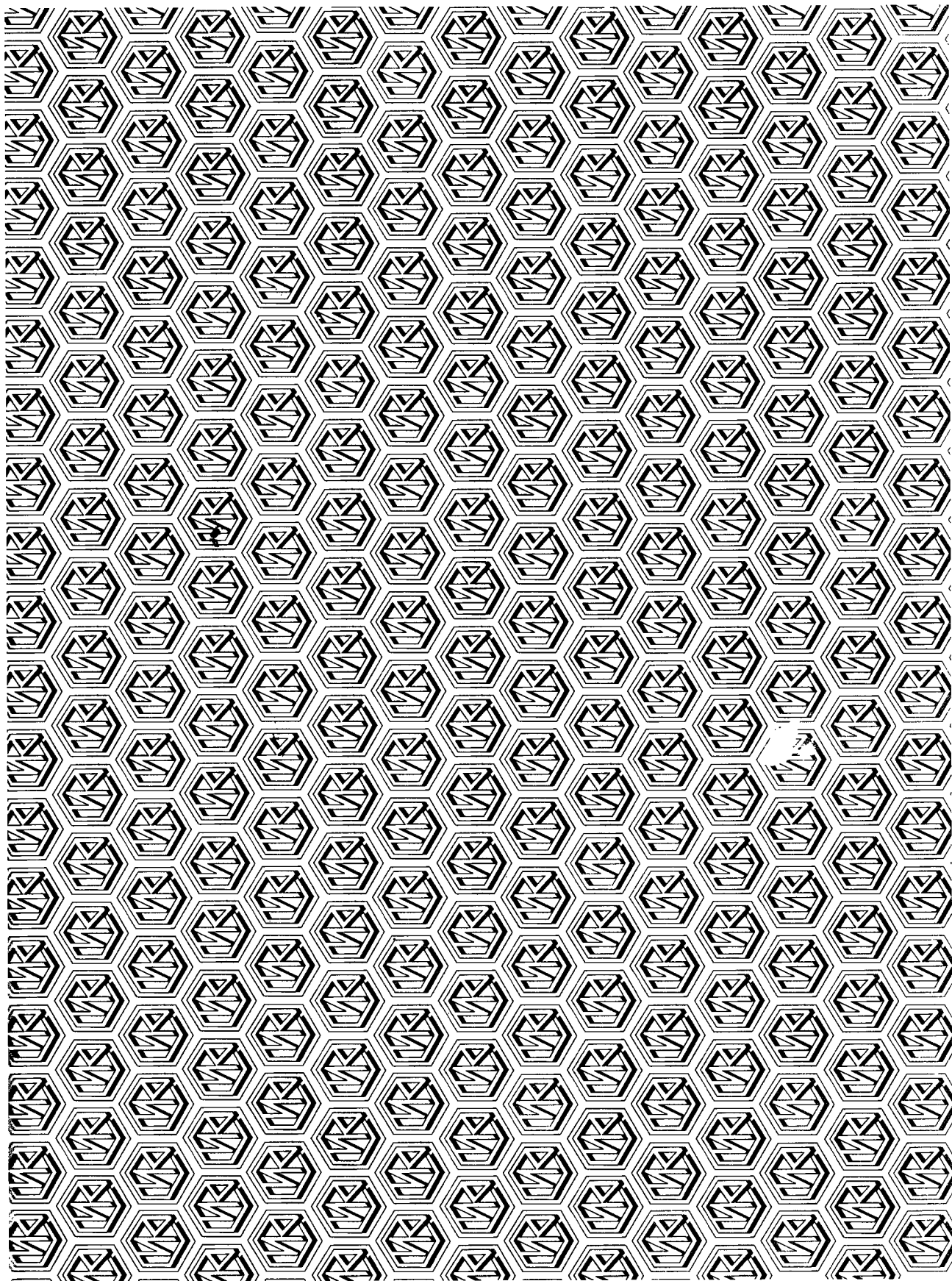
১৩৫৪—১৩৭৯

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

Sera Suktara
CODE NO 87-S-25

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা - ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭
মাঘ ১৪০৩

পুনর্মুদ্রণ ঃ
জানুয়ারি
২০১০

ছেপেছেন ঃ
বি সি মজুমদার
বি পি এম'স প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উঃ)

ছবি এঁকেছেন ঃ
প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ণ চক্রবর্তী
বলাই রায়
শৈল চক্রবর্তী
সমর দে
এন দত্ত
নারায়ণ দেবনাথ
তুষার চট্টোপাধ্যায়
শক্তিময়
কাজী

প্রচ্ছদ ঃ
বিজন কর্মকার

দাম ঃ ১৩০ টাকা মাত্র

(শুকতারার প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র কিছু অংশ।)

আমাদের অভিনন্দন—

জয় হিন্দ্!

শিশু-সাহিত্যের পবিত্র উদ্যানে পদার্পণ করবার আগে প্রণাম জানাই দেবতার পায়ে; তারপর বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকটি লোককে সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে, আমাদের পুরোবর্ত্তী অপরাপর শিশু-সহযোগীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের পরিশ্রম ও আদর্শ বাঙালী ছেলেমেয়েদের কোমল বুকে অনেক দিন হতে সঞ্জীবন-রসের কাজ করে আসছে; বাংলার ছেলেমেয়েরা তাদের শত ব্যথা-বেদনার মধ্যেও আমাদের অগ্রবর্ত্তী সহযোগীদের কাছেই খানিকটা আনন্দ ও শান্তি পেয়ে আসছিল। কাজেই সহযোগীদের কাছে আমরাও কৃতজ্ঞ— ছেলেমেয়েদের তো কথাই নাই!

আবার একখানা কাগজ কেন? প্রথম কৈফিয়ৎ—

এ কথার পরে অনেকে হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, তা-হলে বাংলাদেশে আবার একখানা নতুন শিশু-মাসিকের উদয় কেন?—তাঁদের এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত। প্রত্যুত্তরে আমরা শুধু এই কথাই বলতে চাই, মায়ের এক ছেলে যদি তার মাকে ভালবাসে, তা-হলে অপর ছেলের ভালবাসার কি কোন অধিকার নাই? অথবা, তা একেবারেই বৃথা? বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের অগ্রবর্ত্তী সহযোগীরা সে মায়েরই সেবা করে আসছেন; আমরাও আজ মায়ের সেবাব্রত মাথায় তুলে নিচ্ছি। কাজেই এই হিসেবে "শুকতারা"র উদয় নিছক মাতৃভক্তি।

দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ—

এ ছাড়া আরো একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন।—বাঙালী পরিবারে দুঃখ-দৈন্যের অভাব নেই। তবু এরই মাঝে, কচি ছেলেমেয়েরাই তাদের একমাত্র শান্তি ও আশা-ভরসা। তাদের বুকে আঁকড়ে নিয়েই গোটা বাংলাদেশ! কারণ, ছেলেমেয়েরাই দেশের আকর্ষণ, বাঙালী পরিবারে তারাই আমাদের বসোরাই গোলাপ! এমনি সব গোলাপকে ভালবাসে না কে? গোলাপ ফুল তার নিজের ঐশ্বর্য্যের দাবীতেই সকলের ভালবাসা আদায় করে নেয়—আমরাও তাই বাংলার গোলাপ-কুঞ্জে বাঁধা পড়ে গেছি। কাজেই তাদের মুখের হাসি যাতে শুকিয়ে না যায়, সে হাসি যাতে আরো শতগুণে বাড়িয়ে তোলা যায়, তাদের জীবন যেন রূপ-রস ও গন্ধে আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, আমাদের স্নেহান্ধ মমতা-সিক্ত হৃদয় আজ উদ্বেল কণ্ঠে সে কামনাই করছে! আমাদের গোপন-বুকের অন্তর্নিহিত সেই কামনাটুকুই মাত্র সম্বল করে, আমরাও আজ সেই ফুলের কুঞ্জে প্রবেশ করছি। উদ্দেশ্য,—তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে যদি তাদের পায়ের কাঁটা ও আগাছা কিছু তুলে ফেলা যায়! এমন একখানি নতুন মাসিক বার করবার জন্য বাংলার গোলাপ-শিশুরাও আমাদের কাছে অবিরত যে দাবী জানিয়ে আসছিল, তার দামও নিতান্ত কম নয়,—আমরা তা উপেক্ষা করতে পারলুম না।

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা লাভের লগ্নে যার জন্ম সেই শিশু আজ পঞ্চাশ বছরের পরিণত মানুষ। শুকতারাও তাই। অনেক ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে শুকতারা দিব্যি পেরিয়ে এল পঞ্চাশটা বছর। আগামী ফাল্গুন মাসে শুকতারা পা দেবে পঞ্চাশ বছরে। ছোটদের একটি পত্রিকার পক্ষে সাফল্যের সঙ্গে পঞ্চাশটা বছর পার হয়ে আসা সহজ কথা নয়। তাই শুকতারার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই **সেরা শুকতারা**। একটি নয়, দুটি। শুকতারার প্রথম পঁচিশ বছরে প্রকাশিত বাছাই করা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, নাটক, প্রবন্ধ, ম্যাজিক, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে প্রকাশিত হলো **সেরা শুকতারা** ১৩৫৪ থেকে ১৩৭৯। দ্বিতীয় স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে পরবর্তী বইমেলায়।

পঞ্চাশ বছর থেকে পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের জগৎ যাঁরা আলো করেছিলেন—আজ তাঁদের অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু শুকতারার পাতায় ধরা আছে তাঁদের অবিস্মরণীয় সব সাহিত্য সৃষ্টি। **সেরা শুকতারা** সেই সব লেখাকেই আবার এনে হাজির করল বাংলার সাহিত্যমনস্ক আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সামনে। বইটি তাই বয়স্কদের ফিরিয়ে দেবে তাঁদের হারিয়ে যাওয়া কৈশোর-যৌবনের দিনগুলি। আর এ যুগের পাঠক-পাঠিকারা **সেরা শুকতারা** পড়তে পড়তে অবাক হয়ে ভাববে, কী অসামান্য সব লেখাই না লিখে গেছেন সে যুগের স্বনামধন্য লেখক-লেখিকারা। সেরা শুকতারাকে তাই সে যুগের সঙ্গে এ যুগের মেল-বন্ধন বললে বোধহয় ভুল হবে না।

কেমন হলো বইটি? তার বিচার পাঠকরাই করবেন। আমরা শুধু এইটুকু বলতে চাই, যে আদর্শ নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে শুকতারা তার যাত্রা শুরু করেছিল—তা থেকে আমরা এতটুকুও সরে আসিনি। আদর্শ ছাড়া কী কিছু বাঁচে! শুকতারাও তাই তার আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে চলবে ভবিষ্যতের পানে, শতবর্ষের পথে।

বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭

সূচীপত্র

তুমি প্রভাতের শুকতারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে,
এই কথা বলে জ্যোতিষী।

★ ★ ★

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে কথা মানবই,
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য,
যেখানে তুমি আমাদেরি
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশির-বিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি,
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানব পথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ
জীবন-যাত্রার পথের মুখে—
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।।

(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

কৈশোরের স্বপ্ন

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১১।১২ সাল।

তখন বাঙলা দেশে ছেলেদের কৈশোরের কল্পনায় সার্থক জীবন ভাবতে গেলেই তিনটি স্বর্ণ-সিংহাসন ভেসে উঠত। একটিতে আঙুল দেখিয়ে দাঁড়াতেন তেজোদৃপ্ত এক সন্ন্যাসী—মাথায় গৈরিক পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, আয়ত অদ্ভুত দু'টি চোখ, বলতেন,—জানিও জন্ম হইতেই মহামায়ার উদ্দেশ্যে তুমি বলিপ্রদত্ত! আত্মবলি দিয়া এই সিংহাসনের অধিকারী হও। সে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

আর একটি সিংহাসনের পাশে দাঁড়াতেন—আর এক তেজোদৃপ্ত পুরুষ—মাথায় পাগড়ি, গায়ে চাপকান, দৃঢ়বদ্ধ অদ্ভুত দু'টি ঠোঁট, তেমনি ললাট, চক্ষে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাঁর হাতে লেখনী, কুক্ষিতলে বই। নাম পড়া যেত বইগুলির। কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের দপ্তর, আরও অনেক—অনেক।...তিনি বলতেন—আমার পিছনে এস। গান গেয়ে এস—পৃথিবীর দেশে দেশে—বাঙলা দেশের বেদনার গান। বলিও সুখের কথায় বাঙালীর অধিকার নাই, কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, সার্থক হলে এ সিংহাসনে তুমি বসতে পাবে।

আর একটি সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন একটি পনের-ষোল বছরের কিশোর। দেবদূতের মত কল্পনার জন সে, তার ছবি কখনও দেখিনি তবে বাউলদের মুখে তার গান শুনেছি।

বিদায় দে মা ফিরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী।

ক্ষুদিরাম আঙুল দেখিয়ে বলতেন, এ সিংহাসনের মূল্য গলায় ফাঁসি পরে দিতে হবে। বন্দে মাতরম্!

এই তখনকার দিন।

হয় বিবেকানন্দের মত দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী, নয় বঙ্কিমের আদর্শে সাহিত্যিক, নয় ক্ষুদিরামের আদর্শে শহিদ হওয়াই ছিল বাঙালীর ছেলের কৈশোরের স্বপ্ন।

প্রত্যাবর্তন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথাটা আগে থেকেই ঝিম ঝিম করছিল। আবার বোধ হয় জ্বর আসচে।

পাল্লা-হরিশপুরের মাইনর স্কুলে পড়ি। বাবার হাতে পয়সা নেই, মা কান্নাকাটি করেন, ছেলেটার লেখাপড়া হোল না—তাই পাল্লা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ষড়ানন চাটুয্যে আমার সাবেক স্কুলের মাস্টার মহাশয়ের অনুরোধে পাল্লার মাইনর স্কুলে বিনা মাইনেতে পড়তে দিয়েচেন। গ্রামের পুরুতঠাকুর শ্রীগোপাল চক্কত্তি দয়া করে তাঁর বাড়িতে আমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করেচেন। আছি এখানে আজ বছরখানেক হোল।

থাকতে পারিনে ভালোভাবে দু'কারণে। সে কথা কেউ জানে না। মা জানতো; কিন্তু মা তো এখন নেই এখানে।

প্রথম—ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছি আজ একটি বছর। কত ওষুধ খাচ্ছি, কিছুতেই সারে না।

দ্বিতীয় কারণটা—আমার ছোট ভাই দেশে আছে, তার নাম নন্তু। বড় চমৎকার ছেলে সে। সাত বছর বয়স হোল। আগে আমায় ডাকতো—'তাতা—ও তাতা'। এখন 'দাদা' বলেই ডাকে। সুন্দর দেখতে। নন্তুকে না দেখে বড় কষ্ট হয়।

সেদিন টিফিনের ছুটি হবার আগেই মাস্টার মশাইকে বলি—স্যার, আমার জ্বর আসচে—

ননী মাস্টার আমার দিকে চেয়ে সহানুভূতির সুরে বললেন—আবার জ্বর?

—হ্যাঁ, স্যার।

—বাড়ি যাবি?

—এখন হাঁটতে পারব না, স্যার!

—বেঞ্চিতে শুয়ে পড়। আয় দিকি হাত দেখি—

হাত দেখতে হোল না, গায়ে হাত দিয়েই বললেন—এঃ বড্ড জ্বর যে! গা পুড়ে যাচ্চে। শুয়ে পড়।

শুয়েই পড়ি বেঞ্চিতে।

তারপর জ্বরে কখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েচি। যখন জ্ঞান হোল তখন আমতলার স্কুল বোর্ডিঙে আমাদের ক্লাসের গোপালের তক্তপোশে শুয়ে আছি।

গোপাল আমার পাশে দাঁড়িয়ে; বললে—কেমন আছিস বিনোদ?

সে কোথা থেকে দৌড়ে এসেচে। গায়ে ঘাম, মুখ রোদে রাঙা হয়েচে। বললাম—দৌড়ুচ্ছিলি?

—হাঁ, ষাঁড় তাড়াচ্ছিলাম—হেডমাস্টারের কপিক্ষেত সাবাড় করেচে।

—আমার গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখ—জ্বর আছে?

—হুঁ! বেশ আছে। বাড়ি যাবিনে?

—হাঁটতে পারলেই যাবো।

—তাই যা। এখানে শোবার জায়গা নেই, কোথায় থাকবি? বাড়ি যা—

বাড়ি যাবো কোথায়, তাই ভাবি। এ আমার নিজের বাড়ি নয়। যাঁর বাড়ি থাকি, তিনি বাড়ি বাড়ি ঠাকুরপুজো

করে বেড়ান। তাঁর বাড়িতে খুব খাটতে হয় আমাকে, তাঁর ছোট মেয়েটাকে সর্ব্বদা কোলে করে বসতে হয়। একটু যদি কেঁদে ওঠে খুকি, তার মা আমার ওপর চটে যান।

একদিন মনে আছে, স্কুল থেকে বাড়ি গিয়েচি, খিদেয় সমস্ত শরীর যেন হালকা হয়ে গিয়েচে! খুকিকে আমার কোলে দিয়ে তার মা রান্নাঘরে ঢুকলেন। আমি আসবার আগে থেকেই খুকি কাঁদছিল। আমার কোলে উঠে আরও কাঁদতে লাগলো। আমি কত বোঝালাম, কত ছড়া বল্লাম, গান গাইলাম, কিছুতেই শুনলে না, কান্নাও থামলো না। ওর মা এমন রেগে গেলেন আমার ওপর, আমার কাছ থেকে খুকিকে নিয়ে নিজে কোলে করে বসলেন। আমায় কিছু খেতে দিলেন না। রাত্রেও আমাকে ভাত দিতেন না বোধ হয়। রাত্রে চক্কত্তি-মশায় খেতে বসে বললেন—বিনোদ খেয়েচে?

তখন কত রাত হয়ে গিয়েচে! খিদেয় অবসন্ন হয়ে পড়েচি। স্কুল থেকে এসে পর্য্যন্ত এক গাল মুড়িও খাইনি।

অন্য দিন এমন সময় কোন্ কালে আমার খাওয়া হয়ে যায়! পুরুত-মশায় নবীন দাঁর চণ্ডীমণ্ডপের দাবা খেলার আসর থেকে রোজই বেশি রাত করে ফেরেন। তারপর তিনি খেতে বসেন।

খুকির মা বল্লেন—না।

পুরুত-মশায় বল্লেন—কেন? এত রাত্রেও খায়নি এখনো? জ্বর হয়েচে বুঝি?

—না, জ্বর হবে কেন? বসে পড়ছিল, তাই ভাত দিইনি এখনো।

—যাও, ডেকে দাও। ছেলেমানুষ, খিদে পেয়েচে, আমার পাশেই বসুক।

—তুমি খেয়ে উঠে যাও, দেবো এখন।

—না, ওকে ডাকো। জায়গা করে দাও এ পাশে।

পুরুত-ঠাকুরের কথায় আমায় জায়গা করে ভাত দিলেন খুকির মা। নয়তো আমি জানতাম রাত্রে আমায় তিনি না খাইয়ে রেখে দিতেন। কাউকে কিছু বলা আমার স্বভাব নয়। চুপ করেই থাকতাম।

সেই বাড়িতেই ফিরে যাওয়ার কথা বলচে গোপাল!

সেখানে আমার মা নেই। মা থাকলে আমায় দেখলে রাস্তা থেকে ছুটে আসতেন। এখানে খুকির মা আমার জ্বর দেখলেই মুখ ভার করে বলবে—ঐ এলেন অসুখ নিয়ে! কে এখন সেবা করে? আমার তো বড্ড উপকার হচ্ছে ওঁকে দিয়ে! কুটোটুকু ভেঙে দুখানার উপকার নেই। শুধু সেবা করো। বার্লি রে—সাবু রে—

কিছুই করতে হয় না তো ওঁকে। আমি ওঁকে কখনো কষ্ট দিই নে। আমার রোজ জ্বর লেগেই থাকে। ওঁকে ডাকতে বা কিছু বলতে আমার লজ্জা হয়। উনিও আমার কাছে বড় একটা আসেন না। মিথ্যে বলবো না, সে বরং পুরুত-মশায়। যত রাত্রেই ফিরুন না দাবা খেলে, আমার অসুখ হয়েচে শুনলে আমার শিয়রে এসে বসে আমার হাত দেখবেন; গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখবেন। স্ত্রীকে ডেকে বলবেন সাবু কি বার্লি করে দিতে। নিজে কাছে বসে খাওয়াবেন। সকালে উঠে গোবিন্দ ডাক্তারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ব্যস্ত হয়ে—ও ডাক্তারবাবু, বিনোদ যে এমন ভুগতে লাগলো! পরের ছেলে, আমার বাড়ি আছে, অমন করে পড়ে থাকলে মন বড় ব্যস্ত হয়; ওর অসুখের একটা বিহিত করুন।

পুরুত-মশায়কে দেখলে বাবার কথা মনে পড়ে। দুজনেই নিরীহ; কেউ ওঁদের মানে না, বরং ওঁরাই সবাইকে ভয় করে চলেন!

বড় যদি হই, পুরুত-মশায়ের দুঃখু আমি ঘোচাবো। ওঁর ছেলে নেই। আমি ওঁর ছেলে হবো। না, ওঁদের বাড়ি আমি এখন যাবো না। জ্বর আমার এবার খুব বেশি। হয় তো আরও বাড়বে।

গোপালকে বল্লাম—ভাই, আমি মার কাছে যাবো।

—মার কাছে যাবি! তোদের গাঁয়ে? সে এখান থেকে ছ'কোশ রাস্তা। নদী পার হতে হবে আড়ানির খেয়াঘাটে। পারবি কেন? এই জ্বর গায়ে—

—তা হোক। তুই কাউকে বলিস নে। আমার পকেটে সরকারি ডাক্তারখানার ওষুধ আছে। আমি যাবো। রাত্তিরটুকু তোর খাটে থাকতে দে—

গোপাল রেগে গেল। বল্লে—দায় পড়েচে তোকে থাকতে দিতে! তোর যত বাজে আবদার! বাড়ি যাবি কি করে এই অসুখ গায়ে? বাড়ি যাবি বল্লেই হোল? আমারও খাটে নেই জায়গা। দুজনে শোবো কোথায়? আমি রুগীর সঙ্গে এক বিছানায় শুই নে। বাড়ি যা।—

মনে বড় দুঃখু হোলো, গরীব বলে সবাই হেনস্থা করে! গোপাল যে আমায় এই অসুখ গায়ে তাড়িয়ে দিবে, তার মানেও তাই।

আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বেলা এখনো ঘণ্টা দুই আছে। শরীরটা একটু হাল্কা মনে হচ্চে। এই দু' ঘণ্টা হাঁটলে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারবো না? খুব পারবো। খেয়াঘাটের ইজারাদার যে ঘরে থাকে,

বল্লে আমাকে জায়গা দেবে না একটু? গোপালের মত নিষ্ঠুর তারা নয়। পুরুত-ঠাকুরের বৌয়ের মতন নিষ্ঠুর তারা নয়।

—আচ্ছা ভাই, চল্লাম।

বলেই রওনা হোলাম বোর্ডিং থেকে। লুকিয়ে মাঠের রাস্তা ধরলাম। আমি জানি আমি বেশিদিন বাঁচবো না। মাকে আমার দেখতেই হবে। কারো কাছে যাবো না, মার কাছে যাবো।

চৈত্র মাস। অথচ এমন শীত করে এখনো! বেলা খুব বেড়েচে। মেঠো পথের দুধারে ঘেঁটুফুল ফুটেচে কতো!

বাঘজোয়ানির ঠাকুর-বাড়ি পার হয়ে ফলেয়া গ্রামের পথে পড়ে ছোট্ট খালের খেয়া। একখানা নৌকো আছে। মাঝি থাকে না, নিজেই নৌকো বেয়ে পার হয়ে ওপারে শিমুলতলায় বসি। শিমুল ফুটেচে গাছটাতে, টুপটাপ করে রাঙা ফুল ঝরে পড়চে। শুকনো কঞ্চির বেড়া দিয়েচে পোড়া খালের ধারে ধারে। চাষাদের মুসুরি-ক্ষেতে মুসুরি পেকে গাছ শুকিয়ে গিয়েচে, কিন্তু এখনো মুসুরি তোলেনি। ঘেঁটুফুলের কি সুন্দর সুগন্ধ বেরুচ্চে পড়ন্ত রোদে! নিঃশ্বাস টেনে শুঁকি।

কেবলই হাঁটচি, কিন্তু হাঁটতে পারি নে আর। পা ধরে আসচে। ফলেয়া গ্রামের পেছনে মস্ত বাঁশবাগানে মরা শুকনো বাঁশপাতার কেমন চমৎকার গন্ধটা! বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়ে পথটা, তারপর আবার মাঠ। মাঠের মধ্যে বড় একটা যজ্ঞিডুমুর গাছ। থোলো থোলো যজ্ঞিডুমুর পেকে টুক্‌টুক্ করচে গাছে। আমার গা বমি-বমি করছিল। ডুমুরতলায় বসে বমি করলাম। গা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো! জলতেষ্টা পেলো। ঠাণ্ডা জল কোথায় পাই?

অবসন্ন হয়ে বসে থাকলে চলবে না। মার কাছে পৌঁছতেই হবে। কখনো একা এতদূর পথ হাঁটিনি। ভয় করচে। অন্য কিছুর ভয় আমার নেই। চিল্‌তেমারি গ্রামের শ্মশানটা রাস্তার ধারেই পড়ে। শ্মশানে নাকি কত লোক ব্রহ্মদত্যি দেখেচে, পেত্নী দেখেচে। চিল্‌তেমারি যেতে অবিশ্যি সন্দে হবে না। হে ভগবান, যেন সন্দে না হয়! মাকে দেখতেই হবে। তার আগে যেন সন্দে না হয়, অথবা না মরি! হে ঠাকুর!

একটা কাদের বাড়ি পথের ধারে। দরজায় দাঁড়িয়ে বল্লাম—একটু জল দেবে?

একটি দশ-যারো বছরের মেয়ে আমার সামনে এসে বল্লে—কি জাত?

—ব্রাহ্মণ।

—আমাদের জল খাবে? আমরা জেলে।

—তা হোক্, দাও।

মেয়েটি একটু পরে একখানা পাটালি আর এক ঘটি জল নিয়ে এসে আমায় দিলে। আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে বল্লে—তোমার কি হয়েচে?

—জ্বর।

—কোথায় বাড়ি?

—মনোহরপুরে। পাটালি খাবো না। শুধু জল দাও।

জল খেয়ে আমি হেঁটে চল্লাম অতি কষ্টে। মেয়েটা আমার দিকে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল কতক্ষণ। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্চে। সে চেঁচিয়ে বল্লে—আজ এখানে থেকে গেলেই পারতে। হ্যাঁগা?

আমি ঘাড় নেড়ে বল্লাম—না, আমাকে যেতেই হবে; মার জন্যে মন কেমন করচে!

আবার মাঠ! কি সুন্দর মাঠ! শুধু আকন্দ ফুল আর ঘেঁটুফুল ফুটে আছে। যদি শরীর ভালো থাকতো, এখন মাঠে হাডুডু খেলতাম বন্ধুদের নিয়ে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। এখনো সামনে চিল্‌তেমারি গ্রাম, তারপর কেউটেপাড়ার খেয়াঘাট—যমুনা নদীর ওপর। সন্দে হোলেই আমার ভয় করবে। চিল্‌তেমারির শ্মশান তার আগে পেছনে ফেলতেই হবে; কিন্তু আর যেন হাঁটতে পারচি নে! শরীর কেমন করচে!

একটা তুঁতগাছের তলায় গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসে দম নিই। সূর্য্যটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। সূর্য্য ডুবলেই অন্ধকার হয় না। ভরসা একেবারে ছাড়িনি। আচ্ছা, এই তুঁততলায় যদি আর খানিকটা বসি? না, তা হোলে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাটে পৌঁছতে পারবো না। আবার জ্বর আসবে নাকি? শীত করচে আবার।

এক দাগ ওষুধ পকেট থেকে বের করে নাক টিপে খেয়ে নিলাম। বিকট তেঁতো কুইনিন্ মিক্‌চার। মা সুপুরি কেটে দেবে বাড়িতে, তখন শুধু মুখে আর ওষুধ খেতে হবে না। চিল্‌তেমারি ছাড়ালাম প্রাণের দায়ে জোরে হেঁটে। শ্মশান-রাস্তার বাঁ-দিকে, তেলাকুঁচো আর সোঁদালি গাছের নিবিড় ঝোপে অন্ধকার হয়ে আসচে। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখে সন্তর্পণে রাস্তা পার হয়ে যাচ্চি।

কে যেন বলে উঠলো, পারবি নে তুই মায়ের কাছে যেতে। আমরা তোকে যেতে দেবো না। তোকে এই শ্মশানেই রাখবো।

দূর! ওসব মনের ভুল। রাম রাম, রাম রাম! এখনো অন্ধকার হয়নি। অন্ধকার না হোলে ওসব বেরুতে পারে না। রাম-নামে ভূত পালায়।

সত্যি আর কিন্তু হাঁটতে পাচ্ছি নে। কেউটেপাড়া এখনো কত দূর! ওই দূরে বাঁশবন দেখা যাচ্ছে কেউটেপাড়া গ্রামের। এখনো অনেক দূর। এই বড় মাঠটা পার হতে হবে, জনপ্রাণী নেই! এই সন্দের সময় মাঠে। কেউ দেখবার নেই!

কেন গোপাল আমায় তাড়িয়ে দিলে বোর্ডিং থেকে? আমার ভয়ানক জ্বর এসেচে। আবার জ্বর এসেচে। কেউটেপাড়া কতদূর? চোখে যেন সর্ষের ক্ষেত দেখচি চারিদিকে! পুরুত-ঠাকুরের স্ত্রী রাগ করে বলচেন—মাগো, ছেলেটার শুধু জ্বর আর জ্বর! পরের আপদ কে দেখা-শুনো

করে? আজই বিদেয় করে দাও!

ননী মাস্টার বলচে—ওর পা ফুলেচে, ও বাঁচবে না। ও এবার যাবে।

ডানদিকে একটু বড় জামগাছ রাস্তার ধারে। ঐখানে একটু শুয়ে জিরিয়ে নেবো? আর এক দাগ ওষুধ খাবো? আর হাঁটতে পারিচি নে। ভীষণ জ্বর এসেচে।

হঠাৎ আমার মনে হোল ওই জামতলাতেই মা আঁচল বিছিয়ে বসে আছেন! আমি আসবো বলেই কখন থেকে বসে আছেন! মা এগিয়ে এসেচেন আমায় নিতে।

আমি টলতে টলতে গিয়ে মার কোলে শুয়ে পড়ি। মাথায় একটা কিসের চোট্ লাগলো! তারপর আমার আর জ্ঞান নেই। অন্ধকার নামলো মাঠে।

উদরের জয়

শ্রীকালিদাস রায়

খাটের 'পরে শয্যা ছিল পাতা,
সেখানে চোখ হাত পা মুখ ও মাথা,
ছোট বড় সকল অঙ্গ একসাথে সব মিলে
করল সভা। সভাপতি মাথা আদেশ দিলে
দাঁড়িয়ে উঠে মুখ
বল্লে ডেকে—"হে বন্ধুগণ, দেখেছ কৌতুক,
আমরা সবাই মরছি খেটে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে
উদর ভুঁড়ি বাগান শুধু চুপটি ক'রে রয়ে।
বিনাশ্রমে খাবেন শুধু বেহায়া উদর,
যোগাব না আহার ওরে আমরা অতঃপর।"
বল্লে সবাই—"ঠিক বলেছ, ব'সে ব'সে গেলা,
চলবে না আর, বুঝুন এবার উদরবাবু ঠেলা।"
মাথা শুধু বল্লে—"এসব আত্মঘাতী ঘোঁট,
নেইক জেনো এতে আমার ভোট।"
আহার যোগাড় করে না পা, পেলেও কিছু মোটে
হাত তারে আর তোলেই নাক ঠোঁটে।
মুখে কেহ গুঁজে দিলেও ভাত
চিবায় নাক দাঁত।
এমনি ক'রে কেটে গেল সাতটি পুরা দিন,
দ'মে এলো উৎসাহ আর শক্তি হ'লো ক্ষীণ,
হ'লো সবার হাড় চামড়াই সার।
মাথাটাকে তুলতে নারে ঘাড়।
পা চলে না, হাত ওঠে না, বাক্ ফুটে না মুখে,
প্রাণ ধুকধুক করছে শুধু বুকে।
বল্লে মাথা—"বিপদ্ ডেকে আনলি রে না-হক,
মিটল এবার শখ?
দেখতে চোখে পাসনে যা তাই ভাবিস বুঝি নাই।
ভ্রান্ত তোদের এই ধারণাটাই।
বুঝলি এবার উদর তোদের খায় না ব'সে ব'সে।
তোদের দেওয়া আহার দিয়ে তোদেরই সে পোষে।
তার ভিতরে লুকিয়ে আছে মস্ত একটা কল,
তাইতো তোদের যোগায় জীবন বল।
তোদের একটা ছাঁটলেও নেই ক্ষতি,
উদর ছাড়া নেইক কারো গতি।
খাটে সবাই, কেউ বা খাটে আফিস হাটে মাঠে,
লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে কেউ খাটে।"

দরিদ্র-নারায়ণ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শিশুদের কচি মনে বিশ্বাস ও প্রেরণা জোগানই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। সে কাজে সফল হলে মর্ত্যের শিশু স্বর্গের শিশুতে পরিণত হয়, স্বর্গের দেবতাও তখন হয়ে পড়ে তার খেলার সাথী ও আত্মীয়-স্বজন!

ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে। বয়স সাত কি আট। নাম রেবা। সেদিন একটা বই খুলে কবিতা পড়ছিলঃ

ভগবান হায় তুমি কি নিঠুর,
পাষাণ তোমার দেহ,
ডেকে ডেকে শুধু হায়রানি সার,
জবাব পায় না কেহ!

পড়তে পড়তে হঠাৎ তার কি মনে হলো কে জানে, মাকে জিজ্ঞাসা করে বসলোঃ 'ভগবান কেমন মা? তুমি দেখেছো?'

মা বললেনঃ 'সবাই তো তাঁকে দেখতে পায় না মা, প্রাণ ভরে তাঁকে ডাকতে হয়, তাহলেই তাঁর দেখা মেলে।'

প্রাণ ভরে ডাকা! সে আবার কি রকম? রেবা বললেঃ 'আমি যদি আজ থেকে ডাকি, তাহলেই দেখা পাবো?'

মা বললেনঃ 'ডাকার মত ডাকলেই দেখা পাবে। যেদিন তিনি বুঝবেন—তুমি তাঁকে না দেখে আর থাকতে পারছো না—সেই দিনই তিনি তোমার কাছে আসবেন।'

'কেমন করে আসবেন? চুপি-চুপি?'

'চুপি-চুপি কেন? যেমন করে সবাই আসে, তেমনি করে ঠিক মানুষের মতই আসবেন।'

'আমি তাঁকে চিনবো কেমন করে মা? ভগবান দেখতে কেমন?'

'যেমনটি তুমি ভাববে, ঠিক তেমনি।'

'আমি যদি ভাবি—তোমার মতন?'

'ঠিক আমার মতন হয়েই দেখা দেবেন।'

'যদি ভাবি খোকনের মতন?'

'খোকনের মতন হয়েই দেখা দেবেন।'

'ভগবান কি তাহলে হীরামতি বহুরূপীর মত নাকি মা?'

মা এবার বিরক্ত হলেন। কত জবাব দেবেন? বললেনঃ 'তুই ভারি বক্‌তে পারিস মা! আমি আর তোর আবোল্-তাবোল্ কথার জবাব দিতে পারবো না। বড় হলে সব বুঝতে পারবি।'

রেবা বললেঃ 'না, আমি বড় হব না। আমি এক্ষুণি বুঝবো।'

মা আর কিছু না বলে চলে গেলেন।

রেবা ছিল বাড়ীতে একা। বাবা কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন। মা গেছেন গঙ্গা নাইতে।

রেবা তার পুতুল নিয়ে আপন মনেই খেলা করছিল। মা তার হাতের কাছে এক বাটি মুড়ি আর খানিকটা গুড় রেখে গেছেন। রেবা তাতে হাতও দেয়নি।

এমন সময় এক ভিখারিণী এসে দাঁড়ালো রেবার কাছে। বললেঃ 'চারটি খেতে দেবে মা?'

রেবা বললেঃ 'এই একবাটি মুড়ি আর একটু গুড় আছে; খাবে?'

ভিখারিণী বললেঃ 'কেন খাব না মা?'

বলেই সে তার আঁচল পাতলে। বললেঃ 'দাও, আমার এই আঁচলে ঢেলে দাও।'

রেবা তার আঁচলে মুড়িগুলি ঢেলে দিলে।

ভিখারিণী তার মুখের পানে তাকালে। তারপর বললেঃ 'তুমি রাজরাণী হবে! একা কেন বাছা? মা কোথায়?'

রেবা বললেঃ 'মা আজ ঠাকুরের পূজো করবে কি-না, তাই গঙ্গা নাইতে গেছে।'

'তোমার মা বুঝি ঠাকুরের পূজো করে?'

'হ্যাঁ, রোজ পূজো করে। রোজ চোখ বুজে ঠাকুরকে দেখে। আমি এত করে বলি, আমাকে কোনোদিন দেখায় না। মা বলে, তুমি ডাকো, ডাকলেই দেখতে পাবে।'

ভিখারিণী জিজ্ঞাসা করলেঃ 'ঠাকুরকে তুমি দেখতে চাও?'

রেবা বললেঃ 'হ্যাঁ, খুব চাই, নিশ্চয়ই চাই, দিনরাত দেখতে চাই, কিন্তু কই, দেখতে তো পাই না।'

ভিখারিণী বললেঃ 'আমি যদি বলি—তুমি যাকে দেখতে

''না আমি বড় হব না। আমি এক্ষুণি বুঝবো।'

চাও, আমিই সেই ঠাকুর!'

রেবা অবাক্ হয়ে ভিখারিণীর মুখের পানে একবার তাকালে! তাকিয়ে ভাবলে, মা বলেছিল—ভগবান বহুরূপী। হয়-ত' হবেও-বা!

রেবা বললেঃ 'তুমি ঠাকুর? তাহলে তোমার ওই কাপড়খানা ছেঁড়া কেন? তুমি খেতে পাও না, তুমি গরীব, তুমি—'

কথাটা ভিখারিণী তাকে শেষ করতে দিল না। বললেঃ 'হ্যাঁ, মা, গরীব সাজতে ভগবানের খুব ভাল লাগে। যারা গরীব, যারা খেতে পায় না, পরনের কাপড় নেই,- আজ থেকে জেনো মা—সেই তারাই তোমার ভগবান, তারাই তোমার ঠাকুর।'

এই বলে সে চলে গেল।

রেবার মা গঙ্গা নেয়ে ফিরে এসে যেই ঘরে পা দিয়েছেন, রেবা তাঁর কাছে গিয়ে বললেঃ 'মা, ঠাকুরকে আজ আমি দেখেছি।'

রেবার মা হেসে বললেনঃ 'কোথায়?'

রেবা বললেঃ 'এইখানে, আমাদের বাড়ীতে। আবার যেদিন আসবে, তোমাকে দেখাবো।'

মা হাসতে লাগলেন।

কিন্তু কি জানি কেন, সেইদিন থেকে রেবার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেল—যারা গরীব, যারা খেতে পায় না, তারাই তার ভগবান।

ঘনার বচন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মরতে গেলেও বাঁচতে হবে
পড়তে গেলেও উড়তে।
পিছনে তীর টেনেই তবে
সামনে পারো ছুঁড়তে!

দুনিয়াখানাই উল্টো!
সোজা কথা শোনাও যদি
বুঝবে সবাই ভুল ত'।

বাক্য কিছু হোক্ না বাঁকা
মন শুধু থাক সিধে।
কষে কথা প্যাঁচাও, যদি
মর্ম্মে না যায় বিঁধে।

তিলকে যত তাল করো না,
দিনকে করো রাত।
মুখের তোড়ে হয় যদি তা
হোক্ না বাজি মাৎ।

তালটা শুধু সামলান চাই
হোয়ো না রাত-কাণা।
নইলে পড়ে বেঘোরে শেষ
বুঝবে ঠেলাখানা।

ঘনার বচন শোনো,
সোজা হিসেব পেতে হ'লে
উল্টো করে' গোনো।

উর্ম্মির পছন্দ

বনফুল

চার বছরের উর্ম্মি তার দাদুর সঙ্গে গিয়েছিল গঙ্গার ধারে বেড়াতে। শীতকালের গঙ্গা, বালুর চর বেরিয়ে পড়েছে চারদিকে, আর সেই চরের মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে বইছে জলের ধারা। স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়ে তলা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চিকমিক করছে বালি।

"ওগুলো কি দাদু?"

"বক—"

"চারটেই বক? অত শাদা কেন?"

"ফরসা জামাকাপড় পরেছে।"

"অমন গলা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে কেন আস্তে আস্তে"

"তোমার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে বোধ হয়।"

"কেন?"

"তোমাকে বিয়ে করতে চায়।"

উর্ম্মি ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল বকগুলোর দিকে।

"চারটেকেই আমি বিয়ে করব?"

"করলে ক্ষতি কি। দ্রৌপদী তো পাঁচজনকে বিয়ে করেছিল—"

"দৌপদী কে?"

র-ফলা বেরোয় না উর্ম্মির মুখে।

"সে গল্প আর একদিন বলব তোমাকে।"

"এখনি বল না—"

"আগে ঠিক কর বকদের বিয়ে করবে কি না।"

উর্ম্মি ঘাড় বেঁকিয়ে ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—"করব না। বড্ড লম্বা গলা ওদের, ঠুকরে দেবে না?"

"ঠিক বলেছ, কথাটা ভাবিনি তো!"

খঞ্জনও চরছিল কয়েকটা জলের ধারে। দু-তিন রকম খঞ্জন, কারও হলদে মুখ, কারও শাদা মুখ, কারও ছাই ছাই রং, ল্যাজ্ দুলিয়ে দুলিয়ে মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছিল সবাই। একটা খঞ্জন লাফ দিয়ে উঠতেই উর্ম্মি দেখতে পেলে সেটাকে।

"দেখ দেখ দাদু আর একটা পাখী। একটা নয়, অনেকগুলো। কি রকম লাফালাফি করছে। ল্যাজও দোলাচ্ছে। দেখতে পেয়েছ?"

"আমি অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। ওরা এদেশের পাখী নয়, বিদেশ থেকে এসেছে। অনেক দূর থেকে মাঠ, বন, পাহাড়, নদী পার হয়ে।"

"অনে—ক দূর থেকে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন এসেছে?"

"তোমাকে বিয়ে করবে বলে।"

"আমাকে?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। কেমন সেজে এসেছে দেখছ না?"

"ওরা তো পাখী। পাখীকে বিয়ে করলে মা-বাবা বকবে না?"

"বকবে কেন?"

"তাহলে পাখীর খাঁচায় হাত দিলে মা বকে কেন?"

"টিয়া পাখী যে কামড়ে দেয়।"

"ও। খঞ্জন কামড়ায় না বুঝি?"

"না। কি সুন্দর দেখছ না? কেমন খুর-খুর করে বেড়াচ্ছে—"

"বড্ড ছটফটে কিন্তু। কি রকম লাফালাফি করছে দেখেছ?"

"খঞ্জন তাহলে তোমার পছন্দ নয়?"

"নাঃ।"

"ওই দুটোকে পছন্দ হয়?"

"কোন্ দুটোকে? ওই যে খঞ্জনদের ওপাশে চরে বেড়াচ্ছে? কি পাখী ওরা?"

"বাটান। ছোট বাটান, গলায় কেমন সুন্দর কালো কণ্ঠী দেখেছ—"

"কোথায় থাকে ওরা?"

"ওরাও বিদেশে থাকে। এখানে বেড়াতে এসেছে।"

"কেন?"

"তোমাকে বিয়ে করবে বলে।"

"সব্বাই আমাকে বিয়ে করবে?"

"তুমি পছন্দ করলেই করবে।"

"আমার কাউকে পছন্দ নয়।"

"তাহলেই তো মুশকিল। মানুষ বর পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। পাখীই একটা পছন্দ করতে হবে।"

"কি পাখী?"

"চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ যেটা তোমার পছন্দ হয়।"

উর্ম্মি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"ওগুলো কি দাদু?"

এক ঝাঁক সোয়ালো উড়ছিল জলের উপর। সূর্য্যের আলো পড়ে চকচক করছিল তাদের কৃষ্ণ-নীল পিঠের রং। থামছিল না এক মুহূর্ত্ত। জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল ক্রমাগত।

"ওগুলো সোয়ালো। বাংলা নাম আরাবিল।"

"ওরাও কি বিয়ে করবে বলে এসেছে?"

"তাইত মনে হচ্ছে—"

"ওদের আমি বিয়ে করব না। বিচ্ছিরি নাম। তাছাড়া একটুও বসছে না, খালি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, গল্প করব কখন? আচ্ছা দাদু ওরা আমাদের মতো কথা বলতে পারে তো—!"

"শেখালে পারবে। টিয়াটা কেমন কথা বলে শুনেছ তো।"

"চমৎকার কথা বলে টিয়াটা। কিন্তু বড্ড কামড়ায় বে। বাঃ, ওই পাখীটা তো চমৎকার, কি ওটা—"

গাছের ডালে একটা শালিক বসেছিল, ঘাড় নেড়ে নেড়ে ডাকছিল যেন উর্ম্মিকে।

"ওটা শালিক—! ঘাড় নেড়ে নেড়ে তোমাকে ডাকছে—চল ওর কাছেই যাওয়া যাক—"

গাছটার দিকে এগিয়ে যেতেই 'পিড়িং' শব্দ করে উড়ে গেল শালিকটা।

তারপর দাদুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ঘুরল উর্ম্মি। দাদু তাকে আরও পাখী, গাছপালা, আকাশের মেঘ, সবুজ গমের ক্ষেত দেখালেন। উর্ম্মি কিন্তু বেশ একটু অন্যমনস্ক। যে গাছটায় শালিক পাখীটা বসেছিল সেই গাছটার দিকে ফিরে ফিরে চাইছে কেবল।

দাদু ডাকলেন—"উর্ম্মি—"

উর্ম্মি মুচকি হেসে বললে, "পিড়িং—"

"ওকি—"

"আমি শালিক পাখী হয়েছি। শালিককেই বিয়ে করব। ওর ঠোঁটটা বেশ সুন্দর হলদে নয়? ঠিক আমার ফ্রকের মতো।"

দুদিন আগে উর্ম্মিকে হলদে রঙের ফ্রক কিনে দেওয়া হয়েছিল।

"বেশ, তাহলে শালিকের কাছেই লোক পাঠাই গে চল—! রাজি হয় তবে তো?"

উর্ম্মিকে নিয়ে গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে এলেন দাদু।

বসন্তে

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ঝরে গীতের ঝরণা ছোটে
  বনফুলের গন্ধ,
ঝলকে রূপ চতুর্দ্দিকে
  অনন্ত আনন্দ।
ফুলন সকাল সাজে,
বনের বেণু বাজে,
ভুবন-ভরা হোলির খেলা
  কাজের দুয়ার বন্ধ।

২

তরু-লতায় দোল লেগেছে,
  চঞ্চলতার রাজ্য।
সবাই অমর—জরা মরণ
  করছে না কেউ গ্রাহ্য!
আমের শাখে শাখে—
হর্ষে কোকিল ডাকে।
আজকে কাকের ডাকে ও যে
  জুটল এসে ছন্দ।

৩

রাঙ্গা শিমুল ফুলের সারি
  ফুটেছে কোন্ উচ্চে
জম্‌ছে ভ্রমর মাধবিকার
  শুভ্র কুসুম গুচ্ছে।
যুগের যুগের গীতি
ঝঙ্কৃত হয় নিতি
সমীরকে আজ মদির করে
  রসাল মকরন্দ।

রাজপুত্রের চেয়ে বেশি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'গোপাল!'

রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছিল গোপাল, বলে উঠল, 'যাই মা।'

যাই বললেই কি যাওয়া যায় খেলা ফেলে? বিশেষতঃ এখন যখন নিজের হাতে বল।

আবার ডাক দিল পার্বতীবাঈ। ডাকের পরে ডাক।

কি এমন জরুরি কাজ কে জানে, খেলা ফেলে গোপাল বাড়ি এল। নিশ্চয়ই আজ মার আছে অদৃষ্টে। পার্বতী না মারুক রোশনলাল মারবে।

'কি রে, বাজারে যাবিনে?' ধমকে উঠল রোশনলাল।

'কখন বাজার এনে দিয়েছি।' গোপালের ভীতু চোখ আলো হয়ে উঠল।

'জুতো বুরুশ করেছিস?'

'কখন!'

'কোট-প্যাণ্টগুলো রোদে দিয়েছিস?'

'রেলিঙের দিকে দেখুন না তাকিয়ে।' গলা উঁচু করল গোপাল।

'ঘরঝাঁট?'

'কিছু বাকি নেই।'

'তবে ওকে ডাকছিলে কেন?' পার্বতীর দিকে তাকাল রোশনলাল।

পার্বতী এগিয়ে এল গোপালের দিকে। বললে, 'হ্যাঁরে, তুই আমাকে মা বলে ডাকিস্ না কেন?'

'বা, বলি তো! সব সময়েই বলি। যখন ডাকলেন তখনই তো বললাম, যাই মা—'

'সে তো আমার কথার উত্তরে।' পার্বতী আরো ঘন হয়ে দাঁড়াল। গাঢ়স্বরে বললে, 'শুধু শুধু ডাকতে পারিস না?'

লাজুক মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল গোপাল।

'আর মাকে কি কেউ আপনি বলে? তুমি বলে।'

'সব হবে। আস্তে আস্তে হবে।'

খেলার টানে আবার ছুট দিচ্ছিল গোপাল, পার্বতী তার হাত চেপে ধরল। বললে, 'হ্যাঁরে, তোর বাবাকে বলেছিলি?'

'বলেছিলাম।'

'কী বলে?'

'তিনশো টাকার কম কিছুতেই রাজী হয় না।'

'তিনশো!' হুংকার করে উঠল রোশনলাল। 'একশোর বেশি পাবে না এক আধলা। ঐ যা মুখ দিয়ে একবার বেরিয়েছিল একশো, তার এক চুল এদিক-ওদিক হবে না। আর দস্তরমত কাগজে লিখে দিতে হবে—'

'সব বলেছি বাবাকে। শুনতে চায় না।' অপরাধীর মত মুখ করল গোপাল।

'শুনতে চায় না! মারব টেনে এক থাবড়া।' চড় ওচাল রোশনলাল। অপরাধী কে আর মারতে চাইছে কাকে।

নিভৃতে গোপালকে টেনে নিল পার্বতী। বললে, 'তোর বাবাকে আরেকবার আসতে বলে আয়। দেখি, ভালো করে বলি বুঝিয়ে।'

এতে বোঝাবার কী আছে! তোমরা মিছিমিছি হাঙ্গামায় যাচ্ছ। কেন তোমরা টাকা দিয়ে কিনে নিতে যাবে? আমি তো এমনিতেই বিনি-পয়সাতেই তোমাদের কেনা হয়ে থাকব। কে যাবে তোমাদের ছেড়ে? ঘরে তো আমার কত সুখ! হাড়-পচা গরিব দিনমজুর বাপ আর নিষ্ঠুর বিমুখ বিমাতা। এখানকার এত আদর এত প্রাচুর্য কে ছাড়বে? তা ছাড়া এখানকার জানলা থেকে দেখা দূরের স্বপ্নের নীলাকাশ! এ কি ছাড়বার!

পার্বতীর আরো কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল গোপাল। বললে, 'মিছে তোমাদের ভয়, মা। সব সময়েই আমি তোমাদের আঁকড়ে থাকব। বাবাকে আর বোঝানোর কি দরকার?'

কি সুন্দর করে বলে ছেলেটা! কেমন করুণ মধুর মুখখানি!

'তবে আমাকে তুই মা বলে ডাকিস না কেন?' পার্বতীর চোখদু'টি প্রায় ছলছল করে উঠল!

'বা, ডাকি তো।'

'ও তো চাকরের ডাক।' বললে পার্বতী, 'ছেলের মত ডাকতে পারিস না?'

দশ-এগারো বছরের ছেলে, তফাতটা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। বললে, 'বা, আমি আপনাদের ছেলে-ছাড়া আর কি!'

হয় না, ঠিক সুর ফোটে না, ঠিক রঙ লাগে না।—কোথাও না জানি এক সুতো ব্যবধান থেকে যায়। চাই একটা স্বত্বের সুর, অধিকারের রঙ, বাঁধভাঙা বন্যার ঢেউ। তারই জন্যে তো বেচাকেনার কথা উঠেছে, কাগজে এক কলম লিখে দেওয়ার কথা। তা হলেই তো চাকর ছেলে হয়ে উঠবে। বাড়ির চাকর হয়ে দাঁড়াবে পরিবারের ছেলে—পেটের ছেলে।

রোশনলালরা পাঞ্জাবি, নিঃসন্তান। বহু বছর ধরে ঘুরে ঘুরে চাকরি করছে বাঙলাদেশে, বেশ শিখে নিয়েছে বাঙলা। কয়েক মাস হল বাচ্চা চাকর হিসেবে পেয়েছে গোপালকে, নামটিও গোপাল—পেয়ে অবধি মাতৃস্নেহ উথলে উঠেছে পার্বতীর। সমস্ত মন আকুল হয়ে উঠেছে ওকে আত্মজের মত, অপত্যের মত সম্ভোগ করতে। আপন বাহুর মধ্যে ধরা একান্ত শিশুটির মত। অঢেল খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে, লেখাপড়ায় মন তৈরি করে দিচ্ছে, আরো কত কি উপচার, তবু কিছুতেই কিছু হবার নয়—ঠিক মাস-মাস ওর মাইনে নিয়ে যাচ্ছে ওর বাপ। মাঝে-মাঝে বা মাইনে বাড়ানোর জন্যে মিনতি করছে। ছেলেকে কি মা মাইনে দেয়? না কি ছেলেই মাইনে চায় মায়ের থেকে?

তাই একেবারে অবাধ স্বত্বে কিনে নিতে চায় পার্বতী। চায় নিরঙ্কুশ আত্মসাৎ করতে।

উপযুক্ত টাকা নিয়ে কাগজে লিখে দিক সদাশিব—গোপাল আর তার ছেলে নয়, পার্বতী-রোশনলালের।

লিখিয়ে নিলে আইনের চোখে কি দাঁড়াবে কে জানে! হয়তো কিছুই দাঁড়াবে না। কিন্তু সত্যের চোখে সরল ও স্পষ্ট হবে পার্বতীর স্নেহ, সদাশিবের প্রত্যাখ্যান। তা হলেই যথেষ্ট। তখন সত্যের ঘরে এসে ছেলেকে ফের দাবি করতে সদাশিবের দ্বিধা হবে, আর গোপালও জানবে নির্ভুল পার্বতী-রোশনলালই তার মা-বাপ।

তা ছাড়া লেখা-কাগজের অন্য দাম আছে। যদি হঠাৎ দেশে চলে যেতে হয় রোশনলালদের, সদাশিব না বলতে পারে গোপালকে তারা ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। দেখ এই দলিল দেখ। দলিলেই তার সম্মতি স্বাক্ষরিত।

কিন্তু সদাশিবের কি মতি হয়েছে, তিনশোর এক পাই কমে নামবে না। একটা জলজ্যান্ত আস্ত-সুস্থ ছেলে, তিনশো আর বেশি কি!

যা হোক কাজকর্ম করছে তো তোমাদের বাড়ি, ছেলের মত সোনায়-সোহাগায় রাখলেই হয়। লেনদেনের কি দরকার! তেমন-তেমন খাওয়ালে-পরালেই হয়। শোয়ালেই হয় মশারির নিচে, খাটের উপর গদির বিছানায়। ভর্তি করে দিলেই হয় ইস্কুলে, হলই বা না সবচেয়ে নিচের ক্লাশে। নয় তো রাখো না কেন একটা মাস্টার। একটা কেন, এক গণ্ডা। দলিলের কি দরকার!

'না, লেনদেন চাই, লেখন চাই কাগজের।' পার্বতীও নাছোড়। বললে, 'দলিল হলেই দু' পক্ষের বিবেক তৃপ্ত হবে। মনে বিশ্বাসের জোর আসবে। তুমি জানবে ছেলেতে আর তোমার দাবি নেই, আর আমি জানব ছেলে ষোল আনা আমার।'

গোপাল বাপকে বললে, 'দলিলে কি হয়? মানুষকে কি কখনো বেচা যায় লিখে দিয়ে? এক লাইন লিখে দিলেই আমি তোমার ছেলে, আমি কি পর হয়ে যেতে পারি? কলমের কালি কি গায়ের রক্ত মুছে দিতে পারে? কাগজে যাই লেখা থাক না, আমি তোমার ছেলে তোমারই থাকব। যেখানে যাই বা যেখানেই থাকি, ঠিক ডাকলেই আমার সাড়া পাবে। দেব তোমাকে জিনিসপত্র কাপড়চোপড় টাকাপয়সা। বরং তখন আরো সুযোগ বাড়বে।'

'পরের কথা পরে।' সদাশিব রুক্ষ মুখে বললে, 'এখন তবে, যা বলেছি, তিন-তিনশো টাকা ফেলুক। দিয়ে দিক পুরোপুরি।'

'ওরা আবার একশোর বেশি দিতে চাচ্ছে না।' ডাগর-ম্লান চোখ তুলল গোপাল। বললে, 'আমি বলি, একশো টাকাই বা মন্দ কি! একশো টাকাই তো মুফৎ। উপর-পাওয়া। একশো টাকাই বা কে দেয়!'

'ঠিক কথা।' গোপালের সৎমা আতরমণির কণ্ঠস্বর রুক্ষতর। 'বা তোমার ছেলে, হাড়হাবাতে, এক কানাকড়িরও মুরোদ নেই, ওর পক্ষে ঐ দামই বেশি। ঐ দামে তার বাপ সুদ্ধু বিক্রি হতে পারে।'

'আমি বলি যা পাওয়া যায় তাই নাও।' ভার-ভার গলায় বললে গোপাল, 'আমি যদি চাকর থেকে ছেলে

স্কুলে যেতে পারি, কত বড় কত মস্ত হতে পারব একদিন। তোমার এক ফোঁটা দুঃখ থাকবে না। তোমার পরিচয়েই আমার পরিচয় থাকবে। কে নষ্ট করবে আমাদের সম্পর্ক? শুধু কাগজে একটা টিপ—'

শুধু একটা আঙুলের ছাপেই কী অঘটন ঘটে যাবে! শুকনো কাঠে ফুল ফুটবে। মরা নদীতে বান ডাকবে। মরুভূমিতে ফসল ফলবে।

একটা বাড়ির চাকর পরিবারের ছেলে হয়ে উঠবে। একাকিনী মায়ের একমাত্র সন্তান। সে না জানি কী অসহ্য রোমাঞ্চ! রূপকথার রাজপুত্র হওয়ার চেয়েও বেশি।

শুধু গায়ে-পায়ে দামী জামা-জুতোই উঠবে না, শুধু সমান-সমান ভালো খাবারই পাবে না, ভালো বিছানা, কত খেলার সরঞ্জাম—সবচেয়ে বড় কথা, সে পড়তে পারবে, ইস্কুলে যেতে পারবে, মানুষ হতে পারবে। রূপকথার রাজপুত্রেরা কি ইস্কুলে পড়েছে, না মানুষ হয়েছে কোনো দিন?

কিন্তু সদাশিবের এক গোঁ: 'তিনশো টাকার এক বিন্দু কম নয়।'

'কি রে, গিয়েছিলি তোর বাপের কাছে?' সামনে রোশনলাল দাঁড়িয়ে, জিগগেস করল পার্বতী।

'গিয়েছিলাম—' মুখ তুলতে পারছে না গোপাল।

রোশনলাল বুঝতে পারল, টাকা কমাতে রাজী নয় সদাশিব।

গোপালের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। পার্বতী অসহায়ের মত তাকাল স্বামীর দিকে। উপায় খুঁজল।

রোশনলাল বললে, 'এক কাজ কর। কোনো ছুতোয় সাদা কাগজে তোর বাপের একটা টিপ নিয়ে আয়, সেটাকে একটা ছেলেবেচার দলিল বানিয়ে দিই। তোর বাপ জানতেও পারবে না। মাস মাস তোর যা মাইনে তাই সে নিয়ে যাবে, কিংবা বেশি কিছু। এসে দেখবে তুই কেমন বদলে যাচ্ছিস দিনে-দিনে, কেমন প্যান্ট কোট জুতো মোজা পরে ইস্কুলে যাচ্ছিস, কেমন ব্যাগ নিয়েছিস কাঁধে, কেমন হাতে তোর হকিস্টিক, ক্রিকেট ব্যাট—'

তাই ভালো, তাই ভালো। সমস্ত মনপ্রাণ যেন মধু হয়ে উঠল গোপালের। চোখে এমন এক আলো জ্বলল যা সূর্যে-চন্দ্রেও কোনোদিন জ্বলেনি।

ভজিয়ে-ভাজিয়ে বাবার থেকে আনবে একটা টিপ। বলবে, মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে বাবু। বলেছে বাপের হাতের টিপ দেওয়া রসিদ চাই। তাড়াতাড়িতে রসিদটা লেখা হয়নি—আর টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কিসের বা রসিদ—তুমি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ভুষো মাখিয়ে এই সাদা কাগজে দিয়ে দাও ছাপ—আমি তোমাকে বাড়তি টাকাটা এনে দিচ্ছি এখুনি।

আর সেই এক আঙুলের ছাপেই ফুটে উঠবে নতুন সূর্য, নবজীবনের সূর্য। বাড়ির চাকর পরিবারের ছেলে হয়ে উঠবে। টিনের শূন্য চোঙা থেকে বেরুবে একটা পাখা-ঝাপটানো জ্যান্ত পায়রা।

কিন্তু, শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল গোপাল, এই ফাঁকে বাবা একটা মোটা টাকা পাবে না এটাই বা কেমন কথা! বাবার একটা সুযোগ হয়েছিল টাকা রোজগারের, সেটা মারা যাবে? কত গরিব তার বাপ, কত কষ্টে-নষ্টে দিন কাটাচ্ছে, ছেঁড়ায়-খোঁড়ায় চলেছে ধুঁকতে-ধুঁকতে—তার সে একটা সুরাহা করে দেবে না? মানিক ধুলোয় ফেলেই কি সে আঁচলে গেরো দেবে?

কিন্তু হায়, যদি লেখাপড়া শিখে সে মানুষ হতে পারত, সারে-মাটিতে ফুলন্ত আর ফলবন্ত গাছ, এক নিমেষেই উড়িয়ে দিতে পারত বাবার দুর্দিন।

বা, তাই বলে শুরুতেই কিছু টাকা পাবে না বাবা? তাকে ঠকিয়ে তার কাছ থেকে টিপ নিয়ে আসবে? এই তার বাপের আপন হয়ে থাকা?

অনেক সময়েই দোতলায় একা থাকে গোপাল, বিশেষতঃ যখন রোশনলাল আর পার্বতী একত্র বেড়াতে যায় বাইরে। কখনো কখনো বা আলমারির চাবি বাড়িতেই রেখে যায়, বিছানার নিচে, কিংবা টেবিলের উপরে রাখা একটা কৌটোর মধ্যে। কখনো বা টাঙানো ফোটোর পিছনে।

গোপাল সব দেখে। সব জানে। তাকে অবিশ্বাস করা বা সূর্য পশ্চিমে উঠল, এ ভাবাও তাই। গোপাল শুধু চাকর নয়, গোপাল পুত্রকল্প।

সন্ধ্যা হতেই রোশনলাল-পার্বতী বেরিয়েছে নিমন্ত্রণে, কোথাকার কোন আত্মীয়ের বিয়েতে। বিয়ে যখন, ফিরতে কোন্ না দেরি হবে।

চাবি দিয়ে আলমারি খুলল গোপাল। খুলল গয়নার বাক্স। অনেক গয়নাই পরে গিয়েছে পার্বতী, তাহোক, বাক্সে নিশ্চয়ই কিছু অবশিষ্ট আছে। সমস্ততে গোপালের দরকার নেই। তিনশো টাকার মত হলেই তার চলবে। বাবার ক্ষতি না হলেই হল। হ্যাঁ, এই ছোট হারটাতেই হবে। মান থাকবে বাবার।

আরো চাকর আছে বাড়িতে, নিচের তলার চাকর। দারোয়ানকে বললে, 'আমি আসছি। মা-বাবু এর মধ্যে

এলে বলো এই একটু গেছি মোড়ের দোকানে।'

'কেন, কি দরকার?'

'বোলো টিপের কাগজ কিনতে।'

সটান বাপের কাছে এসে গয়না দিল গোপাল। বললে, 'বাবুর বাড়ির মা দিয়ে দিয়েছেন দাম। হাতে করে ওজন দেখ, নিশ্চয়ই তিনশোর বেশি হবে। তবে এবার দলিল করে দাও। দলিল পেলেই সব চুকে যাবে গোলমাল—'

ঝকঝক করছে সোনার হার।

হারটা নিয়ে মুঠোয় পুরল সদাশিব। বললে, 'দাঁড়া, আগে স্যাকরার কাছে যাই। দেখি যাচাই করে। কত ওজন, কি দাম—'

'দলিল চেয়েছেন যে।' জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল গোপাল।

'হবে'খন—' সদাশিব পাশ কাটাতে চাইল।

'এক্ষুনি—এক্ষুনি যে দরকার। তুমি তো তোমার দাম পেয়ে গেলে, তবে দলিল করতে কী দোষ?'

'দলিল করব, আমি লেখাপড়া জানি?' হুমকে উঠল সদাশিব।

'তবে এই সাদা কাগজে তোমার টিপ দিয়ে দাও।' গোপাল পকেট থেকে সাদা এক তা ফুলস্কেপ কাগজ বের করল।

ধাক্কা মেরে তার হাত সরিয়ে দিল সদাশিব। বললে, 'আগে দেখি কি দর পাই। যদি তিনশোর কম হয়! ঠকব? ঠকতে বলিস?'

'তবে যাচাই করিয়ে কালই দলিল নিয়ে আসবে বলো?' আকুল হয়ে বললে গোপাল।

'কাল না হলে পরশু।'

শুধু দুটো দিন। এ দুটো দিন ভালোয় ভালোয় কেটে গেলেই ভোজবাজি হবে। ব্রজের রাখাল হয়ে দাঁড়াবে দ্বারকার রাজা।

চাকর চাকুরে হয়ে যাবে।

বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে বাক্সে বাড়তি গয়না খুলে রাখতে যেতেই পার্বতী টের পেল একটা হার নেই। এ কেমনতরো চুরি! সব না নিয়ে শুধু একটা গয়না?

'গোপাল, তুই জানিস?' জিগগেস করতেও কষ্ট হচ্ছে পার্বতীর।

'না, আমি কি করে জানব?' সহজ সরল মুখে গোপাল বললে।

'তবে নিশ্চয়ই আর কোনো চাকরে নিয়েছে। না কি আমিই ফেলেছি কোথাও? ফেললে তো বাড়িতেই পড়বে। যে পেয়েছে সে মেরে দেবে চুপচাপ?'

অত সহজ ব্যাখ্যায় খুশি নয় রোশনলাল। সে পুলিশকে খবর দিলে। পুলিশ, ধরবি ধর, গোপালকে ধরল।

কেঁদে উঠল পার্বতী: 'ও নির্দোষ, ওকে ধরবার জন্যে ডাকিনি তোমাদের—'

গোপালকে থানায় পুরল। গোপাল পুলিশকে নিয়ে গেল সদাশিবের কাছে। সদাশিব নিয়ে গেল স্যাকরার দোকানে। বেরুল সোনার হার।

হাতকড়া পরল সদাশিব।

'ওগো, গোপালকে ছাড়িয়ে নিয়ে এস।' স্বামীর হাত ধরে কাঁদতে লাগল পার্বতী: 'ওর কোনো দোষ নেই। ও শুধু ওর বাপের কথায় চুরি করেছে—ওর বাপই কুবুদ্ধি দিয়েছে—তাই তো ওকে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম মানুষ করতে—'

পার্বতীর কান্নায় অস্থির হয়ে রোশনলাল গিয়ে দাঁড়াল কোর্টে। পুলিশকে ধরা-পড়া করে গোপালের জামিন করালে।

জামিনে ছাড়া পেয়ে, কি সাহস গোপালের, গেট পেরিয়ে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বজ্রকণ্ঠে রোশনলাল চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার, ঢুকতে পারবি নে বাড়িতে। দারোয়ান, যদি অমনি না যায়, বার করে দাও ঘাড় ধরে—'

পার্বতী অনেক কাঁদল, কিন্তু কোনো অনুনয়ই রোশনলাল কানে তুলল না। বললে, 'যে এমন অকৃতজ্ঞ তাকে কে পুষবে দুধকলা দিয়ে? যে বাক্স খুলে গয়না নিতে পারে সে গলায় ছুরি দিতে পারে।'

একবার আমাকে তেমন করে ডাক। পার্বতীর কথা মনে পড়ল গোপালের। কিন্তু আশ্চর্য, কণ্ঠে স্বর নেই, ডাক নেই, কান্না নেই। মাথা নিচু করে চলে গেল গোপাল।

কোথায় যাবে, ফিরে এল তার নিজের বাড়ি, তার বাপের বস্তি।

ঝাঁটা হাতে আতরমণি খেঁকিয়ে উঠল: 'নিজে করলি চুরি আর ফাঁসালি বাপকে! বাপকে হাজতে রেখে নিজে বেরিয়ে এলি জামিন নিয়ে! এ ঠাঁয়ে আবার মুখ দেখাতে এসেছিস? যা, যা, বেরো—' বাইরের রোয়াকে ঝাঁটার বাড়ি মারতে লাগল।

বেরিয়ে এল রাস্তায়।

মনে হল যে ডাক মুখে ফুটত না, যে ডাক ভুলে গিয়েছিল তাই বুঝি এবার স্বরে-স্বাদে বেরিয়ে আসে।

স্বপ্নের ডাক!

কিন্তু স্বপ্ন কি কখনো ভাঙে? স্বপ্ন কি কখনো শেষ হয়? ফুটপাতের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল গোপাল।

হালখাতার খাওয়া-দাওয়া

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদা বললে, প্যালা, মেরে দিয়েছি কেল্লা। চল্ একটু মিষ্টিমুখ করে আসা যাক্।

মিষ্টিমুখ করতে আপত্তি আছে—এমন অপবাদ প্যালারামের শত্রুরাও দিতে পারবে না। তবে টেনিদার সঙ্গে যেতেই আপত্তি আছে একটু। ওর মিষ্টিমুখ মানেই আমার পকেট ফাঁক। টেনিদা যখনই বলেছে, চল্ প্যালা—বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে তোকে জলযোগ করিয়ে আনি—তখনি আমার কম্‌সে-কম পাঁচটি করে টাকা স্রেফ বরবাদ! মানে রাজভোগগুলো ও-ই খেয়েছে—আর আমি বসে বসে দু'একটা যা খেতে চেষ্টা করেছি, থাবা দিয়ে সেগুলো কেড়ে নিয়ে বলেছে, এ-সব ছেলেপুলের খেতে নেই—পেট খারাপ করে।

অতএব গেলাস দুই জল খেয়েই আমায় উঠে আসতে হয়েছে। একেবারে খাঁটি জলযোগ যাকে বলে। তাই টেনিদার প্রস্তাব কানে যেতেই আমি তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

বললাম, আমার শরীর ভালো নেই—আমি এখন মামাবাড়ী যাচ্ছি।

টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটাকে খাড়া করে বললে, শরীর ভালো নেই তো মামাবাড়ী যাচ্ছিস কেন? তোর মামা কি ভেটিরিনারী সার্জ্জন যে তোর মতো ছাগলকে পটাং পটাং করে ইন্‌জেক্‌সন দেবে? বেশি পাকামি করিসনি প্যালা—চল্ আমার সঙ্গে।

সত্যি বলছি টেনিদা—

কিন্তু সত্যি-মিথ্যে কিছুই টেনিদা আমায় বলতে দিলে না। আমার পিঠে পনেরো সের ওজনের একটা চাঁটি বসিয়ে বললে, কেন বচ্ছরকার প্রথম দিনটিতে একরাশ মিথ্যে বলছিস্ প্যালা? কোনো ভাবনা নেই—বুঝলি? তোর এক পয়সাও খরচ নেই—সব পরস্মৈপদী।

—পরস্মৈপদী? কে খাওয়াবে? আমাদের মতো অপোগণ্ডকে খাওয়াবার জন্যে কার মাথা ব্যথা পড়েছে?

টেনিদা বললে, তোর মগজে আগে গোবর ছিল, এখন একেবারে নিটোল ঘুঁটে। ওরে গর্দ্দভ, আজ যে হালখাতা। দোকানে গেলেই খাওয়াবে।

—কিন্তু আমাদের খাওয়াবে কেন? নেমন্তন্ন করেনি তো?

—সেই ব্যবস্থাই তো করেছি।—টেনিদা হেঁ-হেঁ করে হেসে বললে, এই দ্যাখ—

বলেই পকেট থেকে বের করলে একগাদা লাল-নীল হালখাতার চিঠি।

—এ-সব চিঠি তুমি পেলে কোথায়?

—আরে আমার চিঠি নাকি? সব কুট্টিমামার।

—কুট্টিমামা!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—সেই যে গজগোবিন্দ হালদার? তোকে বলিনি? সেই যে ভালুকের নাকে টিকের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল? সেই কুট্টিমামা। তার অনেক এসেছে। তাই থেকেই কয়েকটা হাত-সাফাই করেছি আমি। বিশেষ করে এইটে—

বলে একটা লাল রঙের চিঠি এগিয়ে দিলে।

তাতে 'নতুন খাতা মহরৎ-টহরৎ' এই সব বাঁধা গতের তলায় কালি দিয়ে লেখা আছেঃ প্রিয় গজগোবিন্দবাবু, অবশ্য আসিবেন। মাংস, পোলাও, দই, রসগোল্লার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। ইতি আপনাদের চন্দ্রকান্ত চাকলাদার—প্রোপ্রাইটার, নাসিকামোহন নস্য কোম্পানি।

টেনিদার চোখ চক্‌চক্ করে উঠলঃ দেখছিস্ তো খ্যাঁটের

—সত্যি বলছি টেনিদা—

ব্যবস্থাখানা? এমন সুযোগ ছাড়তে নেই। তবে একা খেয়ে সুবিধে হবে না, তাই তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছি।

—কিন্তু টেনিদা—

টেনিদা মুখটাকে গণ্ডারের মতো করে বললে, আবার কিন্তু কি রে! পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খেয়ে খেয়ে তুই দেখছি একটা পটোলের দোল্মা হয়ে গেছিস্। মাংস-পোলাও খেতে পাবি, তাতে অত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন?

—আমি বলছিলাম, হালখাতায় গেলে না কি টাকা-ফাকা দিতে হয়—

—না দিলেই হল! দোকানদারেরা এ-সময়ে ভারী জব্দ থাকে—জানিস্ তো? যত টাকাই পাওনা থাক না কেন—মুখ ফুটে চাইতে পারে না। যত খুশি খেয়ে আয়, হাসিমুখে বলবে, আর দুটো মিহিদানা দেব স্যার? চল্ প্যালা—এমন মওকা ছাড়তে নেই!

ভেবে দেখলাম, ছাড়া উচিতও নয়। আমি টেনিদার সঙ্গই নিলাম।

প্রথম দু-একটা খুচরো খাওয়া-দাওয়া হল।

এক গ্লাশ ঘোলের সরবৎ—দুটো-একটা মিষ্টি—এই সব। দোকানদারেরা অবশ্য আড়চোখে টাকার থালার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আমরা কী দিই। আমরা ও-সবে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের কাজ ম্যানেজ করে গেলাম, অর্থাৎ যতটা পারা যায় রসগোল্লা, ঘোলের সরবৎ, ডাবের জল এ-সব সেঁটে নিলাম। এক-আধজন বেশ ব্যাজার হল, একজনের গলা তো স্পষ্টই শোনা গেলঃ দুশো সাতাশ টাকা বাকী—গজগোবিন্দবাবু একটা পয়সা ছোঁয়ালেন না—আবার দুটো ছোকরা এসে তিন টাকার খাবার সাবড়ে গেল!

ও-সব তুচ্ছ কথায় আমরা কান দিলাম না—দেওয়ার দরকারই বোধ হল না। উপরন্তু দুজনে চারটে করে পান নিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়।

আমি টেনিদাকে বললাম, এ-সব ঘোল-ফোল খেয়ে পেট ভরিয়ে লাভ কী? তোমার সেই নাসিকামোহন নস্য কোম্পানিতেই চলো না—বলতে বলতে আমার নোলায় প্রায় আধসের জল এসে গেলঃ পোলাওটা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তা হলে খেতে জুৎ লাগবে না। তা ছাড়া বেশি দেরী হলে মাংসও আর থাকবে না—কেবল খানকয়েক পাঁঠার হাড় পড়ে থাকবে।

টেনিদা বললে, আঃ—এই পেটুকটা দেখছি জ্বালিয়ে খেল! এই সব টুক্‌টাক্ খেয়ে খিদেটা একটু জমিয়ে নিচ্ছি, তা এটার কিছুতেই আর তর সইছে না!

—মানে, আমি বলছিলাম, যদি ফুরিয়ে-টুরিয়ে যায়—

—হুঁ, সেও একটা কথা বটে!—টেনিদা নাক চুলকে বললে, আচ্ছা চল্—যাওয়া যাক্—

ঠিকানা বাগবাজারের। তাও কি এক গলির মধ্যে। অনেক খুঁজে পেতে বের করতে হল।

এই নাকি নাসিকামোহন নস্য কোম্পানি! দেখে কেমন যেন খটকা লেগে গেল! একটা পুরোনো একতলা ঘর। ভেতরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। বাইরে একটা সাইনবোর্ড—তাতে প্রকাণ্ড নাকওলা লোক এক জালা নস্যি টানছে এমনি একটা ছবি। সাইনবোর্ডটা কেমন কাত্ হয়ে ঝুলছে। এরাই খাওয়াবে মাংস-পোলাও!

বললাম, টেনিদা—পোলাও-টোলাওয়ের গন্ধ তো পাচ্ছি না!

টেনিদা বললে, আছে—সব আছে। চল্—ভেতরে যাই।

ঘরে ঢুকে দেখি একটা ময়লা চাদরপাতা তক্তপোষে দুটো ষণ্ডামতন লোক কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে আছে। পাশে একটা কাচ-ভাঙা আল্‌মারি—তাতে গোটাকয়েক শিশি-বোতল। আর কিচ্ছু নেই।

আমরা কিরকম ঘাবড়ে গেলাম। জায়গা ভুল করিনি তো! কিন্তু তাই বা কী করে হবে! বাইরে তো স্পষ্টই সাইনবোর্ড ঝুলছে। ওই তো আলমারির গায়ে সাঁটা এক টুকরো কাগজে লেখা রয়েছেঃ নাসিকামোহন নস্য কোম্পানি—প্রোঃ চন্দ্রকান্ত চাকলাদার।

আমাদের দেখেই একটা লোক বাঘাটে গলায় বললে, কী চাই?

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় দরজার বাইরে। টেনিদা ঢোঁক গিলে বললে, আমরা হালখাতায় নেমন্তন্ন পেয়ে আসছি।

—হালখাতার নেমন্তন্ন!—লোকটা তেমনি বাঘা গলায় কী বলতে যাচ্ছিল, দু'নম্বর তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, কে পাঠিয়েছে তোমাদের?

ব্যাপারটা কিরকম গোলমেলে মনে হল। আমি ভাবছিলাম কেটে পড়া উচিত, কিন্তু টেনিদা হাল ছাড়ল না। পকেট থেকে সেই চিঠিটা বের করে বললে, এই তো—মামা আমাদের পাঠিয়েছেন। মামা—মানে গজগোবিন্দ হালদার—

—গজগোবিন্দ হালদার?—প্রথম লোকটা এবারে ঝাঁটা

নাকের পাশ দিয়ে মিটি-মিটি হাসল ঃ ওহো—তাই বলো! আগে বললেই বুঝতে পারতাম। আমাদের এখানে আজ স্পেশ্যাল ব্যবস্থা কিনা—তাই বেছে বেছে মাত্র জনকয়েককে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তা গজগোবিন্দবাবু কোথায়? তিনি যে বড় এলেন না?

—তিনি একটু জরুরি কাজে আসানসোলে গেছেন—টেনিদা পটাং করে মিথ্যে কথা বলে দিলে, তাই আমাদের এখানে আসতে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

শুনে প্রথম লোকটা দ্বিতীয় লোকটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপরে তেমনি হাসি হাসি মুখে বললে, তা তোমরা এসেছ—তাতেও হবে। এসো-এসো—

লোকটা উঠে দাঁড়ালো।

—কোথায় যেতে হবে?

—ভেতরের ঘরে। সেখানেই বিরিয়ানি পোলাও আর মোগলাই কালিয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা। এসো—চলে এসো—নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

টেনিদা বললে, আয় প্যালা—

আসতে বলার দরকার ছিল না। তার অনেক আগেই এসে পড়েছি আমি। জিবের ডগাটা সুড়সুড় করে উঠছে। সরবৎ-টরবৎগুলো এতক্ষণ পেটের মধ্যেই ছিল—হঠাৎ সেগুলো হজম হয়ে গিয়ে ক্ষিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি চুঁই-চুঁই করতে লাগল।

সেই লোকটার পেছনে পেছনে আমরা এগিয়ে চললাম। একটা অন্ধকার বারান্দা—তারপরে আর একটা ঘর। তার মধ্যেও আলো নেই। লোকটা বললে, ঢুকে পড়ো এখানে।

—অন্ধকার যে!—টেনিদার গলায় সন্দেহের সুর। আমারো কি রকম যেন বেয়াড়া লাগল। যে-ঘরে পোলাও-কালিয়া থাকে সে ঘর অন্ধকার থাকবে কেন? পোলাওয়ের জলুসেই আলো হয়ে থাকবার কথা।

লোকটা বললে, ঢোকো না—আলো জ্বেলে দিচ্ছি।

টেনিদা ঢুকল, পেছন পেছন আমিও। আর যেই ঢুকেছি—অমনি পটাৎ করে লোকটা দরজা বন্ধ করে দিলে!

—একি—একি—দোর বন্ধ করছেন কেন?

দরজার ও-পাশ থেকে সেই লোকটার পৈশাচিক অট্টহাসি শোনা গেল ঃ পোলাও-কালিয়া খাওয়াব বলে!

—শেকল আটকে দিলেন কেন?—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম ঃ ঘরে তো পোলাও-কালিয়া কিছু নেই। এ যে কয়লার ঘর মনে হচ্ছে! ঘুঁটের গন্ধ আসছে—

লোকটা আবার বাজখাঁই গলায় বললে, ঘুঁটের গন্ধ! শুধু ঘুঁটের গন্ধেই পার পেয়ে যাবে ভেবেছ? এরপরে তিনটি বাছা বাছা গুণ্ডা আসবে—দেবে রাম ঠ্যাঙানি—যাকে বলে আড়ং-ধোলাই! প্রাণখুলে পোলাও-কালিয়া খাবে!

শুনে আমার হাত-পা সোজা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল! আমি ধপাস্ করে সেই অন্ধকার কয়লার ঘরের মেজেই বসে পড়লাম! নাক-মুখের ওপর দিয়ে ফুরুক ফুরুক করে গোটা-চারেক আরশোলা উড়ে গেল!

টেনিদা কাঁপতে কাঁপতে বললে, আমাদের সঙ্গে এ রসিকতা কেন স্যার? আমরা কী করেছি?

...কী করেছ?—লোকটা সিংহনাদ ছাড়লঃ তোমরা—মানে, তোমার মামা গজগোবিন্দ আমাদের কোম্পানি থেকে তিনশো তিপ্পান্ন টাকার নস্যি কিনেছে তিন বছর ধরে—সব বাকীতে। একটা পয়সা ছোঁয়ায়নি। তারপর আর এ-পাড়া সে মাড়ায়নি—আর আমাদের কোম্পানি তারই জন্যে লালবাতি জ্বেলেছে। আজ তাকে ঠ্যাঙাবার জন্যেই পোলাও-মাংসের টোপ ফেলেছিলাম। সে আসেনি—তোমরা এসেছ। টাকা তো পাবই না—কিন্তু তোমাদের রাম ঠ্যাঙানি দিয়ে যতটা পারি—সুখ করে নেব। একটু দাঁড়াও—গুণ্ডারা এল বলে—

টেনিদা হাঁউ-মাউ করে উঠল ঃ দোহাই স্যার—আমাদের ছেড়ে দিন স্যার! আমরা নেহাৎ নাবালক, নস্যি-টস্যির ধার ধারিনে—আমাদের ছেড়ে দিন—

কিন্তু লোকটার আর সাড়া পাওয়া গেল না। দরজায় শেকল দিয়ে বেমালুম সরে পড়েছে। গুণ্ডা ডাকতেই গেছে খুব সম্ভব।

আমার পালাজ্বরের পিলেতে গুর গুর করে শব্দ হচ্ছে। বুকের ভেতরে ঠাণ্ডা হিম! চোখের সামনে কেবল পটোল-ধুঁদুল-কাঁচকলা এই সব দেখতে পাচ্ছি! হালখাতার পোলাও খেতে গিয়ে পটলডাঙ্গার প্যালারামের এবার পটোল তোলবার জো!

টেনিদা বললে, প্যালারে—মেরে ফেলবে যে!

আমার গলা দিয়ে কেবল কুঁই কুঁই করে খানিকটা আওয়াজ বেরুল!

—ওরে বাবা—পায়ের ওপর দিয়ে যে ছুঁচো দৌড়োচ্ছে!

—এর পরে লাঠি দৌড়োবে—অনেক কষ্টে আমি বলতে পারলাম।

টেনিদা দরজাটার ওপর দুম্ দুম্ করে লাথি ছুঁড়তে লাগলঃ দোহাই স্যার—ছেড়ে দিন স্যার—আমরা কিছু জানিনে স্যার—আমরা নেহাৎ নাবালক স্যার—

কটাৎ! আমার কপালে কিসে যেন ঠোকর মারল!

তার পরেই কী একটা প্রাণী নাকের ওপর একটা নোংরা পাখার ঘা দিয়ে উড়ে গেল! নির্ঘাৎ চামচিকে!

—বাপরে—বলে আমি লাফ মারলাম। এক লাফে একটা জানলার কাছে! আর সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করলাম, জানলার দুটো গরাদ ভাঙা! অর্থাৎ গলে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

টেনিদা তখনো প্রাণপণে দরজা ধাক্কাচ্ছে! চেঁচিয়ে বললাম, এখানে একটা ভাঙা জানলা!

—কই? কোথায়?

—এই তো—বলেই আমি জানলা দিয়ে দু' নম্বর লাফ! আর সঙ্গে সঙ্গে—একেবারে ডাষ্টবিনে! রাজ্যের দুর্গন্ধ আবর্জ্জনার ভেতরে।

টেনিদাও আমার ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ল পরমুহূর্ত্তেই। আর তক্ষুণি উল্টে গেল ডাষ্টবিন! আমাদের গায়ে মাথায় পৃথিবীর সব রকম পচা আর নোংরা জিনিস একেবারে মাখামাখি! হালখাতার খাওয়া-দাওয়াই বটে! অন্নপ্রাশন থেকে সুরু করে যা কিছু খেয়েছিলাম—সব ঠেলে বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে!

কিন্তু বমি করারও সময় নেই আর। পেছনে একটা কুকুর তাড়া করেছে—কারা যেন বললে, চোর—চোর! সর্ব্বাঙ্গে সেই পচা আবর্জ্জনা মেখে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করেছি আমরা। সোজা বড় রাস্তার দিকে। সেখান থেকে একেবারে গিয়ে গঙ্গায় নামতে হবে—পুরো দু'ঘণ্টা চান না করলে গায়ের গন্ধ যাওয়ার সম্ভাবনা নেই!
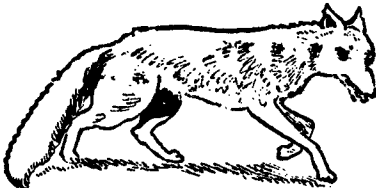
আজব দেশের কথা

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

আজব দেশের আজব কথা আয় রে যারা শুনতে চাস্,
বাঘেরা সেথায় নাগরা পায়ে চিবোয় কচি দুর্ব্বো ঘাস।
শান-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে নেকড়ে টানে ছ্যাক্‌রা গাড়ী,
রামছাগলের তিনটে মাথা, ভুঁড়শিয়ালের লম্বা দাড়ি।
টিকটিকিরা ফিক্‌ফিকিয়ে মুচকি হেসে চরকা কাটে,
গাং-চিলেরা কাস্তে দিয়ে কদমফুলি চুলটা ছাঁটে।

ভোঁদড় ভায়া নৌকো চালায়, নেংটি ইঁদুর কাপড় বোনে,
চামচিকেরা ঠানদি কাছে মানুষ জীবের গল্প শোনে।
রাত-দুপুরে আফিস করে বাদুড়গুলো শামলা মাথে,
কলমি-শাকের চচ্চড়ি খায় রোজ দুবেলা পান্তা ভাতে।
আজব দেশের আমগাছেতে কামরাঙা হয় থরে থরে,
চিতল মাছে চকবাজারে পান-সুপারি ব্যবসা করে।
ব্যাং-বাবাজি পড়ায় সেথা, নামতা লিখে খেঁকশিয়ালে,
গুবরে পোকা হল্লা করে পরীক্ষা দেয় কাঠবিড়ালে।

সেথায় যত রোগের ওষুধ—খুব পুরানো আমসী খাওয়া,
একটি জিনিস বন্ধ থাকে, গরম জলে রাত্রে নাওয়া।
করলে চুরি আজব দেশে কঠিনতরো বড়ই সাজা,
সবাই মিলে পৌণে ছ'টায় বানায় চোরে দেশের রাজা।
তোমরা বোধ হয় এতক্ষণে ভাবছো এসব মিথ্যে বাজে,
জানতে কি চাও সে দেশ কোথা?—তোমার আমার
মনের মাঝে।
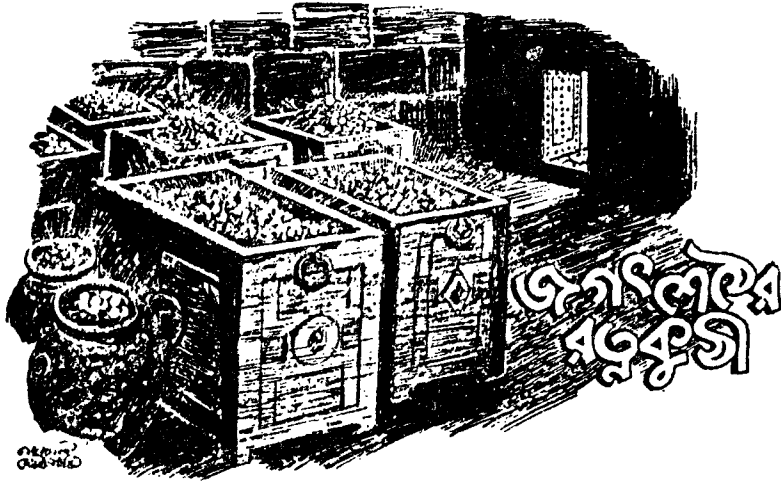
হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম অধ্যায়

ঘটনারহস্য

দোতালার বৈঠকখানা। আসনে আসীন দুই বন্ধু—ভাব যাদের গলায় গলায়। জয়ন্ত ও মানিকের কথা বলছি। চলছিল আলোচনা। সরকারী পুলিসের গোয়েন্দা-বিভাগের বিখ্যাত কর্মচারী সুন্দরবাবু সম্প্রতি 'পেন্সন' নিয়েছেন, তাই নিয়েই আলোচনা।

মানিক মত প্রকাশ করলে, "জয়ন্ত, এইবার আমাদের গোয়েন্দাগিরির শখ বোধহয় সিকেয় উঠলো।"

জয়ন্ত বললে, "কেন?"

—"আমাদের বেশীর ভাগ মামলা আসত সুন্দরবাবুর মারফতেই। তিনি নিলেন অবকাশ, এখন আমাদের সে শখ কে মেটাবে?"

—"মেটাবে আমাদের খ্যাতি। তুমি কি ভেবেছ এতদিন ধরে আমরা কি কেবল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ালুম? মোটেই নয়, মোটেই নয়! শৌখিন হলেও দেশ আর দশের কাছে আমরা এখন অপরিচিত নই। পুলিসে সুন্দরবাবু না থাকলেও আমাদের অলস হয়ে বসে থাকতে হবে বলে মনে করি না। ঐ শোনো! সিঁড়িতে কোন বৃহৎ মূর্তির পদশব্দ! বোধহয় নাম করতেই সশরীরে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব আসন্ন!"

ঠিক তাই! বিপুল ভুঁড়ির ভার নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকেই সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে একখানা চেয়ারের উপর ধুপ্ করে বসে পড়লেন এবং এই অনুচিত অতিরিক্ত ভারের বিরুদ্ধে চেয়ারখানা সশব্দে প্রতিবাদ করে উঠল!

মানিক সহাস্যে বললে, "ভো সুন্দরবাবু! আপনার নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি নিজে আবির্ভূত হয়ে ইংরেজী প্রবাদটার সত্যতা প্রমাণিত করলেন!"

মানিকের রসনাকে সুন্দরবাবু বরাবরই ভয় করে আসছেন। সন্দিগ্ধস্বরে বললেন, "হুম্! কি প্রবাদ?"

"জানেন না? 'Talk of the devil and he will appear!' অর্থাৎ কিনা, দৈত্য-দানবের কথা তুললেই তার উদয় হয়!"

সুন্দরবাবু রেগে চোখ কটমট করে বললেন, "শুনলে তো জয়ন্ত, শুনলে তো? তোমার নচ্ছার দুর্মুখ বন্ধুর কথা শুনলে তো? আমি ডেভিল?"

মানিক বললে, "আহাহা, খামোকা ক্ষেপে যান কেন সুন্দরবাবু? 'ডেভিল' বলতে কেবল ভূত, অসুর, শয়তান বোঝায় না, পাজি, নরপিশাচ, বিশ্বাসঘাতককেও ডেভিল বলে।"

সুন্দরবাবু রুদ্ধরোষে দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন, "তাই নাকি? তাহলে তোমার মতে আমি ওর মধ্যে কোন্‌টি?"

মানিক সুন্দরবাবুর নাগালের বাইরে সরে বসে বললে, "আবার নতুন কৌঁসুলি বা ব্যারিস্টারকেও ডেভিল নামে ডাকা হয়। একরকম খাবারেরও নাম ডেভিল, তাও তো আপনার জানা আছে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমাকে আর শেখাতে হবে না,

ডেভিল আমি অনেক খেয়েছি, মাংসের পুর দেওয়া ডিমের কথা কে না জানে!"

মানিক বললে, "উঁহু, সে ডেভিল নয়, এ হচ্ছে আর একরকম খাবার, বোধহয় আপনি কখনো খাননি—আমাদের মধু রাঁধতে জানে।"

বরাবরের মত আজও নতুন খাবারের নামে সুন্দরবাবুর ঘনীভূত ক্রোধ দ্রবীভূত হবার উপক্রম করলে। কারণ জয়ন্তদের খানসামা মধু যা রাঁধতে পারে, তিনিও যে তা ভোজন করতে পারেন, সে কথাটা ভোজনবিলাসী সুন্দরবাবুর অজানা ছিল না। বেশ-একটু নরম হয়ে তিনি বললেন, "খাবারটা কি শুনি?"

—"খুব মসলা-দেওয়া ভাজা মাংস বলতেও ডেভিল বোঝায়। খাসা খাবার। আস্বাদ নেবার ইচ্ছা আছে নাকি? মধুকে ডাকব?"

এরপর আর ক্রোধ প্রকাশ করা মনুষ্যোচিত নয়। সুন্দরবাবু বিগলিত কণ্ঠে বললেন, "আহা, তা মন্দ কি?"

মানিক কত সহজে সুন্দরবাবুকে চটাতে ও পটাতে পারে তাই দেখে জয়ন্ত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

এমন সময়ে মধুর প্রবেশ।

সুন্দরবাবু আহ্লাদিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"এই যে মধু! ঠিক সময়েই এসেছ হে—স্বাগত, স্বাগত!"

এমন অভাবিত অভ্যর্থনার কারণ বুঝতে না পেরে মধু জিজ্ঞাসু চোখে জয়ন্তের দিকে তাকালে।

জয়ন্ত বললে, "মধু, তোমাকে দেখে সুন্দরবাবু বলছেন—স্বাগত, অর্থাৎ তোমার আগমন শুভ হোক। কেন, তা শুনতে চাও?"

মধু বললে, "তা শুনব না কেন? কিন্তু তার আগে বলে রাখি, একটি ছোকরাবাবু আপনার সঙ্গে জরুরী দরকারে দেখা করতে এসেছেন।"

—"ছোকরাবাবু? জরুরী দরকারে? কোথায়?"

—"নীচেয়। মস্ত একখানা মোটর গাড়ি করে এসেছেন। বড়লোকের ছেলে—জামায় মুক্তোর বোতাম, হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে সোনার আংটি।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "শ্রীমধুসূদন, একনজরেই এতটা লক্ষ্য করে ফেলেছ? আমাদের সহবাসে তুমিও একটি ক্ষুদ্র গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ দেখছি। যাও, বাবুটিকে উপরে পাঠিয়ে দাও।"

মধুর প্রস্থান। মানিকের মুখের পানে সুন্দরবাবুর হতাশভাবে দৃষ্টিপাত।

মানিক আশ্বাস দিয়ে বললে, "মাভৈঃ! মধু তো বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করছে না, যথাসময়েই আমাদের আরজি পেশ করব।"

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে একটি সুবেশী সুশ্রী যুবক, তার বয়স বাইশ-তেইশের বেশী হবে না, চোখের সপ্রতিভ দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়, জনতার ভিতরেও সে নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখতে পারে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই যুক্তকরে নমস্কার করে সে বললে, "আমি জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

জয়ন্ত বললে, "আমিই জয়ন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার পরিচয় জানবার সুযোগ আমার হয়নি।"

যুবক বললে, "আপনি চন্দ্রনাথ অ্যাণ্ড কোম্পানির নাম শুনেছেন?"

—"শুনেছি বৈকি। বিখ্যাত চা-ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান।"

—"কেবল চা নয়, আমাদের প্রতিষ্ঠান আরো অনেক কিছু নিয়ে কারবার করে। চন্দ্রনাথ আমার ঠাকুরদার নাম। বর্তমানে আমি সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মালিক। আমার নাম বীরেন্দ্রকুমার বাগচী।"

—"বসুন বীরেনবাবু। আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?"

—"গোলকধাঁধায় পড়ে।"

—"কি রকম?"

—"আমাদের বাড়িতে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যার মধ্যে অর্থ বা অনর্থ কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ বেশ বুঝতে পারছি যে এর সঙ্গে আছে কোন বিচিত্র রহস্যের সম্পর্ক!"

জয়ন্ত বললে, "বীরেনবাবু, আপনি আমার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে তুললেন। বোঝা যাচ্ছে, যে ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন তা খুন বা ডাকাতি বা চুরি-চামারি নয়, কারণ ওদের মধ্যে অর্থ আর অনর্থ দুই-ই থাকে। কিন্তু রহস্যের সম্পর্কটা কোথায়, বুঝতে পারছি না।"

বীরেন মাথা নেড়ে বললে, "আমিও পারছি না। তাইতো বললুম আমি গোলকধাঁধায় পড়েছি। শোনা আছে ধাঁধার জবাব দেওয়া আপনার পেশা—"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "ভুল বীরেনবাবু, ভুল! ধাঁধার জবাব দেওয়া আমার পেশা নয়, আমার নেশা—অর্থাৎ আমার শখ!"

—"বেশ, তাই! ভ্রম-সংশোধনের জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া করে আমার কথা শুনবেন কি?"

—"নিশ্চয়ই! দয়া না করেও শুনব। বলুন আপনার কাহিনী।"
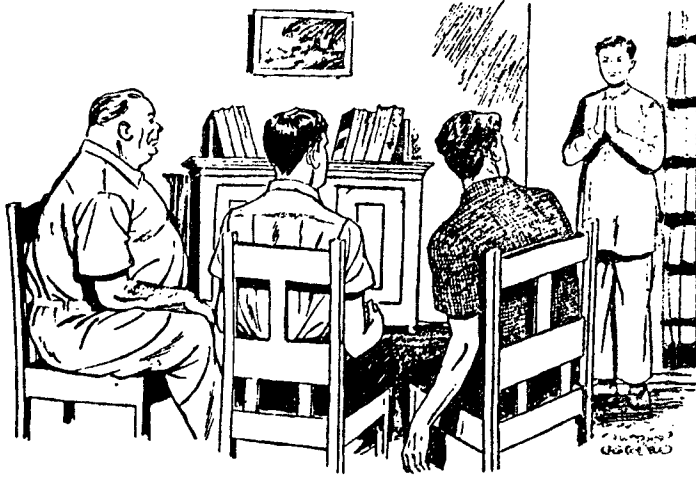
"আমি জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

বীরেন চেয়ারের উপরে নড়েচড়ে ভালো করে বসে তার কাহিনী শুরু করলেঃ

"কারবারের জন্যে আমাকে কলকাতাতেই বাস করতে হয় বটে, কিন্তু আমার পৈতৃক বসতবাড়ি বা বাস্তুভিটা আছে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অনতিদূরে। নবাবী আমলে তৈরী সেকেলে মস্তবড় বাড়ি, এখন সংস্কার অভাবে সদরমহল ছাড়া প্রায় সবটাই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। কালেভদ্রে আমাদের কারুর দেশে যাবার শখ হলে কেবল সদরমহলটাই ব্যবহার করা হয়, কাজেই সেদিকটায় মাঝে মাঝে রাজমিস্ত্রীদের হাত পড়ে। অন্য সময়ে সদরমহলও তালাবন্ধ থাকে। বাড়িখানা স্থানীয় এক ভদ্রলোকের জিম্মায় আছে—সম্পর্কে তিনিও আমাদের কুটুম্ব।

দিনদশেক আগে যদুনাথ বসু নামে এক ভদ্রলোক কলকাতার আপিসে আমার সঙ্গে দেখা করে জানালেন, মাসতিনেকের জন্যে তিনি আমাদের দেশের বাড়ি ভাড়া নিতে চান।

আমি রাজী হলুম না। কিন্তু যদুবাবু অতিশয় জেদাজেদি করতে লাগলেন। বললেন তিনি মাসিক পাঁচশত টাকা হিসাবে তিন মাসের দেড় হাজার টাকার অগ্রিম ভাড়া আমার হাতে জমা দিতে প্রস্তুত আছেন।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, পাড়াগাঁয়ে একখানা সেকেলে বাড়ির জন্যে তিনি এত টাকা ভাড়া দিতে চান কেন?

তখন তাঁর মুখ থেকেই জানতে পারলুম, তিনি হচ্ছেন পূর্ববঙ্গের জমিদার। চিকিৎসার জন্যে রুগ্‌ণ মাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, মাকে নিয়ে যেতে মফস্বলের গঙ্গার ধারে কোন জায়গায়।

আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে বটে, কিন্তু যুক্তিটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। কলকাতার আরো কাছে গঙ্গার ধারে তো কত ভালো ভালো বাড়ি রয়েছে। যাক্, এসব নিয়ে আমি আর বেশী মাথা ঘামালুম না। এই লোভনীয় প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলুম। যদুবাবু আমাকে দেড় হাজার টাকার একখানা চেক দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে আর এক ব্যাপার! একখানা বেনামা চিঠি পেলুম। তাতে জানানো হয়েছেঃ প্রতাপ চৌধুরীকে যেন মুর্শিদাবাদের বাড়ি ভাড়া দেওয়া না হয়, সে সাংঘাতিক লোক।

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম, বাড়ি ভাড়া নিয়েছে তো যদুনাথ বসু, কিন্তু কে প্রতাপ চৌধুরী? আর এই বেনামা চিঠিই বা কে লিখলে? কেন লিখলে? আমি যে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছি, এ কথাই বা সে কেমন করে জানতে পারলে?

তিন দিন পরে বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! যেদিন চেক পেয়েছিলুম তার পর দিন থেকেই দুর্গাপূজার জন্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল, চেক ভাঙাতে পারিনি। ব্যাঙ্ক খুললে পর জানতে পারলুম আমাকে একখানা ভুয়ো চেক দেওয়া হয়েছে, যদুনাথ বসুর নামে ব্যাঙ্কে এক পয়সাও জমা নেই!

এভাবে ঠকে রেগে আগুন হয়ে আমি দেশে রওনা হলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলুম আমাদের বসতবাড়িতে জনপ্রাণী নেই। শুনলুম কয়েকজন গুণ্ডার মত লোক সেখানে দু'দিন ধরে খুব হৈ-হল্লা করে আবার কখন সরে পড়েছে কেউ তা জানে না।

বাড়ির একটা তালাবন্ধ ঘরে ঠাকুরদার আমলের কতকগুলো আসবাবপত্তর একালে অব্যবহার্য বলে গুদামজাত করা ছিল। সেই সঙ্গে একটা দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা প্রকাণ্ড আলমারির ভিতরে ছিল একগাদা সেকেলে কেতাব ও কাগজপত্র। কারা তালা ভেঙে সেই ঘরে ঢুকে কেতাব ও কাগজপত্রগুলো বার করে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলে রেখে গিয়েছে! নিশ্চয় যদুদেরই কীর্তি!

ঠাকুরদার হাতে লেখা একখানা ছেঁড়া খাতাও পেয়েছি। তাতেও সব অদ্ভুত কথা লেখা! বোধহয় ঠাকুরদার গল্প-টল্প লেখার অভ্যাস ছিল! খালি গল্প নয় পদ্যও!"

দ্বিতীয় অধ্যায়

নরকঙ্কাল ও ভীষণ গর্জন

বীরেন চুপ করলে। জয়ন্তও স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, "ভারি গোলমেলে ব্যাপার তো! খামোকা যদু নামধেয় ব্যক্তির আবির্ভাব, অকারণে দেড় হাজার টাকা অগ্রিম দাদন দিয়ে তিন মাসের জন্যে একখানা পাড়াগাঁয়ে সেকেলে বাড়ি ভাড়া নেওয়া, ভুয়ো চেক ঘাড়ে চাপানো, তারপর দু'দিন সেই বাড়িতে কাটিয়েই ফুড়ুৎ করে হঠাৎ পলায়ন, এ সবই যেন মহা পাগলামির কাণ্ড! বীরেনবাবু, আপনি কোন আস্ত পাগলের পাল্লায় পড়েছিলেন, এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করবেন না।"

মানিক বললে, "কিন্তু আমার মন কেমন খুঁত-খুঁত করছে! সন্দেহ হচ্ছে এত সহজে ব্যাপারটা বোধহয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কেন, তোমার সন্দেহের কারণ কি?"

—"যদুর দল তালা ভেঙে বাড়ির বন্ধ ঘরে ঢুকেছিল কেন? আলমারি থেকে কেতাবগুলো টেনে বার করেছিল কেন? নিশ্চয় তারা কিছু খুঁজছিল!"

জয়ন্ত বললে, "আমিও মানিকের কথায় সায় দি। যদু আলমারির ভিতরে হস্তচালনা করেছিল একটা কিছু খোঁজবার জন্যেই। কেবল আলমারি কেন, খুব সম্ভব সে বাড়ির অন্যান্য ঘরেও খোঁজাখুঁজি করতে ছাড়েনি।"

বীরেন বললে, "কিন্তু বাড়ির অন্যান্য ঘরে এমন কিছুই ছিল না, যা দেখে চোরের লোভ হতে পারে। আলমারির বইগুলো নিয়ে ছেলেবেলায় আমিও ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তার মধ্যে ছিল বটতলায় ছাপা কতকগুলো সেকেলে বই—আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, চাহার দরবেশ, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা প্রভৃতির সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত আর ঐ শ্রেণীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ আর তাড়া তাড়া বাজে কাগজপত্র। ব্যাস্, আর কিছুই নয়!"

জয়ন্ত বললে, "ঐ সঙ্গে আপনার ঠাকুরদার নিজের হাতে লেখা একখানা খাতাও ছিল বললেন না?"

—"হ্যাঁ, ছিল। ছেলেবেলায় সেকেলে জড়ানো হাতের লেখা পড়বার আগ্রহ হয়নি, সম্প্রতি পড়ে দেখেছি। খাপছাড়া খোশগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। খাতাখানা আগে ছেঁড়া ছিল না, এখন দেখছি মাঝখান থেকে একখানা কাগজ কে ছিঁড়ে নিয়েছে।"

—"কি করে বুঝলেন?"

—"পত্রাঙ্ক দেখে।"

জয়ন্ত বললে, "সন্দেহজনক, সন্দেহজনক! বীরেনবাবু, খাতাখানা একবার দেখতে পেলে ভালো হত।"

নিজের হাতব্যাগের মধ্যে হস্তচালনা করে বীরেন বললে, "অনায়াসেই দেখতে পারেন। যদি কাজে লাগে এই ভেবে সেখানা আমি সঙ্গে করেই এনেছি"—এই বলে এক্সারসাইজ বুকের আকারে বাঁধানো একখানা পাতলা খাতা বার করে জয়ন্তের হাতে সমর্পণ করলে।

জয়ন্ত খাতাখানা খুলে আগাগোড়া পাতা উলটে প্রথমে ভাসা ভাসা চোখ বুলিয়ে গেল। টানা টানা জড়ানো লেখা, কিছু কষ্ট করে পড়তে হয়। সে বললে, "দেখ মানিক, ৪০ পত্রাঙ্কে খাতা শেষ। বিষয়বস্তু দেখছি পাঁচ অংশে বিভক্ত। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা বা ভূমিকার মত একটুখানি অংশ। তার পরের অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'আভাস'। তৃতীয় অংশে কি ছিল জানবার উপায় নেই, ২১ থেকে ২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অংশের নাম 'ইতিহাস'। পঞ্চম অংশে 'উপসংহার'—একটি পুঁচকে পদ্য বা ছড়া। এখন আগে ভূমিকাটুকু শোনো।"

জয়ন্ত পড়তে লাগল ঃ

"যেখানে ঘটনাক্ষেত্র, তার নাম এখানে বলব না, লেখায় প্রকাশ করলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। আমার সঙ্গী কৈলাস চৌধুরী এখন পরলোকে বটে, কিন্তু তার কুচরিত্র পুত্র ইহলোকে বিদ্যমান থেকে কেমন করে কিছু আভাস পেয়ে আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছে, এমন কি আমাকে ভয় দেখাতেও ছাড়ছে না। আমার একমাত্র ইচ্ছা, সমস্ত গুপ্তকথা জানবে কেবল আমার পুত্র। যদি সে কখনো অভাবে পড়ে, এই গুপ্তকথা তার কাজে লাগবে,

তত্র দুশ্চিন্তা দূর করবে। অন্তিমকাল উপস্থিত হলে সমস্ত গুপ্তকথাই তার কাছে ব্যক্ত করব। যদি সে সময় না পাই, তাহলেও আমার বিশেষ ভাবনার কারণ নেই। আমার পুত্র বুদ্ধিমান, তার জন্যেই তোলা রইল এই খাতাখানা। এই বিবরণ মন দিয়ে পাঠ করলেই সমস্ত রহস্য সে সমাধান করতে পারবে।"

পড়া থামিয়ে জয়ন্ত শুধোলে, "বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদাকে আপনি দেখেছেন?"

—"আমার বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে ছায়া ছায়া মনে পড়ে মাত্র।"

—"আপনার বাবার মুখে আপনি এই খাতাখানার কথা শোনেননি?"

বীরেন সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, "বাবা? আমার বাবা পড়বেন গল্পের পাণ্ডুলিপি? মশাই, বাবাকে আমি জীবনে কোন ছাপানো নভেলের পাতাই ওলটাতে দেখিনি! নিজের কারবারের বাইরে আর কোন কথাই তাঁর মনে ঠাঁই পেত না।"

জয়ন্ত আবার কিছুক্ষণ ধরে চুপ করে কি ভাবতে লাগল। তারপর বললে, "আচ্ছা বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদা মৃত্যুর আগে বা মৃত্যুশয্যায় আপনার বাবাকে এই খাতা সম্বন্ধে কোন কথা ব'লে যাননি?"

সজোরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "কিছু না, কিছু না। মশাই, ঐ খাতার ভিতরে ঠাকুরদার নিজের কোন কথাই নেই, ওর সবটাই হচ্ছে ডাহা গালগল্প। আর মৃত্যুশয্যায় ঠাকুরদা কোন কথা বলে যাবেন কি, মরবার সময়ে তিনি কোন কথা বলবার অবসরই পাননি।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে হচ্ছে, ঠাকুরদা তাস খেলতে খেলতে হঠাৎ বুকের অসুখে মারা পড়েছিলেন। খেলার আসর থেকে তুলে তাঁর মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।"

জয়ন্ত নিজের রূপোর শামুকদানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে খুশী গলায় বললে, "খানিকটা আবছা কাটল বলে মনে হচ্ছে। হৃদরোগে হঠাৎ মৃত্যু, কোন কথা বলাই সম্ভব হয়নি—বটে, বটে, বটে!"

বীরেন কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, "আপনি কি বলতে চান জয়ন্তবাবু?"

জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "আপাতত আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করবার সময় হয়নি। এখন খাতার দ্বিতীয় অংশে কি 'আভাস' পাওয়া যায় দেখা যাক।" সে আবার পাঠ শুরু করলেঃ

"বাল্যকালে আমার জীবনে ঘটেছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা।

প্রতিবেশীদের মধ্যে আমার সব চেয়ে দহরম-মহরম ছিল কৈলাস চৌধুরীর সঙ্গে। সে ছিল আমার নিত্যসঙ্গী—খেলাধূলায় ও আহারে-বিহারে আমরা সর্বদাই মানিকজোড়ের মত একসঙ্গে থাকবার চেষ্টা করতুম।

কৈলাসের সঙ্গে একবার তার মাতুলালয়ে বেড়াতে গেলুম। জায়গাটা আমাদের বাড়ি থেকে দশ-বারো মাইল তফাতে। সেখানে আমরা হাটে-বাটে-মাঠে ছুটোছুটি করে, মার্বেল-ডাংগুলি খেলে ও গঙ্গার এপারে-ওপারে সাঁতার কেটে তিন দিন কাটিয়ে দিলুম মহা আনন্দে। তারপরেই ঘটল পূর্বোক্ত ঘটনা।

গাঁয়ের প্রান্তে একটা মাঠে একদল ছেলে ফুটবল খেলছিল। এদেশে ফুটবল খেলার রেওয়াজ তখন নতুন শুরু হয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে খেলা দেখতে লাগলুম।

হঠাৎ এক বিপত্তি! মাঠের একদিকে গঙ্গাতীরে ছিল একখানা ভাঙাচোরা পোড়ো বাগানবাড়ি। এবং তার পিছনে ছিল একটা জলশূন্য পুরানো ইঁদারা। ফুটবলটা ঝুপ্ করে গিয়ে পড়ল একেবারে সেই ইঁদারার ভিতরে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল চতুর্দিক। ইঁদারার ভিতরে নজর চলে না। ছেলের দল খানিক হইচই করে মাঠ ছেড়ে চলে গেল।

আমি বললুম, 'কৈলাস, বলের জন্যে ওরা কাল সকালে নিশ্চয় আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগে আমরাই আজ কুয়োয় নেমে বলটাকে তুলে আনব।'

কৈলাস শিউরে উঠে বললে, 'বাপ রে, এই অন্ধকারে? পাগল নাকি?'

চিরকালই সবাই আমাকে ডানপিটে ও বেপরোয়া বলে জানে। আমি কিন্তু একটুও দমলুম না, বললুম, 'বেশ, তোকে কুয়োয় নামতে হবে না, তুই খালি খানিকটা মোটা দড়ি আর একটা দেশলাই যোগাড় করে আন দেখি! তুই কেবল উপরে দাঁড়িয়ে থাকবি, কুয়োর ভিতরে নামব একলা আমিই। ফাঁকতালে একটা আস্ত ফুটবল লাভ, এমন সুযোগ ছাড়তে আছে!'

যেমন কথা, তেমনি কাজ। এল দড়ি ও দেশলাই। ভরসন্ধ্যাবেলায় দড়ি বেয়ে নেমে গেলুম ইঁদারার গহ্বরে।

ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। পায়ের তলায় কি কতকগুলো খড়মড় খড়মড় করে উঠল। দেশলাইয়ের প্রথম কাঠি জ্বেলে কেবল এইটুকু দেখলুম, ইঁদারার গায়ে গাঁথা রয়েছে

একজোড়া হাতলওয়ালা লোহার দরজা। তারপর কাঠি নিবে গেল।

দ্বিতীয় কাঠি জ্বেলে নীচের দিকে তাকিয়েই সচমকে দেখি কতকগুলো মাংসহীন নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে আমার পায়ের তলায়। তারপর আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম যেন কোন অপার্থিব বিভীষণের মারাত্মক ফোঁসফোঁসানি!

সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল পরমুহূর্তেই সেই ভয়াবহ বিষাক্ত হিস্ হিস্ শব্দ যেন আমার চোখের সামনেই মূর্তিমান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে! কর্পূরের মত উবে গেল আমার সমস্ত সাহস, দারুণ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে প্রাণপণে দড়ি ধরে কোনরকমে উপরে এসে উঠলুম!

সব শুনে কৈলাস চোখ কপালে তুলে বললে, 'চুলোয় যাক্ ফুটকলাই! ওখানে আছে গুপ্তধন আর যকের পাহারা! গুপ্তধনের লোভে ওখানে গিয়ে যকের হাতে যারা মারা পড়েছে, তুই দেখেছিস তাদেরই কঙ্কাল!'

তৃতীয় অধ্যায়
জগৎশেঠের গুপ্তধন

জয়ন্ত বললে, "খাতার দ্বিতীয় অংশ শেষ হল। তৃতীয় অংশ আমাদের হাতে নেই। চতুর্থ অংশের নাম 'ইতিহাস'। এইবারে সেটুকু পাঠ করা যাক।"

আবার পড়া শুরু হলঃ

"সারা পৃথিবীকে যিনি ঋণদান করতে পারেন, তাঁরই উপযোগী উপাধি হচ্ছে 'জগৎশেঠ'। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্ ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ উপাধি দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের মহাজন ফতেচাঁদকে।

কিন্তু ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হলেও বাঙালী ছিলেন না। তাঁর পূর্বপুরুষ হীরানন্দ শাহা সুদূর রাজস্থান থেকে পাটনায় এসে ব্যবসায় শুরু করেন এবং তেজারতী কারবারে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন।

হীরানন্দের সাত ছেলে। তাঁদের একজনের নাম মানিকচাঁদ। তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার জন্যে বাংলার তখনকার রাজধানী ঢাকায় গিয়ে হাজির হন এবং নবাব-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পশ্চিমবঙ্গে এসে ভাগীরথীতটে নূতন রাজধানী স্থাপন করে নিজের নামানুসারে তার নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ। নবাবের প্রিয়পাত্র মানিকচাঁদও নূতন রাজধানীতে এলেন। নবাব-দরবারে তাঁর প্রভাব ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। তাঁর পরামর্শে মুর্শিদাবাদে নবাবী টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি হন নবাবের অর্থসচিব ও কোষাধ্যক্ষ। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁকে 'শেঠ' উপাধি দান করেন।

এই মানিকচাঁদের বংশধররা পরে কেবল নবাব-বংশের নয়, স্বাধীন বাংলাদেশেরও উত্থান ও পতনের অন্যতম কারণরূপে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

মানিকচাঁদ ছিলেন অপুত্রক। ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদ হন তাঁর দত্তকপুত্র। তিনি দিল্লীতে থেকে অংশীদাররূপে কারবার দেখতেন। কিন্তু ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মানিকচাঁদের মৃত্যু হলে তিনিও মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। এর দুই বৎসর পরেই তিনি জগৎশেঠরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ধনিক বা পুঁজিপতি বলে সুপরিচিত হন।

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর (১৭২৭ খ্রীঃ) পর সুজাউদ্দীন নবাব হয়ে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়টাই হচ্ছে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জীবনে সবচেয়ে গৌরব ও সৌভাগ্যের যুগ। তিনি কেবল সুবিপুল ধনাগারের অধিকারী ছিলেন না, নবাব-দরবারে ও দেশ-বিদেশে তাঁর সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁর সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎশেঠকে প্রথম ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে হল।

তরুণ নবাব সরফরাজ ফতেচাঁদের পুত্রবধূর অসীম রূপলাবণ্যের কথা শুনে নির্বোধের মত তাঁকে স্বচক্ষে দেখবার বাসনা প্রকাশ করলেন,—এটুকু তাঁর খেয়াল এলো না যে, হিন্দুদের অসূর্যম্পশ্যা কুলললনার পক্ষে সেটা হচ্ছে অতিশয় অপমানকর প্রস্তাব!

ফতেচাঁদ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে আলিবর্দী খাঁয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এবং তার ফলে গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সরফরাজের মৃত্যু ও ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দীর সিংহাসনপ্রাপ্তি।

এই ঘটনার চার বৎসর পরে ফতেচাঁদ ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর দুই পৌত্র—মাধব রায় ও স্বরূপচাঁদ। মাধব রায় জগৎশেঠ উপাধির সঙ্গে বেশীর ভাগ সম্পত্তির অধিকারী হলেন এবং বাকি সম্পত্তির সঙ্গে স্বরূপচাঁদ নবাব-দরবার থেকে পেলেন 'রাজা' উপাধি। বাংলাদেশে তখন ইংরেজ ও ফরাসীরাও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন, সুচতুর জগৎশেঠরা তাঁদেরও লক্ষ লক্ষ টাকা ধার দিয়ে তুষ্ট রাখতে ভুললেন না। এইভাবে সব দিক সামলে ব্যবসা চালিয়ে তাঁরা দিনে দিনে অধিকতর আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে চললেন।

তারপরেই আলিবর্দীর মৃত্যু ও ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজের সিংহাসন লাভ এবং তাঁর সঙ্গে জগৎশেঠের বিরোধ। নূতন নবাবের কাছে অপমান ও লাঞ্ছনা লাভ করে জগৎশেঠ

আবার মীরজাফর ও ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ফল, পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজের পতন এবং বাংলার সর্বনাশ।

জগৎশেঠেরা আবার পূর্ব-গৌরবের পদে উন্নীত হয়ে নিজেদের স্বর্ণভাণ্ডারের পরিধি আরো বাড়িয়ে তুললেন বটে, কিন্তু তখনই ভিতরে ভিতরে তাঁদের উপরে শনির দৃষ্টি পড়তে শুরু হল। তারপর অকর্মণ্য মীরজাফরকে বঞ্চিত করে ইংরেজরা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের ভার অর্পণ করলেন মীরকাশিমের হস্তে। নূতন নবাবকে নিয়ে জগৎশেঠেরা সুখী হতে পারলেন না, তাঁরা আবার চক্রান্তে যোগ দিলেন। কিন্তু এবারে তাঁরা আর শেষ রক্ষা করতে ও নিয়তিকে ফাঁকি দিতে পারলেন না, বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে দেখে মীরকাশিম তাঁদের বন্দী করে ফেললেন (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁদের বন্ধু ইংরেজদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা আর মুক্তিলাভ করতে পারলেন না।

তারপর উদয়নালার যুদ্ধ; মীরকাশিমের পরাজয় এবং জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দীদের নিয়ে মীরকাশিমের মুঙ্গেরে প্রস্থান; বক্সারের যুদ্ধ; মীরকাশিমের শেষ পরাজয় (১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) এবং জগৎশেঠ প্রভৃতিকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে হত্যা।

মীরজাফর আবার বাংলার নবাব হন এবং নতুন জগৎশেঠ কুশলচাঁদও (নিহত জগৎশেঠ মাধব রায়ের বড় ছেলে) আবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। তিনিও ইংরেজদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য লাভ করেও শেঠবংশের পূর্বগরিমা আর ফিরিয়ে আনতে পারেননি। বাংলার ভুয়ো নবাবীর সঙ্গে জগৎশেঠদেরও জাঁকজমক ম্লান হয়ে এসেছিল, বাংলার স্বাধীনতাহরণে সাহায্য করে তাঁরাও আত্মরক্ষা করতে পারলেন না।

বুদ্ধিমান কুশলচাঁদ বুঝে নিয়েছিলেন যে, জগৎশেঠদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়—তাঁদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দুঃসময়ের জন্যে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

তাঁর আদেশে একটি গুপ্ত কুঠী নির্মিত হল এবং নিজের সম্পত্তির কতক অংশ তিনি সেইখানে লুকিয়ে রাখলেন।

সেই রত্নকুঠীর কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে, কিন্তু তার ঠিকানা কেউ জানে না। কুশলচাঁদ হঠাৎ মারা পড়েন, তাই গুপ্তধনের সন্ধান নিজের উত্তরাধিকারীর কাছে দিয়ে যেতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত কুশলচাঁদ যা ভয় করেছিলেন তাইই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমেই শেঠদের অর্থ ও প্রতিপত্তি কমে এলেও কুশলচাঁদের মৃত্যুর পর আরো দুইজন জগৎশেঠের নাম শোনা যায়—হারেকচাঁদ ও ইন্দ্রচাঁদ।
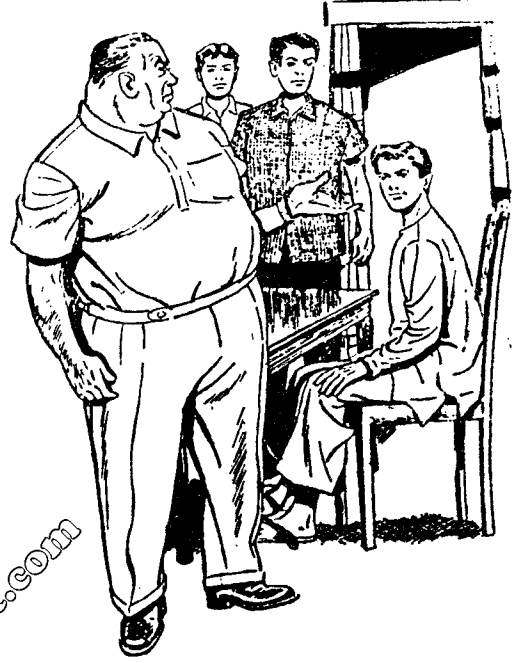
তাঁর ঠাকুরদার গল্প বানানোর অভ্যাস ছিল।

ইন্দ্রচাঁদের পুত্র গোবিন্দচাঁদ 'জগৎশেঠ' উপাধি থেকেও বঞ্চিত হন এবং পিতার সম্পত্তিও বোকার মত দুই হাতে উড়িয়ে দিয়ে ইংরেজের অন্নদাসরূপে শেষ-জীবন কাটাতে বাধ্য হন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকেও দেশদ্রোহী জগৎশেঠদের কাছে উপকৃত ইংরেজরা বৃত্তি দান করতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে বৃত্তিও বন্ধ হয়।

জগৎশেঠের আধুনিক বংশধররাও মুর্শিদাবাদে বাস করেন, কিন্তু লুপ্ত হয়েছে তাঁদের আর্থিক গৌরব। হয়তো তাঁরাও প্রবাদে গুপ্তধনের কাহিনী শ্রবণ করেন, কিন্তু তার সত্যতা নিরূপণ করবার উপায় তাঁদের হাতে নেই—আবিষ্কার করতে পারলে এখন এ গুপ্তধনের মালিক হবে যে কোন ব্যক্তি।"

জয়ন্তের পাঠ সাঙ্গ হল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! সব তো শোনা হল! খানিকটা ভণিতা, খানিকটা গালগল্প, খানিকটা গাঁজা-মেশানো ইতিহাস! বীরেনবাবু ঠিকই ধরেছেন—তাঁর ঠাকুরদার গল্প বানানোর অভ্যাস ছিল!"

জয়ন্ত বললে, "উপসংহারে একটি পদ্যও আছে, সেটাও চেঁচিয়ে পড়া যাক!" বলে সে পড়তে লাগল:

বোকায় ধোঁকা দেবার তরে বুদ্ধিসাগর মন্থি'
গোলকধাঁধার গ্রন্থ রচি আমি নতুন গ্রন্থী।

কিন্তু আমি ঠিক জানি ভাই,
গুপ্তপথে রপ্ত সবাই!
সর্বজনের সামনে লুকোয় সহজ পথের পন্থী।

বিন্দু বারি সিন্ধু হলে যায় না দেখা বিন্দুকে,
ইন্দু আছে মেঘের আড়ে, নিন্দে তবু নিন্দুকে।
মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সেই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে!

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "এ যে বাবা দস্তুরমত হেঁয়ালি!"

বীরেন বললে, "প্রায় অতি-আধুনিক কবিতার মত!"

মানিক বললে, "খাপছাড়া পদ্য-টদ্য নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। জয়ন্ত, তুমি কি মনে কর, বীরেনবাবুর দেশের বাড়িতে যে রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে এই খাতার লেখার কোন সম্পর্ক আছে?"

জয়ন্ত বললে, "এইবারে তাই নিয়েই আলোচনা করতে হবে।"

মধু একখানা খাম হাতে করে ঘরে ঢুকে বললে, "বাবু, একটা অদ্ভুত লোক এসে আপনার নামে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।"

—"অদ্ভুত লোক?"

—"হ্যাঁ বাবু। পরনে সন্ন্যাসীর মত গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ।"

জয়ন্ত খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়েই লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কোথায় সে?"

—"বাবু, চিঠিখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়েই সে হনহন করে চলে গেল!"

চিঠিতে কেবল লেখা ছিল, "সাবধান, সাবধান,—সাক্ষাৎ-শয়তান প্রতাপ চৌধুরীকে সাবধান!"

চতুর্থ অধ্যায়
কে প্রতাপ চৌধুরী?

মানিক বললে, "কি আশ্চর্য! কে এই সাক্ষাৎ-শয়তান প্রতাপ চৌধুরী? বার বার তার কথা তুলে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আরো একটা অদ্ভুত প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই অদ্ভুত লোকটা? পরনে সন্ন্যাসীর মত গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ!"

বীরেন বললে, "আমার বিশ্বাস, এই লোকটাই বেনামা চিঠি লিখে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল!"

জয়ন্ত বললে, "এই গেরুয়াবস্ত্রধারী রহস্যময় লোকটা কে তা জানি না, কিন্তু প্রতাপ চৌধুরী সম্বন্ধে হয়তো কিছু আন্দাজ করতে পারি।"

বীরেন বললে, "পারেন নাকি?"

—"হ্যাঁ। আমার আন্দাজ হয়তো মিথ্যা নয়। আপনার ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবুর লেখা পড়ে আমরা জেনেছি যে, তিনি যখন ইঁদারায় নেমেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন কৈলাস চৌধুরী। আর এক জায়গায় তিনি বলছেন, কৈলাস চৌধুরীর কুচরিত্র পুত্র গুপ্তরহস্যের আভাস পেয়ে তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে আর ভয় দেখাচ্ছে। খুব সম্ভব তারই নাম প্রতাপ চৌধুরী।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু গুপ্তরহস্যটা কি?"

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, "জগৎশেঠের রত্নকুঠী।"

—"আরে ধেৎ, তুমিও কি ঐ রূপকথাটা বিশ্বাস কর?"

—"করি। জগৎশেঠ কুশলচাঁদের গুপ্তধনের কথা আমিও ঐতিহাসিক কাহিনীতে পাঠ করেছি।"

—"ইতিহাস আর কাহিনী এক কথা নয়।"

—"তা নয়। কিন্তু সেকালের ধনীদের মধ্যে গুপ্তধন রাখার প্রথাটা খুবই চলিত ছিল। আর বীরেনবাবুর ঠাকুরদার লেখা পড়লে এই সন্দেহই দৃঢ় হয় যে, তিনি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন। তা নইলে তিনি এ কথা বলতেন না যে, লেখার মর্মোদ্ভেদ করতে পারলে তাঁর পুত্রের অর্থাভাব দূর হয়ে যাবে।"

মানিক বললে, "ধরলুম কৈলাস চৌধুরীর ছেলেরই নাম হচ্ছে প্রতাপ চৌধুরী। হয়তো সত্যসত্যই তার চরিত্র হচ্ছে সাক্ষাৎ-শয়তানের মত ভয়াবহ। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে কেন? এ মামলাটা নিয়ে এখনো আমরা তদন্তে নিযুক্ত হইনি। সে আমাদের অস্তিত্ব জানতে পারবে কেমন করে?"

জয়ন্ত শুধোলে, "বীরেনবাবু, আপনি যে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করতে চান, এ কথা কি আর কারুর কাছে প্রকাশ করেছেন?"

বীরেন সবেগে মাথা নেড়ে বললে, "নিশ্চয়ই নয়! আজ সকাল পর্যন্ত জানতুম না যে, আমি আপনাদের কাছে এসে ধরনা দেব!"

—"তাহলে অন্য কোন পক্ষের লোক আপনার পিছনে পিছনে ছায়ার মত লেগে আছে। আপনি যে আমাদের কাছে এসেছেন, এর মধ্যেই সে খবর তারা পেয়ে গেছে। জানেন তো, অপরাধীদের কাছে আমরা অপরিচিত নই?"

বীরেন বললে, "এ কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কারা তারা?"

—"হয়তো তথাকথিত যদুনাথ বসুর দল। হয়তো যদুনাথ হচ্ছে প্রতাপ চৌধুরীরই ছদ্মনাম!"

মানিক বললে, "যদুনাথ বসু বা প্রতাপ চৌধুরীর কথা বলতে পারি না, তবে এমন আর একজন লোকও বীরেনবাবুর প্রত্যেক গতিবিধির খবর রাখে, যে প্রতাপ চৌধুরীর বন্ধু নয়।"

জয়ন্ত বললে, "তুমি বেনামা পত্রলেখকের কথা বলছ?"

—"হ্যাঁ।"

—"আমিও তোমার মতে সায় দি। আমরা এখনো কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইনি, কিন্তু ব্যাপারটা যে গোড়াতেই অতিরিক্ত মাত্রায় ঘোরাল হয়ে উঠল! আপাততঃ আমাদের এই প্রতাপ চৌধুরী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বীরেনবাবু, আপনি প্রতাপ চৌধুরীকে চেনেন?"

—"না। তবে লোকের মুখে শুনেছি, চুরি, জুয়াচুরি, রাহাজানি, খুনখারাবিতে সে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। একবার কোথায় কি অপরাধ করে সে পনেরো বছরের জন্যে জেলে গিয়েছিল, কিন্তু বছরখানেক যেতে না যেতেই জেল ভেঙে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে।"

সুন্দরবাবু হঠাৎ টেবিলের উপরে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "জয়ন্ত! মানিক! এই সেই 'সোনার আনারস' মামলার প্রতাপ চৌধুরী নয় তো? আমরাই তাকে গ্রেপ্তার করেছিলুম, পনেরো বৎসর কারাবাসের আদেশ পেয়ে এক বছরের মধ্যেই জেল থেকে সে পালিয়ে যায় আর সঙ্গে করে নিয়ে যায় তার দলের আর একজন লোককেও।"

মানিক বললে, "তারও নাম মানিকচাঁদ। সেও এক মারাত্মক অপরাধী, আমাদের প্রায় মৃত্যুপথে পৌঁছে দিয়েছিল, সুন্দরবাবুর জন্যে কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি!"

জয়ন্ত বললে, "হুঁ, সব মনে পড়ছে! প্রতাপ চৌধুরী সেই সময়েই আমাকে বলেছিল, কোন কারাগারই তাকে ধরে রাখতে পারবে না, তার সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে!"

মানিক বললে, "ও বাবা, সে যে এক মহা ধড়িবাজ ব্যক্তি! সেবারে তার হাত থেকে আমরা বাঘরাজাদের গুপ্তধন ছিনিয়ে নিয়েছিলুম। গ্রেপ্তার হবার পর সে আমাদের বলে গিয়েছিল—'আপাতত এই গুপ্তধন তোমাদের জিম্মায় রেখে গেলুম। যথাসময়ে এর সঠিক হিসাব দাখিল করতে হবে।' এখন সে জেলের বাইরে এসেছে। এইবারে আবার কি তার দেখা পাব?"

জয়ন্ত বললে, "সে আবার দেখা দেবে কি দেবে না জানি না। কিন্তু সে যদি এই প্রতাপ চৌধুরী হয়, আর আমরা যদি বীরেনবাবুর মামলার ভার গ্রহণ করি, তাহলে আমাদেরই তাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

সুন্দরবাবু মস্তক আন্দোলন করে বললেন, "হুম্! সে বুঝি সহজ কথা? গেলবারেই দেখেছি, প্রতাপ চৌধুরীটা মেঘনাদের মত আড়ালে থেকে এমন কায়দায় যুদ্ধচালনা করে যে, কেউ তাকে ধরতে ছুঁতে পারে না!"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু তার যুদ্ধচালনার কৌশলটা আমরা জেনে নিয়েছি, সুতরাং এবারে আর বেশী বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না।"

আচম্বিতে সকলকে চমকে দিয়ে রাস্তার ধারের জানালার গরাদের উপরে ঠকাং করে কি-একটা এসে পড়ে ছটকে গেল অন্য দিকে এবং পরমুহূর্তে জেগে উঠল কামানগর্জনের মত একটা কানফাটানো ভীষণ শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে বাড়িখানা কাঁপতে লাগল! হুহু করে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমস্ত দৃশ্য! সম্মিলিত কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ! জনতার উচ্চ কোলাহল! এ যেন পরম শান্তির মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত!

পঞ্চম অধ্যায়

হোটেলখানায় সন্ন্যাসী

এই অভাবিত ও আকস্মিক উৎপাত স্তম্ভিত করে দিলে সকলের দেহ এবং মন। জানালা দিয়ে হুহু করে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল বারুদের গন্ধমাখা রাশীকৃত ধোঁয়া, সকলে ফ্যালফ্যাল করে সেইদিকে তাকিয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত।

বাইরের থেকে সমানে ভেসে আসছে আর্তনাদ, হট্টগোল, বহু লোকের দ্রুত পদশব্দ।

কে চীৎকার করে বললে, "শীগ্‌গির ফোন করে দাও! অ্যাম্বিউল্যান্সের ব্যবস্থা কর!"

সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিলে জয়ন্ত। দৌড়ে জানালার কাছে ছুটে গিয়ে পথের দিকে করলে দৃষ্টিপাত। এদিকে ওদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "বোমা! আমাদের জানালা লক্ষ্য করে কেউ বোমা ছুঁড়েছে!"

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, "হুম্! হুম্! হুম্!"

—"কিন্তু আমাদের জোর কপাল! বোমাটা ঘরের ভিতরেও আসেনি, জানালার গরাদের গায়ে ধাক্কা লেগেও

তার বিস্ফোরণ হয়নি, পথের উপরে আছড়ে পড়বার পর সেটা ফেটে গিয়েছে!"

মানিক বললে, "এই বদ্ধ ঘরের ভিতরে বোমা ফাটলে আমরা কেউ আর বাঁচতুম না!"

—"তা হয়তো বাঁচতুম না। কিন্তু তা হয়নি বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।"

সুন্দরবাবু রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু কৃষ্ণ যাদের রক্ষা করলেন না, তাদের অবস্থাটা দেখে আসা দরকার। চলুন, নীচেয় নেমে তদারক করে আসি।"

রাজপথের উপরে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে রক্ত আর রক্ত! এখানে-ওখানে বইছে যেন রক্তের রাঙা লহর! তারই মধ্যে ছটফট করছে তিনটে রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন দেহ। আর একটা দেহ একেবারে আড়ষ্ট ও নিস্পন্দ। সে বীভৎস দৃশ্য চোখ মেলে দেখা যায় না—বীরেন শিউরে উঠে উঃ বলে হাতে চোখ ঢেকে মাটির উপরে বসে পড়ল।

রাজপথের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "দেখ জয়ন্ত, দেখ! বোমা ফেটে পথের উপরে কত বড় একটা গর্ত হয়েছে—ওরে বাস্ রে বাস্!"

মানিক বললে, "অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা!"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু ছুঁড়লে কে, সেইটেই এখন জানা দরকার।"

পথে লোকে লোকারণ্য, ছুটোছুটি, ভীত চীৎকার! কেউ স্থির হয়ে কারুর কথা শুনছে না, নানাজনে নানাপ্রকার মত জাহির করছে!

ওধারের ফুটপাতে ছিল একখানা চায়ের দোকান, জয়ন্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বললে, "হ্যাঁ স্যার, ব্যাপারটা আমি দেখেছি! একখানা ছুটন্ত মোটর থেকে একটা লোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আপনার বাড়ির দোতলার জানালার দিকে বলের মত একটা জিনিস ছুঁড়ে মারলে—"

সুন্দরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "কি রকম মোটর? ট্যাক্সি?"

—"না, লাল রঙের প্রাইভেট মোটর।"

—"সিডান বডি?"

—"না, খোলা গাড়ি।"

—"নম্বর?"

—"আরে মশাই, নম্বর দেখবার সময় কি পেয়েছি? তারপরই ভীষণ শব্দ আর বিষম হুলুস্থূল—আঁতকে উঠে সেইদিকেই তাকিয়ে রইলুম।"

—"তুমি তো ভারি বোকা লোক হে! কেন তুমি আঁতকে উঠলে, কেন তুমি নম্বরটা টপ্ করে দেখে নিলে না?"

—"মশাই গো, এখানে থাকলে আপনিও তখন আমারই মতন বোকামি করতেন!"

—"কখ্খনো নয়, কখ্খনো নয়, আমি সে পাত্রই নই!"

জয়ন্ত বললে, "যাকগে ও-কথা। তারপর কি হল বল।"

—"তারপর মুখ ফিরিয়ে সেই লাল মোটরখানা আর দেখতে পেলুম না। গাড়িখানা একবারও থামেনি, তীরের মত ছুটে মিলিয়ে গিয়েছে।"

সুন্দরবাবু গজগজ করে বললেন, "যাবেই তো, মিলিয়ে যাবেই তো! তুমি নম্বর দেখবে বলে সে তো আর দাঁড়িয়ে থাকবে না!"

চায়ের দোকানের মালিক হঠাৎ সচমকে বলে উঠল, "দেখুন, দেখুন!"

—"দেখব? কি দেখব?"

—"সেইরকম একখানা লাল মোটর আবার এইদিকে ছুটে আসছে!"

—"হুম্, বল কি?"

—"না, না, গাড়িখানা খানিকটা এসেই আবার মোড় ফিরে পাঁই পাঁই করে সরে পড়ল!"

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!"

মানিক বললে, "মিছে চেঁচিয়ে গলা ভাঙবেন কেন সুন্দরবাবু? কোথাও ট্যাক্সি নেই, লাল মোটরের পিছু ধরা অসম্ভব!"

বীরেন বললে, "হ্যাঁ, লাল মোটরখানা আড়ালে চলে গেছে—আর ওর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "ফাঁকি দিলে যে, ফাঁকি দিলে! হায় হায় হায় হায়!"

জয়ন্ত বললে, "দূর থেকে কারুকে চিনতে পারলুম না বটে, তবে এটুকু আমার চোখ এড়ায়নি যে, গাড়ির ভিতরে ছিল তিনজন আরোহী আর তাদের একজনের দেহে ছিল সাহেবী পোশাক।"

—"কিন্তু জয়ন্ত, ওখানা বোধহয় অপরাধীদের গাড়ি নয়। তাহলে পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসত না।"

—"গাড়িখানা সন্দেহজনক। নইলে এইদিকে আসতে আসতে হঠাৎ অন্য পথ ধরে এত তাড়াতাড়ি সরে পড়ল কেন?"

মানিক বললে, "আমার বোধ হয় অপরাধীরা দেখতে এসেছিল তাদের বোমা লক্ষ্যভেদ করেছে কি না!"

—"আমারও সেই বিশ্বাস। তারপর ঘটনাস্থলে আমাদের বহাল তবিয়তে বর্তমান দেখে চটপট চম্পট দিয়েছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কি দুঃসাহসী অপরাধী!"

—"এই মামলার সঙ্গে ফেরারী আসামী প্রতাপ চৌধুরীর কোন সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু তার দুঃসাহসের প্রমাণ আগেও কি আপনি পাননি সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু সায় দিয়ে বললেন, "পেয়েছি বৈকি, পেয়েছি বৈকি! ঐ দেখ, পুলিস এসে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বিউল্যান্সের গাড়িও!"

জয়ন্ত বললে, "আসুন, আমরা চুপি চুপি সরে পড়ি।"

—"কিন্তু সরে পড়বে কোথায়? বোমা ছুঁড়েছে তোমার বাড়ির উপরে, পুলিস তোমাকে খুঁজবেই।"

—"সে সব পরের কথা। এখন আর একটা দৃশ্য দেখুন।"

—"দৃশ্য? আবার কি দৃশ্য?"

—"চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। একটু দূরে তাকিয়ে দেখুন, আমাদের পাড়ার হোটেলবাড়ির ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র মূর্তি! পরনে গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়ি-গোঁফ। এই লোকটাই কি খানিক আগে মধুর হাতে বেনামা চিঠি সমর্পণ করে গেছে?"

—"হুম্!"

—"আচ্ছা, আমি খবরাখবর নিয়ে আসি, আপনারা বাড়ির ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।" এই বলে জয়ন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উদরপরায়ণ সন্ন্যাসীপ্রবর

মানিক ও বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবাবু আবার জয়ন্তের বৈঠকখানায় ঢুকে একখানা চেয়ারের উপরে নিজের গুরুভার কলেবর স্থাপন করলেন সশব্দে।

এবং তারপর গলা চড়িয়ে বললেন, "ও মধু, অ শ্রীমধুসূদন! মনটা বড়ই উত্তেজিত হয়েছে বাবা, এক পেয়ালা চা না পেলে তো শান্ত হবে না!"

কিন্তু চায়ের পেয়ালা আসবার আগেই সেখানে হল পুলিসের আবির্ভাব। স্থানীয় থানার ইন্‌স্পেক্টার তদন্তে এসে সুন্দরবাবুকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন, কিন্তু আসল রহস্যের কোনই পাত্তা পেলেন না, তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল কেউ বা কারা ভ্রমক্রমে এই বাড়ির উপরে বোমা

বাড়ির ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র মূর্তি!

নিক্ষেপ করেছে।

পুলিস প্রস্থান করলে পর মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, এইবারে চা আসবে তো?"

—"নিশ্চয়! সেইসঙ্গে কিছু 'ইত্যাদি' থাকলেও আপত্তি করব না।"

—"হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আপনার রসনেন্দ্রিয় কি সর্বদাই 'ইত্যাদি'র জন্যে তৈরী হয়ে থাকে?"

—"সর্বদাই ভাই, সর্বদাই! জীবদেহের প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে উদরপূজা। অতএব আসুক চায়ের সঙ্গে ইত্যাদি। ও মধু, অ শ্রীমধুসূদন! এত মিষ্টি করে ডাকছি, তবু সাড়া পাই না কেন বাপধন?"

সুন্দরবাবু চা এবং 'ইত্যাদি' নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, ততক্ষণে জয়ন্ত কি করছে দেখে আসা যাক।

জয়ন্ত হোটেলের কাছে আসতে আসতেই দেখতে পেলে, ছাদের উপর থেকে জটাধারী সন্ন্যাসীর মূর্তিটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল, কেন? তাকেই দেখে নাকি? সে আরো জোরে পা চালিয়ে দিলে।

ভাতের হোটেল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত খরিদ্দারের ভিড়।

মালিক জয়ন্তের পরিচিত। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে হোটেলবাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, জয়ন্তকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ মশাই, ওখানে অত দুমদাম, চ্যাঁচামেচি, ছুটোছুটি কেন?"

খুব সংক্ষেপে হোটেলওয়ালার কৌতূহল চরিতার্থ করে জয়ন্ত শুধোলে, "আপনার এখানে আজ কোন স্বামীজী অর্থাৎ সন্ন্যাসীর আগমন হয়েছে?"

—"হয়েছে বৈকি! তাঁর নাম বোধহয় ভোজনানন্দ স্বামী!"

—"আপনার এমন অনুমানের কারণ?"

—"একাই উড়িয়ে দিয়েছেন তিনজনের খোরাক। মাছ-মাংস কিছুই বাদ যায় না। নিরামিষে অত্যন্ত অরুচি। জনকয় এমন স্বামীজীকে পেলে আমাকে আর হোটেল চালাবার জন্যে ভাবতে হয় না।"

—"স্বামীজী কি আপনার পুরানো খরিদ্দার?"

—"উঁহু, আজ এই প্রথম তাঁর পায়ের ধুলো পেলুম।"

—"তিনি এখনো হোটেলে আছেন তো?"

—"আছেন বৈকি!"

—"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।"

—"বেশ তো, সোজা উপরে উঠে যান। বিবিধ উপচারে উদরসেবা করে তিনি এখন দেহকে একটু হালকা করবার জন্যে ছাদের উপরে পায়চারি করছেন।"

কিন্তু ছাদের উপরে স্বামীজীর জটা বা টিকির খোঁজ পাওয়া গেল না। হোটেলের কোন ঘরেও নয়। বাড়ির খিড়কির দরজাটা নাকি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন খোলা রয়েছে। স্বামীজীর অন্তর্ধানের রহস্যটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

জয়ন্ত আবার সদরের দিকে ফিরে এল হতাশভাবে।

হোটেলওয়ালা তখনও সেখানে মোতায়েন ছিল। "স্বামীজীর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়নি?" মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে প্রশ্ন করলে।

—"না। কেমন করে জানলেন আপনি?"

—"আপনি উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজীকে খিড়কির দিক থেকে হনহন করে এদিকে আসতে দেখলুম। আমি তাঁকে আপনার কথা জানালুম। তিনি বললেন, 'আমার এখন বড় তাড়া, কারুর সঙ্গে মুলাকাত করবার ফুরসত নেই।' তারপর হন্তদন্তের মত এগিয়ে ঐ গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।"

জয়ন্ত বুঝলে, এখন আর স্বামীজীর পশ্চাদ্ধাবন করা মায়ামৃগের পিছনে ছোটার মতই ব্যর্থ হবে। সে বাড়িমুখো হল এই ভাবতে ভাবতেঃ স্বামীজী আমার সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলছেন কেন? তিনি বেনামা চিঠি বিলি করে গুম হয়ে যান। নাগাল ধরতে গেলে পিঠটান দেন। যেন আমাদের ভয় করেন!

স্বামীজীর মাছ-মাংস সবই চলে। একাই খতম করেন তিনজনের খোরাক। যেখানে সেখানে যার তার হাতের রান্না খেতেও তাঁর আপত্তি নেই। স্বামীজী সংযম বা বাছবিচারের ধার ধারেন না। তবে কি তিনি নকল স্বামীজী? তাঁর জটাজূট আর গৈরিক সাজ কি বাজে ভড়ং? তিনি কি ছদ্মবেশী?

বাড়িতে পৌঁছতেই মানিক শুধোলে, "কি হল জয়ন্ত? সন্ন্যাসী কি বললেন?"

—"কিছুই বললেন না। অর্থাৎ কিছু বলবার আগেই আড়ালে গা ঢাকা দিলেন!"

—"বটে, বটে? এই সন্ন্যাসীপ্রবর দেখছি রহস্যের অবতার! অতঃপর?"

—"অতঃপর তল্পিতল্পা বাঁধো। আমরা আজকেই মুর্শিদাবাদ যাত্রা করব।"

সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, "হুম্! এর মানেটা কি?"

—"মানে একটা আছে বৈকি! কিঞ্চিৎ তদন্তের দরকার।"

—"কিসের তদন্ত?"

—"গুপ্তধনের।"

বীরেন বললে, "আপনি তাহলে আমার ঠাকুরদার গল্প সত্য বলে মনে করেন?"

—"করি! দেখছেন তো, আপনি এখানে এসেছেন বলে এর মধ্যেই আমাদের উপরে হামলা শুরু হয়েছে! কোন লোক বা দল চায় না যে, আমরা আপনাকে সাহায্য করি। তাদের এই আপত্তির মূলে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে।"

—"কিন্তু সেজন্যে মুর্শিদাবাদে যাবার প্রয়োজন কি?"

—"জগৎশেঠরা মুর্শিদাবাদেই বাস করতেন।"

—"সুতরাং তাঁদের রত্নকুঠী আছে মুর্শিদাবাদেই, এই হল আপনার যুক্তি?"

—"ঠিক তাই।"

বীরেন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললে, "জগৎশেঠের বিরাট প্রাসাদ মুর্শিদাবাদেই ছিল বটে, কিন্তু এখন গঙ্গা তাকে গ্রাস করেছে। সেখানে আজ গুপ্তধনের সন্ধান করতে গেলে আমাদের ডুবুরী সাজা ছাড়া উপায় নেই। আপনি কি এ খবর রাখেন না?"

—"রাখি বৈকি!"

—"তবে? এইজন্যেই তো আমি ঠাকুরদার কাহিনীটা বাজে গল্প বলেই ধরে নিয়েছি।"

—"ভুল করেছেন।"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, "তোমার যুক্তিটা শুনি?"

—"যথাসময়ে বলব। এখন তল্পিতল্পা বাঁধবার চেষ্টা করুন।"

—"কিন্তু তাড়াতাড়ি কেন বাপু?"

—"মনে রাখবেন, বীরেনবাবুর ঠাকুরদার লেখা খাতার কিছু অংশ যদুনাথ বসু বা প্রতাপ চৌধুরীর হাতে গিয়ে পড়েছে। তার মধ্যেই হয়তো রত্নকুঠীর ঠিকানা আছে। দেরি করলে আমাদের ভাগ্যে লাভ হবে অষ্টরম্ভা।"

সপ্তম অধ্যায়

বিপদের সংকেত

মুর্শিদাবাদ। নগরপ্রান্তে শীতকালের মরা গঙ্গা। যেন কোন অগভীর বড় খাল, কারণ জলে স্রোত নেই বললেও চলে। এখানে ওখানে হেঁটে পার হওয়া যায়।

নৌকোর চালে বসে জয়ন্ত বলছিল, "পলাশীর যুদ্ধের আগে মুর্শিদাবাদের রূপ ছিল ভিন্নরকম। তখনকার ইংরেজদের চিঠিপত্র পড়ে জানতে পারি, সে মুর্শিদাবাদ আকারে আর সৌন্দর্যে বিলাতের লণ্ডন শহরের চেয়ে বৃহৎ আর উন্নত ছিল!"

মানিক বললে, "আজকের মুর্শিদাবাদকে দেখে তো মনে হচ্ছে, কলকাতার শহরতলিও এর উপরে টেক্কা মারতে পারে।"

—"এ হচ্ছে আজ স্মৃতির শ্মশান। দিকে দিকে ছড়ানো আছে ভাঙাচোরা ইঁটের স্তূপ আর পড়ো-পড়ো, বেরঙা, শ্রীহীন অট্টালিকা।"

বীরেন বললে, "মরা গঙ্গার ভাঙা ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঐ নামমাত্র সার আধুনিক নবাবদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দলে দলে লোক তাই দেখবার জন্যে ওখানে গিয়ে ভিড় করে।"

জয়ন্ত বললে, "আমার কিন্তু ওদিকে ফিরে তাকাতেও লজ্জা করে। যারা একদিন গড়েছিল কবির স্বপ্ন তাজমহল আর আগ্রা-দিল্লীর অপরূপ দুর্গপ্রাসাদ, তাদেরই রুচিহীন, ভাগ্যতাড়িত বংশধররা আজ গড়ে তুলেছে ইংরেজদের অনুকরণে মস্ত বড় এক বিজাতীয় প্রাসাদ—নকলের মহিমায় খাস্তা হয়ে গিয়েছে আসলেরও স্বরূপ! এ হচ্ছে দাস-মনোভাবের অসহনীয় পরিচয়!"

বীরেন বললে, "গঙ্গার এপারে মুর্শিদাবাদে জীবন্ত নবাবদের শৌখিন আস্তানা, আর ওপারে আছে তাঁদের মৃতদেহের অন্তিম ধরণীশয্যা। একদিন নবাবীর জাঁকে যাঁদের জরির জুতো-পরা পা মাটিকে ছুঁতে চাইত না, আজ তাঁদের দেহাবশেষ জীর্ণ কবরের তলায় মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে আছে। আলিবর্দীর সমৃদ্ধ সমাধির ছায়ায় দীনতাপূর্ণ কবরের ভিতরে শায়িত আছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব বিপথচালিত সিরাজদ্দৌলার নশ্বর দেহের অশ্রুকরুণ স্মৃতি!"

স্রোতোহীন গঙ্গাজলের উপর দিয়ে দাঁড়ি-মাঝিরা দাঁড় টেনে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকো। অগভীর পরিষ্কার গঙ্গাজল, স্পষ্ট দেখা যায় তলা পর্যন্ত—সর্বত্র বিকীর্ণ রয়েছে স্পঞ্জের মত শৈবালপুঞ্জ।

বীরেন বললে, "ওপারে ঐখানে ছিল সিরাজদ্দৌলার প্রমোদপ্রাসাদ! একদিন ওখানে দুলত কক্ষে কক্ষে রঙিন আলোকমালা, নাচ আর গান আর বাজনায় সঙ্গীতময় হয়ে উঠত চাঁদের আলো। কিন্তু আজ সেখানে দিনের বেলাতেও শোনা যায় না মানুষের কণ্ঠরব, কেবল সন্ধ্যান্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটানা বেজে চলে ঝিল্লীদের বিজনতার গান আর থেকে থেকে কেঁদে ওঠে শিবাদের অশিব নাদ!"

সুন্দরবাবু শুধোলেন, "আর সেই প্রমোদভবন?"

—"সিরাজদ্দৌলার অপঘাত-মৃত্যুর পর তাঁর প্রমোদভবনও গঙ্গাগর্ভে আত্মবিসর্জন দিয়েছে।"

সবাই স্তব্ধ। নৌকো এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। জলে ঝপঝপ করে দাঁড় ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

মানিক জিজ্ঞাসা করে, "গঙ্গাতীরের কাছে জলের কাছে জেগে রয়েছে কতকগুলো বড় বড় ইঁটের স্তূপ। দেখলে মনে হয়, যেন একসময়ে ওখানে ছিল কোন অট্টালিকা।"

বীরেন বললে, "তাই বটে। যাঁর কাছে হাত পেতে নবাবের রাজত্ব আর ইংরেজদের ব্যবসায় চলত, একদিন ঐখানেই ছিল ভারতের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবের জগৎশেঠের ঐশ্বর্যগর্বিত বৃহৎ প্রাসাদ। আজও তার দু-এক টুকরো ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অল্প দিনে তাও তলিয়ে যাবে কীর্তিনাশা গঙ্গার গর্ভে।"

জয়ন্ত কঠিন কণ্ঠে বললে, "যাবেই তো। যাওয়াই উচিত। শেঠদের স্মৃতিও আমার মনকে পীড়িত করে। রাজপুতানার শুকনো মরুপ্রান্ত থেকে বিদেশী মাড়োয়ারী এসেছিল সুজলা সুফলা বাংলাদেশের অর্থ লুণ্ঠন করতে। তারা লক্ষ্মীলাভ করেছিল বটে, কিন্তু বাংলার প্রতি ছিল না তাদের এতটুকু

প্রাণের টান, তাই তারা বংশানুক্রমে প্রথমে রাজার, তারপর দেশের বিরুদ্ধে বার বার চক্রান্ত করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অবশেষে আরো কোনো কোনো দুরাত্মার সঙ্গে মিলে জগৎশেঠরাই ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশকে লুটিয়ে দেয় ফিরিঙ্গীরাজের বুটজুতোর তলায়। সেই মহাপাপের ফলেই তো এই দেশদ্রোহী বংশের উপরে পড়েছে বিশ্বদেবের অমোঘ অভিশাপ, ইতিহাসে আছে কেবল তাদের চরম অপযশ, নিয়তি কেড়ে নিয়েছে তাদের ঐশ্বর্যের শেষ স্মৃতিটুকুও, লাভ করেছে সলিল সমাধি। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করেননি। সুদূর মুঙ্গেরে তাদের দুই ভাইয়ের জীবন্ত দেহ গ্রাস করেও তাঁর ক্ষুধা মেটেনি, মুর্শিদাবাদে এসে বিশ্বাসঘাতকদের স্থাবর সম্পত্তি পর্যন্ত নিজের জঠরের জলাবর্তে টেনে না নিয়ে তিনি ছাড়েননি।"

জলের উপরে জেগে-থাকা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের একপাশে চুপ করে ছবিতে আঁকার মত একটা নিশ্চল বক—যেন বিভোর হয়ে আছে অতীত গৌরবের স্বপ্নে।

বীরেন বললে, "জয়ন্তবাবু, আজ ঐ জলের তলায় কোথায় খুঁজে পাবেন জগৎশেঠের রত্নকুঠী?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "আমরা তো জলের তলায় খুঁজব না!"

—"তবে কোথায়? ডাঙায়?"

—"হ্যাঁ।"

—"ডাঙায় শেঠদের প্রাসাদের কোন চিহ্নই নেই!"

—"তবু খুঁজে দেখব।"

—"কি আশ্চর্য, আপনার বক্তব্য কি?"

সুন্দরবাবুও বিরক্ত হয়ে বললেন, "সত্যি জয়ন্ত, তুমি যুক্তিহীন কথা বলছ!"

জয়ন্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "সুন্দরবাবু, খাতায় জগৎশেঠদের ইতিহাসে কি লেখা আছে? জগৎশেঠ কুশলচাঁদ নিজের সম্পত্তির কতক অংশ লুকিয়ে রাখবার জন্যে গুপ্তকুঠী নির্মাণ করেছিলেন। এখন ভেবে দেখুন, কুশলচাঁদ নিশ্চয় নির্বোধ ছিলেন না। নিজেদের জনাকীর্ণ, বিখ্যাত প্রাসাদের ভিতরে গুপ্তকুঠী নির্মাণের চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে, এটা তিনি ভালো করেই জানতেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল প্রাসাদ থেকে দূরে অন্য কোথাও গুপ্তকুঠী নির্মাণ করা। রাজধানীর বাইরেও যে ধনকুবের জগৎশেঠদের ভূ-সম্পত্তি ছিল, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। বীরেনবাবুর ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবু গঙ্গাতীরের এক পোড়ো বাগানবাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। তার পিছনে আছে এক সেকেলে নির্জন ইঁদারা—তার গায়ে গাঁথা লোহার দরজা। আমি আন্দাজ করি, ঐ বাগানবাড়ির অধিকারী ছিলেন জগৎশেঠ কুশলচাঁদ। সেকালের রাজা-রাজড়া আর ধনপতিরা প্রায়ই পুষ্করিণী বা ইঁদারার মধ্যে গুপ্তধন রক্ষা করতেন, 'সোনার আনারস' মামলাতেও আমরা এই শ্রেণীর এক ইঁদারার সন্ধান পেয়েছিলুম, আশা করি আপনাদের তা মনে আছে। কুশলচাঁদও নিশ্চয় সেকালের সেই রীতি বজায় রেখেছিলেন। ইঁদারার গুপ্তকুঠীর মধ্যে রক্ষা করেছিলেন নিজের অতুল সম্পত্তির কতক অংশ। গুপ্তধন রক্ষা করবার পর সেকালের ধনিকরা আর এক নিষ্ঠুর প্রথা মেনে চলতেন। যাদের সাহায্যে তাঁরা ধনরত্ন পুঁতে রাখতেন, গুপ্তধনের নিরাপত্তার জন্যে তাদের হত্যা করা হত। কুশলচাঁদও তাই করেছিলেন, আর চন্দ্রনাথবাবু ইঁদারায় নেমে দেখেছিলেন সেই নিহত হতভাগ্যদেরই মাংসহীন কঙ্কাল। ইঁদারা নির্মাতা আর ধনবাহকদের হত্যা করবার পর কুশলচাঁদ ইঁদারা জলে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে কালক্রমে কুশলচাঁদের মৃত্যু, জগৎশেঠদের পতন, তাঁদের প্রাসাদের পাতালপ্রবেশ, বেওয়ারিস বাগানবাড়ির শোচনীয় দুর্দশা—ঘরদোর যায় ভেঙেচুরে, বাগান পরিণত হয় কাঁটাজঙ্গলে আর ইঁদারা হয়ে যায় জলশূন্য। মানুষ আর সে অঞ্চল মাড়ায় না। অনেককাল পরে চন্দ্রনাথবাবু ফুটবল কুড়োতে ইঁদারায় নেমে অস্থানে লোহার দরজা দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তিনি জগৎশেঠদের গুপ্তধনের কাহিনী জানতেন। তাঁর সন্দেহ জাগ্রত হয়। তারপর আবার গোপনে ইঁদারায় ফিরে গিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান পান আর তা হস্তগত করেন। বোধহয় সেই সম্পত্তিরই খানিক অংশ নিয়ে তাঁর ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন। অবশিষ্ট সম্পত্তি অসময়ের ভয়ে আবার লুকিয়ে রাখেন। আমরা তারই আশায় এখানে এসেছি। তাঁর লেখা খাতার সবটা পেলে হয়তো আমাদের কাজের যথেষ্ট সুরাহা হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা বিপক্ষ দলের হস্তগত হয়েছে। তবু আমরা একবার বাগানখানা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করব।"

সুন্দরবাবু কৌতুকহাস্য করে বললেন, "ভায়া হে, তুমি যে দেখছি বেশ একটি মনগড়া গল্প ফেঁদে বসেছ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই অজানা বাগানবাড়ির ঠিকানা কোথায় পাবে?"

—"চন্দ্রনাথবাবু লিখেছেন, জিয়াগঞ্জের দশ-বারো মাইল তফাতে আছে সেই বাগানবাড়ি।"

—"হুম্, তাহলেই কেল্লা ফতে হয়ে গেল নাকি?"

—"আরে মশাই, একটু মাথা খাটাবার চেষ্টা করুন। ভুলবেন না, জায়গাটা আছে গঙ্গার ধারে। মুর্শিদাবাদের

পরেই জিয়াগঞ্জ। সেখান থেকে আমরা হাঁটাপথে গঙ্গাতীর ধরে দশ-বারো মাইল অগ্রসর হব। তারপর খুঁজে সহজেই আবিষ্কার করতে পারব এমন একখানা বেওয়ারিস, ভাঙাচোরা, পোড়ো, সেকেলে বাগানবাড়ি—যার পিছনে আছে জলশূন্য ইঁদারা আর তার পরে একটা মাঠ। গঙ্গাতীরে দশ-বারো মাইলের ভিতরে ঠিক এইরকম পরিস্থিতির মাঝখানে পরিত্যক্ত প্রাচীন বাগানবাড়ি বোধকরি আর নেই।"

মানিক বললে, "আমি তোমার মত সমর্থন করি।"

সুন্দরবাবু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, "জয়ন্ত যেভাবে কায়দা করে ব্যাপারটাকে সাজিয়ে দাঁড় করিয়েছে, তাতে আমাদেরও সায় দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কি বলেন বীরেনবাবু?"

বীরেন বললে, "আমি আর কি বলব মশাই, এসব গোলমেলে ব্যাপারে আমার মাথা খোলে না। তবে আমার মন্ত্র হচ্ছে—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'।"

সুন্দরবাবু বললেন, "সাধু, সাধু। একালের ছোকরারা সবাই যদি ঐ মন্ত্র মানত! তাহলে জয়ন্ত, কোথায় নেমে আমরা হাঁটাপথ ধরব?"

—"জিয়াগঞ্জের ঘাটে।"

মানিক খুঁতখুঁত গলায় বললে, "কিন্তু জয়ন্ত, অনেকক্ষণ থেকে আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি।"

—"কি ব্যাপার?"

—"একখানা উটকো পানসি আমাদের পিছনে পিছনে আসছে।"

—"হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। তার অন্য সব জানালা বন্ধ, কেবল একটা খোলা জানালায় একজন লোক যেন আমাদেরই পানে তাকিয়ে আছে।"

—"পানসিখানা একবারও আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়নি। আমরা যখন জগৎশেঠের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কাছে নৌকো থামিয়েছিলুম, ঐ পানসিখানাও থেমে পড়েছিল। তারপর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার ওর যাত্রা শুরু!"

মাঝি হাঁকলে, "বাবুজী, এই তো জিয়াগঞ্জের ঘাট!"

জয়ন্ত বললে, "এস আমরা এইখানে নেমে পড়ে ঐ পানসিখানার ওপরে নজর রাখি।"

নৌকো ঘাটে লাগল। সবাই একে একে নেমে পড়ে একখানা বাড়ির আড়ালে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে রইল।

অজানা পানসিখানা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল! আধ মিনিট থেমে দাঁড়াল, তারপর আবার ঘাট ছাড়িয়ে তরতর করে সোজা চলে গেলো যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকে।

সুন্দরবাবু বললেন, "বাব্বা, বাঁচলুম। ফাঁড়া কেটে গেল। ভেবেছিলুম, ষণ্ডামার্কা বেটারা আবার বোমা কি বন্দুক ছুঁড়বে, মনে মনে আমি জলযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম।"

তাঁর গা টিপে দিয়ে মানিক বললে, "এখনি অপ্রস্তুত হবেন না মশাই!"

—"হুম্‌, মিছে ভয় দেখাও কেন?"

—"আবার ঐ দেখুন।"

—"কি আবার দেখব?"

—"আবার একখানা নৌকো আসছে।"

—"এলেই বা! নদী দিয়ে নৌকো যাবে না?"

—"নৌকোর জানালার কাছে কে বসে আছে দেখছেন তো?"

সুন্দরবাবু দেখলেন, চমকে উঠলেন, তাঁর দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত!

নৌকোর জানালার কাছে যে বসে আছে তার মাথার জটার ঘটা, মুখে গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল, গায়ের গেরুয়া কাপড়েরও খানিকটা দেখা যাচ্ছে!

জয়ন্ত বললে, "সেই সন্ন্যাসী।"

এ নৌকোখানাও জিয়াগঞ্জের ঘাট ছাড়িয়ে অগ্রসর হল।

সুন্দরবাবু বললেন, "কী যেন হচ্ছে, কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

জয়ন্ত বললে, "এখন আর কিছুই বোঝবার দরকার নেই—এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন।"

অষ্টম অধ্যায়
ষড়যন্ত্রের গন্ধ

গঙ্গার ধারে সে জায়গাটাকে বাগানও বলা যায় না, বাড়ি বলাও চলে না। তার স্থানে স্থানে সীমানার বেষ্টনীর কিছু কিছু চিহ্ন এখনো চোখে পড়ে, এই মাত্র। বাগানের বদলে আছে গোটাকয়েক পুরাতন অফলা ফলগাছের সঙ্গে অশথ-বটের দঙ্গল ও যত্রতত্র বিকীর্ণ ঝোপঝাপ আগাছার জঙ্গল। এবং বাড়ির বদলে আছে ভেঙে-পড়া ছাদ আর ধসে-যাওয়া বনিয়াদ আর কোনক্রমে দাঁড়িয়ে-থাকা এক-একটা টুটা-ফাটা দেওয়াল। দরজা-জানালা একেবারেই অদৃশ্য। তবে একসময়ে এখানে যে কোন শৌখিন ধনিকের সাধের ডেরা ছিল, তার সামান্য প্রমাণ এখনো বর্তমান আছে এক-একটা ভাঙা দেওয়ালের গায়ে বিমলিন পঙ্খের কারুকার্যে। লোকের মুখে শোনা যায়, আগে এখানে ছিল বাগানবাড়ি এবং তার পিছনকার মস্তবড় মাঠটা আজও বাগানবাড়ির মাঠ নামে পরিচিত। সেই সূত্রেই জায়গাটার

খোঁজ পাওয়া সহজে সম্ভবপর হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, "এই হচ্ছে সেই ইঁদারাটা। বাঙালীরা যে কুয়া বা পাতকুয়া তৈরী করে তা হচ্ছে ইঁদারারই ছোট আকার। সাধারণতঃ ইঁদারা তৈরী করে অবাঙালীরা আর মনে রাখতে হবে জগৎশেঠদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন রাজপুতানা থেকে।"

সুন্দরবাবু ইঁদারায় ভিতরে উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, "ওরে বাবা, এর তলাটা যে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না! তলায় কি আছে কে জানে!"

জয়ন্ত বললে, "সঙ্গে দড়ির সিঁড়ি এনেছি, তলায় কি আছে এখনি দেখতে পাব।"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, "না ভেবেচিন্তে যখন ডানপিটেদের সঙ্গে এসেছি, তখন পাতাল কত দূর না দেখেই বা উপায় কি? কিন্তু বাপু, আমার অসামান্য বপুখানি নিয়ে ঐ যৎসামান্য দড়ির সিঁড়ি ধরে দোদুল্যমান হলে আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, সেটা খেয়ালে আছে কি?"

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে দড়ির সিঁড়ি নিয়ে নিযুক্ত হয়ে রইল।

সুন্দরবাবু সেদিক থেকে কোন সান্ত্বনা না পেয়ে বললেন, "তার উপরে জানোই তো, আমার আবার একটুখানি—ওর নাম কি—ইয়ে আছে!"

মানিক সুন্দরবাবুকে জানত, মুখ টিপে হাসতে লাগল।

বীরেন কিছুই বুঝতে না পেয়ে শুধোলে, "ইয়ে আছে? সে আবার কি?"

—"ঐ যে গো, যাকে তোমরা বল ভূতপ্রেত!"

—"ভূতপ্রেত?"

—"হ্যাঁ। আমি যে ওঁদের অস্তিত্ব মানি!" বলেই সুন্দরবাবু যুক্তকরে ললাটদেশ স্পর্শ করলেন।

—"ভূতপ্রেতের সঙ্গে আজকের ব্যাপারের সম্পর্ক কি?"

—"সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছেন না? পাজী কুশলচাঁদটা নাকি অনেকগুলো লোককে খুন করেছিল আর তাদের কঙ্কালগুলো নাকি ইঁদারার ভেতরেই পড়ে আছে। হুম্! তাদের প্রেতাত্মারাও যে ঐখানে আস্তানা পাতেনি, এমন কথা কি জোর করে বলা যায়? অভিশপ্ত শেঠদের গুপ্তধনও আজ হয়েছে যকের ধন, প্রাণটি হাতে করে ঐ ইঁদারায় ভেতরে নামতে হবে।"

মানিক বললে, "বেশ তো, প্রাণটি হাতে করেই ইঁদারার নামবেন, ভূত-প্রেতরা দাবি করলেও তাদের হাতে প্রাণ সমর্পণ করবেন না!"

সুন্দরবাবু মুখ গোমড়া করে বললেন, "মরছি নিজের জ্বালায়, তুমি আবার মস্করা করে জ্বালার উপরে জ্বালা দিও না মানিক! আমি সার কথাই বলছি। চন্দ্রনাথবাবু কি ইঁদারায় নেমে অপার্থিব কণ্ঠের ফোঁস-ফোঁসানি শোনেননি?"

জয়ন্ত বললে, "তার মধ্যে অপার্থিব কোন কিছু নেই।"

—"নেই? তবে ফোঁস-ফোঁসানিটা কিসের শুনি?"

—"নিশ্চয় সাপ-টাপ। এঁদো কুয়োয় সাপ বাসা বাঁধে।"

—"এটা তোমার অনুমানমাত্র।"

জয়ন্ত দড়ির সিঁড়ির উপরে পা রেখে অধীর স্বরে বললে, "বাজে কথায় সময় বয়ে যায়! বেলা বেড়ে চলেছে, আর দেরি নয়! মানিক, পাতালে আছে রাতের অন্ধকার, একটা লণ্ঠন আমাকে দাও, আর একটা লণ্ঠন তোমার পিঠে ঝুলিয়ে নাও।"

সুন্দরবাবু অস্বস্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, বিপদসাগরে গোঁয়ারের মত চোখ বুঁজে ঝাঁপ দিও না! আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কারা যেন আড়ালে-আবডালে গা ঢাকা দিয়ে আছে!"

—"শত্রুরা কেমন করে জানবে, আমরা বাগানবাড়ির ঠিকানা আবিষ্কার করেছি?"

—"কিন্তু বুদ্ধিমানের মতে, শত্রুদের অবহেলা করা উচিত নয়।"

জয়ন্ত ইঁদারায় মুখ থেকে সরে এসে বললে, "মানিক, সুন্দরবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, ওঁর পাকা চুলের সম্মান রক্ষা না করলে অন্যায় হবে। আবিষ্কারের উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছিলুম।"

মানিক বললে, "না, ভুলিনি। এ ব্যাপারে আসল কথাই হচ্ছে গুপ্তধনের কথা।"

—"ঠিক তাই কি? আমার মতে, এখনো 'দিল্লী বহুদূর'! যাত্রাপথে বিস্তর বাধা! গুপ্তধন আমাদের চরম লক্ষ্য বটে, কিন্তু যাতে লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে না পারি, সেই উদ্দেশ্যে একদল শত্রু কি আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে না?"

—"কিন্তু সেই শত্রুরা এখন কোথায়?"

—"জলপথে তারা যে আমাদের অনুসরণ করেছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

—"কিন্তু হঠাৎ স্থলপথ অবলম্বন করে আমরা তাদের ফাঁকি দিতে পেরেছি।"

—"পেরেছি কি? এইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।"

—"হাঁটাপথে এতখানি এগিয়ে এলুম, কোন শত্রুর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাইনি।"

সুন্দরবাবু রিভলভার বার ক'রে মৃদুকণ্ঠে বললেন,.....

—"তা পাইনি। কিন্তু 'সোনার আনারস' মামলায় আমরা যখন বাঘরাজাদের গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা করেছিলুম, তখন সারা পথের কোথাও কি প্রতাপ চৌধুরীর অস্তিত্ব টের পাওয়া গিয়েছিল? আগেই তোমাদের কাছে আমি প্রতাপ চৌধুরীর পরিচিত যুদ্ধকৌশলের কথা উল্লেখ করেছি। এ যদি সেই প্রতাপ চৌধুরী হয়, তবে এবারেও সে নিজের নির্বাচিত স্থান ছাড়া যেখানে-সেখানে আত্মপ্রকাশ করবে কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমি কিন্তু পথ চলতে চলতে হাওয়ায় হাওয়ায় পেয়েছিলুম কেমন যেন ষড়যন্ত্রের গন্ধ!"

মানিক হেসে বললে, "পুলিসের চাকরি ছাড়বার পর দেখছি সুন্দরবাবুর ঘ্রাণশক্তি প্রখরতর হয়ে উঠেছে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, ঠাট্টা করতে চাও, ঠাট্টা কর! কিন্তু সংস্কৃত বচনে কি আছে জানো তো? 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যপস্থিতে'! অর্থাৎ বিপদের সময়ে বুড়োদের কথা গ্রাহ্য করা উচিত।"

মানিক বিস্ময়ের ভান করে বললে, "ও হরি, কালে কালে হল কি? হ্যাঁ জয়ন্ত, তুমি কি আর কখনো সুন্দরবাবুকে সংস্কৃত বুলি ঝাড়তে শুনেছ?"

—"তা শুনিনি বটে, তবে আপাততঃ ওঁর পরামর্শে আমাদের কান পাতা উচিত।"

—"তুমি কি বলতে চাও?"

—"শত্রুরা সজাগ।"

—"সজাগ, কিন্তু তারা অবস্থান করছে কোথায়?"

—"ধরে নাও, আশেপাশে। সামনে নয়, অন্তরালে। তারা আছে যে কোন সুযোগের অপেক্ষায়।"

—"আমরাও কি ঘুমিয়ে আছি?"

—"তা নেই, কিন্তু এখনো আমরা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। আমাদের সামনেই এমন সব কাণ্ড হচ্ছে, যার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"যথা?"

—"ধরো আজকের ঘটনাই। গঙ্গায় আমাদের পিছু নিয়েছিল যেন শত্রুদেরই পানসি। কিন্তু তার পিছনে পিছনে নৌকোয় চেপে যে সন্ন্যাসী আসছিল, সে কে? সে কাদের অনুসরণ করছিল—আমাদের না শত্রুদের? কেন অনুসরণ করছিল, তার স্বার্থ কি? সেইই কি বেনামা পত্রলেখক? কেন সে আমাদের সাবধান করে দিতে চায়, সে কি আমাদের বন্ধু? এমন অচিন বন্ধু কি বিস্ময়কর নয়?"

মানিক ফাঁপরে পড়ে বললে, "প্রশ্নে প্রশ্নে তুমি যে আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিলে হে!"

—"না ভাই, না! এ-সব প্রশ্ন আমি কেবল তোমাকেই করছি না, নিজেকেও করছি নিজে নিজেই। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। তোমার কাছে আছে?"

—"উঁহুঁ!"

—"অতএব সুন্দরবাবু হাওয়ায় হাওয়ায় যে ষড়যন্ত্রের কথা তুলেছেন, সেটা তাৎপর্যমূলক বলে মানতে হবে বৈকি!"

—"উত্তম, সুন্দরবাবুর নাকে শোঁকা ষড়যন্ত্রের গন্ধকে স্বীকার করিনি বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। জয়ন্তও যদি সুন্দরবাবুর পক্ষ সমর্থন করে তাহলে একসঙ্গে দুইজনের

প্রতিযোগিতা করবার সাধ্য আমার নেই।”

সুন্দরবাবু অভিমানের স্বরে বললেন, “মানিক, এখনো তুমি ঠাট্টার সুরে কথা কইছ! কিন্তু ভাই, আমি কি ন্যায্য কথাই বলিনি?”

মানিক এইবার গম্ভীর হয়ে বললে, “না সুন্দরবাবু, সব শুনে আমি এখন আপনার কথাতেই সায় দিচ্ছি। কিন্তু অতঃপর আমাদের কর্তব্য কি?”

জয়ন্ত বললে, “কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি। আমাদের সকলের একসঙ্গে ইঁদারায় নামা চলবে না।”

—“তবে?”

—“অন্ততঃ একজনকে এখানে পাহারায় মোতায়েন থাকতে হবে।”

—“থাকবে কে?”

—“সুন্দরবাবু।”

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, “হুম্! আমি? একলা?”

—“দোকলা পাবেন কাকে? মানিক কিছুতেই আমাকে ছাড়তে রাজী হবে না। আর আমিও তাকে ছাড়ব না, সে আমার ডানহাতের মত। আর বীরেনবাবু এ-সব ব্যাপারে একেবারে কাঁচা, ওঁর এখানে থাকা-না-থাকা সমান কথা।”

সুন্দরবাবু বললেন, “না, না, বীরেনবাবুকে আমিও চাই না। যদি কোন বিপদ ঘটে, ওঁকে সামলানোই দায় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার পক্ষেও এখানে একলা থাকাটা কি সমীচিন হবে?”

—“কেন হবে না? আপনি বহুযুদ্ধজয়ী সৈনিক। আপনার একহাতে রইল রিভলভার, আর একহাতে সংকেত-বাঁশী। বিপদ দেখলে দুটোই ব্যবহার করবেন। আমরাও তো হাতের কাছেই রইলুম—বাঁশী শুনেছি কি ছুটে এসেছি! এস মানিক, আসুন বীরেনবাবু!”

জয়ন্ত সর্বাগ্রে ইঁদারার ভিতরে গিয়ে নামল।

সুন্দরবাবু রিভলভার বার করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, “জয় বিপদভঞ্জন মধুসূদন!”

নবম অধ্যায়
রসাতলের কারাগার

পশ্চিমের সম্ভ্রান্ত বাড়ির ইঁদারার মত ব্যবস্থা। বেড় রীতিমত বড়, সার সার সিঁড়ির ধাপ নেমে গিয়েছে নীচের দিকে কিছুদূর পর্যন্ত। তারপরেই অবারিত শূন্যতা। এবং অল্পে অল্পে ঘনায়মান অন্ধকার।

মাঝে মাঝে টর্চের চাবি টিপলে দেখা যায় মানুষের অভাবিত ও বিরক্তিকর আবির্ভাবে ইঁদারার গায়ে দিকে দিকে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে মাকড়সা, বিছে ও কাঁকড়াবিছে দলে দলে। আরো কত জাতের অজানা জীবের চোখে ফোটে বিদ্যুতের ঝলক। মন চমকে দেয় তক্ষকদের প্রতিবাদ। সর্বাঙ্গ ভয়ার্ত হয়ে ওঠে ভীষণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে।

জয়ন্ত বলে, “শুনছ মানিক?”

—“শুনছি।”

—“চন্দ্রনাথবাবুর অপার্থিব গর্জন!”

বীরেন ভয়ে কুঁচকে বলে, “ও মশাই, কামড়াবে না তো?”

—“সেটা ওদের খুশি! আর আমাদের বরাত!”

মানিক বলে, “নামছি তো নামছিই। বাবা, ইঁদারাটা কত গভীর?”

—“অন্ধকার যেন নিরেট হয়ে উঠেছে। আর বেশী নামতে হবে না।”

তারপর আলো জ্বেলে দেখা গেল, রাশি রাশি অস্থি ছড়িয়ে পড়ে ইঁদারার তলদেশটা ভয়াবহ শুভ্রতায় ভরিয়ে তুলেছে।

জ্বলল দুটো লণ্ঠনের আলো। গুনে দেখা গেল নয়টা অস্থিসার নরমুণ্ড, সেগুলো কঙ্কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সেই সব ওষ্ঠাধরের আবরণমুক্ত বিকট দন্তবিকাশ দেখলেই বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে আর প্রাণ মূর্ছিত হয়ে পড়তে চায় সেই সব দৃষ্টিহীন চক্ষুকোটরের বীভৎসতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, “লোভী ধনীর মারাত্মক খেয়ালের খোরাক হবার জন্যে নয়-নয়জন হতভাগ্যের জীবনলীলা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখানে ফুরিয়ে গিয়েছে—তাদের অন্তিম আর্তনাদের সঙ্গে মেশানো ছিল জীবনের যত অতৃপ্ত বাসনা। সুন্দরবাবুর মত মানলে আমিও বলতুম, তাদের অশান্ত আত্মারা আজও ঐ অস্থিস্তূপগুলোর মায়া ছাড়তে পারেনি, আজও তারা এই সংকীর্ণ অন্ধকার কারাগারে বন্দী হয়ে পুনর্বার দেহধারণের জন্যে তপস্যা করছে!”

হঠাৎ বীরেন সভয়ে চীৎকার করে উঠল।

—“কি হল বীরেনবাবু?”

বীরেন কাঁপতে কাঁপতে একটা নরমুণ্ডের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

—“ওখানে কি?”

—“ওর কোটরের মধ্যে চোখ জ্বলজ্বল করছে!”

জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে দেখলে, সত্যই তাই—জ্বলন্ত চক্ষুকোটর! জ্বলছে, একটু একটু নড়ছে! কিন্তু সে ভয় পেলে না, হাতের টর্চের সাহায্যে নরমুণ্ডটাকে ঠেলে দিলে—কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল একটা ত্রস্ত টিকটিকি!

শুকনো হাসি হেসে মানিক বললে, "সত্যি ভাই জয়ন্ত, আমারও বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল! এমনি করেই লোকে ভূত দেখে!"

এখন তারা সত্যসত্যই এসে দাঁড়িয়েছে নিরবচ্ছিন্ন তমসাবৃত পাতালপ্রদেশে। তাদের চারিপাশ ঘিরে থমথম করছে নিঃসাড় মৃত্যুর মত বুকচাপা এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা এবং মানুষের কল্পনাতীত সেই নিদ্রায়মান ও প্রগাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে তাদের অনুচ্চ কণ্ঠস্বরগুলোও শোনাচ্ছিল কর্ণপটহভেদী দামামানির্ঘোষের মত।

জয়ন্ত ও মানিক লণ্ঠনদুটো মাথার উপরে উঁচু করে তুলে ধরলে ভালো করে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে।

প্রথমেই চোখে পড়ল গর্ভগৃহের লৌহকপাট, এত ছোট যে দ্বারপথ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলে মাথা নামিয়ে হেঁট না হলে চলবে না।

জয়ন্ত সচকিতকণ্ঠে বললে, "একি! দরজার পাল্লা দুখানা যে খোলা!"

মানিক বললে, "এ বোধহয় চন্দ্রনাথবাবুর কীর্তি! গুপ্তধন পাওয়ার আনন্দে আকুল হয়ে তিনি যাবার সময়ে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।"

জয়ন্ত আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হল না। তবু মুখে বললে, "তাই হবে। তবে আজ যখন ইঁদারার জল শুকিয়ে গিয়েছে, দরজা খোলা থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।"

তারপর সে খুব মন দিয়ে দরজার কাছটা দেখতে দেখতে বললে, "দেখ মানিক, ইঁদারার এখানটা পাথর দিয়ে শক্ত করে গড়া। আর ওস্তাদ কারিগররা পাথরের গায়ে এমন নিপুণ হাতে লোহার কপাট বসিয়েছে যে একফোঁটা জলও ভিতরে ঢুকতে পারবে না।"

মানিক বললে, "দরজা গড়তে নিশ্চয় খুব ভালো ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। কত কাল জলের তলায় ডুবে ছিল, তবু মরচে ধরেনি।"

উদগ্র আগ্রহে ও দুঃসহ কৌতূহলে বীরেনের তখন আর তর সইছিল না। সে এগিয়ে গিয়ে বললে, "আসুন, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি!"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "আরে মশাই, দাঁড়ান! লণ্ঠনের সঙ্গে সকলে টর্চও ব্যবহার করুন। কে জানে ভিতরে কি বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!"

তাড়াতাড়ি পিছোতে পিছোতে বীরেন বললে, "বিপদ? কি বিপদ?"

—"এই পাতালপুরীতে বহুকাল পরে দরজা খোলা পেয়ে এর ভেতরে শখের বাসা বাঁধতে পারে কেউটে, কি গোখরো, কি ময়াল সাপ! কেউ বিষ ছড়ায়, কেউ পিষে মারে!"

আরো পিছিয়ে গেল বীরেন। শোনা গেল, তার অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হল বিপৎকালে প্রথমেই যা মনে আসে সেই "বাবা" শব্দটি।

তিন তিনটে সঞ্চরমান আলোকশিখায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল একখানা মাঝারি আকারের পাথুরে ঘরের এদিক এবং ওদিক। কিন্তু ভয়াল ময়াল বা কোনজাতীয় বিষধর সরীসৃপ আত্মপ্রকাশ করলে না।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের ভিতরে পদার্পণ করে জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বললে, "কিন্তু কোথায় আছে গুপ্তধন? এ যে একেবারে খালি ঘর!"

বীরেন বললে, "এখানে এসেও মাটি কোপাতে হবে নাকি?"

চতুর্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি সঞ্চালন করে যা দেখবার সব দেখে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "মাটি? কোথায় মাটি? এখানে সব পাথর! আমাদেরও পাথুরে কপাল!"

মানিক বললে, "আমরা নির্বোধ! গাছে কাঁঠাল আছে ভেবেই গোঁফে তেল মাখিয়েছি, কিন্তু তার আগেই কাঁঠাল হয়েছে বুদ্ধিমানের হস্তগত!"

বীরেন হতাশভাবে বললে, "এ তাহলে প্রতাপ চৌধুরীর কাজ!"

জয়ন্ত বললে, "তাহলে মানতে হবে যে, প্রতাপ চৌধুরী হচ্ছে অত্যন্ত ত্বরিতকর্মা।"

মানিক বললে, "জয়ন্ত, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে চন্দ্রনাথবাবুর লেখা সম্পূর্ণ খাতা আমরা পড়বার সুযোগ পাইনি, তার খানিকটা অংশ হস্তগত হয়েছে প্রতাপ চৌধুরীর আর সেই অংশটাই হচ্ছে হয়তো আসল অংশ। সেটুকু ছিঁড়ে নিয়ে প্রতাপ বাকি কাগজগুলো তুচ্ছ ভেবে ফেলে দিয়ে গেছে!"

জয়ন্ত চিন্তান্বিত মুখে বললে, "কিন্তু—কিন্তু এক জায়গায় তবু খটকা থেকে যাচ্ছে!"

—"কোন্ জায়গায়?"

জয়ন্ত জবাব দেবার আগেই আচম্বিতে ঝনঝন শব্দে পাতালপুরীর সেই কক্ষটা ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

সকলে সবিস্ময়ে সচকিত চক্ষে দেখলে, ঝন-ঝন-ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল লৌহকপাট!

জয়ন্ত বেগে ছুটে গিয়ে দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে টানাটানি করতে লাগল, কিন্তু কপাট খুলল না, একটু নড়লও না। সে ফিরে দাঁড়িয়ে তিক্ত হাসি হেসে বললে, "মানিক, মানিক, রসাতলের কারাগারে আমরা বন্দী হলুম!"

দশম অধ্যায়
অঘটন সংঘটন রহস্য

খানিকক্ষণ কারুর মুখ দিয়েই হল না বাক্য-নিঃসরণ।

সেই ভূগর্ভগৃহের স্তব্ধতা এমন নিবিড় যে, হাতঘড়ির ক্ষীণ টিকটিক শব্দকেও মনে হয় উচ্চরোল!

জয়ন্ত শুধোলে, "ঘড়িতে কটা বেজেছে?"

মানিক দেখে বললে, "সাড়ে পাঁচটা।"

—"হুঁ। বাইরের পৃথিবী এখন সন্ধ্যার ছায়াছবির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তারপর ফুটবে কালো রাত। তারপর আবার আসবে রঙীন প্রভাত। তারপর আবার হবে জ্যোতির্ময় সূর্যোদয়। কিন্তু আমরা আবার তা দেখতে পাব না। কি বল মানিক?"

—"লণ্ঠনদুটোর তেল কাল সকালেই বোধহয় ফুরিয়ে যাবে। টর্চের আলো দেবার শক্তিও বেশীক্ষণ নয়। তারপর আমরা দেখব খালি অন্ধ-করা অন্ধকার। যতক্ষণ বাঁচব ততক্ষণ।"

—"কিন্তু সে কতক্ষণ মানিক? আমাদের সঙ্গে না আছে জল, না আছে খাবার।"

বীরেন একেবারে বোবা।

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে এক চক্কর ঘুরে এসে বললে, "কিন্তু দরজা বন্ধ করতে পারে কে?"

মানিক বললে, "এক পারেন সুন্দরবাবু। কিন্তু এমন সাংঘাতিক কৌতুক তিনি করবেন বলে বিশ্বাস হয় না।"

—"আর পারে প্রতাপ চৌধুরী।"

—"কিন্তু ইঁদারার মুখে পাহারায় আছেন সুন্দরবাবু।"

—"হয়তো তিনিও বন্দী। কিংবা নিহত। প্রতাপ চৌধুরীর নরহত্যায় আপত্তি নেই।"

—"আমরা কিন্তু উপর থেকে রিভলভারের বা সংকেত-বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পাইনি। হয়তো উপর থেকে কোন আওয়াজই এত নীচে পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না।"

—"কিংবা সুন্দরবাবু রিভলভার কি বাঁশী ব্যবহার করবার সময় পাননি।"

—"অমনি একটা কিছু হয়েছেই। কিন্তু ফল একই। আমাদের মরতে হবে।"

বীরেন কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, "এইভাবে মরব বলেই কি জন্মেছিলুম? অন্ধকারে, অনাহারে, দিনে দিনে, তিলে তিলে?"

জয়ন্ত বললে, "প্রতাপ চৌধুরী আরো দুবার আমাদের যমালয়ে পাঠাবার জন্যে বন্দী করেছিল। দুবারই আমাদের রক্ষা করেছিল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তি।"

—"কিন্তু এবারে তার পুনরভিনয়ের কোন সম্ভাবনাই দেখছি না।"

—"মানিক, চিরদিনই আমি নিয়তিবাদী। আজও নিয়তির উপরে নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কোনই উপায় নেই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মানিক বললে, "তাই বটে।"

আবার কিছুক্ষণব্যাপী নীরবতা। আবার কানে জাগে হাতঘড়ির টিক-টিক-টিক-টিক।

জয়ন্ত বললে, "একটু আগেই যা বলেছিলুম। প্রতাপ চৌধুরীর যুদ্ধকৌশলের কথা। তার পদ্ধতি কিছুমাত্র বদলায়নি। সে নিজে দেখা দেয় না। কিন্তু শত্রুদের বন্দী করে। সেরা শিল্পীদের পদ্ধতি বদলায় না। অপরাধের আর্টে প্রতাপ চৌধুরীকে সেরা শিল্পী বলে মানতেই হবে।"

বীরেন ভাঙা-ভাঙা স্বরে বললে, "জয়ন্তবাবু, এই কি অপরাধের আর্ট নিয়ে আলোচনা করবার সময়?"

জয়ন্ত শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে, "তা ছাড়া আর কি করবেন ভাই?"

—"আর কিছুই করবার নেই?"

—"কিছু না, কিছু না!"

—"ভালো করে দেখেছেন?"

—"কি?"

—"দরজাটা সত্যই বন্ধ কি না?"

—"আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?"

—"কি জানি, যদি—"

—"বেশ, আপনিও একবার টেনে দেখুন না!"

—"তা একবার দেখলে ক্ষতি কি?"

—"কোন ক্ষতি নেই। কিছু না করার চেয়ে একটা কিছু করা ভালো। যান, আপনিও দরজা ধরে টানাটানি করে আসুন। খানিকটা সময় তবু কাটবে।"

বীরেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল জীবনহীন যন্ত্রচালিত পুত্তলের মত—তার মুখে নেই কোনরকম উৎসাহের ভাব। জয়ন্ত ও মানিক তার দিকে ফিরেও তাকালে না।

বীরেন আংটা ধরে খুব জোরে এক টান মারলে এবং

সঙ্গে সঙ্গে হড়-হড় ঝন-ঝন করে বন্ধ দরজার পাল্লা আবার খুলে গেল!

শব্দ শুনে চমকে জয়ন্ত ও মানিক মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে। নিজেদের চোখকেও তারা বিশ্বাস করতে পারলে না, ভাবলে তারা জেগে-জেগেই দেখছে কোন অসম্ভব স্বপ্ন!

না এ ভোজবাজি—বীরেন জাদুর খেলা জানে?

বীরেনও হতভম্ব—তার মুখ দিয়ে হল না বাক্যস্ফূর্তি!

জয়ন্ত আচ্ছন্নের মত বললে, "হ্যাঁ মানিক, আমি ভুল দেখছি না তো? সত্যিই কি দরজাটা খুলে গেছে?"

দুই হাতে দুই চোখ কচলে আর একবার ভালো করে দেখে মানিক বললে, "দরজা তো খোলাই রয়েছে দেখছি!"

—"কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি, দরজা ছিল বাইরে থেকে বন্ধ!"

বীরেন বললে, "না, বন্ধ ছিল না! আমি একবার টানতেই খুলে গেল!"

—"আর আমি একবার দু'বার নয়, প্রাণপণে টেনে দেখেছি বার বার!"

মানিক বললে, "তাহলে একটু আগে তুমি যা বলছিলে—এ হচ্ছে সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তির লীলা!"

—"না মানিক, কেউ বাইরে থেকে দরজাটা আবার খুলে দিয়েছে!"

—"কে খুলে দেবে? সুন্দরবাবু? কিন্তু সুন্দরবাবু কি আমাদের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর রসিকতা করবেন?"

—"আমার বিশ্বাস হয় না। দেখ তো, বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না।"

মানিক বাইরে ছুটে গেল এবং তারপর চেঁচিয়ে বললে, "এখানে কেউ নেই। কেবল একটা কৌতূহলী তক্ষক খবরদারি করবার জন্যে ইঁদারার গা বয়ে নেমে এসেছিল, আমাকে দেখে আবার উপর দিকে চম্পট দিলে!"

জয়ন্ত বেকুবের মত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "মানিক, সত্যসত্যই একটা কোন অঘটন ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কি তা আমি বুঝতে পারছি না!"

—"হয়তো সুন্দরবাবু এ অদ্ভুত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। উপরে চল।"

—"তাই চল। রত্নকুঠী তো রত্নহীন, এখানে আর থেকেই বা লাভ কি?"

পাতালের অন্ধকার উদর ছেড়ে তারা এসে উঠল পৃথিবীর উপরে রাতের অন্ধকারের কোলে। সর্বাঙ্গে নিবিড় কালিমা মেখে জঙ্গলের বড় বড় গাছগুলো কি যেন নৈশ রহস্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কানাকানি করছে মর্মর-ভাষায়। থেকে থেকে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস এবং সঙ্গে সঙ্গে কূলে কূলে লিখে চলেছে অদূরবর্তিনী গঙ্গা তার মুখর তরঙ্গকাহিনী।

জয়ন্ত ডাকলে, "সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু! অন্ধকারে কোথায় গা ঢেকে পাহারা দিচ্ছেন?"

কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না।

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়েননি তো?"

জয়ন্ত বললে, "সেটা সম্ভব নয়। আমার মন আবার বলছে, একটা কোন অঘটন ঘটেছেই!"

—"কি অঘটন?"

—"খোলা দরজা আপনি বন্ধ হয়, বন্ধ দরজা আপনি খুলে যায়, সুন্দরবাবু পাহারা না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকেন, এ সবই তো অঘটন! মানিক, তুমি একদিকে যাও, বীরেনবাবু, আপনি আর একদিকে যান, আর আমি যাই এই দিকে। দেখা যাক সুন্দরবাবুকে খুঁজে পাই কি না!"

মাঠের ও নদীর মধ্যবর্তী এই জঙ্গুলে জায়গাটায় রাত-আঁধারে লোকজন পদার্পণ করে না। জমি এবড়োখেবড়ো এবং খানা-ডোবায় দুর্গম। সহজে সুন্দরবাবুর পাত্তা পাওয়া যাবে বলে কেউ মনে ভাবেনি। কিন্তু তাদের সৌভাগ্যক্রমে একটুখানি অগ্রসর হয়েই সফল হল খোঁজাখুঁজি।

একটা ঝোপ দুলছে ঘনঘন। যেন কোন জন্তু তার মধ্যে ঢুকে ছটফট করছে। সেই দিকে আকৃষ্ট হল মানিকের দৃষ্টি।

ঝোপের খানিকটা এক হাতে সরিয়ে আর এক হাতে তার মধ্যে আলো ফেলে মানিক সচমকে দেখলে, সেখানে ভূশয্যাশায়ী সুন্দরবাবু একসঙ্গে রজ্জুবদ্ধ পদযুগল ছুঁড়ছেন আর ছুঁড়ছেন! কেবল পা নয়, তাঁর বাহুযুগলও দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা এবং মুখ ও চোখের উপরে রয়েছে কাপড়ের বন্ধনী!

সুন্দরবাবুকে তাড়াতাড়ি বন্ধনমুক্ত করতে করতে মানিক ফুকরে উঠল, "জয়ন্ত, জয়ন্ত! সুন্দরবাবুকে পেয়েছি!"

সুন্দরবাবুর বিপুল ভুঁড়ি ফুলতে ও চুপসে যেতে লাগল স্যাঁকরার হাপরের মত। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে হাঁপিয়ে নিয়ে তিনি সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করলেন তাঁর সেই চিরপ্রিয় শব্দ—"হুম্!"

এতক্ষণে সুন্দরবাবু বাক্শক্তি পেয়েছেন বুঝে জয়ন্ত শুধোলে, "আপনার এ দশা করলে কে?"

—"চোখে দেখিনি, তবে পরে কানে শুনে আন্দাজ

করেছি।"

—"কিছুই বুঝলুম না।"

—"এখন বেশী বুঝিয়ে বলবার শক্তি নেই। তবে আসল কথাগুলো শটে বলতে পারি। তোমরা ইঁদারায় নেমে গেলে। আমি ঠায় বসে বসে পাহারা দিতে লাগলুম। কোথাও কারুর সাড়া পর্যন্ত নেই, অথচ আচমকা পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে আমার কানের ঠিক পিছনে কে এসে বেমক্কা মুষ্টিপ্রহার করলে—মুষ্টিযোদ্ধারা যাকে বলে 'র‍্যাবিট পাঞ্চ'। ওরকম ঘুষি মানুষকে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান করে দেয়—আমিও একেবারে বেহুঁশ! জ্ঞান হলে পর দেখি আমার এই অবস্থা! আমার চোখ বন্ধ, মুখ বন্ধ, আমি চলৎশক্তিহীন! কেবল কান খোলা ছিল বলে শুনতে পাচ্ছিলুম। শুনলুম অনেকগুলো পায়ের শব্দ। শুনলুম, কে বললে—'বড়বাবু, লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি।' তারপর বোধহয় বড়বাবুই বললে—'দড়ির সিঁড়িটা টেনে তুলে রেখে দে!' আমাকেও কারা হিড়হিড় করে টেনে এই ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রাখলে। তারপর বোধকরি সেই বড়বাবুই বললে—'চল্ এইবারে! আর কোন খলিফা আমাদের পিছনে জ্বালাতে আসবে না, আমরা নিশ্চিন্ত!' তারপর পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। সব নিঝুম।" সুন্দরবাবু থামলেন। আবার হাঁপাতে লাগলেন।

—"তারপর আর কিছু বলবার নেই?"

—"নেই মানে? আলবৎ আছে! তারপরেই তো আসল বলবার কথা। কিন্তু একটু রও ভাই! আর একটু না হাঁপিয়ে জুত করে বলতে পারছি না— আমাতে কি আর আমি আছি দাদা?"

মিনিটখানেক আরো খানিকটা হাঁপিয়ে নিয়ে ও আরো খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তারপর কি হল শোনো। খানিকক্ষণ ঝিঁঝিপোকাগুলোর একটানা গান ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। তারপর আশপাশের ঝিঁঝিপোকাগুলো আচমকা গান বন্ধ করে দিলে। আবার একজন মানুষের পায়ের শব্দ আমার পাশেই এসে থামল। আমি তো 'নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু'র উপরেও আরো বেশী আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে ভাবতে লাগলুম—এই রে, সেরেছে! এবারে বুঝি আমার প্রাণ নিয়েই টানাটানি করতে এল! তারপরেই শুনি—না, সে সব নয়, এ আবার নতুন ব্যাপার, যাকে বলে কল্পনাতীত! কে একজন আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে—'সুন্দরবাবু, ভালো করে শুনে রাখুন! আমি আবার দড়ির সিঁড়িটা ইঁদারার ভেতরে ঝুলিয়ে রেখেছি আর লোহার কবাটও খুলে দিয়েছি। আপনার কোন ভয় নেই, জয়ন্তবাবুরা এখনি এসে আপনাকে উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তাঁদের বলবেন, প্রতাপ চৌধুরী তার দলবল নিয়ে বীরেনবাবুদের সাবেক বাড়ির দিকে গিয়েছে।' তারপর আবার পায়ের শব্দ, আবার সব চুপচাপ, আবার শুরু হল ঝঞ্ঝাটে ঝিঁঝিদের ঝাঁজরা গলায় ঝিমিঝিমি চীৎকার! সেই একঘেয়ে ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ আওয়াজ শুনতে শুনতে আমার সর্বাঙ্গ যেন ঝিন-ঝিন আর মাথাটাও ঝিম-ঝিম করতে লাগল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি আন্দাজ করতে পারলুম, দুরাত্মারা তোমাদের বন্দী করে দড়ির সিঁড়ি উপরে তুলে নিয়েছিল! তার কতক্ষণ পরে শুনলুম, তোমাদের ডাকাডাকি! আমি তো ব্রাদার, পড়ে গেলুম মহা ফাঁপরে,—কি ক'রে তোমাদের জানাই যে আমার পক্ষে এখন সাড়া বা দেখা দেওয়া দুইই অসম্ভব! কিন্তু হাজার হোক আমি হচ্ছি গিয়ে প্রাচীন সৈনিক, ঝাঁ ক'রে বুদ্ধি খুলে গেল! বুঝে ফেললুম, আমি চলতে না পারলেও বাঁধা পাদুটো ছুঁড়ে ছুঁড়ে অনায়াসেই ঝোপ নেড়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি! তারপর আর কি—হুম্!"

সুন্দরবাবুর শেষ কথাগুলো জয়ন্ত যেন শুনছিল না, সে হঠাৎ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল।

মানিক বললে, "জয়ন্ত, সব-শেষে যে লোকটা সুন্দরবাবুর কাছে এসেছিল, সে নিশ্চয়ই সেই সন্ন্যাসী! কে সে জয়ন্ত, তাকে আমরা চিনি না, সে কিন্তু আমাদের সকলকেই চেনে, আর তার দৌলতেই আজ আমরা রসাতলের কারাগার থেকে ছাড়ান্ পেয়েছি!"

জয়ন্ত হঠাৎ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সানন্দে চেঁচিয়ে বললে, "আবার তার অনুগ্রহেই আজ প্রতাপ চৌধুরী সদলবলে ধরা পড়তে পারে!"

মানিক বললে, "বুঝেছি তোমার মনের কথা! তুমি এখনি বীরেনবাবুর বাড়ির দিকে ধাওয়া করতে চাও?"

—"নিশ্চয়! এ সুযোগ কে ছাড়ে?"

—"কিন্তু দুটো মুশকিল আছে। প্রথমতঃ, সেখানে পায়ে হেঁটে গিয়ে পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। ততক্ষণ কি তারা থাকবে?"

—"আর দ্বিতীয় মুশকিল?"

—"দলে তারা ভারী।"

—"মা ভৈঃ! উঠুন সুন্দরবাবু! স্থানীয় পুলিসের থানার দিকে দ্রুত পদচালনা করুন। আপনি সম্প্রতি অবসর নিলেও বাংলাদেশের পুলিস বিভাগে সুপরিচিত ব্যক্তি। খবর দিন, বিখ্যাত ডাকাত, হত্যাকারী আর ফেরারী আসামী প্রতাপ

চৌধুরীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করুন। প্রতাপকে ধরবার জন্যে সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই মস্ত সুখবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিসের তৎপরতা তিনগুণ বেড়ে উঠবে। একদল বন্দুকধারী সেপাই চাই। যেমন করে হোক, সকলকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে দু'-তিনখানা মোটরগাড়িও দরকার!"

মানিক বললে, "এ সব আয়োজন করতে করতেও রাত পুইয়ে যেতে পারে।"

—"যাক। প্রতাপ চৌধুরী আজ বীরেনবাবুর বাড়িতেই রাত কাটাবে বলে মনে হয়। তাদের বিশ্বাস আমরা এখনো বন্দী, তারা নিরাপদ।"

একাদশ অধ্যায়
প্রতাপ চৌধুরীর শাগরেদ

সে হচ্ছে রাত্রি ও দিবসের মিলনলগ্ন। আকাশ নিবিয়ে দিচ্ছিল তারার বাতি, বিদায়ী আঁধার আসর ছেড়ে সরে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে এবং উদয়াচলে চলছিল তখন দীপ্তোজ্জ্বল রঙের খেলার মোহনীয় আয়োজন! বাতাসে নূতন দিনের ঠাণ্ডা ছোঁয়া এবং বিহঙ্গরা রচনা করছিল আলোকোৎসবের বন্দনাসংগীত। চিরদিনই আসে এই অন্ধকারের পরে এই আলোর পালা, কিন্তু কখনো একঘেয়ে মনে হয় না এর তাজা মাধুর্যটুকু।

কিন্তু মাধুর্যের মাঝখানেও, এই সৌন্দর্যের কাব্যলোকেও মানুষ করে ছন্দভঙ্গ। সেই সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে আজ বীরেনবাবুর বসতবাড়ির চারিপার্শ্বে। সেখানে কোন রক্তাক্ত নাট্যাভিনয়ের মহলা চলছে।

পাছে অপরাধীরা সাড়া পায়, সেই ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে খানিক তফাতে মোটর থামিয়ে পুলিসের লোকরা চুপিচুপি গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকাংশই তখনও শয্যার আশ্রয় ছাড়েনি। মাত্র কয়েকজন বয়স্ক লোক সবে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে এবং গৃহস্থদের কয়েকজন বৌ-ঝি কলসী কাঁখে নিয়ে চলেছে এ-বাড়ির ও-বাড়ির পুকুরঘাটে।

হঠাৎ সকলে সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখলে, পুলিসবাহিনী এসে বাগচী-বাড়ির চারিদিক ঘিরে ফেললে। গ্রামের পুরুষরা বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল, মেয়েদের আর জল আনতে যাওয়া হল না, শূন্য কলস নিয়ে ভীত-চকিত চক্ষে যে যার বাড়ির দিকে ফিরে চলল দ্রুতচরণে।

বাগচীদের অর্থাৎ বীরেনবাবুদের বাড়িখানা ছিল একটা

"দরজা খোলো। নইলে আমরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব।"

ফর্দা জায়গার মাঝখানে। সেকেলে তিনমহলা বাড়ি। বাড়ি ঘিরে আগে ছিল যে বাগান, তা এখন পরিণত হয়েছে ছোটখাটো একটি মাঠে। বাড়ির সীমানা নির্দেশের জন্যে বেড়া দেওয়া আছে বটে, কিন্তু ফটকের বাধা নেই, গ্রামের লোকজনরাও অনায়াসে সীমানার ভিতরে এসে মস্ত পুকুরটার জল ব্যবহার করে।

সুন্দরবাবু, মানিক ও বীরেনকে নিয়ে জয়ন্ত আত্মগোপন করে পিছনদিকে অবস্থান করতে লাগল, থানার দারোগাবাবু কতক লোক নিয়ে বাড়ির সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বাকি লোকদের মোতায়েন রাখলেন চারিদিকে পাহারা দেবার জন্যে।

নিরাপদ ব্যবধানে থেকেও বাড়ির যতটা কাছে যাওয়া যায় ততটা কাছে গিয়ে দারোগাবাবু গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন, "বাড়ির ভিতরে কে আছ? বাইরে বেরিয়ে এস।"

এতক্ষণ দোতালার একটা জানালায় জেগে ছিল একখানা মুখ। দূর থেকে সে লক্ষ্য করছিল পুলিসের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু দারোগাবাবুর নির্দেশ-বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখখানা আর দেখা গেল না।

কয়েক মিনিট কাটল। সদর দরজাও খুলল না বা বাড়ির ভিতর থেকেও এল না কোন সাড়াশব্দ।

দারোগাবাবু আবার হাঁকলেন, "দরজা খোলো। নইলে আমরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব।"

তখনও কেউ সাড়া দিলে না।

মিনিট-দুয়েক অপেক্ষা করে দারোগাবাবু চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন, "ভাঙো তবে দরজা। যে বাধা দেবে তাকেই গুলি করে কুকুরের মত মেরে ফেলবে।"

বাড়ির ভিতর থেকে কে বললে, "দরজা ভাঙতে হবে না। আমরা বাধা দেব না, আত্মসমর্পণ করব।"

—"উত্তম! বেরিয়ে এস একে একে।"

দরজা খুলে গেল। পরে পরে নয়জন লোক বাইরে এসে দাঁড়াল—প্রত্যেককে দেখলেই দুর্দান্ত ও দুশমন বলে চিনতে দেরি হয় না। প্রত্যেকের হাতে পরিয়ে দেওয়া হল লোহার হাতকড়া। তখন প্রত্যেকেরই জামাকাপড়ের ভিতর থেকে বেরুলো কোন-না-কোন মারাত্মক অস্ত্র।

কুখ্যাত প্রতাপ চৌধুরী সদলবলে এমন শান্তশিষ্টের মত ধরা দিলে দেখে জয়ন্তের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না, সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এসে বন্দীদের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে বলে উঠল, "কোথায় প্রতাপ চৌধুরী? তোমরা কেউ প্রতাপ চৌধুরী নও!"

বন্দীদের একজন হেসে বললে, "আমরা কেন প্রতাপ চৌধুরী হতে যাব? বাপ-মা আমাদের অন্য নাম রেখেছে!"

দারোগাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "চোপরাও বদমাশ! আবার রসিকতা হচ্ছে? বল্ কোথায় প্রতাপ চৌধুরী?"

—"জানি না। প্রতাপ চৌধুরী বলে কারুকে আমরা চিনি না।"

জয়ন্ত বললে, "দারোগাবাবু, আমার সঙ্গে কিছু লোক দিন। বাড়ির ভিতরটা খুঁজে দেখব।"

তন্ন তন্ন করে তল্লাশের পরেও প্রতাপ চৌধুরীকে পাওয়া গেল না।

দেখা গেল, খিড়কির দরজাটা খোলা। সন্দেহজনক! খিড়কি খোলা কেন? ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে সেখানটা গাছপালায় আচ্ছন্ন। অল্প দূরেই পুকুরের একটা ঘাট।

জয়ন্ত বললে, "দেখ মানিক, প্রথম ভোরের আধা-অন্ধকারে কেউ যদি এই ছায়া-ঢাকা পথ দিয়ে পুকুরঘাটে যায়, তাহলে সহজে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।"

মানিক জিজ্ঞাসু চোখে বললে, "কি বলতে চাও তুমি?"

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে ঘাটের দিকে অগ্রসর হল। এদিকে ওদিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

একজন আধবুড়ো পাহারাওয়ালা খানিক দূরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

তার কাছে গিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "একটু আগে এখানে কোন লোককে দেখেছ?"

—"কোন লোক? পুরুষমানুষ? না।"

—"তবে কি এখানে কোন স্ত্রীলোক ছিল?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। গাঁয়ের কোন স্ত্রীলোক। মেটে কলসীতে জল নিতে এসেছিল—এখানে আসতে আসতে এমন অনেক মেয়েকেই তো দেখলুম!"

—"তারপর?"

—"তারপর পুলিস দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে পালিয়ে গেল!"

—"ঘোমটায় মুখ ঢেকে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কোন্ দিকে গেল?"

বাড়ির পিছনদিকের একটা পায়ে-চলা পথ দেখিয়ে দিয়ে সে বললে, "ঐদিকে।"

—"কেন তুমি তাকে ছেড়ে দিলে?"

—"সে কি বাবু? আমরা এই বাড়ির ভিতরকার দুশমনদের ধরতে এসেছি, গাঁয়ের ভদ্দরলোকের মেয়ে ধরব কেন? সে তো বাড়ির ভেতরেও ছিল না।"

—"ঠিক দেখেছ?"

—"ঠিক দেখেছি। মেয়েমানুষটি কাঁকালে কলসী নিয়ে নীচে থেকে উঠেছিল পুকুরের ঘাটের উপরে।"

জয়ন্ত ফিরে বললে, "বীরেনবাবু, এই পায়ে-চলা পথটা কি গাঁয়ের দিকে গিয়েছে?"

বীরেন বললে, "না, গঙ্গার দিকে। ঐ বাঁশঝাড়টার পরেই কলাবাগান, তার পরেই গঙ্গা—বাড়ির দোতালা থেকে দেখা যায়।"

জয়ন্ত বললে, "এখন আর পরিতাপ করে লাভ নেই। আমাদের এত চেষ্টা ব্যর্থ হল!"

সুন্দরবাবু চমকিত মুখে বললেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, তুমি কি বলতে চাও সেই স্ত্রীলোকটা—"

—"স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। প্রতাপ চৌধুরী নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে পাহারাওয়ালার চোখে ধুলো দিয়েছে। সে পালাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে, এখন আর তাকে ধরবার উপায় নেই, তবু ওদিকটা একবার ঘুরে আসি চলুন!"

সবাই দ্রুত পদচালনা করলে, তারপর আচম্বিতে দেখলে এক কল্পনাতীত অদ্ভুত দৃশ্য!

দ্বাদশ অধ্যায়
গুপ্ত নয়, ব্যক্ত ধন

বাঁশঝাড় আর কলাবাগানের মাঝখানে, পায়ে-চলা পথের পাশে খানিকটা জঙ্গুলে জমি। সেইখানে ভয়াবহ বীভৎসতায় সোনালী সকালের আনন্দকে বিষাক্ত করে তুলে মাটির উপরে পড়ে আছে রক্তধারার মধ্যে দুটো রক্তাক্ত নরদেহ—একটা মৃত ও আড়ষ্ট এবং আর একটা মৃতবৎ হলেও তখনও জীবিত। সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিতের মত।

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য তাদের মুখের কথা কেড়ে নিলে কিছুক্ষণ পর্যন্ত। তারপর সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিয়ে মৌন ভঙ্গ করলে জয়ন্ত। মৃতদেহটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে বললে, "দেখ মানিক, পুরুষের দেহে নারীর শাড়ি! ওকে চিনতে পারছ?"

সুন্দরবাবু চমৎকৃত মুখে বলে উঠলেন, "আরে হুম্! ঐ তো ফেরারী প্রতাপ চৌধুরী! ওর বুকে বেঁধা একখানা ছোরা, ওকে মারলে কে?"

"আমি!"

যে বললে তার মাথায় জটা, মুখে দাড়ি-গোঁফ। অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র। চিত হয়ে শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, "প্রতাপ চৌধুরীকে আমিই বধ করেছি। আমাকে চিনতে পারেন জয়ন্তবাবু?"

—"না। কে আপনি?"

—"ছদ্মবেশ না থাকলে চিনতে পারতেন। আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না, তাই যাবার আগে পরিচয়টা দিয়ে যাই। আমার নাম মানিকচাঁদ।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কি আশ্চর্য! তুমি তো ছিলে প্রতাপ চৌধুরীর প্রধান শাগরেদ, তারই সঙ্গে জেল ভেঙে পালিয়েছিলে!"

শ্বাস টানতে টানতে কষ্টের সঙ্গে মানিকচাঁদ বললে, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। কিন্তু তার পরের কথা আপনারা জানেন না। তার সঙ্গে জেল থেকে বেরিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, অসৎ পথে আর থাকব না, সৎ হব। প্রতাপ চৌধুরীকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। সে হল আমার উপরে খড়্গহস্ত। আমি তার সমস্ত গুপ্তকথা জানতুম, সে আমাকে পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দেবার জন্যে বার বার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার জন্যে আমি পালালুম, ছদ্মবেশ ধারণ করলুম। এমন হাঘরে যাযাবর-জীবন প্রাণ আমায় অতিষ্ঠ করে তুললে। শেষটা তাকে পুলিসের হাতে আবার ধরিয়ে দিয়ে নিজে নিরাপদ হতে চাইলুম। তার অভিসন্ধি আমি জানতুম, নিজে আড়ালে থেকে তাকে চোখে চোখে রাখতে লাগলুম। আপনাদের কাছে তার খবর সরবরাহ্ করতুম। নিজের পরিচয় দিতে পারতুম না, কারণ আমিও ফেরারী আসামী।"

তার কথা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে এসে একেবারে বন্ধ হবার মত হল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে আর একবার সামলে নিয়ে মানিকচাঁদ কোনরকমে আবার বললে, "আজ সে পালাচ্ছিল, আমি তাকে বাধা দি। সে রিভলভার ছোঁড়ে, তখন নিজে চরম আঘাত পেয়েও তার বুকে ছোরা বসিয়ে আমি প্রতিশোধ নি।"

তার অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝে বীরেন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, "জগৎশেঠের রত্নকুঠীর কথা আপনি কিছু জানেন?"

কিন্তু মানিকচাঁদ নির্বাক। তার দুই চক্ষু মুদে এল।

জয়ন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "ভগবান মানিকচাঁদকে সৎপথের পথিক হবার সুযোগ দিলেন না বলে আমি দুঃখিত। আর বীরেনবাবু, আপনি ভাববেন না। এইবারে জগৎশেঠের রত্নকুঠী নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করব। চলুন।"

বাড়িতে আবার ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, "বীরেনবাবু, যে ঘর থেকে প্রতাপ চৌধুরী আপনার ঠাকুরদার গল্পের খাতার খানিকটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, আমরা এখন সেই ঘরে গিয়েই বসতে চাই।"

বীরেন শ্রান্ত স্বরে বললে, "কি হবে আর সেই গুদামঘরে গিয়ে? আমার মন ভেঙে পড়েছে, আর পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে ভালো লাগছে না।"

সুন্দরবাবু সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ বীরেনবাবু, আমারও ঐ মত। গুপ্তধন তো হয়ে দাঁড়াল অলীক দিল্লী কা লাড্ডু, আর মুখের কথায় হিল্লী-দিল্লী করে বেড়িয়ে লাভ কি? প্রচুর কাদা ঘাঁটা হয়েছে, আমি এখন হস্ত-পদ বিস্তৃত করে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে চাই। হুম্, চাই ঘুম!"

মানিক বললে, "আহা, যা বলেছেন! আমি এখনি একদৌড়ে বাজারে গিয়ে আপনার নাসিকার জন্যে এক শিশি সর্ষপ তৈল কিনে আনব কি?"

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে মানিকের পৃষ্ঠদেশে মুষ্টিপ্রহার করতে উদ্যত হলেন, সতর্ক মানিক একলাফে গিয়ে পড়ল হাত কয়েক তফাতে!

কিন্তু জয়ন্ত গোঁ ছাড়লে না, শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে বীরেনকে উদ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে হাজির হতে হল। তারপর অবহেলাভরে বললে, "এখন বলুন জয়ন্তবাবু, আপনার

বক্তব্য কি?"

জয়ন্ত প্রথমে মুখে কিছু বললে না, স্তব্ধভাবে ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

এটা গুদামঘরই বটে, নানান রকম একালে অব্যবহার্য জিনিস বাড়ির এই ঘরখানায় কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে—গুরুভার ও মস্তবড় লোহার সিন্দুক, আগাগোড়া কাঠের আলমারি, ডেস্ক, ভারী ভারী বাসনকোসন এবং গৃহস্থালীর ও গৃহসজ্জার কড়িখচিত দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি। শেষোক্ত জিনিসপত্রগুলিতে প্রাচীন বাংলাদেশের একটি নিজস্ব বিশেষত্ব ছিল। রকমারি কড়ির নামও ছিল ভিন্ন ভিন্ন—যেমন বিদন্তা, সিংহী, মৃগী ও হংসী প্রভৃতি। ঘরের কড়িকাঠ থেকে দোলনার মত ঝুলছে একটি কড়ির আলনা। এ শ্রেণীর জিনিস অধিকাংশ একেলে বাঙালী চোখেও দেখেনি।

একদিকে স্তূপীকৃত বা বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে অনেক প্রাচীন পুস্তক।

জয়ন্ত শুধোলে, "এই বইগুলোই বুঝি প্রতাপ চৌধুরীরা আলমারির ভেতর থেকে টেনে বার করেছিল?"

বীরেন বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বইগুলো যেভাবে ফেলে গিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে।"

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মত দুই-তিনখানা বই তুলে নিয়ে পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগল—মুখে তার চিন্তার লক্ষণ।

বীরেন অধীর স্বরে বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনি কি আলোচনা করবেন বলছিলেন না?"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ। বীরেনবাবু, আপনি বোধহয় মনে করেন যে, জগৎশেঠের গুপ্তধন হস্তগত করে প্রতাপ চৌধুরী শূন্যহস্তেই সদ্য সদ্য স্বর্গে বা নরকে যাত্রা করেছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে করি।"

—"উঁহুঁ, আমি তা মনে করি না।"

—"কেন করেন না?"

—"প্রমাণ দেখে।"

—"কি প্রমাণ?"

—"প্রথমত, গুপ্তধনের সন্ধানেই প্রথমে সে এই বাড়িতে এসেছিল। এখান থেকে সে চন্দ্রনাথবাবুর লেখা কাহিনী সংগ্রহ করে। সেই পাঁচ অংশে বিভক্ত লেখা কাহিনীর তৃতীয় অংশ সে খাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়, আমরা তা দেখতে পাইনি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সেই তৃতীয় অংশেই চন্দ্রনাথবাবু বর্ণনা করেছিলেন, শেঠেদের বাগানবাড়িতে গিয়ে দ্বিতীয়বার ইঁদারায় নেমে কেমন করে তিনি গুপ্তধন দর্শন করেছিলেন। প্রতাপ চৌধুরীও তা পাঠ করে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে দেখে যে, ইঁদারার মধ্যে গর্ভগৃহ আছে বটে, কিন্তু গুপ্তধন নেই।"

—"এটা আপনার যুক্তিহীন ধারণা।"

—"না, যুক্তিহীন নয়। প্রতাপ সেখানে গিয়ে গুপ্তধন পেলে পর আর আপনাকে আর আমাদের নিয়ে এত বেশী মাথা ঘামাতে আসত না, সানন্দে যাত্রা করত অজ্ঞাতবাসে।"

সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, "ঠিক, ঠিক! জয়ন্তের এ কথা জজে মানবে!"

জয়ন্ত বললে, "তারপর দেখুন, সে কাল রাত্রে আবার এখানে এসেছিল। আজ যখন আমি প্রতাপের খোঁজে এই বাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরছিলুম তখন দেখলুম যে, সে আর তার দলের লোকরা বাড়ির নানা ঘরে ঢুকে দেয়াল আর মেঝে খুঁড়েছে, লোহার সিন্দুক আর আলমারি প্রভৃতি ভেঙে তচনচ করে ফেলেছে। কেন তারা আবার এসেছিল? নিশ্চয়ই হাওয়া খেতে নয়! কি তারা খুঁজছিল? নিশ্চয়ই গুপ্তধন!"

বীরেন বললে, "আপনার মতকে আর অযৌক্তিক বলতে পারি না বটে, কিন্তু কোথায় সেই গুপ্তধন?"

—"গুপ্তধন হস্তগত করেছিলেন চন্দ্রনাথবাবু। কারবার পত্তন করবার সময়ে তার বেশ একটা মোটা অংশ খাটিয়ে বাকি অংশ তিনি লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।"

—"কোথায়?"

—"বীরেনবাবু, আপনাদের কলকাতার বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন কে?"

—"আমার বাবা।"

—"আপনার ঠাকুরদাও কি সেখানে বাস করতেন?"

—"না।"

—"তিনি থাকতেন কোথায়?"

—"ব্যবসা-সূত্রে তাঁর কলকাতায় আসা-যাওয়া ছিল বটে, কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতেন এই বাড়িতেই।"

—"তাহলে গুপ্তধনের বাকি অংশও আছে এই বাড়িতেই।"

—"আবার জিজ্ঞাসা করি, কোথায়? প্রতাপ খুঁজতে কোথাও বাকি রেখেছে কি?"

—"অন্ধের মত খুঁজলে কিছুই পাওয়া যায় না।"

বীরেন এইবারে কিঞ্চিৎ শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বললে, "তাহলে চক্ষুষ্মানের মত খোঁজবার পদ্ধতি আপনিই দেখিয়ে দিন।"

জয়ন্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "তাই দেখাব বলেই

তো আমার এখানে আগমন।"

—"উত্তম। আমরা অপেক্ষা করছি।"

পকেট থেকে চন্দ্রনাথ লিখিত অসম্পূর্ণ কাহিনী সংবলিত খাতাখানা বার করে জয়ন্ত বললে, "বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদার রচনার পঞ্চমাংশে অর্থাৎ উপসংহারে কি আছে,। ভোলেননি তো?"

—"আছে একটা অর্থহীন পদ্য বা ছড়া। কিন্তু মূল কাহিনীর সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই।"

—"কে বললে সম্পর্ক নেই? কে বলে তা অর্থহীন? আপনি যা ভেবেছেন, প্রতাপ চৌধুরীও তাই ভেবেছিল, সেইজন্যেই আঁধার ভেদ করে ফুটে ওঠেনি আলোর রেখা। আমিও প্রথমে সেই পদ্যটিকে অগ্রাহ্য করেছিলুম, কিন্তু তার পরে মনে মনে তাকে নিয়ে যথেষ্ট ভেবেচিন্তে রীতিমত অর্থের সন্ধান পেয়েছি!"

—"অর্থ না অনর্থ?"

—"না, অনর্থের মধ্যেই সত্য অর্থ। অর্থাৎ সেই পদ্যটিই ব্যক্ত করে দিয়েছে গুপ্তকে। অতঃপর আমি সেই পদ্যের নির্দেশ মেনেই গুপ্তধন অন্বেষণ করব।"

সকলে অবাক হয়ে জয়ন্তের কাণ্ডকারখানা নিরীক্ষণ করতে লাগল বিস্মিতনেত্রে। অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য অন্বেষকরা যা করে জয়ন্ত সে সব কিছুই করল না—অর্থাৎ সিন্দুক, আলমারি, দেরাজ, ডেস্ক বা বাক্স প্রভৃতি হাঁটকেও দেখলে না কিংবা ঘরের ছাদ, দেওয়াল কি মেঝে ঠুকেও দেখলে না কোন জায়গা ফাঁপা বা নিরেট।

সে প্রথমে বিকীর্ণ ও স্তূপীকৃত পুস্তকগুলোর প্রত্যেকখানা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি হস্তচালনা করে গেল। তারপর বাসনকোসনগুলোও নেড়েচেড়ে দেখলে। তারপর কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত কড়ির আলনার দিকে উচ্চমুখে, স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সুন্দরবাবু বললেন, "কি হে, আলনা দেখে একেবারে থ হয়ে গেলে যে!"

—"হ্যাঁ, কড়ির কারুকার্য-করা সুন্দর আলনা, একালে আর দেখা যায় না। দণ্ডটা অন্তত চার হাত লম্বা আর এক বিঘত মোটা। দণ্ডের সমস্তটা পুরু লাল কাপড়ের আবরণ দিয়ে মোড়া আর উপরে বসানো অজস্র কড়ি। হংসী কড়ি, কারণ রং সাদা। সুন্দরবাবু, সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর আগেও কলকাতায় আর মফস্বলে বাজারে কড়ি ফেলে জিনিস কেনা যেত, জানেন কি?"

—"না। ঐ কি তোমার গুপ্তধন?"

—"উঁহুঁ, ও হচ্ছে এখন বাজারে অচল ব্যক্ত ধন, সবাই দেখেও দেখতে চায় না। কিন্তু আলনাটা একবার নীচে নামালে হয় না?"

—"ধেৎ, কেন?"

—"আরো ভালো করে সেকেলে কারিগরের কারিগুরি দেখব।"

—"তোমার যত সব ছেলেমানুষী বায়না!"

কিন্তু জয়ন্ত যা ধরে, আর ছাড়ে না। কাজেই দড়ি ছিঁড়ে আলনাটাকে নীচে নামিয়ে আনতে হল।

জয়ন্ত মাটির উপরে বসে পড়ে দুই হাতে দণ্ডটাকে নাড়াচাড়া করে বললে, "এটা খুব ভারী, নিরেট বলে মনে হয়। সেকালের লোকরা ভারী ভারী আসবাব বানিয়ে ধনগর্ব প্রকাশ করত আর একালের আমরা হচ্ছি সূক্ষ্মতার ভক্ত। কড়িখচিত লাল আবরণীর তলায় কাঠ আছে বলেই মনে হয়। বীরেনবাবু, একখানা করাত বা ধারালো কাটারি এনে দিতে পারেন?"

—"কি আশ্চর্য, কি করবেন?"

—"আনলেই দেখতে পাবেন।"

করাত ও কাটারি দুইই পাওয়া গেল। জয়ন্ত বিনাবাক্যব্যয়ে কড়ির আলনার একটা প্রান্ত কেটে ফেলে বললে, "এটা দেখছি বিশেষভাবে তৈরী ফাঁপা জিনিস। তবু এত ভারী কেন?"

সে ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে যা বাইরে টেনে আনলে তা হচ্ছে এমন চমকপ্রদ, অভাবিত জিনিস যে, সুন্দরবাবু, মানিক ও বীরেন বিস্ময়ে, আনন্দে ও উত্তেজনায় মুহ্যমান হয়ে স্তম্ভিতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল মৌন শিলামূর্তির মত! তার মধ্যে ছিল হীরক, নীলকান্তমণি, মরকত, পদ্মরাগ ও মুক্তা প্রভৃতি মহামূল্য রত্নরাজি! আরো কয়েকবার হস্তচালনার ফলে কক্ষতলে ছড়িয়ে পড়ল আরো কয়েক মুঠো মণিমুক্তা! যেন দীপ্যমান ইন্দ্রধনুর খানিকটা খণ্ড খণ্ড হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ছড়িয়ে পড়ে সৌন্দর্যস্নান করছে প্রভাতী সূর্যকিরণে! শুক্ল, হরিৎ, নীল, পীত ও রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের সে কি অপরূপ সমুজ্জ্বল পুলকোচ্ছ্বাস!

জয়ন্ত পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বললে, "বাইরে যা এনেছি তাইই যথেষ্টরও বেশী! ভিতরে রইল আরো কত লক্ষ টাকার ঐশ্বর্য, আমার কল্পনায় তা আসে না! এখন আপনাদের কিছু বলবার আছে?"

সুন্দরবাবু কেবল বললেন, "হুম্!"

মানিক বললে, "জয়ন্তের কথা শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম, আজ এখানে এমনি কোন অপূর্ব আর আশ্চর্য ব্যাপারই দেখতে

পাব!"

বীরেন অভিভূত ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু, আপনি ঐন্দ্রজালিক! না না, আপনি তারও চেয়ে বিস্ময়কর!"

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, "অত্যুক্তি করবেন না বীরেনবাবু! আমি কেবল সহজ বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারি, আপনি যা পারেন না।"

বীরেন বললে, "এখনো বুঝতে পারছি না, আমার গলদ হয়েছে কোন্‌খানে?"

—"কেন আপনি খাতার পদ্যটিকে অর্থহীন শব্দসমষ্টি বলে মনে করেছিলেন?"

বীরেন বললে, "তার অর্থ আপনিই আমাকে বুঝিয়ে দিন।"

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, "অর্থ তো স্বতঃস্ফূর্ত! তার কতক অংশ আবার শুনুনঃ

'কিন্তু আমি ঠিক জানি ভাই!
গুপ্ত পথে রপ্ত সবাই,
সর্বজনের সামনে লুকোয় সহজ পথের পন্থী!'

তারপর স্পষ্ট কথাঃ

'মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সে-ই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে!'

টীকা করব? চন্দ্রনাথবাবু বলছেন, 'গুপ্ত পথে চলতে সবাই অভ্যস্ত। যা গুপ্ত, তাকে আবিষ্কার করতে গেলে সকলেই আগে গোপনীয় স্থানই অন্বেষণ করে। যা চোখের সামনাসামনি থাকে, তাকে অবহেলা করা হয়। এইজন্যে যার সহজ বুদ্ধি আছে, সে সকলেরই চোখের সামনে অনায়াসে অবস্থান করেও কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তারই অন্বেষণা সফল ও তারই ভাগ্যে মণিমাণিক্য লাভ হয়, যার মানসনেত্র উন্মুক্ত। কিন্তু মূর্খেরা ভাবে, রত্নের সন্ধান পাওয়া যায় কেবল প্রকাণ্ড লৌহসিন্দুকেই!' বীরেনবাবু, এই পদ্যই হয়েছে আমার চাবিকাঠি, আর তারই সাহায্যে খুলেছি আমি রহস্য-সিন্দুক! সুতরাং—"

সুন্দরবাবু বললেন, "সুতরাং—
জয়ন্তের কথা ফুরালো
বীরেনের ব্যথা জুড়ালো!
হুম্, আমিও বাবা পদ্য-টদ্য রচনা করতে পারি,—দেখছ তো!"

খোকন মানিক

মৌলবী জসীমউদ্দীন

খোকন আমার সোনামণি,
খোকন আমার ধন,
চাঁদের দেশে এমন মানিক
দেখেছে কোন্ জন?
এমন খোকন তারাতে নেই, নেইক মালীর বাগে,
এমন খোকন শিশিরে নেই দূর্ব্বা-শীষের আগে!
এমন খোকন আকাশে নেই, বাতাসে নেই আর,
পাতাল-পুরীর পাতালে কেউ পায় না দেখা তার!
এমন খোকন কোথায় পেলুম? পুতুল-খেলার ঘরে
খেলতে যেয়ে একটি পুতুল হাসল জীবন ধরে।
টিয়ে-পাখী পেলে তারে,
পাখায় করে নিত,
রামধনুকের রাঙা দোলায়
দোল দুলিয়ে দিত।
জোনাক-মতি পেলে তারে
জড়াত হাতে-পায়ে,
মেঘ-বিজুলী পেলে তারে
জড়িয়ে নিত গায়ে।
জড়িয়ে নিত, ছড়িয়ে নিত, উড়িয়ে নিত আর,
আকাশ-পাতাল বাতাসে কেউ খোঁজ পেত না তার!
তাইত তারে দোলনা দিয়ে, খেলনা দিয়ে বাঁধি,—
ছড়ার পড়ার নূপুর গড়ে করছি সাধাসাধি!

সত্যিকারের গল্প

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মানে গাল-গল্প নয়। সত্যি-সত্যিই এমনি ঘটেছিল।

অনেকদিন—প্রায় দু'শ বছর আগের কথা। পারস্য দেশ, এখন যাকে ইরাণ বলা হয়—সেখানে হলমেহী বলে একটি অনাথ মেয়ে ছিল। মেয়েটি জ্ঞান হয়ে অবধি কখনও বাবাকে দেখেনি। সে জানত তার বাবা মারা গেছেন তার শৈশবেই। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে শুনলে যে, তার বাবা এখনও বেঁচে আছেন। পনেরো বছর আগে দেশে যখন রাষ্ট্রবিপ্লব হয়, তখন তিনি যে পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, সে পক্ষ পরাজিত হয় এবং তিনি হন বন্দী। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি বন্দীই আছেন—কারণ সেদিনকার বিজয়ী-পক্ষই আজ পর্য্যন্ত দেশের শাসক। ওর বাবা বিখ্যাত বীর এবং যোদ্ধা ছিলেন, সেনাপতি মেল-ই-আবেথের নাম আজও লোকে ভোলেনি। তাই তাঁকে রাখারও খুব কড়া ব্যবস্থা। নদীগর্ভে এক পাহাড়, সেই পাহাড়ের ওপর কঠিন এবং দুর্ভেদ্য কারাগারে তিনি বন্দী। কারুর সাধ্য নেই যে সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে।

কথাটা শুনে বিস্মিত হল হলমেহী। কিন্তু কথাটা ভুলতে পারল না। তার না-দেখা বাবার বীর মূর্ত্তি কল্পনায় চোখের সামনে ভাসতে লাগল দিন-রাত।...অমন বাবা তার, তাঁকে সে দেখতে পাবে না?

অবশেষে সে এক মহা দুঃসাহসিক সঙ্কল্প গ্রহণ করলে। কেউ যা পারেনি সে তাই করবে। বাবাকে ফিরিয়ে আনবে।

ওর মা ছিলেন না। ছিলেন এক বুড়ী মাসী। তাঁকেই একদিন সে বললে, 'মাসি, আমি চললুম।'

'সে কি? একা মেয়েছেলে কোথায় যাবি রে?'

'কোথায় যাবো তা এখন জানাব না। তবে সে দূর দেশ। দুর্গম সে পথ!'

'কেমন করে যাবি? সঙ্গে কে যাবে?'

'যাবো যেমন করে পারি? আর সঙ্গে? স্বয়ং খোদাই সঙ্গে আছেন মাসী, আর কাকে দরকার?'

মাসী অনেক বোঝালেন। পাড়ার লোকেও।

কিন্তু কারুর কথাই শুনল না সে। একা, সামান্য কাপড়জামা এবং যৎসামান্য কয়েকটি টাকা সম্বল করে একদিন সে বেরিয়ে পড়ল পথে।

তখন রেলগাড়ী হয়নি। ঘোড়া বা উটে আসা-যাওয়া করতে হত। কিন্তু অত পয়সা কোথায় ওর?

হেঁটেই চলল হলমেহী। বিপদ্‌সঙ্কুল পথ, অজানা, অচেনা। সহায়-সম্বলহীন অল্পবয়সী মেয়ে সে। কিন্তু তবু হাল ছাড়লে না। যেতে যে তাকে হবেই!

এইভাবে বত্রিশ দিন ক্রমাগত হেঁটে তাইগ্রিস নদীর তীরে এক জায়গায় এসে পৌঁছল—যেখানে খরস্রোতা নদীর গর্ভে খাড়া পাহাড়ের চূড়ায় দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে আছেন ওর বাবা—বীর সেনাপতি মেল-ই-আবেথ!

ওর সঙ্গে যা সামান্য কিছু পয়সা-কড়ি ছিল তা পথে এই ক'দিন খেতেই ফুরিয়ে গেছে। ভাগ্যিস, কাছেই একটা ছোট-খাটো শহর ছিল, ও সেইখানে গিয়ে অনেক কষ্টে এক ক্যাম্বিস-ওলার কাছে চাকরী জোগাড় করলে। মাইনে সামান্যই, কাজও সাধারণ ঝিয়ের—তবে লোকটি ভাল, নিরাপদে থাকতে পারবে, এই ভেবে সে ঐখানেই কাজ নিলে। অন্য কোন কাজের চেষ্টা করলে না।

দিন যায়, মাস যায়—

আসল কাজের কোন কিনারা হয় না। উদ্বেল হয়ে ওঠে হলমেহীর মন। এই জন্যই,—পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করার জন্যই কি সে এত কষ্ট করলে?

কিন্তু না, সে জানে—জীবনের এই ক'দিনের অভিজ্ঞতাতেই সে শিখেছে যে, যাদের কোন সম্বল নেই তাদের ধৈর্য্য বা আশা হারালে চলে না।

মাস ছয়েক বাদে, যখন বুঝলে যে মনিব তার কাজে খুশী হয়েছেন—তখন সে একদিন তাঁকে কথাটা খুলে বললে। শুনে এবং পরিচয়-লিপি দেখে তিনি ত অবাক্!

'তুমি কি পাগল হয়েছ মা? একে ত সে দুর্ভেদ্য কারাগার। নৌকো ছাড়া সেখানে পৌঁছবার কোন উপায়ই নেই। অথচ শাহের হুকুম, ওর একশ হাতের মধ্যে কোন নৌকো গেলে সে নৌকো এবং মাঝি দুই-ই যাবে। এ অবস্থায় কে তোমাকে নিয়ে যাবে বলো? না না মা—ওসব মতলব ছাড়ো।'

'তাহলে আমি একাই যাবো বাবা।' শান্ত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে

উত্তর দেয় হলমেহী।

সেদিন থেকে তার কাজ হল অবসর পেলেই সাঁতার শেখা। মরুর দেশের লোক সে—এতকাল সাঁতার কাটবার কোন সুযোগই মেলেনি। কিন্তু প্রতিদিন একটু একটু করে সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে এক সময় সে পাকা সাঁতারু হয়ে গেল। আজকাল সে সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে পাহাড়ের কাছ অবধি যায়—বাবার কারা-কক্ষের জানলাও তার নজরে পড়ে, সে জানলার গরাদের মধ্য দিয়ে এক বৃদ্ধকেও দেখ্‌তে পায়; হয়ত তিনিই ওর বাবা—কিন্তু তিনি যে ওর দিকে ফিরেও তাকান না! সম্ভবতঃ অতদূর থেকে তাঁর নজর চলে না।

কী করা যায়? কেমন করে ওর কথা তাঁকে জানাবে সে?

অবশেষে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে মনিবের কাছ থেকে এক টুকরো ক্যাম্বিস চেয়ে নিয়ে তাতে বড় বড় করে নিজের নাম ও পরিচয় লিখলে গোটা গোটা হরফে—তারপর সেটা হাতে করেই সাঁতার কেটে চলল পাহাড়ের দিকে। সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা আলোতে কারাগারের জানলার সামনাসামনি এসে মেলে ধরে সে ক্যাম্বিসটা। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল একবার। অদৃষ্ট সেদিন ওর ওপর বুঝি কিছু সুপ্রসন্ন, তাই হঠাৎ ওপরের বৃদ্ধ বন্দী সেদিনই সেদিকে তাকালেন চোখ তুলে। বড় বড় লাল হরফ ঝাপ্‌সা আলোতেও চোখে পড়ল। হাত নেড়ে তিনি জানালেন যে—তিনি দেখেছেন সে লেখাটুকু।...

বৃদ্ধ সারারাত সেদিন ঘুমোতে পারলেন না—আশা ও আনন্দে। সারাদিন ধরে বিছানার চাদর থেকে সুতো বার করে করে দড়ি পাকালেন—সূক্ষ্ম অথচ মজবুত দড়ি। সেদিন সন্ধ্যায় মেয়ে কাছে আসতেই দড়িটা নামিয়ে দিলেন। সেই দড়ির প্রান্তে হলমেহী বেঁধে দিল দুটি 'উকো' আর একটি ছোট চিঠি—'নেমে এসো; আমি সারারাত এই পাহাড়ের খাঁজে অপেক্ষা করব।'

উকো দিয়ে ঘষে ঘষে প্রায় সারারাতের চেষ্টায় একটি গরাদ কাটা গেল। তারই মধ্য দিয়ে বহু কষ্টে গলে বেরোলেন বৃদ্ধ—তারপর সেই কঠিন খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা—তাও কোনমতে প্রাণপণ চেষ্টায় নামলেন তিনি। এক সময় অবসন্নভাবে এসে মিলিত হলেন মেয়ের সঙ্গে—দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে।

তপস্যার বুঝি সিদ্ধি মিলল হলমেহীর।

কিন্তু তখন আর সে মিলন উপভোগ করবার অবসর কোথায়? পূর্ব্বাকাশে সোনালী আলোর আভাস ফুটে উঠছে যে! এখনই হয়ত সব জানাজানি হয়ে যাবে।

দুজনে নেমে পড়লেন জলে। সাঁতার কাট্‌তে শুরু করলেন।

কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি দীর্ঘকাল কারাবাসে ব্যায়ামের অভ্যাস হারিয়েছেন। দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে দেহ—তিনি পারবেন কেন ঐ তীব্র স্রোত ঠেলে এগিয়ে যেতে? কিছুদূর গিয়েই তাঁর হাত-পা এলিয়ে পড়ল। তিনি বললেন, 'বিদায় দাও মা, আমার জন্য তোমার জীবন নষ্ট করো না। তোমার দেখা পেয়েছি, আর কোন দুঃখ নেই—সুখেই মরব।'

তিনি হাত-পা ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু হলমেহী কি পারে তাঁকে ছাড়তে? এই জন্যই কি সে এই দীর্ঘকাল তপস্যা করেছে? এমনি অসহায় মৃত্যুর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে যাবে বলে? সে প্রাণপণে তার বাবার অনড় দেহটাকে টেনে নিয়ে চলল। প্রবল স্রোত পাহাড়ে ঘা খেয়ে আরও দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে, নিজে-নিজে সাঁতার কাটাই দুঃসাধ্য। তার ওপর আর একটা দেহ টেনে নিয়ে চলা ত প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ ঐটুকু এক বালিকার পক্ষে। কিন্তু হলমেহী সেই অসম্ভবই সম্ভব করলে। কোনমতে এইটুকু যেতে পারলেই নিরাপদ। ও-পারে তার মনিবের থাকবার কথা—ঘোড়া নিয়ে। পারবে না এইটুকু যেতে? হে ভগবান!

এইটুকু এল—আসতে পারলে কোনমতে। প্রাণপণে, শুধু মনের জোরে।

কিন্তু এপারের কাছাকাছি আসতেই তাদের যারা টেনে তুললে, তারা ওর মনিবের লোক নয়—সরকারী পুলিশ। ইতিমধ্যেই ওদের পালাবার খবর পৌঁছেছিল কর্ত্তাদের কানে; তাঁদের লোক নিঃশব্দে এসে ওৎ পেতে বসে ছিল।

হলমেহীর মনিবকেও ধরেছে তারা। এখন এদের ধরে চালান করলে—সোজা বসরায় সুবেদারের কাছে।

তিনি হুকুম করলেন মৃত্যু—বাপ মেয়ে দু'জনকারই।

হলমেহীর তাতে দুঃখ নেই—বাবার দেখা পেয়েছে সে, আর একসঙ্গেই মরছে ত, ভয় কি?

সুদুশ্চর এই তপস্যা কোন কাজেই লাগল না শেষ পর্য্যন্ত—শুধু পিতৃভক্তির ইতিহাসে আর একটি নাম স্বর্ণাক্ষরে যোজিত হল মাত্র!
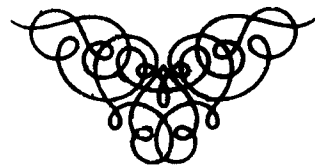
রাখাল হেডমাস্টার

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

রবিবার। ছুটির দিন।

বাড়িতে দু'একজন আত্মীয় এসেছেন।

জেলা স্কুলের হেডমাস্টার রাখালবাবু নিজেই তাই গঞ্জের হাটে বাজার করতে চলেছেন।

বাড়ি থেকে গঞ্জের হাট প্রায় মাইল দু'য়েক হবে।

হাটের কাছ বরাবর এসেছেন, এমন সময় নায়েব মশায়ের সঙ্গে দেখা।

হেডমাস্টারকে তখন দেখে নায়েব মশাই হাতজোড় করে নমস্কার করে। এমনি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করে,—কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

হেডমাস্টার তখন মনে মনে অন্য কি কথা ভাবছিলেন। অন্যমনস্কভাবে বলে ফেলেন,—বাড়ি যাচ্ছি!

নায়েব অবাক হয়ে বলে,—বাড়ি যাচ্ছেন...তা এদিক দিয়ে কেন?

নায়েবের কথায় হেডমাস্টারের হুঁশ হয়। তিনি বুঝতে পারেন, অন্যমনস্কভাবে ভুল বলে ফেলেছেন। দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবেন, তারপরই ঘুরে আবার বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করেন।

খালি থলে হাতে বাড়ি ঢুকতেই স্ত্রী চীৎকার করে উঠলেন,—খালি থলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলে যে?

হেডমাস্টার উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন,—বাজারেই যাচ্ছিলাম। পথে অন্যমনস্কভাবে নায়েবকে বলে ফেলি যে বাড়ি যাচ্ছি। তাই কথার সত্যতা বজায় রাখবার জন্যে বাড়ি ফিরতে হলো।

গৃহিণী আর কিছু বলেন না। তিনি তাঁর স্বামীকে ভাল করেই জানতেন।

রাখালবাবু উঠোন থেকে আবার থলি হাতে বেরুলেন হাটের দিকে।

সমস্ত জেলার লোক জানে, রাখাল হেডমাস্টার জীবনে ভুলেও কখনও মিথ্যা বলেন না।

লোকে সেইজন্যে তাঁকে শ্রদ্ধা করতো।

আবার সেইজন্যে অনেকে আড়ালে উপহাসও করতো, বলতো—হেডমাস্টারের এ এক উৎকট বাতিক। আজকের যুগে এজাতীয় আদর্শবাদ চলে না।

বিশেষ করে জেলা স্কুলের শিক্ষকেরা মাঝে মধ্যে ক্ষেপে উঠতেন। স্ত্রীর কঠিন অসুখ বলে ছুটি নিতে হতো। স্কুলে আসতে দেরি হলে মিথ্যে অজুহাত দিতে হতো। রাখালবাবু মুখ ভারী করে শুধু বলতেন,—হুঁ!

টিফিনের সময় বিশ্রামের ঘরে যখন সব মাস্টার এসে জুটতেন, তামাক খেতে খেতে সকলকে শুনিয়ে আপনার মনে যেন বলতেন,—কলিযুগে সত্যি কথা বলা বড় শক্ত...তাই কলিযুগে ভগবান সত্যরূপেই ধরা দেন। যে সত্যি কথা বলে, সত্য আচরণ করে, সে ভগবানকে পাবেই

পাবে।

মাস্টাররা মুখ টিপে হাসাহাসি করতেন।

অঙ্কের মাস্টার নীলমণিবাবু মনে মনে হেডমাস্টারের ওপর ভীষণ চটা ছিলেন। কারণ, মাস্টারী করতে করতে তিনি কিছু জমি-জমা করে ফেলেছেন। প্রায়ই জমিতে যেতে হয়। এবং সেইজন্যে নানা মিথ্যে অজুহাতে ছুটিও নিতে হয়। রাখালবাবুর অধিকাংশ লেকচার তাঁকেই শুনতে হতো।

সামনে কিছু বলতে পারতেন না, কিন্তু আড়ালে হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে বিষ-উদগার করতেন। প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন,—কলিযুগে দু'জন লোক ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে পেয়েছে, একজন হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস, আর একজন হলেন আমাদের হেডমাস্টার!

সম্প্রতি এক ব্যাপারে এই রাগটা অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে ওঠবার এক কারণ ঘটে।

ছেলের খুব অসুখ বলে দু'দিনের ছুটি নিয়েছিলেন। ধান মেপে ঘরে আনতে হবে, সামনে দাঁড়িয়ে না থাকলেই ভাগীদার ফাঁকি দেবে। তাই দু'দিন তাঁকে ক্ষেতঅঞ্চলেই থাকতে হবে। যাবার সময় ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে বলে গেলেন,—খবরদার, এ দু'দিন স্কুলে যাবি না!

এমনি ভবিতব্যতা, সেইদিনই বিকেল বেলায় হেডমাস্টার স্কুলের পর মতি গয়লার বাড়িতে যান, সের খানেক বাড়তি দুধের জন্যে।

গয়লা-বাড়িতে গিয়ে দেখেন, মহা হৈ চৈ। মতির আমগাছে চড়ে দু'টি ছেলে আম চুরি করছিল। মতি হাতে-নাতে তাদের ধরে ফেলে। হেডমাস্টার যেতে মতি হেডমাস্টারের ওপরই বিচারের ভার দিল। হেডমাস্টার বিস্মিত হয়ে দেখেন, দু'টি ছেলের মধ্যে একটি হলো নীলমণি মাস্টারের ছেলে, যার বাড়াবাড়ি অসুখের জন্য মাস্টার দু'দিন ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছেন!

ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, স্কুলে গিয়েছিলি?

—না!

—কেন যাস্‌নি?

—বাবা যেতে বারণ করেছেন...

—বাবা কোথায়?

—অসুখ করেছে...বাড়িতে...

রাখালবাবু আর প্রশ্ন করলেন না।

ছুটির পর নীলমণি মাস্টার স্কুলে এসেছেন। টিফিনের সময় সব মাস্টার বিশ্রামের ঘরে বসে।

হেডমাস্টার বহুকষ্টে চুপ করে ছিলেন। কিন্তু শেষকালে আর পারলেন না। নীলমণিবাবুকে ডেকে বললেন,—বাপ হয়ে ছেলেকে এই বয়স থেকেই মিথ্যাচরণ করতে শেখাচ্ছেন...অথচ আপনারা শিক্ষক...আপনাদের ওপর ছাত্রদের শিক্ষার ভার!

নীলমণিবাবুর উত্তরের অপেক্ষা না করে হেডমাস্টার ঘর থেকে চলে গেলেন। তখন তাঁর মুখ দেখলে মনে হতো যেন, ভূমিকম্পে তাঁর সমস্ত জগৎ ভেঙে ধসে পড়ে গিয়েছে। কেন লোকে এত সামান্য কারণে মিথ্যা বলে?

জেলা স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে। এবারেও হেডমাস্টারের ছেলে সুনীল ফার্স্ট হয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। বরাবর সে ফার্স্ট হয়ে আসছে। হেডমাস্টারের মনে আশা, সুনীল জেলা স্কুলের মান রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও সে স্ট্যাণ্ড করবে! অনেকদিন হয়ে গিয়েছে, তাঁর স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কেউ স্ট্যাণ্ড করতে পারেনি।

সুনীল নিশ্চয়ই পারবে!

সেদিন জমিদার বাড়িতে পড়াতে এসে নীলমণি মাস্টার পড়ানোর পর জমিদার রতিকান্ত চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করছেন।

কথায় কথায় হেসে বললেন,—এবারেও হেডমাস্টারের ছেলেই ফার্স্ট হলো!

রতিকান্ত চৌধুরী গড়গড়ার নল মুখ থেকে সরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তাঁর একমাত্র ছেলে অভয়কান্তি আজ দু'বছর ক্লাস নাইনে পড়ে রয়েছে। এবারেও ফেল করেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চৌধুরী মশাই বলেন,—নীলমণিবাবু, বড় সাধ করে আপনাকে অভয়ের প্রাইভেট টিউটর রেখেছিলাম...কিন্তু আমার বরাত...

নীলমণি মাস্টার সাহস করে সত্যি কথাটা বলতে পারলেন না। বলতে পারলেন না, অভয়কান্তিকে পড়িয়ে কোন শিক্ষকই পাস করাতে পারেন না, পারে হয়ত কোন জাদুকর...

উল্টে বললেন,—এবারে অভয়কান্তির বিশেষ দোষ নেই...সব সাবজেক্ট্ মিলিয়ে মাত্র তিন নম্বরে ফেল করেছে...হেডমাস্টার ইচ্ছে করলে অনায়াসে তিন নম্বর গ্রেস দিয়ে পাস করিয়ে দিতে পারতেন!

নল টানতে টানতে চৌধুরী মশাই বলেন,—বংশের একমাত্র সন্তান...ওর জন্যে আমার বড় ভাবনা...

সুবিধা বুঝে নীলমণি মাস্টার বলেন,—আপনি একবার হেডমাস্টারকে বলুন না...মাত্র তিন নম্বরের জন্যে একটা ছেলের কেরিয়ার...

গম্ভীরভাবে চৌধুরী মশাই বলেন,—বলতে ইচ্ছে করে না...এমনি উৎকট ওঁর ধর্ম-জ্ঞান...হুঁ!

সত্যনারায়ণ-পুজো উপলক্ষে জমিদার বাড়িতে হেডমাস্টারের নেমন্তন্ন হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর নিভৃতে চৌধুরী মশাই হেডমাস্টারকে শুনিয়ে বলেন,—অভয়ের জন্যে বড়ই আমার ভাবনা!

সমবেদনায় হেডমাস্টার বলেন,—হবারই কথা!

—আমি ভাবছি, নীলমণিবাবুর বদলে আপনাকেই অভয়ের প্রাইভেট টিউটর রাখবো...মাইনে আপনি যা চান...

কথাটার ভেতর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে হেডমাস্টার শিউরে ওঠেন।

—প্রাইভেট টিউশনি করা আমি ছেড়ে দিয়েছি চৌধুরী মশাই...বড় কথার সৃষ্টি হয়!

—লোকের কথায় কি যায় আসে?

—লোকের কথার পেছনে অধিকাংশ সময়ই সত্য থাকে না জানি...তবুও তাকে সমীহ করে চলতে হয়!

—একথা আপনি বলছেন?

—বলছি এইজন্যে যে, অপবাদ এমন জিনিস যে ভগবানকেও বিভ্রান্ত করে ফেলে...রামায়ণ পড়েননি?

চৌধুরী মশাই গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর তিক্তকণ্ঠে বলে ওঠেন,—আপনি স্কুলের হেডমাস্টার, আপনার ছেলে প্রত্যেক বছরে ফার্স্ট হচ্ছে...আমি সেই স্কুলের চেয়ারম্যান, আমার ছেলে প্রত্যেক বছরেই ফেল করছে...লোকের কাছে বলতে কইতেও কেমন লাগে, না?

হেডমাস্টার গুম্ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

পরের সপ্তাহেই তিনি জেলা স্কুল থেকে তাঁর ছেলেকে সরিয়ে কলকাতার স্কুলে পড়াবার ব্যবস্থা করলেন।

ছেলের মা কেঁদে বহু অনুনয় করলেন, কলকাতায়, মেসে, একা...ভয়ানক কষ্ট হবে সুনীলের...হয়ত পড়াশোনারও...

হেডমাস্টার কোন অনুনয় শুনলেন না। গৃহিণীকে বললেন,—আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে লোকে কথা বলবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না! যাকে শিক্ষক হতে হয়, তার চরিত্রে সন্দেহ করবারও অবকাশ থাকলে চলে না!

জমিদার রতিকান্ত চৌধুরী যখন শুনলেন, হেডমাস্টার তাঁর ছেলেকে জেলা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন, রাগে তাঁর সর্বশরীর জ্বলে উঠলো।

স্কুল কমিটির মিটিঙের পর হেডমাস্টারকে ডেকে বললেন,—আপনার ব্যবহার দেখে, আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আপনার মাথায় কিছু গোলমাল আছে নিশ্চয়ই!

হেডমাস্টার চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—কেন বলুন তো?

চৌধুরী মশাই গর্জে ওঠেন,—সুনীলকে জেলা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন কেন?

একান্ত শান্তভাবে হেডমাস্টার বলেন,—আমি অনেক ভেবে তবে এ কাজ করেছি। আমার ছেলের মতনই জেলা স্কুলকে আমি ভালবাসি...আজ দশ বছর ধরে একটি মাত্র স্বপ্ন দেখে আসছি, জেলা স্কুলের কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যাণ্ড করবে...সুনীলকে সেইভাবেই গড়ে তুলছিলাম... সেদিন আপনার কথায় আমার মনে প্রশ্ন জেগে উঠলো, যে attention সুনীলকে দিচ্ছি, লোকে তো ভুল বুঝতে পারে, আমার ছেলে বলেই তাকে সে attention দিচ্ছি?

চৌধুরী মশাই হেডমাস্টারের মুখের ওপর একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলা ছুঁড়ে মারলেন...তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন,—সেটা কি মিথ্যে কথা?

হেডমাস্টার হঠাৎ পাথরের মতন হয়ে যান।

কোন রকমে বলেন,—জীবনে জ্ঞানত কখনো মিথ্যাচরণ করিনি, কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, তাই বুক ভেঙে গেলেও এই মিথ্যা সন্দেহ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সুনীলকে জেলা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি!

—আপনার সত্য-মিথ্যা জ্ঞান, আপনিই বোঝেন... আমরা বুঝি না...বুঝতে পারি না!

চৌধুরী মশাই রেগে ঘর ছেড়ে চলে যান।

কিন্তু মানুষের ভাগ্য-বিধাতার এমনি কৌতুককর খেলা যে, হেডমাস্টারের যে সত্য-মিথ্যা-জ্ঞানকে তুচ্ছ করে চৌধুরী মশাই সদর্পে তাঁকে সেদিন অপমান করতে পেরেছিলেন, এক মাসের মধ্যেই এমন এক ঘটনা ঘটলো যার জন্যে চৌধুরী মশাইকে নতজানু হয়ে হেডমাস্টারের সেই সত্য-মিথ্যা-জ্ঞানের সামনে ভিক্ষা চাইতে হলো। যে-মন্দিরের দরজায় পদাঘাত করেছিলেন, সেই মন্দিরের দরজায় মাথা কুটে কাঁদতে হলো।

জমিদারের একমাত্র ছেলে অভয়কান্তি নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত, কারারুদ্ধ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 'বেইল্' পর্যন্ত

দেননি।

যে-ছেলেটি মারা পড়েছে, সে তাদেরই আশ্রিত এক চাষীর ছেলে। অভয়কান্তির গোপন দুষ্কার্যের সহায় ও সহচর। রাগের মাথায় অভয়কান্তি তাকে এমন প্রহার করে যে তার ফলে সে মারা যায়।

সমস্ত কেস্ নির্ভর করছে, হেডমাস্টারের সাক্ষ্যের ওপর।

দুর্ঘটনা ঘটে, বেলা আড়াইটার সময়।

আসামীর পক্ষে জবাবদিহি হলো, অভয়কান্তি তখন জেলা স্কুলের ক্লাসে বসে যথারীতি পড়াশোনা করছিল এবং নিয়মিত সে বেলা চারটে পর্যন্ত স্কুলেই ছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট জেলা স্কুলের হেডমাস্টার রাখালবাবুকে ভাল করেই চেনেন, রীতিমত শ্রদ্ধা করেন।

চোখে জল...পাংশু শুষ্ক মুখ...রতিকান্ত চৌধুরী হাত জোড় করে হেডমাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন,—ম্যাজিস্ট্রেট জানেন, আপনি জীবনে কখনো মিথ্যা বলেন না...আপনি শুধু একবার বলবেন, সেদিন সারাক্ষণ অভয় স্কুলেই ছিল...অভয় ছাড়া পাবে...

পাথরের মূর্তির মতন হেডমাস্টার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

—যে ছেলেটি মারা গিয়েছে, আমি আপনার সামনে তাদের সংসারের সব ভার নিজে বইবার ব্যবস্থা করে দেবো...আমার বংশের সুখ-শান্তি...মর্যাদা সব আপনার ওপর নির্ভর করছে...আপনার শুধু একটা কথা...হাতজোড় করে ভিক্ষে চাইছি আপনার কাছে...

রতিকান্ত চৌধুরীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে...

হেডমাস্টার তেমনি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে...মুখে কোন কথা নেই...বোবা!

—যেদিন থেকে অভয়কে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছে...চেয়ে দেখুন আমার দিকে...আমার শরীরে আর কিছু নেই...বাড়িতে অভয়ের মা...আমি জানি, অভয়কে যদি ছাড়িয়ে আনতে না পারি, মারা যাবেন...আমিও বাঁচবো না...আপনার শুধু একটা কথায়...শুধু একটা মুখের কথা...দয়া করুন...দুটো প্রাণ আপনার শুধু একটা কথার ওপর...

ব্যথায় উন্মাদ জমিদার রতিকান্ত চৌধুরী হঠাৎ নতজানু হয়ে হেডমাস্টারের পা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেন।

পাথর নড়ে ওঠে।

কিন্তু মুখে কোন কথা বেরোয় না।

কেসের শুনানীর দিন জেলার লোক চারদিক থেকে এসেছে আদালতে।

পুলিস ভিড় সামলে রাখতে পারে না।

রতিকান্ত চৌধুরীর সঙ্গে বহুকষ্টে ভিড় ঠেলে রাখাল হেডমাস্টার আদালত-ঘরের দিকে এগিয়ে চলেন।

হেডমাস্টারকে দেখে বিপুল জনতার ভেতর থেকে অস্ফুট গুঞ্জন-ধ্বনি জেগে ওঠে।

ভীত-চোখে রাখাল হেডমাস্টার একবার সেই বিপুল জনতার দিকে চেয়ে দেখেন।

রতিকান্ত চৌধুরী হাত ধরে তাঁকে ভেতরে নিয়ে যান।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রাখাল হেডমাস্টার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে দেখেন।

কাউকে দেখতে পান না।

মুহুরী এসে তাঁকে শপথ পড়িয়ে গেল...আজ ক্লাসে ইউক্লিডের কোন্ থিওরেম্টা পড়াবার কথা ছিল?

কে যেন বলে উঠলো,—স্যার, ক্যাব্লা আমাকে মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে!

হেডমাস্টার বেতটার জন্যে হাত বাড়ালেন, খুঁজে পেলেন না!

বড্ড গোলমাল হচ্ছে। স্কুল বসবার সময় রোজ এইরকম গোলমাল হয়। বেতটা হাতে করে রাখাল হেডমাস্টার একতলা থেকে দোতলার শেষ ঘরটা পর্যন্ত একবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

ঢং করে ঘণ্টা বাজলো না?

টিফিনের ঘণ্টা?

আজ টিফিনের ঘণ্টা এত শিগ্গির বেজে উঠলো কেন?

রতিকান্ত চৌধুরীর হাত ধরে রাখাল হেডমাস্টার আদালত থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন।

জমিদার-গৃহিণী আজ হেডমাস্টারের বাড়িতেই বসে ছিলেন।

রতিকান্ত চৌধুরী গৃহিণীকে দেখে হেসে বলেন, প্রণাম কর!

গলায় কাপড় দিয়ে জমিদার-গৃহিণী রাখাল হেডমাস্টারকে প্রণাম করেন।

হেডমাস্টারকে শুনিয়ে চৌধুরী মশাই গৃহিণীকে বলেন,—হেডমাস্টারের দয়ায় অভয়কে ফিরে পাব...

হেডমাস্টারের কথা শোনার পর ম্যাজিস্ট্রেট আর কারুর কোন কথাই শুনলেন না!

সাশ্রুনেত্রে হেডমাস্টারের দিকে চেয়ে জমিদার-গৃহিণী

বলেন,—আপনি দেবতা! আমাদের প্রাণ বাঁচালেন!

পরের দিন স্কুল বসবার সময় হেডমাস্টার বেত নিয়ে যথারীতি ক্লাস ঘুরতে লাগলেন।

কিন্তু আজকে...একি হলো?

গোলমাল তো থামছে না!

একদল ছেলে সিঁড়ি দিয়ে দুড় দুড় করে ছুটে নামছে...বেত হাতে হেডমাস্টারকে দেখে তারা থেমে গেল।

হেডমাস্টার ওপরে উঠতেই তারা আবার ছুটতে আরম্ভ করলো।

দোতলার বারান্দা দিয়ে বেত হাতে রাখাল হেডমাস্টার এগিয়ে চলেন। বারান্দায় কতকগুলো ছেলে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, হেডমাস্টারকে দেখে তারা ক্লাসে ঢুকে গেল।

কিন্তু গোলমাল থামছে না, কেন?

বেত তাঁর হাতেই থাকে, কখনো ব্যবহার করতে হয় না, কখনো হয়নি। বেতটা তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন।

বারান্দার কোণ ফিরতেই যে-ক্লাসটা চোখে পড়লো, উঁকি মেরে দেখেন তখনো ক্লাসে টীচার আসেননি! ক্লাস নাইন্...ফার্স্ট পিরিয়ড্...বিনোদবাবুর...! আশ্চর্য, বিনোদবাবু এখনো ক্লাসে আসেননি!

বিরক্ত হয়ে এগিয়ে চলেন। শেষ ঘরটায় উঁকি মারতেই দেখেন, এ ক্লাসেও টীচার আসেননি...দু'টি ছেলে প্রাণের আনন্দে বক্সিং লড়ছে!

রেগে ক্লাসের ভেতরে ঢোকেন। তাঁর দিকে মুখ করে যে-ছেলেটি ঘুষি তুলেছিল, সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। পেছন ফিরে যে ছেলেটি লড়ছিল, সে তখন একটা "আপার্ কাট্" সবে মাত্র তুলেছে, দেখে কে এসে তার পিঠে যেন টোকা মারছে। ফিরতেই দেখে, হেডমাস্টার!

হেডমাস্টার চীৎকার করে ওঠেন,—স্ট্যাণ্ড আপ্ অন্ দি বেঞ্চ!

ছেলেটি কুণ্ঠিতভাবে কি যেন বলতে যায়!

হেডমাস্টার গর্জন করে ওঠেন,—আই সে...স্ট্যাণ্ড আপ্ অন্ দি বেঞ্চ!

ছেলেটি বেঞ্চির ওপর দাঁড়াবার জন্যে দু'পা গিয়ে কাঁদ-কাঁদ সুরে বলে,—আমার কি দোষ স্যার! এখনো ক্লাস বসবার ঘণ্টা তো বাজেনি!

হেডমাস্টার চমকে ওঠেন।

—এখনো ঘণ্টা পড়েনি?

কে একটি ছেলে বলে,—এখনো চার মিনিট দেরি আছে, স্যার!

হেডমাস্টারের পা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেন।

যে-ছেলেটিকে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতে আদেশ করেছিলেন, তার দিকে চেয়ে হেডমাস্টার বলেন,—আমার ভুল হয়েছে...তুমি কিছু মনে করো না!

গম্ভীরভাবে হেডমাস্টার ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ছেলেরা হেসে ওঠে।

জমিদার রতিকান্ত চৌধুরী বাড়িতে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেছেন। যাঁরা এই মামলায় তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের জন্যেই এই ভোজ। অথবা তাঁদের উপলক্ষ্য করে হেডমাস্টারের জন্যেই এই ভোজ!

হেডমাস্টারের জন্যে তিনি আসল তসরের ধুতি-চাদর আনিয়েছেন। রুপোর বাসন বার করেছেন, রুপোর বাসনে আলাদা করে হেডমাস্টারকে সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াবেন, জমিদার-গৃহিণী।

সন্ধ্যা হতেই একে একে নিমন্ত্রিতেরা আসতে লাগলেন। কিন্তু তখনো হেডমাস্টারের দেখা নেই। চৌধুরী মশাই বুড়ো নায়েব মণ্ডল মশাইকে পাঠালেন, হেডমাস্টারকে নিয়ে

আসবার জন্যে।

হেডমাস্টারের জন্যে জমিদার-গৃহিণী আজ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তৈরি করেছেন, পঞ্চাশটা রুপোর বাটিতে সাজিয়ে রাখছেন...

মণ্ডল মশাই ফিরে এলেন, একা, মুখ থমথম করছে। কথা বলতে পারছেন না।

চৌধুরী মশাই ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন,—রাখালবাবু?

বৃদ্ধ নায়েব বলেন,—পাগল হয়ে গিয়েছেন!

রতিকান্ত চৌধুরীর গলা শুকিয়ে আসে।

—পাগল হয়ে গেছেন? কোথায় তিনি?

—এক কাপড়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছেন...বাজারের পথে লোকে তাঁকে ছুটে চলে যেতে দেখেছে...লোক দেখলেই ছুটে পালাচ্ছেন...

রতিকান্ত চৌধুরী খুঁজতে খুঁজতে সাত মাইল দূরে কৃষ্ণ-সায়রের পাড়ে শরবনের ধারে দেখতে পেলেন, সারা গায়ে কাদা আর ধুলো, রাখাল হেডমাস্টার আপনার মনে বিড় বিড় করে কি বকে চলেছেন।

চৌধুরী মশাই অতি সন্তর্পণে তাঁর সামনে গিয়ে ডাকেন,—রাখালবাবু!

হেডমাস্টার সোজা উঠে দাঁড়ান, একটা নল-খাগড়া উপড়ে নিয়ে বেতের মতন আস্ফালন করে বলেন,—স্ট্যাণ্ড আপ্ অন্ দি বেঞ্চ!

পেছনের জঙ্গলে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে শেয়াল ডেকে ওঠে।

লোটন পালোয়ান

মণ্টু সরকার

ঘোটন গড়ের ঘটোৎকচ
লোটন পালোয়ান,
হুলোর মত মুখটি করে
চোখ বুজিয়ে চান।
লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে দাঁতে,
লবণ মেখে গায়;
আড়াই হাজার মুগুর ভাজেন
পৌনে দু' ঘণ্টায়!
পাঁচটা পিপে বাদাম তেলে
নিত্য করে স্নান,
প্যাঁজের রসে লেবু দিয়ে
রোজ সকালে খান।
পেল্লাই তার গোঁফ জোড়াটা,
পেল্লাই তার টাক,
ঘাড় গর্দান সমান সমান;
মরচে ধরা নাক।
সেই নাকেতে টুথ পাউডার
নস্যি গুঁজে দিয়ে,
ঘুমোন কষে বসে বসে;
বিকট নাক ডাকিয়ে—
নাকের ডাকে চমকে উঠে'
বলেন, অট্টহেসে—
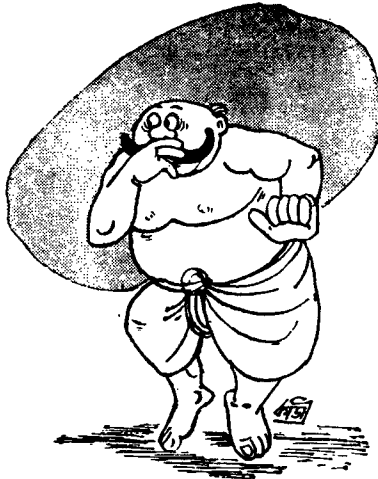
মুটের মাথায় চড়ে আমি
যাবো চাঁদের দেশে।
হাসির ডাকে ছুটে আসে
লোক লস্কর যত,
রাস্তা থেকে ধরে আনে
মুটে মনের মত।
ঝাঁকার মাথায় তুললো ঠেলে
জন পঁচিশে মিলে,
মাথায় তুলে মুটে মশায়ের
চমকে ওঠে পিলে।
দু'ফুট লম্বা মানুষটা—সে
ঝাঁকার চাপে বেঁকে
চ্যাপটা হলো দু'ফুট হঠাৎ
বাপরে বাপ হেঁকে!
পা বাড়াতেই মচকে হাঁটু
পড়লো চিৎপটাং,
মাথার বোঝা বুকে পড়ে
শেষ হলো তার প্রাণ।
মুটে বেটা বেজায় চালাক
গেল চাঁদের দেশে,
লোটনেরে লটকে দিয়ে
ফাঁসির কাঠে শেষে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এক

একে শীতের রাত, তার উপরে আবার ঝড় আর বৃষ্টি। ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ।

কিন্তু সীতার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। এমনিতেই তো প্রতি রাত্রে ঐ বিশ্রী ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা হয়, আজ যেন আরো বেশী মনে হচ্ছে। অনেক কালের পুরানো বাড়ি। দিনের বেলাতেই সীতার গা কেমন ছম ছম করে। রাতের বেলায় তো কথাই নেই। গ্রামের অমন সুন্দর এবং পরিচিত ঘরবাড়ি, দীঘির ঘাট, ফুলের বাগান ছেড়ে আসতে সীতার কষ্টটা বোধহয় সবার চাইতে বেশী হয়েছিল। কিন্তু উপায় নেই। মা, বাবা, দাদা ও দিদির সঙ্গে তাকেও চলে আসতে হয়েছিল। এবং শহরে এসে আজ মাসখানেক হলো এই বিরাট দোতলা পুরানো বাড়িটায় তারা আরো গ্রামের অনেকের সঙ্গেই দুটো ঘর এসে দখল করেছে। দিনের বেলা ভয় করলেও অনেক লোকজন থাকে সব ঘরে ঘরে। তাদের কথাবার্তা চেঁচামেচিতে তবু কিছুটা সাহস পাওয়া যায়, কিন্তু রাতের সঙ্গে সঙ্গেই পুরানো সেই বাড়িটার চুন-বালি খসা দেওয়ালে দেওয়ালে এদিক ওদিকের কোণে কোণে চাপ বাধা ঝুপ্‌সী ঝুপ্‌সী অন্ধকার, মনে হয় যেন সব বিচিত্র অদ্ভুত ছায়া নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। পুরাতন জানালার পাল্লাগুলো হাওয়ায় বিশ্রী শব্দ তুলতে থাকে। বুকটার মধ্যে টিপ টিপ শুরু করে।

মা'র বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে সীতা।

একটি বারের জন্যও চোখ খুলতে সাহস হয় না।

আজ রাতে আবার সেই সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হওয়ায়, সেই বিশ্রী শব্দগুলো যেন আরো বিশ্রী মনে হয় সীতার।

মা-বাবা ঘরের মধ্যে দুজনাই ঘুমিয়ে, কেবল একা সীতার চোখেই ঘুম নেই।

হঠাৎ সীতার কানে এলো সেই বিশ্রী শব্দটা ছাপিয়ে একটা করুণ ভীত কান্নার শব্দ যেন, মিঁয়াও।

মিঁয়াও! ঘরের মধ্যে নয়, বাইরে। কিন্তু এই শীতের রাত্রে, ঝড়জলের মধ্যে ওর কি ভয়ডরও নেই!

আবার শোনা গেল, মিঁয়াও!

মুহূর্তে যেন সীতার ভয় কোথায় পালিয়ে যায়। কৌতূহলে ছেঁড়া লেপটার তলা থেকে মধ্য রাত্রে, গত এক মাসের মধ্যে আজই সর্বপ্রথম সীতা মাথা বের করে চোখ খুলে জুল্ জুল্ করে তাকালো।

ভাঙা হ্যারিকেনটায় এত কালি পড়েছে যে সেটা জ্বলছে কিনা বোঝাই যায় না।

ক্যাঁচ, ক্যাঁচ—মিঁয়াও!

এই প্রথম সীতা জুল্ জুল্ দৃষ্টিতে রাত্রে ঘরটার চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

আবার শোনা গেল, মিঁয়াও!

ক্যাঁচ, ক্যাঁচ—সেই বিশ্রী রোজ রাত্রের বুকের রক্ত হিম করা শব্দটা শোনা গেল আবার।

তারপরই থুপ্ করে একটা শব্দ।

চেয়ে চেয়ে দেখছে সীতা।

মিঁয়াও!

এবারে একেবারে ঘরের মধ্যেই শব্দটা।

এবারে দেখতে পায় সীতা, একটা ধূসর রঙের বেড়াল বাচ্চা।

মিঁয়াও!

দপ্ করে ঐ সময় ঘরের ঝুলপড়া হ্যারিকেনের শিখাটা তেলের অভাবেই বোধহয় নিভে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঘরটা ভরে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

চাপ চাপ অন্ধকার যেন সমস্ত দৃষ্টিকে মুহূর্তে গ্রাস করে নিল সীতার।

মিঁয়াও!

সবুজ দুটো গোল আলোর বল অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

মিঁয়াও!

আর ভয় করছে না সীতার এতটুকুও। অন্ধকারে সে চেয়েই থাকে।

পায়ের কাছে সীতার লেপটা ধরে যেন কিসে টানছে।

তারপর একসময় সীতা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম যখন ভাঙলো সীতার পরের দিন সকালে, মনে পড়লো গত রাত্রির কথা।

তারপরই মা'র কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ও-মা এ বেড়াল বাচ্চাটা কোথা থেকে এলো! সীতা, ও সীতা—সূর্য উঠে গিয়েছে যে, উঠবি নে—

উঠে বসতেই সীতার নজরে পড়লো, তার পায়ের কাছে লেপের উপর গুটিসুটি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে একটা বেড়াল বাচ্চা।

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে সীতা ঘুমন্ত বেড়াল বাচ্চাটার

দিকে।

সাদা আর মেটে রঙের গা-ভর্তি লোম। ধীরে ধীরে সীতা বেড়াল বাচ্চাটার গায়ে হাত রাখতেই, বাচ্চাটা চোখ মেলে তাকালো—মিঁয়াও!

সীতা বাচ্চাটা কোলে তুলে নিল।

কি নাম রাখা যায় বাচ্চাটার?

মীনু! মীনুই বেশ মিষ্টি নাম। আজ থেকে তোর নাম হলো মীনু, বুঝলি—সীতা বলে।

বেড়াল বাচ্চাটা কি বুঝলো সে-ই জানে। কেবল একবার ডাকলো—মিঁয়াও!

সেই থেকে মীনু সর্বদা সীতার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। তার সঙ্গে খাবে, তার সঙ্গেই শোবে। কোথায়ও যদি যায় তো মীনু বলে ডাকলেই ছুটে আসবে!

আর সেই রাত থেকেই সীতার আর রাত্রে এতটুকু ভয় করে না। রাতের সেই বিশ্রী ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা এখনো হয়। তবু সীতার এতটুকু ভয়ও করে না কিন্তু।

দুই

যে বিরাট ধনী ভদ্রলোকের পুরানো বাড়িটা সীতার বাবা ও তাদের গাঁয়ের অন্যান্যরা জোর করে দখল করেছিল, সেই ভদ্রলোক কিন্তু কিছুতেই ওদের থাকতে দেবেন না ঐ বাড়িতে।

প্রথমে ভাল মুখে অনুরোধ জানালেন ভদ্রলোক। তারপর চোখ রাঙানো, চেঁচামেচি, শেষটায় দাঙ্গা বাধবার জোগাড়।

কিন্তু সীতারাই বা যায় কোথায়! বাড়ি ঘর দোর সব তাদের গিয়েছে, একটা মাথা গোঁজবার মত অন্তত ঠাঁই তো তাদের চাই!

ভদ্রলোক সে-সব কথা শুনতে চান না। বাড়িটা ছেড়ে দিতেই হবে। জায়গা সমেত পুরানো বাড়িটা তিনি একজনকে নাকি বিক্রী করে দিয়েছেন। সেই ভদ্রলোক ঐ পুরানো বাড়িটা ভেঙে নতুন বাড়ি করবেন। অনেক টাকা তাঁর। নাম শোনা গেল মহেশ্বরী প্রসাদ।

শেষ পর্যন্ত পুলিস এলো, মামলা বেধে গেলো।

পাঁচ মাস ধরে মামলা চললো একদল বাস্তুহারার ধনকুবের মহেশ্বরী প্রসাদের সঙ্গে।

সেদিন রাত্রে সীতা মীনুকে বুকের কাছে জড়িয়ে শুয়ে আছে, শুনতে পেল তার বাবা মাকে বলছেন, এবার বোধহয় আর এ বাড়ি আমাদের না ছেড়ে দিয়ে উপায় নেই মনোরমা।

মা বললেন, তাহলে কোথায় আমরা যাবো?

রাস্তায় বা স্টেশনে—

কিন্তু একি অন্যায় জুলুম বলতো!

নিশ্চয়ই, এবং আমরা যেমন ওদের ব্যাপারটা অন্যায় জুলুম ভাবছি, ওরাও তেমনি আমাদের এ দাবীকে অন্যায় জুলুমই ভাবছে মনোরমা।

কবে যেতে হবে?

উৎখাত করবার ডিক্রী পেয়ে গিয়েছে আদালত থেকে। যে কোন দিন এখন এসে তাড়াতে পারে আমাদের।

তাহলে উপায়!

উপায় আর কি, ভগবান!—তবে ডিক্রীই পাক আর যাই করুক, এত সহজে আমরাও নড়ছি না।

সীতার বাবার অনুমানটা মিথ্যা হলো না। দিন দুই পরেই নতুন বাড়িওয়ালা মহেশ্বরী প্রসাদ লোকজন ও পুলিস নিয়ে ওদের সকলকে বাড়ি থেকে তাড়াবার জন্য এসে হাজির হলেন।

কিন্তু এতগুলো লোক কোথায় যাবে? ওরাই শুধায়।

সরকারের একজন কর্মচারী ছিল ওদের সঙ্গে। তিনি বললেন, টালার রিফিউজি ক্যাম্পে—

কিন্তু সকলে ঘর-সংসার গুছিয়ে বসেছে। কেউ যেতে রাজী নয়।

বাড়িওয়ালাও ছাড়তে রাজী নয়।

বিশ্রী একটা চেঁচামেচি গোলমাল শুরু হয়ে গেলো।

সীতা একপাশে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। মীনু তার পায়ের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ির নতুন ক্রেতা, মহেশ্বরী প্রসাদ, বিরাট ভুঁড়িটা দুলিয়ে দুলিয়ে বলছিলেন, যানেহি পড়েগা—হঠাৎ মীনু এক ফাঁকে গিয়ে মহেশ্বরী প্রসাদের পায়ে এক কামড় বসিয়ে দিতেই তিনি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে লাফিয়ে এক কাণ্ড করে বসলেন।

খুন, খুন করেছে রে হামাকে—মহেশ্বরী প্রসাদ চেঁচাতে লাগলেন।

বিরাট গালপাট্টাওয়ালা দারোয়ান লাঠি হাতে প্রভুর পাশেই দাঁড়িয়েছিল। মীনুকে কামড়ে ছুটে পালাতে দেখে সে চেঁচিয়ে ওঠে, সরকার, বিল্লী—

পাকড়ো, পাকড়ো—উসকো! সরকার চেঁচিয়ে উঠলেন।

দারোয়ান লাঠি হাতে মীনুর পিছনে পিছনে তাড়া করলো। নিচের তলায় এঘর থেকে ওঘর, সিঁড়ি, বারান্দায় দোতলা—মীনুও যেন মজা পেয়েছে, দারোয়ানকে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সারা বাড়িময়।

শেষ পর্যন্ত মীনুকে তাড়া করে হঠাৎ এক সময় দারোয়ান তার বিরাট বপু নিয়ে পা পিছলে সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে

এসে নিচে পড়েই, চেঁচিয়ে উঠলো, মর গিয়া—মীনু তখন ছুটে আবার মহেশ্বরী প্রসাদের দিকে যেতেই, তিনি একলাফে ছুটে বাইরে যেতে যেতে চেঁচাতে লাগলেন—আরে বিল্লী ফির মেরা পিছু পড়া—

ব্যাপারটা আকস্মিক এবং হাস্যকর।

সকলেই হো হো হি হি করে হাসতে শুরু করে দেয়।

এবং শেষ পর্যন্ত সেদিন বাড়ি দখল করার ব্যাপারটাই স্থগিত হয়ে যায়।

সীতার বাবা ও অন্য সকলে আরো সাতটা দিন সময় চেয়ে নেয়।

তবে এও কথা দিতে হয় সাতদিন পরে বাড়ি সকলকে ছেড়ে দিতে হবে।

সাতদিন পরে আবার মহেশ্বরী প্রসাদ দলবল নিয়ে এলেন। কারণ সীতার বাবা ও অন্য সকলে তাঁদের কথা রাখেননি।

আর দেখা গেল এবারে মহেশ্বরী প্রসাদের সঙ্গে একটা বিরাট অ্যাল্‌সেসিয়ান্ কুকুর। বাঘের মত চেহারা।

তবু আবার বচসা, আবার চেঁচামেচি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলকে বাড়ি ছেড়ে গুটি গুটি মোটঘাট নিয়ে বের হতেই হলো।

বাবার পিছনে সীতা।

তার কোলে মীনু।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিকে।

কারণ সকলের বের হতে হতে ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল।

সীতারাই শেষ দল। শেষ পরিবার।

মহেশ্বরী প্রসাদ এখনো যাননি। দরজার গোড়াতেই একটা টুল পেতে বসে আছেন।

সকলকে বের না করে দেওয়া পর্যন্ত বাড়ি থেকে তিনি নড়বেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন।

পাশেই দাঁড়িয়ে বাঘের মত কুকুরটা।

দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে যেতে সীতার কোলেই মীনু একবার ডেকে উঠলো, মিঁয়াও—

সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঘের মত কুকুরটা ডেকে উঠলো, ঘাউ—

অদ্ভুত একটা ভয়ের অনুভূতিতে সীতার বুকের ভিতরটা আবার অনেকদিন পরে যেন শিরশিরিয়ে উঠলো।

সে চোখ বুজলো ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে।

এবং তিন-চার পা চলার পর চোখ খুলে সীতা পিছন

বিরাট ভুঁড়িটা দুলিয়ে দুলিয়ে বলছিলেন

পানে তাকালো।

অন্ধকার বাড়িটা যেন একটা বিরাট বাদুড়ের মত ডানা গুটিয়ে বসে আছে।

আজ আর ওর কোন ঘরেই আলো জ্বলেনি।

মীনু আবার ডেকে উঠলো, মিঁয়াও—

তবু কিন্তু সীতার কেমন ভয় ভয় করে!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একেবারে বাবার পাশে পাশে সীতা চলতে থাকে।

পাশ দিয়ে ঐ সময় মহেশ্বরী প্রসাদের বিরাট স্টুডি কমাণ্ডার ঝক্‌ঝকে গাড়িটা পোঁ করে বের হয়ে গেল। এবং চকিতের জন্য সীতার চোখে পড়লো বিরাট সেই বাঘের মত কুকুরটা চলন্ত গাড়ির জানালাপথে মুখ বের করে রয়েছে। কিন্তু তখন আর ভয় করে না সীতার।

রাস্তার দু'ধারে বিজলী বাতির আলোয়, দিনের মতই যেন ঝকমক করছে। তাছাড়া রাস্তায় রাত হলেও কত মানুষ! চোখ মেলেই চলতে লাগলো সীতা সকলের পাশে পাশে।

ধোঁয়াটে মুখ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

তোমরা অনেক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়েছ, ভয়াবহ ভূতের গল্পও তোমাদের অনেক জানা আছে, কিন্তু এখানে আমি এমন একটি ঘটনার কথা বলব, যা একাধারে অলৌকিক, অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর আর ভূতুড়ে সবই। এবং তার উপরে এটি হল সম্পূর্ণ সত্য—এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই। এর সত্যতা প্রমাণের জন্যে কোন চেষ্টাই করতে হয়নি, সবার চোখের উপর ঘটেছে এ ঘটনা। যে জিনিষ দেখা যায় না, বা যা কেবল একজনই দেখে বা বলে, তা নিয়ে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু এ ঘটনাটি সবাই একসঙ্গে চাক্ষুষ দেখেছে বলে এটিকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি—মতান্তরের অবকাশই ঘটেনি। বৈজ্ঞানিকরাও হার মেনেছেন এ ঘটনার কাছে। আজও তাঁরা এর সঠিক হদিশ বার করতে পারেননি।

ঘটনাটি ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১০-১১ সালে জার্ম্মানির লাইপজিক সহরতলীর এক লোহার কারখানায়। গ্রামের সীমানা যেখানে প্রায় শেষ হয়েছে, সেখানে এক ছোট নদীর ধারে ছিল এই কারখানা। এখানে ঢালাইয়ের কাজ হত। লোহা গলিয়ে তা থেকে স্ক্রু, বল্টু, কেট্‌লি প্রভৃতি তৈরি হত। আশপাশের শত শত লোক কাজ করত এই কারখানায়। যে ঘরে লোহা গলানো হত সেই ঘরটি ছিল এই কারখানার মধ্যে মারাত্মক জায়গা। রাবণের চিতার মত দিনরাত সেখানে আগুন জ্বলত দাউ দাউ করে। সেই আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চাইলে চোখ ঝল্‌শে যেত। বিরাট কড়ার মধ্যে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটত গলন্ত ধাতু। তার রক্তাভায় সারা ঘরের রঙ লাল হয়ে থাকত। সে-চুল্লি কখনও নিবত না।

কারখানার সেই 'ফার্ণেস'-ঘরের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল লস্ ব্রুস্ নামে বুড়ো কারিগর। কাছেই এক গ্রামে তার বাড়ী, কিন্তু বুড়ো কখনও বাড়ী যেত না। এখানেই দিনরাত থাকতে হত তাকে। কারখানার মধ্যে গালাই-ঘরের কাছেই ছোট একটি ঘরে সে থাকত। বুড়োর বয়স প্রায় আশি বছর। কিন্তু এ বয়সেও ছিল যেমন অসুরের মত চেহারা, তেমনি গায়ের জোর। সেজন্যে কারখানার মালিকরা ঐ গালাই-ঘরের হেফাজতেই রেখে দিয়েছিল তাকে। এই ভয়াবহ জায়গার গুরুত্বও খুব বেশী বলে, যে কোন নতুন লোককে সেখানে রাখা যেত না। তাছাড়া কারখানার গোড়া থেকেই সে এখানে কাজ করছিল। এর উপর তার আসক্তি ছিল অসাধারণ। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর দুর্জ্জয় সাহস নিয়ে দিনের পর দিন আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলত বুড়ো। আগুনের তাপে তার সারা গায়ের রঙ্ ঝল্‌শে খয়েরের মত হয়ে গিয়েছিল।

কারখানার মালিকরা তাকে মাসিক ভাতা দিয়ে অবসর গ্রহণের জন্য বহুবার বলেছিল, কিন্তু লস্ তাতে রাজী হয়নি। সে বলত, এ কাজ না করে বসে থাকলে সে মরে যাবে। অগ্নিদেব তার বন্ধু, আর এই আগুনই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সত্যই সময় সময় আগুনের সঙ্গে যেন খেলা করত বুড়ো! বিড়-বিড় করে কি-সব বকত, হাসত, ভেংচি কাটত 'ফার্ণেস'টার দিকে চেয়ে। সবাই বলত, 'এই রে, বুড়োর এবার ভীমরতি ধরেছে! মরবে!'

হলও তাই। যে রক্ষক সেই একদিন ভক্ষক হল! নেশার ঘোরে অসাবধানতাবশতঃ বুড়ো একদিন লোহা গালাইয়ের জ্বলন্ত ধাতুপাত্রের মধ্যে পড়ে নিমেষে কর্পূরের মত উবে গেল। ছ্যাঁক্ করে একটা শব্দ হল কেবল। আর ফার্ণেসের উপর থেকে খানিকটা ধোঁয়া চিম্‌নীর ভেতর দিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। হাঁ হাঁ করে উঠল তার ঘরের অন্যান্য লোকেরা। সারা কারখানায় খবর ছড়িয়ে পড়ল চক্ষের নিমেষে। খবর পেয়ে মালিক নিজেই ছুটে এলো গালাই-ঘরে, কিন্তু তখন সেখানে লসের আর কোন বাষ্পও নেই!

এতদিনের পুরোনো কর্ম্মচারী বুড়ো লসের এই অপঘাত-মৃত্যুতে সবাই মর্ম্মাহত হল। কারখানায় ছুটির বাঁশি বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মালিক তার সম্মানে কারখানা তখনি বন্ধ করে দিলে। চারিদিকে নানা গল্প চলতে লাগল লসের সম্বন্ধে। ছুটির পর পথ চলতে চলতে কারিগরদের মধ্যে একজন বললে, 'মৃত্যুই ওর ভাল হয়েছে—যার সঙ্গে ওর সারাজীবনের সম্বন্ধ সেই ফার্ণেসের মধ্যেই ও মিশে গেছে!'

একজন বললে, 'এই বেশ, এ বয়সে পেটের অসুখে

মাংস পুড়ে জড়িয়ে গেলে যেমন হয়, তেমনি বীভৎস ভয়াবহ।

ভুগে মরার চেয়ে এ মৃত্যু অনেক ভালো——হিরোয়িক্ ডেথ!'

দু'তিন দিন ধরে এমনি সব বলাবলি চলতে লাগল পুরোনো কারিগরদের মধ্যে। বুড়ো লসের জয়গানে সবাই পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

আসলে বুড়ো একটু-আধটু নেশা-ভাঙ করলেও মানুষ হিসাবে ছিল খাঁটি। বৌ মরে যাবার পর বুড়ো তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়নি। এই কারখানায় ঢুকে কারখানাকেই ঘরবাড়ি করে নিয়েছিল। বাড়িতে যদিও তার এক বোম্বেটে ধরণের ছেলে ছিল,——তার সঙ্গে বুড়োর এক তিল বনত না। অবসর-সময় কারখানার ছোক্‌রাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেই বুড়ো কাটিয়ে দিত, তাদের অনেককেই সে ভালবাসত নিজের ছেলের মত। কিছু কিছু নিজের মাইনে থেকে লুকিয়ে দান-ধ্যানও সে করত। সবসুদ্ধ এখানে লস্ কাজ করেছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। এইসব কারণে কারখানায় শুধু তার সহকর্ম্মীদের নয়, মালিকের পর্য্যন্ত তার মৃত্যুতে দুঃখের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

ক'দিন এইভাবে কাটবার পর শোকের বেগ একটু কমলে কারখানার কারিগররা সকলে মিলে তার মৃত-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য কারখানার ভিতরকার খোলা ময়দানে জড় হলো। এ-সব সভায় সাধারণতঃ যেমন সব হয়, তেমনি এখানেও অনেকে লসের গুণাবলী নিয়ে——কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি নিয়ে বক্তৃতা করলে। ক'জনের বক্তৃতা হয়ে যাবার পর কারখানার মালিক যখন বক্তৃতা করতে উঠে তার স্মৃতিরক্ষার জন্যে বেশ কিছু টাকা দিয়ে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি তৈরি করাবার কথা ঘোষণা করলে, তখন ঘটল এক বিপদ। উপস্থিত জনতার ভিতর থেকে লসের ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করে বললে, 'আমার বাবার কোন ছবি বা ফটোগ্রাফ্ নেই, কাজেই প্রস্তরমূর্ত্তি করায় অসুবিধা আছে। এই টাকাটা এভাবে খরচ না করে বরং আমাদের দরিদ্র সংসারে দিলে খুব উপকার করা হবে!'

এ কথায় আশপাশের অনেকেই আপত্তি তুললো, কারণ তারা ছেলের চরিত্র জানত এবং বাপের সঙ্গে ছেলের যে কোন সম্পর্ক ছিল না, তাও অজানা ছিল না তাদের। কাজেই তার হাতে একেবারে এ টাকা তুলে দিতে অনেকে আপত্তি জানালে। কিন্তু তার মধ্যেই অনেকে আবার সায়

দিলে ছেলের কথায়। সম্ভবতঃ লসের ছেলের কাছ থেকে ঐ টাকার কিছু অংশ পাবে বলে তারা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

এই নিয়ে সভায় বেশ বাদানুবাদ এবং গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। একপক্ষ বললে, 'লসের চেহারা আমরা কল্পনা থেকে আঁকিয়ে তা থেকে তার 'ষ্ট্যাচু' করব। সেই 'ষ্ট্যাচু' এই কারখানার মধ্যে থাকবে, এবং প্রতি বছর তার মৃত্যু-দিবসে সকলে আমরা একসঙ্গে সমবেত হব এখানে।'

অপর পক্ষ বললে, 'যে ক্ষেত্রে ফটো নেই, সে ক্ষেত্রে কল্পনা থেকে যা-তা একটা কিছু করা ঠিক হবে না, তার চেয়ে টাকাটা তার গরীব ছেলেকে দিয়ে সাহায্য করাই ভাল।'

দু'দলের মধ্যে এই বাদানুবাদ যখন বেশ তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তখন এক অলৌকিক অভূতপূর্ব ঘটনায় সকলেই বিস্ময়াভিভূত হল। সকলের দৃষ্টি গেল আকাশের দিকে। নির্ম্মল নীলাম্বরের বুকের উপর দিয়ে কারখানার চিম্‌নী থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে যে ধোঁয়া উঠছিল, তারই মধ্যে ভেসে উঠেছে বুড়ো লসের মুখ! হাওয়ার বেগে ধোঁয়ার রাশ যেমন ভেসে ভেসে যাচ্ছে, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, তেমনি মুখখানাও এক একবার ভেঙে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে হাওয়ার সঙ্গে, আবার জোড়া লাগছে এসে! সে মুখ ঠিক জীবন্ত লসের মুখের মত না হলেও, তা থেকে চেনা যায় লস্‌কে। মাংস পুড়ে জড়িয়ে গেলে যেমন হয়, মুখের চেহারা তেমনি পোড়া বীভৎস ভয়াবহ!

সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে আকাশের দিকে—সেই ধূম্রকুণ্ডলীর মধ্যে ধোঁয়াটে মুখের দিকে!

কারখানার মালিক ওয়াগ্‌নার বললে, 'এখনি ঐ মুখের একটা ফটো তুলে নেওয়া হোক, ঐ থেকেই মর্ম্মরমূর্ত্তি তৈরি হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে তাই করা হল। আকাশে আলো ছিল তখনও, ছবি তুলতে অসুবিধা হল না। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে গ্রামের আশপাশ থেকে লোক এসে হাজির হল সেখানে। সকলেই আকাশের গায়ে ঐ অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ভৌতিক দৃশ্য দেখে একেবারে থ! তারপর রাত্রের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বুড়ো লসের ঐ বিকৃত মুখ!

পূর্ব্বপৃষ্ঠার এই ছবিটি সেই ফটো থেকেই ওদেশের এক আর্টিষ্টের আঁকা। "Unknown Worlds" নামক মাসিক-পত্রিকায় এটি বেরিয়েছিল।

এরপর প্রতি বছরই তার স্মৃতি-বার্ষিকীর দিনে ঐ মুখ আজও নাকি ভেসে ওঠে আকাশের বুকে ঐ চিম্‌নীর ধোঁয়ার মধ্যে! সেদিন হাজার হাজার লোক দূর-দূরান্ত থেকে দেখতে আসে এই দৃশ্য—আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে তারা! তারপর হঠাৎ একসময় সকলকে আশ্চর্য্য, ভীত, সচকিত করে ভেসে ওঠে লসের মুখ—সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিঃসাড়ে চেয়ে থাকে সে মুখের দিকে! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না সেখানে।

জাফর মিঞার দর্পচূর্ণ

নবনীতা দেব

আরব দেশের জাফর মিঞার মাথায় বিশাল টাক
জাফ্‌রাণীরং পাগ্‌ড়ী নিয়ে বড্ডই তার জাঁক।
টাক-ঢাকা সেই পাগ্‌ড়ী জবর, রোদ লেগে ঝকঝকে
দূর থেকে তাই চিনতে পারে আশপাশে সব লোকে।
জাফ্‌রাণীরং পাগ্‌ড়ী মাথায় জাফর মিঞা যায়
পাগ্‌ড়ীর গৌরবে জাফর বুক ফুলে বেড়ায়॥

একদিন এক সকালবেলা, পাগ্‌ড়ী মাথায় দিয়ে
জাফর যাবে ভিন্‌গাঁয়ে, তার বোনের মেয়ের বিয়ে।
সহর থেকে বেরিয়ে এসে মেঠোপথের ধারে
জাফর চলে অন্যমনে, পুঁটলি নিয়ে ঘাড়ে।
এমন সময় বাজপাখী এক হঠাৎ এলো উড়ে—
ছোঁ মেরে সেই পাগ্‌ড়ী তুলে, ভাগলো অনেক দূরে।
ঘাবড়ে গিয়ে জাফর মিঞা শূন্যে দুহাত তোলে
জাফ্‌রাণীরং পাগ্‌ড়ী নিয়ে পক্ষী উড়ে চলে।
দর্প গেল জাফর মিঞার, গর্বের এই ফল—
পথের মাঝে দাঁড়িয়ে অবাক্—চক্ষু ছলোছল॥

মেজদার জরিমানা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

যাঃ, পাঁচ সিকের ফাউন্টেন পেন আর ক'দিন কাজ দেবে? ঝপ্‌ঝপ্ করে কালি পড়ছে দেখ না। ০, এঃ, ট্রান্স্লেসনের খাতাখানা কালিতে কালিতে কালিগঙ্গা হয়ে গেল একেবারে। এ-খাতা বিভূতি মাস্টারকে দেখানোই চলবে না।

পাতাখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন পাতায় হাত দিল দেবল।

কিন্তু লিখতে গিয়েই সে থম্‌কে গেল! এখুনি ত' এ-পাতায়ও কালিবৃষ্টি সুরু হবে। কলমটা পাল্‌টাতে পারলে হ'ত।

ঐ ত' মেজদার জামার পকেটে কলম রয়েছে!

একবার মনে হ'ল—দরকার নেই। মেজদা বড়দার মত নয়, কথায় কথায় বেধড়ক পিটোয়। তার আন্‌কোরা নতুন পার্কার দেবলের হাতে পড়ে কাগের-ছা বগের-ছা আঁকতে বাধ্য হয়েছে শুনলে দেবলকে আর সে আস্ত রাখবে না। না, না, দরকার নেই ওতে।

কিন্তু নিষিদ্ধ ফলের আকর্ষণ চিরদিনই বেশী। মেজদা চটবে—এটা জানা আছে বলেই তার কলম নেবার জন্যে দেবলের ঝোঁকটা অদম্য হয়ে উঠল। জানলে চটবে, চটলে মারবে—এটা নিশ্চিত। কিন্তু না জানলে? এই ত' অল্প গোটাকতক ট্রান্স্লেসন! মেজদা বেড়িয়ে ফেরার আগেই হয়ে যাবে এখন। দিদিটাও কাছেপিঠে নেই; এগ্‌জামিনের পড়ার নাম করে শোবার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করেছে। নিজের পড়া যে সে কত করে, তা ত' আর দেবলের অজানা নেই! তার বালিশের তলায়, লেপের ভাঁজে বিলিতি নভেল গিজগিজ করছে—যার দরকার থাকে, দেখে আসুক। ও যেমন উঠতে বসতে দেবলের নামে নালিশ করে। দেবল ত' ওর নামে তা করে না। করলে ও মজা বুঝত!

দিদির ওপর রাগ থাকলেও দিদিকে দেবল ভালবাসে, ভীষণ রকম ভালবাসে। যে-দিদি বি. এ. পাশ করবে দু'দিন বাদে—তাকে ষষ্ঠ মানের পড়ুয়া দেবল ভাল না বেসে পারবে কেন? স্কুলে গিয়ে সহপাঠীদের কাছে গৌরব করার ত' ঐ একটিই জিনিস দেবলের আছে! তার দিদির বিদ্যে!

দিদির কথা ভাবতে ভাবতে আন্‌মনা দেবল যে কী করে বসেছে এর ভিতর, তা সে নিজেই টের পায়নি। টের পেল—নিজের হাতকে খাতার পাতায় দ্রুত চলতে দেখে। হাত শুধু নিজেই চলছে না—মেজদার পার্কার পেনকে ঘোড়দৌড়ের বেগে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সত্যি ভারি চমৎকার এ কলমটা। দুনিয়ার যত মজা, মেজদাই লুটে নিলে! লেখাপড়া মাঝপথেই ছেড়ে দিয়ে আচমকা দিব্যি চাকরি বাগিয়ে ফেলেছে একটা; হাতে হাতঘড়ি, বুকপকেটে কলম, পাশ পকেটে সিগারেট। মানিব্যাগও থাকে—তবে সেটা ভিতরের পকেটে; ওটা এর আগে কখনো খুলে দেখেনি দেবল; আজ একবার তাও দেখে নিল।

হ্যাঁঃ, লেখাপড়া বেশী কিছু নয়; অর্থাৎ ব্যাটাছেলের

মানিব্যাগটা একবার দেখে নিল

পক্ষে। মেয়েরা পড়ুক; না পড়ে তারা করবে কী? কিন্তু ব্যাটাছেলে—আরে ছিঃ—বেশীদিন ইস্কুল কলেজে থাকলে ভোঁতা মেরে যায়। যেমন গিয়েছে দেবলের বড়দা। পড়ছে ত' পড়ছেই! হেন পরীক্ষা নেই, যা সে পাস করেনি। ছেলে পড়িয়ে কিছু রোজগার করে হয়ত, তাইতে নিজের হাতখরচটা চালায়। পকেটে ইঁদুর মুর্‌ছো যাচ্ছে, দু'চার পয়সার বেশী কদাচ পাবে না। হ্যাঁঃ—ও-পকেটের অবস্থা দেবল ভালই জানে; কারণ রোজই সে দু'একবার ওটাকে হাত্‌ড়ায়। ওদিক দিয়ে মেজদার চাইতে বড়দাকে ভালই বলতে হবে। দেবল পয়সা নিয়েছে জানলেও কক্ষণো কিছু বলে না—

আর মেজদা? সর্বনাশ! দেবল তার পকেটে হাত যদি দেয় কখনো, আর মেজদা সে কথা জানতে যদি পারে, কী যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটবে, ভাবতেই পারে না দেবল।

"ওরে বাঁদর! মেজদার কলম নিয়ে এ কী করেছিস্ তুই?"

এমনি বিভীষিকার আভাস ফুটে বেরুলো সুরমার কণ্ঠ থেকে—মনে হল সে যেন হঠাৎ বেহ্মদত্যি দেখেছে চোখের সামনে।

মুহূর্তের ভিতর দেবল পাথর বনে গেল একেবারে। এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিলিতি নভেলের নেশা কাটিয়ে তার দিদি যে হঠাৎ উঠে আসতে পারল, এ ত' তারই বরাতের ফের শুধু!

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে দিদির হাতে-পারে ধরতে লাগল দেবল। "আর কক্ষণো করব না দিদি! আমার কলমটা দিয়ে এক্কেবারেই লেখা যাচ্ছিল না দিদি! খাতা নোংরা হলে বিভূতি মাস্টার এমনি মারে দিদি!"

সুরমা স্পীক্-টি নট্। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—যেন বিদ্রোহী সেনাপতির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে বিজয়িনী সম্রাজ্ঞী থিয়েটারের স্টেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

কলম মেজদার পকেটে রেখে, গালে হাত দিয়ে বসে রইল দেবল। আজ তার দুঃখে শেয়াল-কুকুর কেঁদে যাবে। মেজদা! রাশিয়ায় এখন আর "জার" নেই; তাদের মেজাজটুকু তারা লুকিয়ে রেখে গেছে দেবলের মেজদার মগজে! আই-এ ফেল করে চব্বিশ বছর বয়সেই একশো ত্রিশ টাকা মাইনে টানছে যে মহাপুরুষ, তার অন্তরে দয়া-মায়া থাকবার কথা নয়। আজ দেবলের একটা ফাঁড়া আছে নিশ্চয়! বাঁচে কি মরে—ঠিক নেই!

রাতটা কিন্তু ভালোয়-ভালোয় কেটে গেল। সুরমার একপাল বান্ধবী এসে পড়ল দমকা হাওয়ার মতো। তারা দল বেঁধে সিনেমায় যাচ্ছে। সুরমাও গেল; ফিরল প্রায় রাতদুপুরে। মেজদা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাতটা কাটল। কিন্তু সকালটা? ভোর ছ'টা থেকে বেলা ন'টা পর্যন্ত মেজদা ত' বাড়ীতেই থাকবে! এর ভিতর কি আর দিদি অপরাধী দেবলকে কাঠগড়ায় তুলবার চেষ্টা করবে না একবার?

সুরমা মুখ হাত ধুয়ে পড়ার ঘরে আসতেই—

অবাক কাণ্ড! মেঝেয় বসে দেবল একরাশ ভাজা চিনেবাদামের খোসা ছাড়াচ্ছে!

চায়ের সঙ্গে চিনেবাদাম খুব ভালবাসে সুরমা। খু-উ-ব! কিন্তু দেবল হঠাৎ এই সাত-সকালে ভাজা চিনেবাদাম পেল কোথায়? পাবার এত গরজই বা কিসের জন্যে?

ব্যাপারটা বুঝে ফেলল সুরমা। নভেল পড়ে পড়ে মাথাটা তার খুবই সাফ হয়েছে বলতে হবে। দেবলের অতিভক্তির কারণটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। একটু হাসির ঝিলিক বুঝি দেখা গেল তার ঠোঁটের কোণে। কিন্তু সে মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য। আবার গম্ভীর হয়ে সে চেয়ারে বসে হুকুম করল—"যা, চা-টা নিয়ে আয় তাহলে!"

সুরমা চা খেল, বেশ করে মনের আনন্দে ভাজা বাদাম চিবোলো একটি একটি করে। অনেকক্ষণ ধরে চলল এই সব। অনেকক্ষণ ধরেই চুপ করে মেঝের উপর বসে রইল দেবল। কিন্তু—দেখ না বরাতের ফের!—'দিদি, কথাটা যেন মেজদাকে বলে দিও না'—এ-মিনতিটুকু জিভের ডগা দিয়ে কিছুতেই বার করতে পারল না দেবল। এমন-কি, করুণ চোখে দিদির দিকে দুই-একবার তাকিয়ে মৌন আবেদনের ভিতর দিয়ে তার যে করুণা জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করবে, তাও সে পেরে উঠল না। মাথাটি নীচু করে ঠায় সে বসে রইল মেঝের উপর দিদির ঠিক পায়ের গোড়াতেই।

আর দিদি? দেবল হয়ত লজ্জায় কিছু বলতে পারছে না মুখে, কিন্তু বি. এ. পড়ুয়া দিদি—নভেল পড়ে পড়ে মাথা যার অতো সাফ হয়েছে—সে কি আর বেচারা ভাইয়ের মনের কথা একটুও আন্দাজ করতে পারছে না? তার কি মনে হচ্ছে না যে, ছেলেটাকে একটু ভরসা দিয়ে দুই-একটা কথা তার বলা উচিত? ঘুষ পেলে ভগবান পর্যন্ত সদয় হন—দিদি কি ভগবানের চাইতেও নিষ্ঠুর?

কতক্ষণ সে এইভাবে মেঝেতে বসে থাকত—বলা যায় না মোটেই! কিন্তু উঠতে তাকে হল; হঠাৎ উঠতে

হল। বড়দা ডাকছেন—"দেবু! ও ভাই দেবু!"

বড়দা ডাকছেন? বেকার নিঃসম্বল হলেও বড়দাকে সে একটু মানে। ভয়ে নয়, ভক্তিতে। কারণ, তাঁর পকেটে দু'চার পয়সা যা-ই থাকুক, না বলে নিলে তিনি কখনো দেবলকে বকেন না। তিনি ডাকছেন যখন—

উঠে এল দেবল। "কী বড়দা?"

একটু কিন্তু-ভাবে বড়দা বললেন—"পকেটে ছ'টা পয়সা ছিল, সবই কি খরচ করে ফেলেছিস? একটাও যদি থাকে, ঐ অন্ধকে দে ভাই! আমার পকেটে আর কিছু নেই, আজ যদি ছেলে-পড়ানোর টাকাটা না পাই, মুস্কিলই হবে।"

বড়দার কথার শেষ দিকটা কানে গেল না অভাগা দেবলের। জানালার দিকে একবার তাকাল; বাইরে একটা অন্ধ ভিখারীর হাত ধরে ছোট্ট একটা মেয়ে সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে বটে!

কিন্তু—"একটাও যদি থাকে"—এ-কথাটুকু দেবল সত্যিই শুনেছে। যে-বড়দার পয়সা নিলে কোনদিন কোন কথা ওঠে না, সেই বড়দা একান্ত নিরুপায় হয়ে ছয় পয়সার ভিতর একটি পয়সা ফেরত চেয়েছেন, এটা মাথায় ঢুকেছে দেবলের। বেচারী বড়দা! কাল রাত্রে পকেটে ছয় পয়সা রেখে তিনি ঘুমোতে গিয়েছিলেন; সেই পয়সা কয়টির ভরসাতেই ভিখারীর "অন্ধ-নাচারকে একটি পয়সা দে' বাবা"—এই কাকুতি শুনে হেঁকে বলে উঠেছেন—"দাঁড়াও বাবা, দিচ্ছি!"

দেবল মনে মনে ডাকছে—"মা ধরণি! দ্বিধা হও! আমার এ-লজ্জা লুকোনোর ঠাঁই নেই আর!"—হায় রে বিড়ম্বনা! বড়দার পকেটের সেই ছয় পয়সাই যে দেবলের হাত দিয়ে চীনে বাদামে রূপান্তরিত হয়ে রাক্ষসী সুরমার উদরে ঢুকল এতক্ষণ ধরে!

এঃ—এর চেয়ে মেজদার হাতে গো-বেড়েন হওয়াও যে ভাল ছিল তার! বড়দা অন্ধকে ভিক্ষে দেবার জন্য ডেকে এখন যদি বলতে বাধ্য হন—'নেই বাবা, অন্য জায়গায় দেখ'—তাহ'লে—

ওঃ! তার চাইতে দেবলের এক্ষুণি মরে যাওয়া ভাল।

বড়দা করুণ হাসি হাসলেন—"নেই, বুঝেছি! কিন্তু বেচারীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। দেখ্ ভাই, মায়ের কাছে যদি একটা পয়সা পাস!"

মা?—এত দুঃখেও হাসি পেল দেবলের। মা যে এ-বাড়ীতে কেউ নয়, তাঁর হাতে যে একটি আধলাও কখনো থাকে না, তা জেনেশুনেও বড়দা যে মায়ের কাছে পয়সা চাওয়ার কথা বলে বসেছেন—এর অর্থ—

দেবল আর ভাবতে পারে না, ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বড়দার মুখ কিন্তু রক্ষে করেছে দেবল। একটা এক-আনি এনে হাতে দিয়েছে অন্ধ ভিখারীর। বড়দা খুশী মনে জামা চড়িয়ে ছেলে পড়াতে চলে গিয়েছেন; কোথায় এক-আনি পেল দেবল, তা আর জিজ্ঞাসা করবার কথা মনে হয়নি তাঁর।

ভিখারী চলে গেল, বড়দাও বেরিয়ে গেলেন, দেবল বসে বসে দুর্গা নাম জপ করতে থাকল। ইস্কুলে যাবার আগেই একটা প্রলয়কাণ্ড হবে হয়ত। কারণ, দেবল স্কুলে যাবে দশটায়, মেজদা তার এক ঘণ্টা আগে বেরুবেন অফিসে। আর, অফিস বেরুবার সময় জামার ভিতর-পকেট থেকে ব্যাগ বার করে পয়সাকড়ি গুণবেন তিনি। রোজই তা গোনেন মেজদা।

অন্যদিন মেজদা বেরিয়ে যাবার পরে সে স্নান করতে যায়; আজ গেল মেজদা স্নানের ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে। অন্যদিন স্নান করে আসবার পরও তার খেতে বসবার চাড় থাকে না। "ওরে দেবু, ইস্কুলের বেলা বয়ে গেল, তুই খেতে বসবি কখন!"—বলে মা অন্ততঃ বিশবার চীৎকার করবার পর তবে সে খেতে আসে। আজ কিন্তু মেজদা খেয়ে উদ্গার ছাড়তে ছাড়তে খাবার ঘরের এক দরজা দিয়ে বেরুলেন, আর অন্য দরজা দিয়ে চট্ করে ঘরে ঢুকে নিজেই আসন পেতে নিয়ে সে চুপি চুপি বলল—"শীগ্গির ভাত দাও মা, আজ আধ ঘণ্টা আগে ইস্কুল বসবে।"

কিন্তু হায়! এত কৌশল, এত কারসাজি কিছুতেই কিছু হল না। সবে মাছের ঝোল ঢেলে নিয়েছে থালায়, এমন সময় একটা হুংকার শোনা গেল ওপর থেকে।

"দেবা!"

যারা এ-হুংকারের কারণ জানে না, তারা ত' চমকালই, সবকিছু জেনে-শুনে তৈরী থাকা সত্ত্বেও দেবু এমন চমকে উঠল যে, হাতের আলুর টুকরো হাত ফসকে ছুটে গিয়ে পড়ল হেঁসেলের কোণে মায়ের পায়ের কাছে।

উপরে তখন উত্তেজিত দুটো কণ্ঠের আওয়াজ। মেজদার, সুরমার! চীনেবাদামের গুণে একটুখানি পোষ মেনেছিল গোখরো সাপ, এখন মেজদার ক্রোধের ধুনোর গন্ধ পেয়ে মা মনসা একেবারে কুলো-পানা চক্কোর তুললেন। "শুধু চারটে পয়সা কী বলছ মেজ-দা! ও ছেলে কতবড় পকেটমার হয়েছে, তা ত' জান না! কাল তোমার নতুন পার্কার

পেন নিয়ে হিজিবিজি লেখা হচ্ছিল বাবুর!"

আর একটা আওয়াজ! এটা হুংকার নয়, চাপা আওয়াজ একটা! শব্দের ভিতর দিয়ে ক্রোধটা বেফায়দা অপচয় হয়ে যায়—এটা মেজদার মতলব নয়। মনের আবেগটা মনে মজুদ রেখে তিনি দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে নীচে নামলেন অপরাধীর পিঠে দুম্‌দাম্‌ কিল বসাবার জন্য।

"ওরে! ওরে! ও যে খেতে বসেছে!"—বলতে বলতে মা হেঁসেল থেকে লাফিয়ে উঠলেন বাচ্ছা ছেলেটাকে আগ্‌লাবার জন্য।

"তোমার আস্কারাতেই রাস্কেলটা—"

আর কথা নয়; মেজদার এক লাথি পিঠের উপর পড়তেই ভাতের থালার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল দেবল! মা? তিনি হাহাকার করে লুটিয়ে পড়লেন দেবলের পাশে।

"এঃ—রাগলে তোমার আবার জ্ঞান থাকে না মেজদা"—চিবিয়ে চিবিয়ে এই কথা বলতে বলতে সুরমা বাঁ হাতে আঁচল সামলাতে সামলাতে গুটি গুটি এগিয়ে এল রান্নাঘরের ভিতরে। এ-সময়ে তার কিছু একটা করা উচিত—এরকম একটা সন্দেহ তার নভেল-পড়া মগজের কোণে কোণে উঁকি দিচ্ছিল বটে, কিন্তু সে-একটা যে কী, তার ইঙ্গিত সে তার পড়ে শেষ করা এক হাজার একখানা উপন্যাসের কোনটার ভিতরেই দেখতে পায়নি এতকাল।

"নাঃ, বেশী ত' লাগেনি। ইস্কুলে যাব না কেন?"—বলে মায়ের কোল থেকে উঠে বসল দেবল। মায়ের পায়ে—কী জানি কী মনে করে টিপ করে প্রণাম করল একবার।

উপরে উঠে একটা জামা পরল দেবল; তার পরই নামল আবার।

"ও কি বইখাতা নিলি নি?"—মা জিজ্ঞাসা করলেন সংশয়ের সুরে।

"কী জানো মা, আজ ত' ইস্কুলে পড়া হবে না! একটা মিটিং আছে ছেলেদের। তোমায় আগেই বলিনি যে আজ আধ ঘণ্টা আগে ইস্কুলে যেতে হবে!"

ছেলেদের আজকাল মিটিং হয় মাঝে মাঝে। এটা শোনা আছে মায়ের। তিনি আর কিছু বললেন না—"মিটিং হয়ে গেলেই বাড়ী আসবি বাবা!"

সুরমা নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। দু'আনা পয়সা দেবলের দিকে এগিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে বলল—"নে, চকোলেট খাস!"

দেবল হঠাৎ হেসে ফেলল—"ফিরে এসে খাব'খন দিদি!"

চলে গেল দেবল।

বেলা চারটে বাজল, পাঁচটা বাজল, ছ'টা বাজল, সাতটা, দশটা, বারোটা—নাঃ, দেবল ফিরল না।

মেজদা আফিস থেকে এসে পড়ল ছ'টা নাগাদ। সাতটায় সে ইস্কুলে গেল খবর নিতে। মিটিং? রামঃ! দারোয়ান বললে—"আজ ছেলেদের কোন মিটিং ছিল না।"

মেজদা বাড়ী ফিরে এসে তম্বি করল অনেক; প্রথমতঃ মা'কে লক্ষ্য করে, তারপর হাওয়াকে উদ্দেশ্য করে, তার বক্তব্য হল এই যে—ছোট ছেলেকে অন্যায়ের জন্য শাসন করলেই সে যদি হাওয়া হয়ে যায়, তবে ভদ্রলোকে ঘরসংসার করবে কেমন করে? দেখ দেখি গেরো! সারাদিন আফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এখন আবার—

ন'টা নাগাদ ভবতারণবাবু বাড়ী ফিরলেন। তিনি সব শুনে গুম্‌ হয়ে গেলেন একেবারে। খাবার আসে না দেখে চটে উঠে বললেন—"ছেলে পালিয়েছে ত' হয়েছে কী? আমার যে এদিকে প্রাণপাখী খাঁচা ছেড়ে পালাতে চাইছে! লুচি কি ভাজোনি?"

সত্যই লুচি ভাজা হয়নি। ত্রিশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে ভবতারণ এমন অনিয়মের ভিতর পড়েননি কখনো। তিনি তারস্বরে ঘোষণা করলেন—"কালই পেন্সনের দরখাস্ত দিয়ে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাব। যার যা খুশী, তাই করুক!"

বড়দা এলেন রাত প্রায় দশটায়। এসেই উৎফুল্ল হয়ে বললেন—"প্রোফেসারিটা নিয়েই এলাম বাবা! ওরা অনেক দিন থেকেই বলছিল; নিতাম না; কিন্তু একটা পয়সার অভাবে ভিখারী ফিরে যাচ্ছিল আজ; পাগলা দেবু কোথা থেকে একটা আনি এনে দিয়ে আমার মুখরক্ষা করে।"

কী জানি মেজদার কী হল—ছুটে এসে বড়দার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল একেবারে। হাপুস কান্না বেচারীর—কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বেরোয় না আর।

অবশেষে এক সময় সব কথাই শুনলেন বড়দা। গায়ের জামা না খুলেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন আবার। মেজদাও সঙ্গ নিলেন তাঁর।

তারপর দুই ভাই—এ থানা, ও থানা, এ হাসপাতাল, ও হাসপাতাল।

নাঃ—

অবশেষে ভোরবেলায় আধমরা হয়ে যখন বাড়ী ফিরে এসেছে দু'ভাই; বাড়ীর কড়া নড়ে উঠল। মাসতুতো ভাই

শামু এসে খবর দিচ্ছে—কাল সন্ধ্যে নাগাদ—উস্কো-খুস্কো ছন্নছাড়ার মতো তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছিল দেবু—সেই দমদমে।

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—"কই? কই সে? তাকে নিয়ে আসিসনি বুঝি! দেখ—ছেলেটার বুদ্ধি দেখ!"

লাঞ্ছনা পেয়ে শামু খেঁকিয়ে ওঠে। "নিয়ে আসব কেমন করে শুনি? ভোরে উঠে তাদের আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে নাকি?"

তাদের? কাদের?

ক্রমশঃ বোঝা গেল। রাতটা কাটিয়ে দেবু আবার পালিয়েছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে শামুর ছোট ভাই রবিকে। দুইজনে চিঠি লিখে রেখে গেছে—"আমরা আর নির্যাতন সইতে পারি নে। সন্নিসী হয়ে যাচ্ছি।"

শামুর মায়ের গেরুয়া রঙের শাড়ীখানার পাড় ছিঁড়ে, ফেলে গেছে ঘরের ভিতর। দু'খানা কৌপীন হবে আর কি!

বড়দা মেজদার ট্যাক্সি যখন যশোর রোডে ওদের ধরে ফেললো—তখন ত' ওরা ফকির-সন্ন্যাসী। পরনে গেরুয়া, গায়ে একজনের সাদা জামা, একজনের নীল।

বড়দা না থাকলে মেজদা দেবুকে ফেরাতে পারত কি না সন্দেহ। তার মুখের দিকে তাকাতেই চায় না দেবু। অবশেষে মেজদা পকেট থেকে পার্কার পেনটা খুলে গুঁজে দিল হাতে—

"আমার এই জরিমানা মঞ্জুর কর ভাই; এটা তোর হল।"

বড়দা হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন দেবুর।—"জানিস দেবু, আমি আড়াই-শো টাকার একটা চাকরি নিয়েছি। দিদিকে যত ইচ্ছে চীনেবাদাম খাওয়াস এবার থেকে; আর ভিখিরীদের আনি দুয়ানি টাকা পর্যন্ত যখন যা-খুশী ভিক্ষে দিস্!"

ইঁদুর আর বিড়াল

সামসুল হক

দুটো ইঁদুর এবং কটা বাচ্চাতে
নিরিবিলি কাটিয়ে দিতো একসাথে।
হাজার খানেক বিড়াল এসে কোত্থেকে
নেংটি ইঁদুর ধরতে গেলো প্রত্যেকে।

দুটো ইঁদুর এবং কটা বাচ্চারা
কেউ কারুরি চায় না হ'তে কাছছাড়া।
হাজার বিড়াল কাঁপিয়ে তোলে ঘরবাড়ি—
ইঁদুরগুলোর মাংস বড় দরকারী।

দুটো ইঁদুর তাইতো কটা বাচ্চাকে
লুকিয়ে রাখে বুকের ভেতর এক ফাঁকে।
হাজার বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ে অকস্মাৎ
বাইরে যখন বৃষ্টি ঝরে—নিঝুম রাত।

দুটো ইঁদুর, আহা কটা বাচ্চারে
হাজার বিড়াল ধরলো বুঝি এইবারে।
মায়ের চোখে জল টলটল অশ্রুতে—
টললো না প্রাণ বিড়াল মাসীর কিচ্ছুতে।

হঠাৎ দেখি ঘরের কোণে আহ্লাদে
বাচ্চা ইঁদুর এবং বিড়াল বাচ্চাতে
খেলছে খেলা রঙবেরঙের রঙদারী,
বলছে যেন ঝগড়া করাই ঝকমারি।

ধেড়ে ধেড়ে প্রাণীগুলোই মন্দ সব,
সোনার শিশু স্বর্গ-ঝরা সুসৌরভ॥

এক চড়

আশাপূর্ণা দেবী

বনমালী তো কাসতেই সুরু করে দিয়েছে

ডাবরের মতো মুখ, ঘটের মতো পেট, থোড়ের মতো হাত-পা, বুরুশ-কুচির মতো চুল আর সবটা মিলিয়ে একটি আস্ত বিলিতি কুমড়োর মতো চেহারা!

নীল হাফ্‌প্যান্ট আর গোলাপী হাফ্‌সার্ট পরে এসে দাঁড়ালো! না, শুধু 'দাঁড়ালো' বললে ভুল হবে—এসেই বাড়ীসুদ্ধু সকলকে ঘটাঘট্‌ প্রণাম করতে সুরু করলো। যতো বলা হচ্ছে 'থাক্‌ থাক্‌', কে কার কথা শোনে। শেষ পর্য্যন্ত ভয়ানক একটা হাসির রোল ওঠায় তবে থামা দিলো। বোধহয় এতোক্ষণে মাথায় ঢুকলো একটা কিছু ভুল করে ফেলেছে।

আমাদের এদিকে ছিপিখোলা সোডার বোতলের সোডার মতো হাসি বাগ মানছে না। হরিদাস আমাদের চাকর বনমালীকে সুদ্ধু প্রণাম করে মরেছে! এতে বাপু কে হাসি চেপে রাখতে পারে? বনমালী তো কাসতেই সুরু করে দিয়েছে।

অবিশ্যি মানলাম বনমালীকে চাকর বলে বোঝা মফস্বলের ছেলের কর্ম্ম নয়, কারণ বনমালী তার গেঞ্জি পর্য্যন্ত স্টীম লণ্ড্রীতে কাচিয়ে নেয়। তবু—আমরা তো হাসবোই!

সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওর নামকরণ করে ফেললাম ভক্ত হরিদাস!

রাসু অমায়িক মুখে বলে, "হ্যাঁ ভাই ভক্ত হরিদাস, তোমাদের দেশে ঝাড়ুদার-টাড়ুদারদেরও প্রণাম করতে হয়?"

হরিদাস অবাক মুখে বলে, "ঝাড়ুদার? কই না তো!"

আমরা আর একবার সরবে হেসে উঠি।

এরপর মেজখুড়িমা ওকে জলখাবার-ছুতোয় উদ্ধার করে নিয়ে যান। কারণ হরিদাস মেজখুড়িমারই দূর সম্পর্কের বোনপো। মেদিনীপুর জেলার কোন্‌ গ্রাম থেকে যেন স্কুল-ফাইন্যাল দিয়ে কলকাতায় কলেজে পড়বার আশায় এসেছে। এখানেই থাকবার বাসনা।

শুনে রাসু, নসু আর আমি 'হুররে' করে উঠলাম।

আহা, উঠতে বসতে হাতের কাছে ক্ষ্যাপানোর উপযুক্ত এমন একখানি চীজ্‌ অনেক পুণ্যফলে মেলে!

প্রথম আলাপ-আলোচনার ধরণটা এই—

"হ্যাঁ হে হরিদাস, তোমাদের স্কুলের নামটা কি?"

"মাকড়তলা হাই স্কুল!"

বলা বাহুল্য আগেই শুনেছি, তবু চোখ কপালে তুলে বলি, "ওঃ তাই!"

"তাই মানে?" হরিদাস আশ্চর্য্যান্বিত।

আমি উদাসীনের অবতার হয়ে বলি—"না, মানে স্কুলটা যখন মাকড়তলা, তখন তার ছাত্রদের একটু মাকড়া মাকড়া বুদ্ধি তো হবেই।"

আমাদের সঙ্গে বনমালীও হাসে—"হি হি হি, আমাদের হরিদাসবাবু না কি কলকেতার কলেজে পড়বে?"

আমি গম্ভীরভাবে বলি, "দূর পাগলা, কলকাতার কলেজে পড়বে কি? ওকে পড়াবার উপযুক্ত প্রফেসর কি আর এদেশে আছে? ও সোজাসুজি বিলেতেই চলে যাবে!"

হরিদাস তার কুমড়োর মতো ভার-ভারীক্কি চেহারাটি

নিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, "বিলেত যাবার অবস্থা থাকলে তো যেতামই, বাবার সামান্য আয়, কি করে হবে বলো ভাই?"

আমরা আশা করছিলাম হরিদাস আমাদের 'আপনি' বলবে, 'তুমি' বলায় চটলাম। অথচ স্পষ্ট করে বলতেও পারি না, আমরা তিনজন, মানে রাসু, নসু আর আমিও যে এযারে স্কুল ফাইন্যাল দিয়েই বসে আছি। ও যদি আমাদের আপনি আজ্ঞে করে, খামোকা বয়েস বেড়ে যায় আমাদের। অথচ ওই হাফ্‌প্যান্ট পরা গাঁইয়া ছেলেটা আমাদের তুমি তুমি করবে এও অসহ্য।

বললাম, "হরিদাস, তোমার বয়েস কতো?"

হরিদাস বুরুশ-কুচির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলে, "চোদ্দ!"

শোনো, শোনো কথা একবার! ওইতো ভূত একটা, কোন না এক এক ক্লাসে দু'বছর করে জিরিয়েছেন, উনি না কি আবার চোদ্দ বছরে স্কুল ফাইন্যাল সেরে এসেছেন। তা' ছাড়া ওজনে তো আমাদের দু'জনের একজন। বোকা চালিয়াৎ আর কাকে বলে।

মুখ বাঁকিয়ে হাসি আমরা, আর বলি, "সে কি হরিদাস, চোদ্দ? অতো বয়েস তোমার? আমরা ভাবছিলাম দশ-এগারো!"

হরিদাস তার ইঁটের মতো নীরেট মুখে গরুর মতো চোখ দুটি ড্যাব্‌ডেবিয়ে বলে, "সে কি ভাই, অতো কম কি করে হবে? দশটা ক্লাস পার হতেই তো দশ বছর লেগে গেছে।"

রাসু বলে, "তাই বুঝি? আহা! আমরা ভাবছিলাম তোমার মতো এমন একটা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টের কি আর ক্লাস টেনে উঠতে দশ বছর লেগেছে? ডবল প্রমোশন পেয়ে পেয়ে বোধ হয় পাঁচ বছরেই সেরেছো।"

হাঁদারাম আরো নিরেট মুখে বলে, "হতো হয়তো, কিন্তু আমাদের স্কুলটায় যে আবার ডবল প্রমোশনের নিয়ম নেই!"

আচ্ছা এতো 'গাড্ডু' মানুষে হয়?

এ ছেলে যে স্কুল ফাইন্যাল পর্য্যন্ত এগিয়েছে কি করে, তাই ভাববার কথা। রাসু বলে, "ভাববার কিছু নেই, মনে রেখো 'মাকড়তলা'।"

মেজদা আবার ওর আর একটি নতুন নামকরণ করেন। বেশ চমকপ্রদ আবিষ্কার। গম্ভীরভাবে ডাকলেন, "ভূষিমাল, ওহে ভূষিমাল, শোনো শোনো।"

হরিদাস হকচকিয়ে বলে, "আমায় কিছু বলছেন?"

"হ্যাঁ হে বাপু।"

"কিন্তু আমার নাম—মানে আমার নাম হরিদাস।"

"তাতে কি?" মেজদা মুচকে হাসেন, "অতো শক্ত কথা বাপু আমার মনে থাকে না, তার চাইতে 'ভূষিমাল' অনেক সোজা। আপত্তি আছে তোমার?"

হরিদাস গম্ভীর মুখে বলে, "আজ্ঞে না, আপত্তি কিসের? নামেতে কি আসে যায়? ভূষিমাল বলে যদি আপনি সুখ পান তাই বলবেন।"

মেজদাও গম্ভীর হয়ে বলেন, "রেজাল্ট তো বেরিয়ে এলো, কোন কলেজে ভর্ত্তি হবে ঠিক করেছো?"

ভূষিমাল লজ্জাবতী কনে বৌয়ের মতো ঘাড় হেঁট করে বলে, "আজ্ঞে ওর আর ঠিক করাকরি কি? প্রেসিডেন্সিই তো শুনেছি সব থেকে সেরা কলেজ, ওতেই যাবো।"

মেজদা তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলেন, "তা' হলে তো বাপু ভূষিমাল ডাকটা ঠিক হয়নি আমার, বলা উচিত ছিলো সেরামাল! সেরামালই সেরা জায়গায় থাকে।"

হরিদাস আরো লজ্জাবতী!

মেজদা মৃদু হেসে বলেন, "কিন্তু প্রেসিডেন্সির যে আবার একটা বদরোগ আছে হে, মার্কসীট্ মনের মতো না হলে ভর্ত্তি করে না।"

"আজ্ঞে সে তো জানিই।" বলে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো ভূষিমাল।

"সত্যি ছেলেটা এতো হাঁদা!" উঠতে বসতে সবাই বলে।

না বলে উপায় কি!

না বোঝে ঠাট্টা, না জানে কথা, না পারে মিশতে। একদিন সিনেমা দেখতে যেতে বলা হলো, বললো কিনা, "না ভাই, মার কাছে দিব্যি গেলেছি—কলকেতায় এসে সিনেমা-থিয়েটার দেখবো না।"

আমরা চোখ কপালে তুলে বলি, "কেন বলো তো?"

হরিদাস পরম বিজ্ঞের মতো বলে, "দেখলেই নেশা জন্মাবে, নেশা জন্মালেই উচ্ছন্ন যেতে হবে।"

শুনে রাসু রেগে উঠে বলে, "ও, তার মানে আমরা সব উচ্ছন্ন যাওয়া ছেলে?"

হরিদাস বিপন্নভাবে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, "না না, সে কি কথা, তা' বলছি না, তা' বলছি না।"

ওর বেশী কথা আর জোগায় না ওর।

পারে খালি হাঁটতে আর খাটতে।

বাড়ীতে কোনো কাজের কথা শুনেছে কি, হরিদাস একপায়ে খাড়া। তা' সে—রাতদুপুরে বড় জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের মশারি টাঙিয়ে দেওয়াই হোক, আর দুপুর রোদ্দুরে এক মাইল রাস্তা হেঁটে পিসেমশাইয়ের জন্যে ডাব আনাই হোক। ক'দিনের মধ্যেই বাড়ীসুদ্ধু মহিলার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো হরিদাস। আর উঠতে বসতে আমাদের সঙ্গে হরিদাসের তুলনামূলক সমালোচনা শুনতে শুনতে হাড় জ্বলতে লাগলো আমাদের। মা থেকে সুরু করে সকলের মুখে এক কথা—"দেখ্ তোরা দেখ্! হরিদাসের কাছে শেখ একটু।"

নসু বললো, "দেখ আশু, এর একটা প্রতিবিধান দরকার। এ অপমান আর সহ্য হচ্ছে না।"

আমি বললাম, "এ বিষয়ে—আমি তোর সঙ্গে একমত। কিন্তু করা যায় কি?"

"একদিন ওকে নির্জ্জনে কোথাও ডেকে নিয়ে গিয়ে চাঁদা করে চাঁটি লাগাইগে চল।"

"দূর! বাড়ীতে প্রকাশ পেয়ে গেলে আমাদেরই চাঁটি খেতে হবে।"

"কিন্তু কী পাজী দেখেছিস? আমাদের সব অবাধ্য আর খারাপ ছেলে প্রতিপন্ন করবার জন্যে গুণের অবতার সেজে বসে আছে।"

"দেখতে অথচ ভিজে বেড়ালটি! এদিকে তো হাঁদাপেটা গাধারাম, কিন্তু পেটে পেটে শয়তানীটি দেখেছিস তো? সকালে যেই ছোটকাকার খাবার সময় শুনেছে লেবু নেই, অমনি না বলতেই ছুটে কিনে নিয়ে আসা হলো!"

"হুঁ, শেষ পর্য্যন্ত করবেন তো ওই বাজার সরকারি, ভাই এখন থেকেই হাত পাকাচ্ছেন!"

"তা' ঠিক! ওই বুদ্ধি নিয়ে আর কতো হবে? আমাদের তো বাবা দোকান-বাজারের নামেই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।"

"ওর ওতেই আনন্দ! সেদিনকে দেখলি না—বনমালী সামনে থাকতেও মেজকাকার সার্ট নাকি আনতে লণ্ড্রীতে ছুটলো!"

"এর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে ঘুষি—" নসু বলে ওঠে, "স্রেফ্ একখানি প্রকাণ্ড ঘুষি। ঘুষিটি লাগিয়ে দিব্যি গালিয়ে নেওয়া হোক—'ভালোছেলেগিরি চলবে না তোমার। আমাদের দলে মিশতে পারো তো থাকো, না হলে'—"

বলতে বলতেই দেখি হরিদাস আসছে।

চুপ হয়ে গিয়ে আমরা চোখে চোখে ইসারা করলাম, এখন নয়, সময় বুঝে।

কিন্তু হরিদাসকে ঘুষি লাগানো আর হলো না আমাদের! সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ হরিদাসই একদিন আমাদের সকলের গালে ঠাশ্ করে এক বিরাট চড় বসিয়ে দিলো!

সে চড়ের জ্বালায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছট্ফট্ করছি আমরা!

নসু বলেছে শীগগিরই ও গেরিমাটি কিনে কাপড় ছোপাবে, রাসু বলেছে ও সুবিধে মতো একদিন গিয়ে হাওড়ার পুলের ওপর থেকে সোজাসুজি নীচের দিকে ঝাঁপ্ দেবে, আর আমি টিনচার আইডিনের সাহায্যে আত্মহত্যা করা যায় কিনা তাই নিয়ে গবেষণা করছি। হরিদাসের সঙ্গে একত্রে বাস করা আর সম্ভব নয়।

একটি চড়ে আমাদের তিনজনের গাল লাল!

আর হরিদাস এই বিরাশী সিক্কা ওজনের চড়টি আমাদের গালে বসিয়ে দু'দিনের জন্যে দেশে গেছে মা-বাপের সঙ্গে দেখা করতে।

কি বলছো? একটি চড়ে তিনজনের গাল লাল হলো কি করে তাই জিজ্ঞেস করছো?

তা' হাতে করে তো ঠিক মারেনি—মেরেছে অন্য রকমে!

চড় মানে চড় নয়, চড় ওর রেজাল্ট।

এ বছর স্কুল ফাইন্যালে ফার্স্ট হয়েছে মাকড়তলা হাইস্কুলের হরিদাস খাসনবীশ!

আর আমাদের রেজাল্ট? সেটাও কি আমার মুখ দিয়ে বলিয়েই ছাড়বে?

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ভয়ের মুখোস
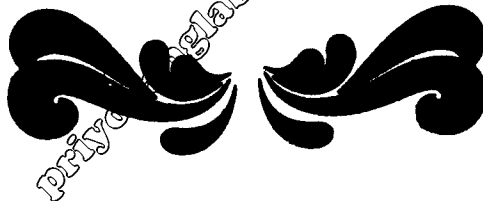
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

চায়ের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল। তার ওপর দুজনে একেবারে পাশাপাশি। দীপু আর তপু। দীপক আর তপেন।

দুজনে একই বাড়ির ছেলে। গলির একেবারে কোণে যে লালরংয়ের বাড়ি, তারই একতলার ভাড়াটে। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই। প্রায় একবয়সী। খুব হিসাব করে দেখলে জানা যায়, দীপু তপুর চেয়ে মাস দুয়েকের বড়।

পাড়ার হিন্দুনিকেতনে দুজনে আট ক্লাসে পড়ে। পড়ে মানে বই-খাতা হাতে করে স্কুলে যায় ওই পর্যন্ত, ক্লাসে বেশীক্ষণ থাকে না। বেরিয়ে পড়ে। তারপর সারাটা দুপুর টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়।

এখন লোকের বাগান বিশেষ নেই। গাছপালা কেটে কারখানা চালু হচ্ছে। কাজেই পরের বাগানের ফলপাকুড় চুরি করার সুবিধা নেই। খাল-বিলে মাছ ধরার সুযোগও কম।

দুজনে শহরতলির পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও সাধুর ভেলকিবাজি দেখে, কোথাও বানরনাচ, আবার কোন কোনদিন বই-খাতা মাথায় পার্কে টানা ঘুম লাগায়।

এর জন্য বাড়িতে যে লাঞ্ছনা জোটে না, এমন নয়।

তপেনের বাপ নেই। অনেকদিন মারা গেছে। দীপুর বাবাই অভিভাবক। ধরেন যখন, তখন দুজনকে আধমরা করেন। আস্ত কঞ্চি পিঠের ওপর ভাঙেন।

দিন কয়েক ঠিক থাকে। স্কুলে যায়। বাড়িতে মাস্টারের কাছেও পড়তে বসে। তারপর আবার যে কে সেই।

দীপু-তপুর মায়েরা কান্নাকাটি করে। বিশেষ করে তপুর মা। এখন থেকে যদি লেখাপড়া না করে, এভাবে দুরন্তপনা চালায়, তবে ভবিষ্যতে দুজনে যে দুটি ডাকাত হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই।

সেদিন রবিবার। স্কুলের বালাই নেই, লেখাপড়ায় পাঠ নয়। ভোরবেলা দু কাপ চা আর দুখানা রুটি খেয়ে দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। বেঞ্চে বসে বসে ভাবছে এরপর কি করা যায়।

ন্যাশনাল আয়রন কোম্পানির পিছনের মাঠে বিরাট শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। কলকাতা থেকে বিখ্যাত যাত্রার দল এসেছে। মাথুর পালা হবে।

তপু আর দীপু দুজনেই বসে বসে ভাবছে, বাড়িতে কি বলে তারা দুজনে ওই যাত্রার আসরে গিয়ে বসবে। সারা রাতের ব্যাপার। বাড়ি থেকে যেতে দেবে এমন সম্ভাবনা কম।

দীপু বলল, তপু, একটা মতলব বের কর।

তপু বসে বসে হাতের আঙুল কামড়াচ্ছিল, আঙুলটা মুখ থেকে বের করে বলল, আমি বলি কি, চলেই যাই দুজনে, ভোর ভোর চুপিচুপি ফিরে আসব এখন।

দীপু মাথা নাড়ল, দূর, তা হবে না। বাবা কি রকম কড়া লোক জানিস তো। রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে সব ঘরগুলো একবার দেখবে, আবার ভোরবেলা উঁকি দেবে ঘরে ঘরে। সব ঠিক আছে কি না। রাত বারোটার আগে বাবা শুতে যায় না, আবার ওঠে সেই ভোর চারটেয়।

তপু বলল, ঘরে ঢুকে জ্যাঠা গায়ে হাত দিয়ে তো আর দেখবে না। জানলা দিয়ে দেখবে। আমরা দিব্যি বালিশের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে রাখব। জ্যাঠা বুঝতে পারবে না।

ব্যবস্থাটা দীপকের খুব মনঃপূত হল না।

নিজের বাপকে সে খুব ভাল করেই চেনে। পাশবালিশ দিয়ে তাঁকে ঠকানো যাবে না। অন্য কিছু একটা ভাবতে হবে।

কিন্তু অন্য কিছু ভাববার আর সময় পেল না। হইচই চীৎকারে চমকে রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল।

একটা কানা ভিখারী রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিল, লাঠি ঠুকে ঠুকে, হঠাৎ ইটবোঝাই একটা লরি এসে পড়ল।

দীপু আর তপু যখন গিয়ে পৌঁছল, দেখল চাপ চাপ রক্তের মাঝখানে ভিখারীটা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। বেঁচে আছে কিনা কে জানে!

লরিটা পালাতে পারেনি। লোকেরা আটকে রেখেছিল।

দীপু আর তপু ধরাধরি করে ভিখারীকে লরির ওপর তুলল। ড্রাইভারকে বলল দ্রুত হাসপাতালের দিকে চালাতে।

মাঝপথ থেকে একটা পুলিসও উঠে বসল ড্রাইভারের পাশে।

শহরের হাসপাতালে যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন দুপুরের রোদ চারদিক জ্বালিয়ে দিচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টার ওপর অপেক্ষা করার পর ভিখারীকে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল। দীপু আর তপু বাইরে বসে রইল।

একটা নার্স এসে তাদের সামনে যখন দাঁড়াল তখন প্রায় পাঁচটা। দীপু আর তপু দুজনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

কি হল? কেমন আছে?

দীপু প্রশ্ন করল।

নার্স ধীরে ধীরে মাথা দোলাল।

খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, মারা গেছে। বাঁচানো গেল না।

দীপু আর তপু উঠে দাঁড়াল। ওই কানা ভিখারীকে তারা চিনত। লাঠি হাতে করে বাড়ির দরজায় দরজায় গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত। চমৎকার গানের গলা।

মনে আছে, কতদিন বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে দীপু আর তপু চাল আলু এনে ভিখারীর ঝুলিতে ফেলে দিয়েছে।

ভিখারীটা শেষ হয়ে গেল। আর কোনদিন তার গান শোনা যাবে না।

দুজনে ক্লান্ত পায়ে, পরিশ্রান্ত দেহে যখন বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে।

দরজার কড়ায় আর হাত রাখতে হল না, দীপকের বাবা লিকলিকে বেত হাতে উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুজনের ওপর। তারপরই এলোপাথাড়ি মার।

সেই সাতসকালে চা আর রুটি খেয়ে দুজনে বেরিয়েছিল, সারাটা দিন পেটে কিছু পড়েনি, তারপর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দুজনেই ব্যাকুল ছিল।

চীৎকার করে আসল ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করল, কোন ফল হল না। রাগ চণ্ডাল, রাগলে দীপকের বাবা চণ্ডালেরও অধম। দুজনের চুলের মুঠি ধরে অবিশ্রান্ত প্রহার। বাড়ির লোক দীপকের বাপকে খুব চেনে, সেইজন্য কেউ বাড়ির বাইরে এল না।

দীপকের বাবা নিজে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন বেতটা উঠানে আছড়ে ফেলে দিয়ে পাশের ছোট দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

একটা পেঁপেগাছের তলায় দীপু আর তপু নির্জীবের মতন পড়ে রইল। শরীরের অনেক জায়গা কেটে রক্তপাত হচ্ছে। দু-এক জায়গায় কালশিটে পড়েছে। তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ।

এই সময়ে একটু জল পেলে হত। কিন্তু কোথায় জল? কে দেবে জল?

তপু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

টলতে টলতে দীপুর কাছে গিয়ে চাপাকণ্ঠে ডাকল,

দীপু, এই দীপু।

দীপু চোখ চেয়েই ছিল, বলল, কি?

এ বাড়িতে আর থাকব না। কোন কথাই জ্যাঠা শুনতে চাইল না। বেমালুম পেটালে শুধু।

দীপুও উঠে দাঁড়াল। জামা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল।

আমারও থাকতে ইচ্ছা করছে না এ বাড়িতে। চল, কোথাও চলে যাই।

কোথায় যাবি?

যে কোন দিকে হোক। এদেশে বনজঙ্গল কম আছে?

বনজঙ্গল যেমন আছে, তেমনই বাঘ-ভালুকও আছে তো।

থাক না, এভাবে নির্যাতন সহ্য করার চেয়ে, বাঘ-ভালুকের পেটে যাওয়া ঢের ভাল।

ঠিক বলেছিস, চল।

দীপু আর তপু চলতে শুরু করল।

রাত তখনও বেশী হয়নি। পথে লোকচলাচল রয়েছে। দীপু আর তপু আলোর সীমানা থেকে সরে অন্ধকার দিয়ে হাঁটতে লাগল। যাতে কারো চোখে না পড়ে। তা ছাড়া আলোয় শরীরের রক্তাক্ত চিহ্নগুলো দেখা যাবে। লোকে হয়তো প্রশ্ন করবে তা নিয়ে। এই এক অস্বস্তিকর অবস্থা।

প্রায় মাইলখানেক চলার পর দুজনে থামল।

আর তাদের চলার শক্তি নেই। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা।

দীপু বলল, আর পারছি না রে তপু।

তপুর অবস্থাও তথৈবচ। চলতে চলতে সে পথে অনেকবার দাঁড়িয়েছিল। এমন কি মনে মনে একবার ভেবেছিল, দীপুকে বলবে বাড়িতে ফিরে যাবার কথা। লজ্জায় পারেনি।

তপু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমারও দুটো পা টনটন করছে।

দীপু এদিক-ওদিক দেখল তারপর উৎসাহের সুরে বলল, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।

কি মতলব?

বলছি।

দীপু বলল না। অনেক দূরে হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা লরি আসছিল, সেইদিকে চেয়ে রইল।

লরিটা কাছে আসতে দীপু দুটো হাত মাথার ওপর তুলে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাতে লাগল, থাম, থাম। জরুরী দরকার আছে।

ব্রেক কষে লরিটা থামল। একটু দূরে।

দীপু আর তপু দৌড়ে লরির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করল।

কি হয়েছে? থামতে বললে কেন?

দীপু বলল, কোথায় যাচ্ছে লরি?

শহরে। খিদিরপুর ডকে।

আমাদের নিয়ে যাবে লরিতে?

ড্রাইভার বিস্মিত হল।

তোমরা দুটো বাচ্চা, এই রাতে কোথায় যাবে?

খিদিরপুরেই যাব আমরা। মাসীমার বাড়ি। পয়সা হারিয়ে ফেলেছি, তাই বাসে উঠতে পারছি না। আমরা খিদিরপুরে নেমে যাব।

ড্রাইভার কিছুক্ষণ কি ভাবল। ঝুঁকে পড়ে দুজনকে দেখল, তারপর দরজা খুলে বলল, উঠে এস।

দীপু আর তপু দুজনে কেউ হেডলাইটের সামনে যায়নি, পাছে ড্রাইভার তাদের শরীরের অবস্থা দেখতে পায়।

তারা লরির ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, ড্রাইভার দরজা খুলে দিতেই লাফিয়ে তার পাশে গিয়ে বসল।

তারপর একটানা যাত্রা। মসৃণ পথ। মাঝে মাঝে অন্য যানবাহনের আসা-যাওয়া। ড্রাইভার একমনে গাড়ি চালাচ্ছে।

দীপু আর তপু কেউ কথা বলতে সাহস করল না।

দুটো হাত মাথার ওপর তুলে...

ড্রাইভারই একসময়ে কথা বলল।

খুব হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে। পকেট থেকে পয়সা চুরি গেল ভারি লজ্জার কথা। শহরে কিন্তু আরো সাবধান হয়ে থাকবে। শহর বড় খারাপ জায়গা। চোর-জোচ্চোরদের আস্তানা।

দুজনেই মাথা নেড়ে ড্রাইভারের কথায় সায় দিল।

শহরে যে কটা দিন থাকবে, খুবই সাবধানে থাকবে তারা।

তপু জিজ্ঞাসা করল, লরিতে কি যাচ্ছে?

পাট। পাট নিয়ে যাচ্ছি।

কোথায় যাবে পাট?

আমি তো খিদিরপুরের ডকে মাল নামিয়ে দেব। সেখান থেকে জাহাজে উঠে পাট বিলেত চলে যাবে।

দীপু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মানুষ না হয়ে পাট হলেই বুঝি ভাল হত। এভাবে মেরে কেউ লোপাট করে দিতে পারত না। তা ছাড়া মহানন্দে ঢেউয়ের বুকে দুলতে দুলতে দেশদেশান্তরে পাড়ি

দেওয়া যেত।

একটু বোধ হয় ঢুলুনি এসেছিল দুজনের, হঠাৎ ড্রাইভারের কথায় চমকে উঠল।

এই তো খিদিরপুর। তোমরা কোথায় নামবে?

দীপু আর তপু চোখ খুলে বাইরে দেখল।

সারি সারি অনেক জাহাজ দেখা যাচ্ছে। কিছু জাহাজ মাঝনদীতেও নোঙর করা রয়েছে। রাত বলে মনেই হচ্ছে না। চারদিকে আলোর রোশনাই।

এখানেই থামাও, আমরা নেমে পড়ি।

লরি থামল। ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

দীপু আর তপু রাস্তার ওপর নেমে দাঁড়াল।

লরিটা অদৃশ্য হয়ে যেতে দীপু বলল।

চল, গঙ্গার জলে মুখ-হাত ধুয়ে নিই। রক্ত শুকিয়ে রয়েছে, সেগুলোও মোছা দরকার।

দুজনে সাবধানে ধাপ বেয়ে বেয়ে নেমে গেল।

মুখ-হাত তো ধুলোই, আঁজলা করে সেই অপরিষ্কার জলই পান করল।

তারপর দুজনে ইতস্ততঃ মাল ছড়ানো জেটির ওপর বসল।

তপু বলল, এবার কোথায় যাবি?

জাহাজের মাস্তুলের দিকে চেয়ে দীপু বলল, জাহাজে চড়ে দূরে কোথাও চলে যাব।

তপু আপত্তি করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পিঠের যন্ত্রণাটা বেড়ে উঠল, মনে পড়ে গেল জ্যাঠার অমানুষিক অত্যাচারের কথা।

সে বলল, ঠিক বলেছিস। অনেক দূরে চলে যাব। এদেশে আর ফিরে আসব না।

দুজনেরই দুঃখ, আজকের দেরিতে বাড়ি ফেরার কারণটা একবার শুনলও না। কিছু বলতেই দিল না। অন্য দিনের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু আজ তারা কোন অন্যায় করেনি। ভিখারীটাকে বাঁচাতে অবশ্য পারল না, সে আর কি করবে। পরমায়ু দেবার মালিক তারা নয়, কিন্তু চেষ্টা তো করেছিল। লোক তো ধারেকাছে অনেক জমেছিল, শুধু তারা দুজনেই তোড়জোড় করে নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে।

পৃথিবীর কোন লোক এমন কাজকে অন্যায় বলবে না। বইয়ের পাতায় পাতায় পরোপকারের আদর্শের ব্যাখ্যা থাকে। ক্লাসে শিক্ষকেরা নীতির কত কথা বলেন, অথচ নিজেদের জীবনে এসব করতে যাওয়ার ফল প্রহার।

তপু বুঝতে পারল তার দুটি চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

দীপু উঠে দাঁড়াল।

চল, একটু ঘোরাফেরা করে দেখি।

এক জেটি থেকে বেরিয়ে দুজনে পাশের জেটিতে গিয়ে ঢুকল। এখানেও একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। জেটিভর্তি নানারকমের কলকবজা। বড় বড় যন্ত্রপাতি।

একেবারে কোণের দিকে গোল গোল লোহার বাটি। বিরাট আকারের। ওপরে অর্ধেক ঢাকা ডালা।

দীপু উঁকি দিয়ে বলল।

ঢুকতে পারবি এর মধ্যে?

তপুও ঝুঁকে একবার দেখল, দীপুর দিকে চেয়ে বলল।

তারপর?

তারপর দুজনে জাহাজে উঠব।

সেকি?

দেখ না। আমি আগে উঠি, তারপর তুই উঠিস।

এদিক ওদিক চেয়ে দীপু ডালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কুলিরা জেটির ওপর কেউ নেই। রাস্তার ওপর জটলা করছে।

খুব সাবধানে তপুও ঢুকে পড়ল।

একটুও শব্দ না করে।

ভিতরে অনেকটা জায়গা।

দুজনে গুটিসুটি হয়ে শুতে কোন অসুবিধা হল না। বরং বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রকোপ থেকে বাঁচল।

দুজনে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ তপুর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল সবসুদ্ধ কে যেন তাদের শূন্যে তুলছে।

প্রথমে সে মনে করল বুঝি ভূমিকম্প, দীপুকে জড়িয়ে ধরে বলল, এই দীপু, দীপু, ভূমিকম্প হচ্ছে।

দীপু একটা হাত তপুর মুখের ওপর চেপে ধরে বলল।

চুপ, চেঁচাসনি। ভূমিকম্প নয়।

তবে?

ক্রেনে করে আমাদের জাহাজে ওঠাচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ জেগেছি, সব দেখেছি। যেমন শুয়ে ছিলি, তেমনই শুয়ে থাক।

তপু শুয়েই ছিল। দীপুর কথায় আরো সরে এসে কুঁকড়ে শুয়ে রইল, দু হাত দিয়ে দীপুকে জাপটে ধরে।

বড় বাটিটা খুব দুলছে। মনে হল এদেশের মাটি থেকে দীপু আর তপুকে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশে। সব মায়া, সব সম্পর্ক কাটিয়ে।

খুব জোর একটা শব্দ হল। মনে হল বাটিটা মাটির

ওপর কে যেন আছড়ে ফেলল।

দীপু আর তপুর শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল।

বাইরে কুলির স্তিমিত কোলাহল, লোহার চেনের আওয়াজ।

দুজনেরই অদম্য ইচ্ছা হল উঠে একবার বাইরের অবস্থাটা দেখবে, কিন্তু অনেক কষ্টে কৌতূহল দমন করল।

এখন ধরা পড়ে গেলেই সব মাটি। এই ক্ষতবিক্ষত শরীরের ওপরই আবার হয়তো প্রহার চলবে। দুজনকে টেনে নামিয়ে দেবে জেটির ওপর।

এত রাতে বাড়ি ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বাড়ি ফিরে গেলেও সেখানে কি ধরনের অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে, তাও তাদের অজানা নয়।

মনে হল চাকার ওপর বসিয়ে বাটিটাকে কারা যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গড়গড় করে শব্দ।

আবার ঘটাং করে আওয়াজ।

এবার ফাঁক দিয়ে খুব ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বোধ হয় রেলিং-এর ধারে বাটিটা রেখেছে। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দও শোনা যাচ্ছে।

একটু একটু করে বাইরের হট্টগোল কমে গেল। ঘুম নেমে এল দীপু আর তপুর চোখে।

একসময়ে অনেকগুলো লোকের কথা বলার আওয়াজে দুজনের ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে ঠিক কিছু বুঝতে পারল না। মনে হল, নিজেদের বিছানাতেই বুঝি শুয়ে আছে। কিন্তু এত হট্টগোল কিসের? আবার কেউ লরি চাপা পড়ল নাকি, যে জন্য লোকেদের চেঁচামেচি শুরু হয়েছে।

দুজনে প্রায় একসঙ্গেই চোখ খুলল।

দেখল, ডালার ফাঁকে গোটা তিন-চার মুখ উঁকি দিচ্ছে।

ছোট ছোট চোখ, শুকনো কঠিন চেহারা, মাথায় সাদা টুপি।

দীপু আর তপু উঠে বসল।

কে তোমরা? এর মধ্যে এলে কি করে?

পরিষ্কার বাংলা ভাষা। উচ্চারণে একটু জড়তা আছে, কিন্তু বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

কি? কথা বলছ না কেন? বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস।

ঢোকা যত সহজ ছিল, বেরিয়ে আসা মোটেই তত সহজ নয়। বেরোবার চেষ্টা করতে গিয়েই দীপু আর তপু সেটা বুঝতে পারল।

বাইরে দাঁড়ানো লোকগুলোও বোধহয় বুঝল।

একজন লোহার মতন শক্ত দুটো হাত বাড়িয়ে দীপুকে ধরল, তারপর তাকে টেনে বের করে জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল।

আবার সেইভাবে তপুকেও বাটি থেকে বাইরে নিয়ে এল।

ডেকের ওপর দাঁড়িয়েই দুজনে অবাক্।

চারদিকে শুধু জল আর জল। গঙ্গার মত ঘোলাটে কাদা জল নয়, ফিকে সবুজ জলের রঙ। মাঝারি আকারের ঢেউ। ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউয়ের ধাক্কায় সাদা ফেনার সৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও স্থলের চিহ্নমাত্র নেই।

বিরাট জাহাজ। মাস্তলে নিশান উড়ছে। কালো একটা চোঙের মধ্য দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হচ্ছে।

ডেকের ওপর সার দিয়ে দাঁড়ানো একদল লোক। সবার পরনে একই রঙের পোশাক। হাতে লম্বা ঝাড়ু। কোণের দিকে অনেকগুলো লাল রঙের বালতি।

যে লোকটা ওদের তুলেছিল, সে এগিয়ে এসে বলল।

কই বললে না কে তোমরা? এর মধ্যে কি করে এলে?

দীপু একবার সকলের মুখের দিকে দেখে নিল, তারপর বলল, আমার নাম দীপক, আর ওর নাম তপেন। আমরা দুই ভাই।

দুই ভাই, তা এর মধ্যে কি করে এলে?

জেটিতে যখন এগুলো রাখা ছিল, তখন আমরা এর মধ্যে ঢুকেছি।

কেন?

এ পর্যন্ত বলতে কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু এবার কি বলবে।

কি করে বলবে, বাড়িতে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছিল। এ দেশের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাইরে কোথাও চলে যেতে চেয়েছিল।

দীপুকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটা ধমক লাগাল।

কি, চুপ করে আছ যে? কথা বল।

তপু এতক্ষণ চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হালচাল দেখছিল, এবার এক পা এগিয়ে এসে বলল।

আমাদের কেউ কোথাও নেই। শুধু এক সৎমা আছে, ভীষণ নির্যাতন করে। বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

কয়েকদিন আগেই তপু একটা গল্পের বই পড়েছিল। তাতে এক সৎমার অত্যাচারের কাহিনী ছিল। সেটা মনে পড়ে গেল।

মনে হল লোকটার মুখের কঠিন রেখাগুলো একটু যেন সরল হল। চোখের ভাবও কিঞ্চিৎ করুণ।

কিন্তু এভাবে মালের জাহাজে লোক যাওয়ার নিয়ম নেই।

এ কথার দীপু আর তপু কোন উত্তর দিল না।

ইতিমধ্যে লোকগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জটলা করছে নিজেদের মধ্যে।

একটু পরে সেই লোকটাই এগিয়ে এল। বলল।

চল, তোমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে যেতে হবে।

আগে আগে দীপু আর তপু, পিছনে জন তিনেক লোক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

ডেকের ওপর আবার একটা ডেক। তার মাঝখানে সাদা রঙের ছোট সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে সবাই আরো ওপরে উঠল।

সিঁড়ির শেষে ছোট একটা ঘর। গোল কাঁচের জানলা। ঝকঝকে তকতকে ব্রাসের হ্যাণ্ডেল দরজার। দরজার গোড়ায় মোটা পাপোশ।

একটি লোক বন্ধ দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিল।

সাব। সাব।

দরজা খুলে গেল।

দীর্ঘ চেহারার একটি লোক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

হাঁসের পালকের মতন সাদা ধবধবে পোশাক। সার সার বোতাম বসানো। মাথায় হেলমেট ধরনের টুপি।

এই তাহলে ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন ভ্রূ কুঁচকে বলল।

কি হয়েছে?

মেসিন কভারের মধ্যে দুটো ছেলে, সাব।

কি?

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল কেবিনের চৌকাঠ পেরিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে গেল।

একপাশে জড়াজড়ি করে দীপু আর তপু দাঁড়িয়ে।

আরে, এ তো একদম বাচ্চা।

ক্যাপ্টেন হাতের ইশারায় দুজনকে কাছে ডাকল।

দীপু আর তপু আস্তে আস্তে পা ফেলে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কে তোমরা? জাহাজে চড়েছ কেন?

দীপু আর তপুকে কিছু বলতে হল না। দলের লোকটাই বলল, এরা বুঝি দুই ভাই সাব। বাড়িতে মার অত্যাচারের জন্য পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু জাহাজে উঠলে জাহাজের ভাড়া দিতে হবে।

তপু আর দীপু হিসাব করল।

তপুর পকেটে আট আনা আছে, আর দীপুর পকেটে একটা সিকি। টিফিনের পয়সা থেকে বাঁচানো। একজনের কাছে কত আছে, আর একজনের জানা।

তাই তপু বলল।

আমাদের কাছে বারো আনা আছে। এতে আপনার জাহাজের ভাড়া হবে?

রাগ করতে গিয়েও ক্যাপ্টেন হেসে ফেলল।

ক্যাপ্টেন বাঙালী নয়, কিন্তু বাংলায় কথা বলতে পারে। ভাঙা ভাঙা বাংলা। বুঝতেও পারে।

হাসি চেপে বলল।

এ জাহাজ প্রথমে রেঙ্গুন যাবে। এক একজনের ভাড়া ডেকে পঁচিশ টাকা। দিতে পারবে?

প্রায় একসঙ্গে দীপু আর তপু মাথা নাড়ল।

না।

তাহলে?

তাহলে কি হবে দীপু-তপুর জানা নেই। কি নিয়ম জাহাজের? জলে ফেলে দেয় বিনা টিকিটের যাত্রীদের?

যা ইচ্ছা করুক। এভাবে আর পারছে না। ক্লান্তিতে সারা দেহ ভেঙে পড়ছে। যাই করুক, মেরে ফেলে দিক, জলে ফেলুক, তার আগে দুজনকে পেট ভরে অন্ততঃ খেতে দিক। তা না হলে, অসহ্য ক্ষুধার জ্বালাতেই দুজনে মারা যাবে।

কি ব্যাপার, ভিড় কিসের এত?

পিছন থেকে ভারী গলার আওয়াজে চমকে দীপু আর তপু মুখ ফেরাল।

বেশ মোটাসোটা চেহারা, গোলগাল মুখ, মাথাটা ডিমের মতন মসৃণ। একগাছা চুল নেই। চোখে চশমা।

ক্যাপ্টেন উত্তর দিল।

এই যে ডাক্তার, আপনার দেশের লোকের কাণ্ড দেখুন।

কি হল?

ডাক্তার ঠিক দীপু আর তপুর পিছনে এসে দাঁড়াল।

রাত্রিবেলা চুপিচুপি কখন মেসিন কভারের মধ্যে ঢুকে বসেছিল। বিনাভাড়ায় জাহাজে চড়বার শখ।

ডাক্তার চোখ ফিরিয়ে দীপু আর তপুকে দেখল, তারপর বলল।

আমাদের দেশের ছেলেরাই তো এসব করে। পাহাড়-পর্বত লঙ্ঘন করে, ময়ূরপঙ্খী ভাসায় ঢেউয়ের বুকে, গুলির সামনে বুক পেতে দেয়। কিন্তু এরা দেখছি নিতান্ত বাচ্চা।

কিন্তু মাঝদরিয়ায় এদের নিয়ে কি করা যায়?

উপস্থিত এদের চেহারা দেখে যা বুঝছি, অনেকক্ষ

বোধ হয় পেটে কিছু পড়েনি। এদের কিছু খাওয়াবার বন্দোবস্ত কর।

ক্যাপ্টেন হেসে বলল, তারপর?

তারপর আর কি, রেঙ্গুনে পৌঁছবার পর ফিরতি জাহাজে যাদের বাছা তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কই, এস তোমরা আমার সঙ্গে।

ডাক্তারের পিছন পিছন দীপু আর তপু সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

জাহাজের সামনের দিকে মাঝারি সাইজের একটা কেবিন।

ঢুকেই দীপু আর তপু অবাক্ হয়ে গেল।

ভিতরে এলে মনে হয় যেন কোন সাজানো বাড়ির কামরা। জাহাজের মধ্যে আছে তা মনেই হয় না।

একদিকে ধবধবে বিছানা পাতা। দেয়াল আলমারি। গোল টেবিলের দুপাশে দুটো চেয়ার।

ডাক্তার বিছানার ওপর বসল। তার নির্দেশে দীপু আর তপু দুটো চেয়ারে বসল।

নাম কি তোমাদের বল তো এইবার।

কি জানি কেন, বোধ হয় ডাক্তারের কথা বলার ভঙ্গীতে, দীপু আর তপু দুজনেরই মনে হল, যেন নিরাপদ একটা আশ্রয়ে এসেছে। আর ভয়ের কোন কারণ নেই। এমন একটা মানুষের কাছে নিশ্চিন্তে মনের কথা বলা যায়।

তাই দীপু বলল, আমার নাম দীপক সেন, ওর নাম তপেন সেন। তপেন আমার খুড়তুতো ভাই।

তা বেশ, তপেনবাবু, মাঝরাত্রে ওভাবে হাঁড়ির মধ্যে ঢুকতে গেছো কেন?

তপু ভেবেছিল ডাক্তারের কাছে সত্যি কথাটা বলবে, কিন্তু একটু ভেবেই সাবধান হয়ে গেল।

কিছু বলা যায় না, সকলের কাছে এক ধরনের কথা বলাই ভাল। এক একজনের কাছে এক এক রকমের কথা বললে ধরা পড়ে যাবে। কেউই তাদের বিশ্বাস করবে না।

তাই সৎমার নির্যাতনের কথাটাই আবার বলল।

কিন্তু বিদেশে গিয়ে তোমরা করবে কি? লেখাপড়া এমন জান না যে চাকরি করবে। হাতে-কলমে কোন কাজ জান না যে কারখানায় কাজ পাবে।

তপু বলল, আমরা অত কথা কিছু ভাবিনি। রাগের মাথায় বেরিয়ে এসেছি।

এমন সময় দরজা ঠেলে একটা লোক ঢুকল।

তার হাতে একটা ট্রে। তাতে দু কাপ দুধ, অনেকগুলো পাঁউরুটির টুকরো, দুটো ডিমসেদ্ধ আর একরাশ ফল।

লোকটা সেগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার আগেই দীপু আর তপু সাগ্রহে জিনিসগুলো টেনে নিল।

কিন্তু খেতে যাবার মুখেই বিপদ্।

একটু দাঁড়াও। ডাক্তারের গম্ভীর গলার স্বর।

দুজনেই চমকে উঠল। আবার কি হল? খাবার ব্যাপারে জাহাজের অন্য কোন নিয়ম আছে নাকি!

তপু, তোমার হাতে লালচে দাগটা কিসের?

শুধু হাতে! অবশ্য হাতটাই দেখা যাচ্ছে। পিঠ আর বুক তো জামায় ঢাকা।

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে সার্টটা টেনে খুলে ফেলল, ডাক্তারের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, দেখুন পিঠের অবস্থা। সারা পিঠ জুড়ে কালশিটে আর রক্তাক্ত আঁচড়।

দীপুর দেখাদেখি ততক্ষণে তপুও জামা খুলে ফেলেছে। তার পিঠেরও একই অবস্থা।

ঈস্! আহা, কচি ছেলেকে এভাবে কেউ মারে!

ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে দেয়াল আলমারি খুলে তুলো আর ওষুধ বের করল, তারপর খুব সাবধানে তপু আর দীপুর আঘাতচিহ্নের ওপর লাগিয়ে দিল।

ওষুধ লাগানো হতে দুজনে খেতে বসল।

অত খাবার শেষ হতে মিনিট দশেকের বেশী লাগল না। পেটের মধ্যে যে যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠছিল, সেটার উপশম হল।

এবার তোমরা বাইরের ডেকে চলে যাও। তোমাদের থাকার ব্যবস্থা একটা করছি।

দুজনে বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এসেই অবাক্।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবিনে বাতি জ্বলছিল বলে কিছু বোঝা যায়নি।

আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। জল এখন আর ফিকে সবুজ নয়, গাঢ় কালো। ঢেউয়ের আকার দারুণ বেড়েছে। হাওয়ার বেগের জন্য এগোনোই দুঃসাধ্য। ঠেলে যেন পিছনে হটিয়ে দিচ্ছে।

একটা লোক দৌড়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, ওদের দেখে বলল, নীচে চলে যাও তোমরা। ভীষণ ঝড় উঠছে।

নীচে? নীচে আর কোথায় যাবে? এ জাহাজের কোথায় কি আছে কিছুই তাদের জানা নেই। জানার অবকাশই পায়নি।

ছুটতে ছুটতে তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে এল। একেবারে

জাহাজের খোলে।

নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিশ্রী একটা গন্ধ। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে যাবার দাখিল।

একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে দেখল, একগাদা ছাগল বাঁধা রয়েছে। এদিকে খাঁচার ওপর খাঁচা। তার মধ্যে মুরগী, হাঁস আর কুঁকড়ো।

গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল।

কিন্তু ওপরে ওঠবারও উপায় নেই। বোঝা গেল জাহাজটা বেশ দুলছে। একবার এদিক থেকে ওদিক, আর একবার ওদিক থেকে এদিক।

দোলার সঙ্গে পাঁঠা, মোরগ, হাঁসের ঐক্যতানে কানে তালা ধরবার যোগাড়।

দুজনে নাক চেপে সিঁড়িতেই বসে পড়ল।

একটু আগে যে সব সুখাদ্য পেটে গিয়েছিল, সেগুলো পাক দিয়ে উঠতে লাগল। গন্ধে আর জাহাজের দোলানিতে।

দু হাতে মুখ চেপে ধরে দুজনে বমির বেগ সামলাল।

প্রায় আধঘণ্টার ওপর একভাবে চলল, তারপর মনে হল জাহাজ যেন একটু সামলে নিল। বোধ হয় ঝড়ের বেগ কম।

ওরা সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল।

সমস্ত ডেকটা ভিজে গিয়েছে। বোধ হয় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল।

এক জায়গায় কুণ্ডলীপাকানো ম্যানিলা দড়ি ছিল, দুজনে তার ওপর গিয়ে বসল।

সকালের মতন একদল লোক লম্বা ঝাড়ু হাতে এসে হাজির হল। ঝাড়ু দিয়ে ঠেলে ঠেলে জল ফেলে দিতে লাগল রেলিংয়ের ফাঁকে।

একটা লোক কাছে আসতে তপু জিজ্ঞাসা করল।

খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে বুঝি?

ঝাড়ু রেখে লোকটা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল।

বৃষ্টি কোথায়? এ তো ঢেউয়ের জল।

ঢেউ?

হ্যাঁ, ঝড়ের সময় ঢেউয়ের সাইজ তিনতলা চারতলা পর্যন্ত হয়। এদিক দিয়ে ঢেউ উঠে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একেবারে ডেক ভাসিয়ে।

বিস্ময়ে দীপু আর তপু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণ পরেই দমকলের ঘণ্টার মতন ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে লাগল।

দীপু আর তপু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

সর্বনাশ, জাহাজে আবার আগুন লাগল নাকি?

সবাই ঝাড়ু বালতি সরিয়ে সার হয়ে দাঁড়াল, তারপর চলতে শুরু করল।

দীপু আর তপুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন বলল।

চল, খাবার ঘণ্টা পড়েছে। খেতে যাবে না?

ওটা দমকলের ব্যাপার নয়, খাবার ঘণ্টা। দীপু আর তপু একটু আশ্বস্ত হল। দুজনে আর সকলের পিছন পিছন হাঁটতে আরম্ভ করল।

এভাবে দু দিন দু রাত কাটল।

শোবার জন্য দুজনে একটা কেবিন পেয়েছে। ডাক্তারের কেবিনের মতন অমন চমৎকার সাজানো নয়। শুধু দুটো বিছানা, আর একটা আয়না।

ওদের পক্ষে এই যথেষ্ট।

তিনদিনের দিন সকাল থেকেই সারা জাহাজে বেশ একটু চাঞ্চল্য। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সবাই চোখের ওপর আড়াআড়িভাবে হাত রেখে জলের ওপারে চেয়ে চেয়ে কি দেখছে।

জলের রং আর ঘন নীল নয়, আবার ফিকে সবুজ।

ক্যাপ্টেনও চোখে দূরবীন লাগিয়ে নিজের ছোট ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এ ক'দিনে ওরা শিখে গেছে। যে লোকগুলো জাহাজের কাজ করে, তাদের সারেং বলে।

একজন সারেংকে ডেকে তপু জিজ্ঞাসা করল।

কি হয়েছে? তোমরা সবাই ওরকম করে কি দেখছো?

সারেং হাসল।

একটু পরেই মাটি দেখা যাবে। বর্মার মাটি। মংকি পয়েন্ট। ওই দেখ, ডাঙা আর দূরে নেই।

দীপু আর তপু চেয়ে দেখল।

রেলিংয়ের পাশে পাশে বিরাট আকারের সাদা সাদা পাখী উড়ছে। ঠিক যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে জাহাজটাকে।

কি ওগুলো?

ওই তো সি-গাল পাখী। ওরা ডাঙার খবর নিয়ে আসে। সেইজন্য ওদের মারা বারণ। কেউ মারতেও পারবে না, ধরতেও নয়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা রেলিংয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ওই তো কালো দাগ। জল শেষ হয়ে, মাটির রেখা।

দীপু আর তপু কিন্তু চোখ কুঁচকে সেদিকে চেয়েও কিছু দেখতে পেল না।

তবে একটু পরেই ফিকে সবুজ জল ঘোলাটে হয়ে এল। কাদাগোলা।

এবার সবুজ রেখাও স্পষ্ট দেখা গেল।

গাছপালাঢাকা মাটির চিহ্ন।

বিরাট একটা আর্তনাদ করে জাহাজটা দাঁড়িয়ে পড়ল। মাঝখানে।

কি হল ?

তপু প্রায় চীৎকার করে উঠল।

কি হবে ?

জাহাজ হঠাৎ থেমে গেল যে ?

সারেং হাত নেড়ে দীপু আর তপুকে ডাকল।

এদিকে এস। ওই দেখ।

দীপু আর তপু এদিকের রেলিং-এ এসে দাঁড়াল।

ঠিক জাহাজের পাশে একটা সাদা মোটরলঞ্চ এসে দাঁড়িয়েছে। জাহাজ থেকে একটা সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে জলের ওপর।

সারেং বলল, ওটা পাইলটের লঞ্চ। ওই দেখ সাদা পোশাক পরা পাইলট সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে।

কি করবে পাইলট ?

সমুদ্রের পথঘাট ক্যাপ্টেনের সব জানা। জাহাজ নিয়ে আসতে তার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু নদীতেই মুশকিল। কোথায় জল কম, কোথায় জলের চোরাটান আছে সে সব সম্বন্ধে পাইলট ওয়াকিবহাল। তাই মোহানা থেকে রেঙ্গুন বন্দর পর্যন্ত এই পাইলটই জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

এটা কি নদী ?

এর নাম লেইং। ইরাবতীর একটা শাখা।

সারেংয়ের কথা শেষ হবার আগেই জাহাজ চলতে শুরু করল। জল কেটে কেটে।

এখন দুপাশের তীরভূমি বেশ স্পষ্ট। লোকজনও দেখা গেল। দু-একটা কলকারখানা।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে জাহাজ জেটিতে নোঙ্গর ফেলল।

জাহাজ থামতেই ডাক্তার এসে পাশে দাঁড়াল।

শোন, তোমরা যেন নেমো না। অচেনা জায়গা, বিপদে পড়বে। এখানে জাহাজ দিন দুয়েক থাকবে। মাল খালাস করে সিঙ্গাপুর চলে যাবে। তার আগে জাহাজ কোম্পানির অফিসে তোমাদের দিয়ে আসব। আজ বৃহস্পতিবার, শনিবার ফেরার জাহাজ আছে। এস এস এডাভানা কলকাতায় ফিরে যাবে, সেই জাহাজে তোমাদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করব।

দীপু আর তপু কোন কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে

তার পরনে কালো জামা

দাঁড়িয়ে শুনল।

ডাক্তার সরে যেতে দীপু তপুকে বলল।

তপু, যে রকম করেই হোক এদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমাদের পালাতে হবে, না হলে ভীষণ বিপদ্।

কি বিপদ্ ?

কি বিপদ্ বুঝতে পারছিস না ? আরো দুটো কঞ্চি বাবা আমাদের পিঠে ভাঙবে। বাড়ি থেকে পালানোর কি শাস্তি ভাবতে গেলেই তো বুক কেঁপে উঠছে।

কিন্তু এখানে কোথায় যাব ? কেউ তো আমাদের চেনে না।

তপু যেন একটু সন্দেহ প্রকাশ করল।

এই জাহাজেই কি কেউ আমাদের চিনত ? একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল তো ?

আর কোন কথা হল না। মাল নামানো শুরু হল। কুলির দল লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজের ওপর উঠল। কতকগুলো সারেং সেজেগুজে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

দুই ভাই রেলিংয়ের ধারে বসে বসে দেখল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে চা খাওয়া সেরে দুজনে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল। কেউ

কোথাও নেই। ক্যাপ্টেন বেরিয়েছে। ডাক্তার ওপরের ডেকে বসে বই পড়ছে।

চল, নামি।

দুজনে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে জেটিতে এসে দাঁড়াল।

জেটির বাইরে সোজা রাস্তা। দুধারে আলো জ্বলছে। জেটির ওপর তখনও কিছু মাল পড়ে রয়েছে।

রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দীপু বলল, ওই দেখ বর্মী যাচ্ছে।

পরনে কালো ছোট কোট, রঙিন লুঙ্গি, পায়ে চটি একটা লোক হনহন করে এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল।

তপু বলল, এ তো আবার আর একটা মুশকিল।

কি?

এদের ভাষাও তো বুঝব না। এক কথা বললে আর এক কথা শুনবে। মহা ঝামেলা হবে তাই নিয়ে।

দীপু বলল, এগিয়ে চল। এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। ডাক্তার একবার দেখতে পেলে লোক দিয়ে ধরে ফেলবে।

ছোট একটা পার্ক। দুজনে পার্কের মধ্যে ঢুকল।

কয়েক পা গিয়েই থেমে গেল।

ঝাঁকড়া গাছের নীচে একটা বেঞ্চ। জায়গাটা অন্ধকার। লোকটাকে দেখা গেল না। তার গলার স্বর শোনা গেল।

কে তোমরা?

দুজনে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল।

বেঞ্চ থেকে যে লোকটা এগিয়ে এসে তাদের কাছে দাঁড়াল, তার পরনে কালো জামা, কালো ঝলঝলে প্যান্ট। গোঁফজোড়া সরু হয়ে দুপাশের ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে। চোখের বালাই নেই। নাকের অবস্থাও তাই।

লোকটা চীনে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু চীনে এত সুন্দর বাংলা বলছে কি করে?

দীপু বলল।

আমরা বাঙালী। কলকাতা থেকে জাহাজে করে বেড়াতে এসেছি।

এখানে কোথায় যাবে?

কোথায় যাব এখনও-ঠিক করিনি। এখানে আমাদের জানাশোনা কোন লোক তো নেই।

তোমাদের সঙ্গে কে আছে?

কেউ নেই। আমরা দুজনেই বেরিয়েছি।

চীনেটি আরো কয়েক পা এগিয়ে দীপু আর তপুর মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দুটো হাত রাখল দুজনের কাঁধে।

হেসে বলল, চাকরি করবে তোমরা?

ওরা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেল।

তপু বলল, চাকরি পেলে আর কে না করে, কিন্তু আমাদের মতন এত ছোট ছেলেকে কে চাকরি দেবে?

চীনেটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসল। একসময়ে হাসি থামিয়ে বলল।

ছোট ছেলেদের জন্যও চাকরি আছে বৈকি। এমন চাকরি আছে যা কেবল ছোটদেরই উপযুক্ত। তোমরা করবে কিনা বল?

দীপু বলল, বললাম তো করব।

বেশ, তাহলে এস।

চীনে এগিয়ে চলল। দীপু আর তপু তাকে অনুসরণ করল।

পার্কের বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

চীনে কাছে গিয়ে দুহাতে তালি দিল। গাড়োয়ানটা একটু দূরে ছিল, ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

চীনে হাসতে হাসতে বলল, উঠে পড় খুদে ভাইরা। তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে তবে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

প্রথমে দীপু আর তপু তারপর চীনেটি গাড়িতে উঠে বসল।

দীপু আর তপু পাশাপাশি। উলটোদিকে চীনে।

গাড়ি ছাড়তে দীপু জিজ্ঞাসা করল।

আচ্ছা তুমি তো জাতে চীনে, তাই না?

চীনে হাসতে হাসতে বলল, আমার নাক দেখে বুঝতে পারছ না? যখনই দেখবে এক চোখের জল গড়িয়ে আর এক চোখে পড়ছে, তখন বুঝবে লোকটা চীনে।

চীনের কথায় দীপু আর তপু দুজনেই খুব জোরে হেসে উঠল।

এবার তপু বলল।

কিন্তু এত ভাল বাংলা শিখলে কি করে?

এবার চীনেটা আরো জোরে হেসে উঠল।

আরে আমি জাতে চীনে হলে কি হবে, কোনদিন কি আমি গেছি চীনদেশে! আমরা তিন পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা। ট্যাংরায় আমাদের চামড়ার কারখানা। আমি অবশ্য বছর কুড়ি বর্মায় এসেছি ব্যবসা করতে।

তোমার কিসের ব্যবসা।

ব্যবসা কি আমার একটা। নানারকমের ব্যবসা। তোমরা থাকতে থাকতেই সব জানতে পারবে। তোমাদের মতন সেয়ানা ছেলেই তো খুঁজছিলাম এতদিন।

সেয়ানা বলাতে দীপু আর তপু দুজনেই খুব খুশী হল।

দীপু বলল, আমাদের মাইনে কিন্তু একটু বেশী দিতে হবে। আমাদের এই একটি সার্ট আর একটি প্যান্ট সম্বল।

জামা-কাপড় কিনতে হবে আমাদের।

তাছাড়া কিছু টাকা আমরা দেশেও পাঠাতে চাই।

তপুর হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। বিধবা মাকে কিছু টাকা পাঠানো দরকার।

গাড়ির মধ্যেটা অন্ধকার। চীনেটা হেসে উঠতেই তার দুটো সোনাবাঁধানো দাঁত চকচক করে উঠল।

চীনে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, সব হবে, সব হবে। এখন নাম, আমরা এসে গেছি।

ছোট্ট কাঠের একতলা বাড়ি। সবই অন্ধকার। কেবল একটা ঘর থেকে মিটমিটে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দীপু আর তপু আশা করেছিল লোকটা যে রকম ব্যবসার ফিরিস্তি দিচ্ছিল, বাড়িটাও সেই অনুপাতে জমজমাট হবে।

বাড়ির পিছনেই নদী। অন্ধকারে গোটা দুয়েক পালতোলা নৌকার কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

এস, এস, নেমে এস।

চীনেটা হাসতে হাসতে আপ্যায়ন করল।

দীপু বলল, বাড়িটা এত অন্ধকার কেন?

আমি ছিলাম না বাড়িতে তাই অন্ধকার। এক্ষুনি আলো জ্বলবে। চলে এস তোমরা। ঠাণ্ডায় আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেক না।

দীপু আর তপু চীনের পিছন পিছন বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

একতলায় পৌঁছে চীনে বলল, ডানদিকে একটা ঘর আছে সেটাতে ঢুকে পড়। আমি বাতির বন্দোবস্ত করছি।

হাত দিয়ে অনুভব করে তপু বলল, দরজা যে বন্ধ।

অন্ধকারে চীনের হাসির শব্দ শোনা গেল।

দূর বোকা ছেলে, বন্ধ হবে কেন? ভেজানো আছে, ঠেললেই খুলে যাবে।

সত্যিই তাই। তপু হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে দীপু আর তপু ভিতরে ঢুকল।

তারপরই চমকে উঠল।

পিছনে সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল বাইরে থেকে যেন শিকলও তুলে দেওয়া হল।

দীপু আর তপু দুজনেই দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আরে, দরজা বন্ধ করলে কেন? শুনছো, দরজা খোল।

কোন উত্তর নেই। ফাঁকা ঘরে ওদের চীৎকারের প্রতিধ্বনিই ফিরে এল।

দুজনে প্রাণপণ শক্তিতে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

খুট করে একটা শব্দ।

দীপু আর তপু ফিরে দাঁড়াল।

পিছনের কাঠের দেয়ালে চৌকো একটা গর্ত। তার মধ্যে চীনের মুখটা দেখা গেল। কাছে বোধ হয় বাতিও রয়েছে, কারণ সেই বাতির আলো চীনের মুখের ওপর এসে পড়েছে।

পৈশাচিক একটা হাসি, তারপরই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

খোকাবাবুরা বিশ্রাম কর, একটু পরে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দীপু চীৎকার করে উঠল।

এভাবে আমাদের বন্ধ করে রাখলে কেন? কি মতলব তোমার?

চীনে দুটো চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল।

ছেলেমানুষ, বিদেশে পথ হারাবে, তাই ভাল জায়গায় রেখে দিয়েছি।

আমরা চেঁচাব। পুলিসে খবর দেব।

দীপু আর তপু দুজনেই প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাতে লাগল।

কেন চেঁচিয়ে নিজেদের গলা ভাঙবে? এ ঘরের আওয়াজ বাইরে যায় না।

বদমায়েশ কোথাকার, তোমাকে খুন করব।

শূন্যে ঘুষি ছুঁড়তে গিয়ে দুজনে দেখল, চীনের মুখটা গর্ত থেকে সরে গেছে, তার বদলে ম্লানদীপ্তি একটা লণ্ঠন লোহার শিকে ঝুলছে।

সেই আলোয় কামরাটা দীপু আর তপু ভাল করে দেখল।

এককোণে খড়ের বিছানা পাতা। এদিকে কাঠের ছোট টেবিল, নীচু দুটো টুল। মেঝেটা সিমেন্টের, কিন্তু অনেক জায়গায় সিমেন্ট উঠে মাটি বেরিয়ে পড়েছে।

দীপু খড়ের বিছানার ওপর বসল।

তপু টুলের ওপর।

দীপু ক্লান্ত গলায় বলল, মনে হচ্ছে আমরা ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি।

ডাকাতের পাল্লায়? তপুর কেমন একটু সন্দেহ হল, ডাকাত আমাদের ধরে কি করবে? আমাদের না আছে টাকাপয়সা, না আছে সোনার গয়না। বোধ হয় লোকটার উদ্দেশ্য অন্য।

কি উদ্দেশ্য?

আমাদের ওপর নির্যাতন করে আমাদের ঠিকানা বোগাড় করবে, তারপর জ্যাঠাকে লিখবে তোমাদের ছেলে যদি ফেরত চাও, তাহলে দশ হাজার টাকা অমুক জায়গায়, অমুক লোকের হাতে দিয়ে এস।

কিন্তু বাবা অত টাকা পাবে কোথায়?

না দিতে পারলে আমাদের হয়তো কেটে ফেলবে।

তাহলে উপায়?

উপায়, বলা যে আমাদের তিনকুলে কেউ নেই। কে উদ্ধার করবে টাকা দিয়ে!

তাতে কি রেহাই পাব?

কি জানি, লোকটার কি মতলব সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। নদী খুব কাছে। জলের ছলাৎ ছল শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দীপু আর তপু দুজনেই দুর্দান্ত ছেলে। ভয় কাকে বলে জানে না। বয়সের চেয়ে অনেক সাহসী।

কিন্তু এই থমথমে পরিবেশে, নিজের দেশ থেকে এত দূরে একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ল।

আজ রাতটা হয়তো কিছু করবে না, কাল ভোরে চীনে আবার সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন তার মতলব বোঝা যাবে।

ঠিক দীপুর মাথার কাছে একটা শব্দ হতে সে লাফিয়ে খড়ের বিছানা থেকে উঠে এল।

মাথার ওপর একটা ফোকর, তার মধ্য দিয়ে একটা টিফিন কেরিয়ার টেবিলের ওপর নেমে এল।

বোঝা গেল একটা বাঁকানো তারের সঙ্গে টিফিন কেরিয়ারটা আটকানো ছিল। টেবিলের ওপর টিফিন কেরিয়ারটা বসিয়েই তারটা ফোকর দিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল।

দুজনেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল।

তাদের মনে হয়েছিল অদৃশ্য জায়গা থেকে চীনেটা হয়তো খাবার নির্দেশ দেবে।

দশ মিনিট কেটে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই।

দীপু বলল, আয় দেখি টিফিন কেরিয়ারে কি আছে।

সে এগিয়ে টিফিন কেরিয়ার খুলে বাটিগুলো টেবিলের ওপর সাজাল। দুটো বাটিতে লম্বা লম্বা চালের ভাত। দুটো বাটিতে থোড়ের ঝোল। আর একটা জায়গায় দুটো পেঁয়াজ।

খাবারের চেহারা দেখে চোখে জল এল। ক'দিন জাহাজে খাওয়াটা বেশ ভালোই হচ্ছিল। সেরকম জিনিস তারা বাড়িতেও কোনদিন চোখে দেখেনি।

তপু বলল, আয়, আরম্ভ করে দিই।

হাত বাড়িয়েও দীপু হাত গুটিয়ে নিল।

এতে বিষ মেশানো নেই তো?

তপু বলল, এখন আমাদের মেরে ফেলে চীনের লাভ কি? মেরে ফেলবার জন্য নিশ্চয় কষ্ট করে এতদূর নিয়ে আসেনি। আমরা যদি ওর উদ্দেশ্য সফল না করতে পারি, তখন মেরে ফেলার কথা ভাববে।

আর দ্বিধা না করে দুজনে খেতে শুরু করল।

খাওয়া শেষ করে দুজনে খড়ের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

শরীর খুবই পরিশ্রান্ত, কিন্তু উদ্বেগের জন্য ঘুম এল না। দুজনেই এপাশ-ওপাশ করতে লাগল।

একসময়ে কামরা অন্ধকার হয়ে গেল। বোধ হয় লণ্ঠন নিভে গেল কিংবা সেটাকে কেউ ফুটো দিয়ে টেনে ওপরে তুলে নিয়েছে।

রাত গভীর হতে, সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কেবল নদীর জলের আছড়ানির শব্দ একটু একটু করে জোর হতে লাগল।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, কিন্তু একটা হাসির আওয়াজে তপু জেগে উঠল।

দীপু, দীপু।

খুব ফিসফিস করে তপু ডাকল।

বল, আমি জেগে আছি।

দীপুর গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

হাসির আওয়াজ শুনতে পেলি?

হ্যাঁ।

কেউ বোধ হয় এ ঘরে ঢুকবে।

কি জানি বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ আবার হাসির শব্দ। একজনের নয়, একাধিক লোকের। মনে হল হাসির আওয়াজটা যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

দীপু পিছনের দেয়ালে কান পাতল। ঠিক পিছন থেকেই যেন শব্দটা আসছে।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনের আর ঘুম এল না।

খুব জোরে একটা আওয়াজ হতে দুজনেই চমকে উঠে বসল।

দরজা খোলা। ঠিক দরজার গোড়ায় চীনেটা দাঁড়িয়ে আছে।

কি, ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

দীপু চোখ মুছতে লাগল। তপু একদৃষ্টে চেয়ে রইল চীনের দিকে।

বিনা মতলবে চীনে নিশ্চয় এসে দাঁড়ায়নি।

দীপু চেঁচিয়ে উঠল।

কেন তুমি এভাবে আমাদের আটকে রেখেছ?

চীনের হাসি অম্লান। হাসলে মাংসের আড়ালে দুটো চোখ অদৃশ্য হয়ে যায়।

হাসতে হাসতেই বলল, তোমাদের একটা ভাল চাকরি দেব, তাই এখানে রেখেছি। তোমরা যদি আমার কথা শোন, তাহলে খুব উন্নতি হবে তোমাদের। ভাল জামা-কাপড় পাবে, আর পকেটবোঝাই পয়সা। দুহাতে খরচ করবে। আর কথা যদি না শোন—

না শুনি তো কি হবে?

হাসি না থামিয়ে চীনে বলল, না শোন তো—

কথা শেষ না করে সে পা দিয়ে দেয়ালের গায়ে একটা বোতামে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড় করে একদিকের পার্টিশন সরে গেল। লোহার গরাদ। তার পিছনে একটা চিতাবাঘ গর্জন করে উঠল।

দীপু আর তপু লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল।

ভয় নেই, ভয় নেই জোড়া খোকাবাবু, ওটা বন্ধ রয়েছে। এখন কিছু করতে পারবে না। তবে বোতামটা আর একটু জোরে টিপলে ওই গরাদগুলোও সরে যাবে, তখন ও এ ঘরে ঢুকে পড়বে। তোমাদের সঙ্গে মোলাকাত করতে।

চীনের অসাধ্য কোন কাজ নেই, সেটা দীপু আর তপু বেশ বুঝতে পারল।

তপু বলল।

কি কাজ করতে হবে?

বলব, বলব, সময়ে সব বলব। ব্যস্ত হয়ো না। তোমাদের বয়সী একটি ছেলে একবার খুব তেজ দেখিয়েছিল, হুঁ হুঁ, মাংসটা গেল লালীর পেটে, আর হাড়গুলো বস্তাবন্দী করে নদীর জলে ফেলে দিলাম। তাই বলছি, কখনও গুরুজনের অবাধ্য হতে নেই। তোমাদের চা খাওয়ার অভ্যাস আছে তো?

কেউ ভয়ে কোন উত্তর দিল না।

চীনে একটু বাইরে ঝুঁকে সজোরে হাততালি দিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে বেঁটে, কদাকার একটা লোক এসে দাঁড়াল।

চীনে তাকে খুব চেঁচিয়ে বলল।

এই চা নিয়ে আয়।

লোকটা চলে যেতে চীনে বলল, এ ব্যাটা আবার বোবা আর কালা। খুব চেঁচাতে হয় আমাকে।

তপু একবার মুখ ধোবার কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে সামলে নিল।

চা এল, সঙ্গে আধপোড়া রুটি।

দীপু আর তপু লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল

চীনেটা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

দীপু আর তপু ভাবল, এইবার চীনেটা বোধ হয় আস্তে আস্তে দেশের বাড়ির খোঁজখবর নেবে। ঠিকানা চাইবে। যাতে চিঠি লিখতে পারে।

কিন্তু সেরকম কিছু করল না।

শুধু বলল, আজ রাতে একটু জেগে থেক খোকারা। আজ থেকেই তোমাদের চাকরিতে লাগিয়ে দেব।

দীপু বলল।

কিসের চাকরি?

আরে, বেশী জিজ্ঞাসা কর না। বললাম যে ভাল চাকরি। জীবনভোর চাকরি করতে হবে।

কথা শেষ করে চীনেটা হাসল।

চীনের এই হাসিতেই ভয় লাগে। এর চেয়ে যদি গালাগাল দিত কিংবা ধমক, দীপু আর তপু সহ্য করত, কিন্তু এই হাসি অসহ্য।

তপু বলল।

আমাদের চাকরিতে দরকার নেই, তুমি আমাদের জাহাজেই রেখে এস।

দূর, তা কি হয়! আগে কেমন মজার চাকরি তাই

দেখ।

চীনেটা সরে গেল।

বোঝা গেল বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তালাচাবি দেবার শব্দও কানে এল।

সারাটা দুপুর একভাবে কাটল। ঠিক বারোটায় রেকাবিতে ভাত আর তরকারি এল। কয়েক গ্রাস মুখে ঠেকিয়েই দুজনে রেকাবি সরিয়ে রাখল।

ঠাণ্ডা, শক্ত ভাত। বিস্বাদ তরকারি।

দুজনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

দুপুর কেটে বিকাল হল। বিকালের পর সন্ধ্যা।

রাতের খাওয়া শেষ করে দুজনে সবে শুয়েছে। একটু তন্দ্রার ভাব নেমেছে চোখে, এমন সময় ঝনাৎ করে দরজা খোলার শব্দ হল।

কই হে ওঠ, ওঠ, চাকরি করবে তো উঠে পড়।

দুজনে ধড়মড় করে উঠে বসল।

চীনেটা এগিয়ে এসে দুহাতে দুজনকে ধরল তারপর আধো-অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোতে আরম্ভ করল।

চারপাশে ঘন আগাছা, ইটের পাঁজা, মাঝখানে সংকীর্ণ রাস্তা। খুব কাছে না গেলে দেখাই যায় না।

চীনে রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, খুব সাবধানে নেমে যাও।

তপু বলল, নামব কি, পথই যে দেখতে পাচ্ছি না।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের উজ্জ্বল আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়ে গেল।

দীপু আর তপু দুজনেই দেখল, চওড়া সিঁড়ির ধাপ নীচের দিকে নেমে গিয়েছে।

নামো, নামো, দেরি কর না।

তাড়া খেয়ে দীপু আর তপু নামতে শুরু করল। ঘোরানো সিঁড়ি। দুধারে কাঠের রেলিং। একেবারে চাতালে নেমে দুজনেই অবাক্ হয়ে গেল।

টর্চের আলোর আর দরকার নেই। চারদিকে আলোর ব্যবস্থা। দিনের মতন পরিষ্কার।

কাঠের একটা পার্টিশন। তার ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

এবার দীপু আর তপু বুঝতে পারল, কাল রাতে এই হাসির শব্দই তারা শুনতে পেয়েছিল।

এবার চীনে একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল।

এস, আমার সঙ্গে। এদিক-ওদিক দেখবার দরকার নেই।

এভাবে সতর্ক না করলে দীপু আর তপু হয়তো কোন দিকেই দেখত না। সোজা চলে যেত।

কিন্তু চীনের কথাতে দুজনেরই সন্দেহ হল।

তাহলে এদিকে-ওদিকে নিশ্চয় কিছু দেখবার আছে।

লাল পর্দা টাঙানো। শীতের মধ্যেও ভিতরে পাখা ঘুরছে। সেই পাখার বাতাসে মাঝে মাঝে পর্দাটা উড়ছে।

তার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল।

সামনে পাশার মতন একটা ছক ফেলা। চারদিকে চারজন বসে আছে। পরনে ছোট কোট আর রঙিন লুঙ্গি। মাথাতেও রঙিন কাপড়ের টুকরো বাঁধা।

একটা কৌটায় হাড়ের একটা ঘুঁটি নিয়ে ফেলছে আর যে জিতছে, সেই বোধ হয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠছে।

চারজনের পাশেই চারটে গড়গড়া। কেউ নলটা হাতে ধরে আছে, কেউ টানছে।

একেবারে কোণের দিকে একটা ঘরে গিয়ে চীনে চেয়ারে বসল।

তারপর দুজনের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বলল।

এইখানে তোমাদের কাজ করতে হবে। যারা খেলছে, সেবা করতে হবে তাদের।

সেবা ?

সেবা মানে যে লোকগুলো খেলছে তাদের তরিবত করা। সময়ে চা খাবার দেওয়া, অন্য সব ফাইফরমাশ খাটা।

দীপু আর তপু কোন উত্তর দিল না। বুঝতেই পারল উত্তর দিয়ে কোন লাভ নেই। চীনে যা বলবে, তা করতেই হবে। অমান্য করলেই সর্বনাশ।

পরের দিন থেকেই দুজনে কাজে লেগে গেল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাজের আসল চেহারা মালুম হল। পাঁচ মিনিট অন্তর কালো চা দেওয়া, একটু দেরি হলেই লোকগুলো খেপে যেত। কাছে ডেকে চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক প্রহার।

কত রাত পর্যন্ত যে খেলা চলত, তার ঠিক নেই। দীপু আর তপুকে জেগে অপেক্ষা করতে হত আসরের একপাশে।

তারপর সবাই চলে গেলে সেই বোবা আর কালা লোকটা এসে দাঁড়াত। ইঙ্গিতে দুজনকে পিছন পিছন যেতে বলত।

সেই পুরোনো কামরা, পুরোনো খড়ের শয্যা।

দিন পনেরো পরেই বিপদ্ হল।

যেটা শুধু খেলার আসর বলে দীপু আর তপু মনে করেছিল, ক'দিনেই বুঝতে পারল সেটা আসলে জুয়ার আড্ডা।

এক একজন খেলোয়াড়ের পাশে স্তূপীকৃত নোট। খেলার সঙ্গে সঙ্গে সেই নোট হাত বদল করে। যে হারে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, এবং তার সব তাল পড়ে দীপু আর তপুর ওপর।

মাঝরাতে দুজনে কালো চা এনে আসরে রাখছিল। লোকগুলোর তন্ময়তা দেখে মনে হল খেলাটা খুব জোর জমেছে। কেউ কোন কথা বলছে না। কেবল ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ।

হঠাৎ দুম করে একটা শব্দ। মনে হল বন্দুকের।

সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো পাশে রাখা নিজেদের নোটগুলো নিয়ে পকেটে পুরল।

আবার দুম করে আওয়াজ। এবার যেন আরো কাছে।

একটা লোক হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে ঝুলন্ত লণ্ঠনগুলোর ওপর সজোরে আঘাত করল। লণ্ঠনের কাচগুলো ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাতি নিভে সব অন্ধকার।

দীপু আর তপু বুঝতে পারল, সেই জমাট অন্ধকারে একটা ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে। সবাই যেন একটা দিক লক্ষ্য করে ছুটেছে।

দীপু অন্ধকারের মধ্যে তপুর হাতটা আঁকড়ে ধরে বলল।

এই তপু, শীগগির ওদের পিছনে পিছনে চল। ওরা অন্য দিক দিয়ে বের হবার রাস্তা জানে।

দুজনে ছুটতে শুরু করল।

ততক্ষণে সিঁড়িতে একটা টর্চের আলো দেখা গেল। টর্চ নিয়ে কে যেন দ্রুত নেমে আসছে।

সেই টর্চের স্বল্প আলোতেই দেখা গেল একটা আলমারি। তার পাল্লা খুলে সবাই ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

দীপু আর তপু আর একটুও বিলম্ব করল না। আলমারির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গেই আলমারির পাল্লাদুটো একেবারে এঁটে বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দুজনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকগুলো কোন্ দিকে গেল কিছু বুঝতে পারল না।

এটুকু বুঝতে পারল, এতদিন যেটাকে আলমারি ভেবে এসেছে, আসলে সেটা আলমারি নয়, বাইরে যাবার রাস্তা।

বোধ হয় কোথাও কোন স্প্রিং আছে, যার সাহায্যে আলমারির পাল্লাদুটো খোলা এবং বন্ধ করা যায়।

আস্তে আস্তে তপু পা ঘষতে লাগল।

মনে হল ভিতরে যেন ধাপ রয়েছে। নীচে নামবার সিঁড়ি।

দীপু।

উঁ।

মনে হচ্ছে নামবার সিঁড়ি আছে। লোকগুলো এখান থেকেই কোথাও চলে গেছে। আমরা নামবার চেষ্টা করি।

দুজনে হাত আঁকড়ে ধরে খুব সাবধানে পা ফেলে নামতে লাগল।

যেন অনন্ত সোপান। শেষ নেই। বেশ কয়েকবার দুজনেই আছাড় খেতে খেতে সামলে নিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল, আবার নামতে শুরু করল।

যত নামতে লাগল, ততই নদীর কল্লোল স্পষ্ট হতে লাগল। নদী তো কাছেই, এই সিঁড়ি বোধ হয় নদীতেই শেষ হয়েছে।

ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই তপু চেঁচিয়ে উঠল।

দীপু!

চেঁচাবার কারণ দীপুর বুঝতে অসুবিধা হল না।

জলে দুজনের গোড়ালি ডুবে গেছে।

তপু বলল, আর এগোলে আমরা তো নদীর মধ্যে গিয়ে পড়ব।

দীপু কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও তো নিরাপদ নয়। জোয়ারের জল এসে আমাদের ডুবিয়ে দেবে। যদি আমরা সিঁড়ি দিয়ে আরো ওপরে উঠে যাই, তাহলেও বাঁচব না। কতক্ষণ এই অন্ধকার গহ্বরে থাকব ?

তপু বলল, তার চেয়ে জল ঠেলে এগোই চল। লোকগুলো তো এই পথেই গেছে।

দুজনে এগোতে আরম্ভ করল।

জল হাঁটুর ওপর। স্রোত দেখে বুঝতে পারল, এ জল নদীর।

বেশ কিছুটা যাবার পর সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে এল।

মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। দু-একটা তারা জ্বলছে।

নদীর প্রায় মাঝবরাবর একটা মোটরলঞ্চ দেখা গেল।

তপু সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল।

হয়তো লোকগুলো ওই লঞ্চেই পালিয়েছে।

দীপু বলল, খুব সম্ভব, কিন্তু আমরা কি করব ?

চল, এপাশ দিয়ে যাই। নদীর জল ছেড়ে আমাদের ডাঙায় উঠতে হবে।

এদিকে জল কম, কিন্তু কাদা হাঁটু পর্যন্ত। খাড়া পাড়।

দুজনে কাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

সামনেই একটা জেটি। বোধ হয় ব্যবহার হয় না। একদিকটা ভেঙে গেছে।

তপু আর দীপু কাঠে পা দিয়ে দিয়ে সেই জেটির ওপর উঠল।

সর্বাঙ্গে কাদা, বুক পর্যন্ত ভেজা, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ। আর চলবার শক্তি নেই। জেটির এককোণে একটা ছেঁড়া ত্রিপল পড়ে ছিল, কোনরকমে গিয়ে দুজনে তার ওপর শুয়ে পড়ল।

ব্যস, আর চোখ খুলে রাখার ক্ষমতা নেই। দুজনে গাঢ় ঘুমে অচেতন।

কিছু লোকের কলরবে ঘুম ভেঙে গেল।

রোদ উঠেছে। নদীতে বোধ হয় জোয়ার। জলের শব্দ খুব জোর।

দুজনে উঠে বসল।

জেটির ওপর কয়েকজন ভদ্রলোক পায়চারি করছে। নানাজাতের লোক। ভারতীয় আছে, বর্মীও আছে। দু-একজনের সঙ্গে ছেলেপুলেরাও রয়েছে।

ছেলেরা অবাক্ চোখ মেলে তপু আর দীপুর দিকে চেয়ে রয়েছে।

অবশ্য তাদের দোষ নেই। একজন আর একজনের দিকে চেয়েই বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারল। সারা মুখে কাদা, তখনও জামা-প্যান্ট কিছু ভিজে। কিম্ভূতকিমাকার দুটি মূর্তি।

তপু বলল, এবার? এবার কি করবি?

দীপু উঠে দাঁড়াল।

চল, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি পাক দিচ্ছে। অন্ধকার দেখছি চোখে।

আমারও তো সেই অবস্থা।

দুজনে ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

দীপু বলল, আয়, আগে মুখ-হাতের কাদা ধুয়ে ফেলি। এমন অবস্থায় দেখলেই সবাই পাগল ভাববে।

তপু বলল, কোথায় ধুবি?

চল, ওই চায়ের দোকানে একটু জল চেয়ে দেখি। নদীতে নামলে আবার তো কাদার ওপর দিয়ে যেতে হবে।

রাস্তার পাশেই ছোট একটা চায়ের দোকান।

বিরাট এক কেটলি চাপানো। পাশে একটা বড় উনানে রুটি সেঁকা হচ্ছে। সে রুটির সাইজও বিরাট।

টিনের চেয়ার-টেবিল। যারা চা-রুটি খাচ্ছে তাদের দেখে শ্রমিক শ্রেণীরই মনে হল।

দুজনে দোকানের এক ছোকরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু মুখ ধোবার জল দেবে?

ছোকরা একবার মুখটা তুলে ওদের দিকে দেখল, তারপর বলল।

বাইরে বালতি আর মগ আছে।

দোকানে ঢোকবার মুখে জলভরা বালতি ছিল। পাশে মগ।

মুখ-হাত ধোয়া শেষ করে দুজনে আবার দাঁড়াল দোকানের সামনে।

ভীষণ খিদে পেয়েছে। যদি কেউ দয়াপরবশ হয়ে একটু চা কিংবা রুটির টুকরো খেতে দেয়। কারুর প্লেটের ভুক্তাবশেষ খেতেও আজ তাদের কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু কেউ তাদের দিকে একবার ফিরেও দেখল না।

দু-একজন করে শ্রমিকরা উঠে যেতে লাগল।

এই শোন।

খুব মোলায়েম কণ্ঠস্বরে দুজনেই চমকে উঠল।

এতক্ষণ শ্রমিকদের ভিড়ের জন্য চোখে পড়েনি। এবার দেখা গেল।

চোখে কালো চশমা, পরনে দামী ছোট কোট আর লুঙ্গি, একজন বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল, সেই কথা বলল।

তবু নিশ্চিত হবার জন্য তপু বলল।

আমাদের?

লোকটা এবার কথা নয়, ইশারায় ওদের কাছে ডাকল।

চল, লোকটা কিছু খেতে দিতেও পারে।

দুজনেই আস্তে আস্তে এগিয়ে লোকটার টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

অনেকক্ষণ ধরে দেখছি তোমরা দুজনে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছ। কি ব্যাপার বল তো?

তপু একটু ইতস্ততঃ করল। দীপু বলল।

আমরা এদেশে নতুন। জাহাজ থেকে নেমে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।

লোকটা ঘাড় নাড়ল।

তাই বুঝি? তাহলে তো তোমরা ভীষণ মুশকিলে পড়েছ।

হ্যাঁ, এইবার তপু বলল, কাল থেকে আমাদের পেটে কিছু পড়েনি।

আহা হা, তাই তোমাদের মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে। বস, বস, সামনের চেয়ারে বসে পড়।

কথা শেষ হবার আগেই দুটো চেয়ার টেনে দুজনে

বসে পড়ল।

লোকটা দোকানের ছোকরাকে হাত নেড়ে ডেকে বলল।

এই এদের পেট ভরে খাইয়ে দাও তো।

যতক্ষণ দীপু আর তপু খেল, লোকটা বসে বসে কাগজ পড়তে লাগল।

খাওয়া শেষ হতে কাগজটা ভাঁজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

চল, তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি।

দীপুর সঙ্গে তপুর দৃষ্টিবিনিময় হল।

অর্থাৎ, আবার কি ব্যবস্থা! নতুন কোন বিপদের মধ্যে পড়ব না তো!

দীপু ফিসফিস করে বলল।

পৃথিবীর সব লোক অসৎ, তা কি হতে পারে! কিছু ভাল লোকও তো আছে।

তপুর সন্দেহ গেল না।

জিজ্ঞাসা করল, আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করবেন?

চীনেটা পরিষ্কার বাংলা বলত, এ লোকটা ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। ঘোরতর বিপদের মধ্যে না পড়লে এ ধরনের বাংলা শুনলে দীপু আর তপু দুজনেই হাসাহাসি করত।

লোকটা বলল, জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা। তোমাদের কথা তাদের জানিয়ে দেব, যাতে অন্য একটা জাহাজে তোমাদের ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেয়।

আবার ভারতবর্ষ, তার মানে অভিভাবকের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো।

যে অপরাধ দুজনে করেছে তাতে এবার হয়তো পিঠের ছালচামড়া তুলে দেবে।

তবু বিদেশে এই অনিশ্চিত জীবনের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে, এভাবে বিপদের পর বিপদের ঝুঁকি নেবার চেয়ে, দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল।

রাস্তার ওপর কালো একটা মোটর।

লোকটা মোটরের দরজা খুলে বলল।

একটু সাবধানে উঠ, ভিতরে আমার অনেক জিনিস রয়েছে।

সত্যিই তাই। সীটের ওপরে, নীচে ছোট বড় অনেক প্যাকেট।

দুজনে গুঁড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে লোকটা দুজনের নাকের ওপর রুমাল চেপে ধরল দুহাতে। তীব্র ওষুধের গন্ধ। মাথা ঘুরে গেল। আস্তে আস্তে চোখের ওপর কালো যবনিকা নেমে এল।

প্রথমে তপু চোখ মেলল। তারপর দীপু।

দুজনে বড় একটা খাটে শুয়ে ছিল।

এদিক-ওদিক চোখ ফেরাতেই চায়ের দোকানে দেখা লোকটা নজরে পড়ল। দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসে ছিল।

এদের চোখ মেলতে দেখে সে খাটের পাশে এসে দাঁড়াল।

কি, শরীর কেমন লাগছে?

তপু চেঁচিয়ে উঠল।

শরীরের খোঁজ নিচ্ছ? তুমিই তো নাকে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করিয়ে দিয়েছিলে।

লোকটা হাসল। আকর্ণবিস্তৃত হাসি, কিন্তু নিঃশব্দ।

হাসি থামতে বলল, এমনি কি আর তোমরা আসতে। চেঁচামেচি শুরু করে লোক জড় করে ফেলতে। আমি পড়তাম মুশকিলে।

দরজায় খট্ করে একটা শব্দ হল।

দীপু আর তপুকে সচকিত করে সেই চীনেটা ঘরে ঢুকল।

তাকে দেখে বর্মী লোকটা বলল।

এই যে আ লিম খুড়ো এসে গেছে। তোমাদের সঙ্গে খুড়োর তো চেনা আছেই।

আ লিম এগিয়ে এসে দীপু আর তপুর পিঠ চাপড়াল।

বাহাদুর ছেলে। কাল রাতে পুলিসের লোককে খুব ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছ। তোমরা ধরা পড়লেই মুশকিলে পড়তাম। তোমাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত।

দীপু হঠাৎ বলল।

পুলিসের লোকই বা তোমার আড্ডায় হামলা করল কেন?

খাটের এক প্রান্তে বসে পড়ে আ লিম মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

আর বল কেন। ওদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। যত শান্তিপ্রিয় লোকদের পিছনে লাগাই ওদের স্বভাব।

দীপু আর তপু কিছু বলল না। ওটা জুয়ার আড্ডা সেটা যে ওদের অজানা নয়, এ কথা জানতে পারলে আ লিম হয়তো খেপেই যাবে।

আ লিম বলল।

যাক, তোমরা খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। বিকেলে তোমাদের এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব।

কথা শেষে করে আ লিম আর দাঁড়াল না। খাট থেকে নেমে বেরিয়ে গেল।

তখন দীপু বর্মীটাকে বলল।

তুমি যে বলেছিলে আমাদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেবে।

বর্মী মুখ মুচকে হাসল।

কি হবে দেশে ফিরে! এখানে থেকে যাও। এ বড় মজার দেশ। যাক, আগে তোমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করি।

খাওয়াদাওয়া ভাল। থাকার ব্যবস্থাও উত্তম।

তবে জানলা দিয়ে বাইরে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেল দুজন বর্মী ছোকরা পাহারা দিচ্ছে। দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ।

আ লিম এল বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে।

এই নাও তোমাদের জন্য নতুন পোশাক এনেছি, পরে নাও। এবার আমরা বেড়াতে বের হব।

আ লিম খাটের ওপর দুটো নতুন সার্ট আর নতুন প্যান্ট ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দীপু বলল, এই জামা-প্যান্টটার আর পদার্থ নেই। নতুন পোশাক পরি, কি বল?

তপু ম্লান হাসল, খুড়ো যখন বলেছে, তখন পরতেই হবে। এখানে আমাদের মতামতের কোন দাম নেই।

একটু পরে আবার আ লিম ঢুকল।

পরা হয়ে গেছে? বেশ বেশ, চল, বের হই এবার।

তিনজনে বের হল।

কালো একটা মোটর সামনে। সমস্ত কাঁচগুলো কালো রং দেওয়া। বাইরে থেকে ভিতরের কিছু দেখার উপায় নেই।

এরা উঠতেই মোটর ছেড়ে দিল।

বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না, ভিতর থেকে কাঁচে চোখ রাখলে বাইরের সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

দীপু আর তপু কাঁচে চোখ রেখে দেখতে লাগল।

একটু গিয়েই চোখে পড়ল সোনালী রং করা গম্বুজাকৃতি একটা মন্দির। সিঁড়ি বেয়ে অনেকে উঠছে।

এটা কিসের মন্দির?

তপু জিজ্ঞাসা করল।

আ লিম দেখল না। গাড়ির মধ্যে চোখ রেখেই বলল, ওটা হচ্ছে সুলে প্যাগোডা। মানে, ছোট ফয়া। বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে এখানে।

প্যাগোডা পার হয়ে মোটর ছুটল। অনেকটা যাবার পর দুপাশের দৃশ্য দেখে তপু আর দীপুর মনে হল, মোটর শহরের সীমানা পার হয়ে গ্রামে ঢুকছে। বাঁশের বেড় দেওয়া ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। বিরাট সাইজের কাঠের গুঁড়ি কোথাও স্তূপাকার করা।

একসময়ে মোটর থামল।

চারদিকে ফাঁকা মাঠ। ছোট ছোট ঝোপ। একটা বড় নালা। তার ওপর বাঁশের সাঁকো।

আ লিম বলল।

আমার একটা উপকার করতে পারবে?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করল।

এই মাঠটা পার হয়ে একটা কাঠের একতলা বাড়ি দেখতে পাবে। তার মালিকের হাতে এই প্যাকেটটা দিয়ে আসতে হবে। বলবে, এ মাসের খোরাক। আমিই যেতাম কিন্তু সকাল থেকে কোমরে একটা ব্যথা হয়েছে, চলতে কষ্ট হচ্ছে।

দীপু বলল, কিন্তু আমাদের ভাষা ও লোকটা বুঝবে কেন?

বা, ঠিক কথা বলেছ, আ লিম খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কথাটা আমার খেয়ালই হয়নি। কোন কথা বলতে হবে না, তোমরা দুজনে বরং একসঙ্গে মাথায় একটা হাত রেখ। তাহলেই আমার বন্ধু বুঝতে পারবে।

দীপু আর তপু সাঁকো পার হয়ে এগিয়ে চলল।

অনেকটা যাবার পর পিছন ফিরে দেখল। আ লিম মোটরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।

এটার মধ্যে কি আছে বল তো তপু?

বোঝাই যাচ্ছে কোন নিষিদ্ধ জিনিস। গাঁজা, আফিং কিংবা কোকেন। বুড়োর কোমরে ব্যথার কথা সব বাজে, বিপদটা আমাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিল। ধরা পড়ি তো আমরা পড়ব।

দীপু একবার এদিক-ওদিক দেখে বলল।

চারদিক ফাঁকা। পালাবার চেষ্টা করলে হয়।

উঁহু, নিশ্চয় চারদিকে বুড়োর চর আছে। পালানো সম্ভব হবে না। ধরা পড়লে নির্যাতন শুরু হবে। একেবারে খতম করে দেওয়াও বিচিত্র নয়।

দুজনে দ্রুত পা ফেলে চলতে লাগল।

একটা খালের ধারে একতলা বাংলো। চারদিকে বাগান। ধারেকাছে যখন আর কোন বাড়ি নেই, তখন এটাই হবে।

লোহার ফটক। বন্ধ।

কাছে গিয়েই দীপু আর তপুর খেয়াল হল, কি বলে

ডাকবে? লোকটার নাম তো জানা নেই। এ বাড়িতে অনেকগুলো লোক যদি থাকে, তাহলে প্যাকেটটা কার হাতে দেবে?

দুজনে আলোচনা করতে করতে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল।

হাত দিয়ে গেটটা তো নাড়ানো যাক। দেখি কে আসে।

গেটটা হাত দিয়ে ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শব্দ।

চমকে দুজনে পিছিয়ে এল।

গেটের ওপারে নেকড়ে বাঘের সাইজের এক কুকুর। লকলক করছে জিভ। দুটো থাবা গেটের ওপর দিয়ে বিকট গর্জন করে চলেছে।

কি ভাগ্যিস, গেটটা বন্ধ ছিল, নাহলে বাঘের মতন ওই কুকুরটা এতক্ষণে দুজনের টুঁটি কামড়ে ধরত।

পালিয়ে যাবে কিনা ভাববার মুখেই বারান্দায় একটি লোক এসে দাঁড়াল। মাথাজোড়া চকচকে টাক, ঝোলা গোঁফ, চোখ দুটো এত ছোট যে আছে কিনা বোঝাই দুষ্কর।

কে? কি চাই?

উত্তরে দীপু প্যাকেটটা তুলে ধরল। তপু একটা হাত রাখল নিজের মাথায়।

মনে হল প্যাকেটটা দেখে লোকটা যেন একটু প্রসন্ন হল।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে কি বলল। অমন বাঘের মতন তেজী কুকুর পলকে শান্ত হয়ে গেল।

গেটটা খুলতেই দীপু আর তপু কিন্তু বেশ কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু না, কুকুরটা এল না। ল্যাজ গুটিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

লোকটা এগিয়ে এসে এদিক-ওদিক দেখল তারপর কোন কথাবার্তা নয়, চিলের মতন ছোঁ মেরে প্যাকেটটা নিয়েই বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেট বন্ধ করে দিল।

দীপু আর তপু তো অবাক্।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা ফেরার পথ ধরল।

পথে তপু বলল, আমাদের দিয়ে কেন এসব করাচ্ছে বুঝতে পারছিস?

পারছি বইকি। পুলিস যদি ধরে আমাদের ধরবে। তাছাড়া আমরা এদেশে নতুন, পথঘাট চিনি না, ওদের আস্তানাও জানি না। কাজেই পুলিসের কাছে কিছুই বলতে পারব না।

আমাদের তাহলে সাবধান হওয়া উচিত।
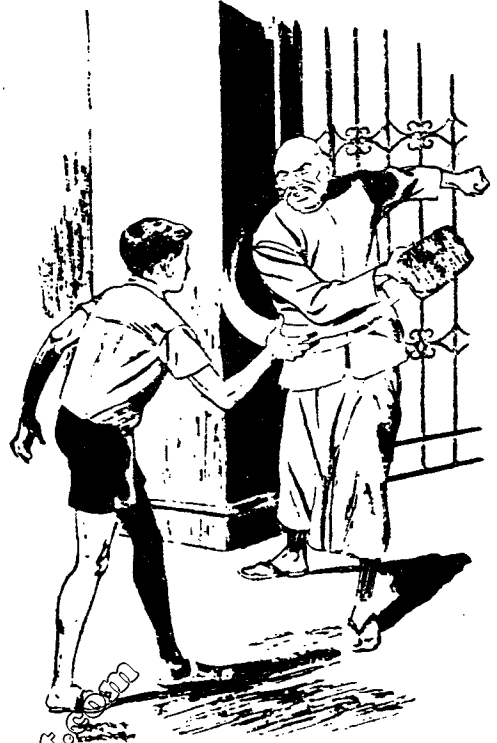
চিলের মতন ছোঁ মেরে প্যাকেটটা

সাবধান আর কি করে হব? এদের কাজ করব না বললে হয়তো মেরেই ফেলবে।

তা সত্যি।

সাঁকো পার হয়ে দুজনে রাস্তায় এসেই অবাক্।

রাস্তা ফাঁকা। মোটর কোথাও নেই। আ লিমও নয়।

চারদিকে একটু একটু করে অন্ধকার নামছে। কাছাকাছি বসতি নেই বলে, আলোও দেখা যাচ্ছে না। এধারে-ওধারে জোনাকির মেলা।

তাইত মোটর কোথায় গেল?

তপুর কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল সে ভয় পেয়েছে।

আমাদের ফেলে চলে গেল নাকি?

কিন্তু তাতে চীনের লাভ?

কি জানি, হয়তো পুলিস ঘোরাফেরা করছিল, দেখে মোটর নিয়ে সরে পড়েছে।

উপায়?

চল, যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিকে হাঁটতে আরম্ভ করি।

দুজনে তাই করল। বুঝতে পারল এতটা পথ হেঁটে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ঠিক করল, রাস্তায় যদি কোন বাড়ি পায়,

সেখানে আশ্রয় চাইবে।

তাতেও অসুবিধা কম নয়। এদেশের ভাষা জানে না। নিজেদের বিপদের কথা বোঝাবে কি করে?

কিছুটা গিয়েই দুজনে চমকে উঠল।

মোটরের হর্ন, অথচ ধারেকাছে কোথাও মোটর নেই।

দুজনে দাঁড়াল।

একটু পরেই ঝোপের আড়াল থেকে একটা মোটর বেরিয়ে এল।

মোটর থেকে আ লিম নামল।

আরে, দুজনে হনহন করে চলেছ কোথায়?

কি করব, রাস্তায় মোটর দেখতে পেলাম না।

আ লিম হাসল। আধো-অন্ধকারে তার সোনাবাঁধানো দাঁতগুলো চকচক করে উঠল।

রাস্তার মাঝখানে মোটর রাখতে আছে? ফাঁকা রাস্তা, কখন আর কোন গাড়ি এসে ধাক্কা লাগিয়ে দেবে, তাই একপাশে মোটর সরিয়ে রেখেছিলাম। নাও নাও, উঠে এস।

দীপু আর তপু মোটরে উঠে বসল।

মোটর চলতে শুরু হতে আ লিম জিজ্ঞাসা করল।

জিনিসটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছ তো?

তপু বলল, তা দিয়েছি, কিন্তু কি সাংঘাতিক কুকুর! কামড়ালে আর বাঁচতে হত না আমাদের।

আ লিম আবার হাসল।

বুঝলে না, ওরকম ফাঁকা জায়গায় থাকে, বিপদ্ ঘটতে কতক্ষণ। সেইজন্যই বাঘা কুকুর রেখেছে।

দীপু প্রশ্ন করল।

আচ্ছা ও জিনিসটা কি? যেটা আমরা দিয়ে এলাম।

অন্ধকারে আ লিমের মুখ দেখা গেল না। মনে হল দাঁতে দাঁত চেপে সে যেন অস্ফুট একটা শব্দ করল।

তারপর ঢোঁক গিলে বলল।

ওষুধ, ওষুধ। বেচারী হাঁপানিতে ভুগছে। বাড়ি থেকেও বের হতে পারে না, তাই ওষুধ পাঠিয়ে দিলাম।

সারাটা রাস্তা আর কোন কথা হল না।

পুরোনো আস্তানায় পৌঁছে বর্মী লোকটির হাতে দুজনকে ছেড়ে দিয়ে আ লিম চলে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর তিনজনে কথা হল।

দীপুই শুরু করল।

তুমি আমাদের দেশে ফেরার কি করলে?

একটা কাঠি দিয়ে বর্মী দাঁত খুঁটছিল। খুঁটতে খুঁটতেই বলল।

দেশে ফিরে আর কি করবে তোমরা? এখানেই থেকে যাও, তোমাদের ভাল হবে।

দীপু রেগে উঠল।

ছাই ভাল হবে। রোজ রোজ আমাদের দিয়ে গাঁজা কোকেন চালান দেবার চেষ্টা। পুলিসের কাছে ধরা পড়লে কি হাল হবে আমাদের?

দীপুর কথার সঙ্গে সঙ্গে বর্মীর সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে বজ্রকঠিনস্বরে বলল।

বেশী চালাক হবার চেষ্টা কর না, বিপদে পড়বে। ঠিক যা বলব, সেইটুকু করে যাবে। কোন কথা বলবে না। তোমাদের মতন অবাধ্য গোটা তিনেক ছেলে আমাদের হাতে এসেছিল। মেজাজ দেখিয়েছিল, তিনটেই চিতাবাঘের খোরাক হয়ে গেছে। সাবধান।

বর্মীটা উঠে বেরিয়ে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত দুজনের চোখে ঘুম এল না। বিছানায় চুপচাপ বসে রইল। কথা বলতেও সাহস হল না। এরা বাংলা বোঝে। বলা যায় না, চারদিকে হয়তো কান পেতে রেখেছে।

পরের দিন উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

যখন উঠল, তখন রোদ্দুর তেজ খুব কড়া।

বিছানায় বসে দেখল, টেবিলের ওপর দু কাপ চা আর দু বাটি শিমের বীচিসিদ্ধ পড়ে রয়েছে।

মুখ-হাত ধুয়ে দুজনে খেয়ে নিল।

আ লিম এল বিকালের দিকে।

নাও নাও, মুখ-হাত ধুয়ে নাও। বিকালে একটু না বের হলে শরীর থাকবে কি করে!

ওদের স্বাস্থ্যের জন্য এত উদ্বেগের আসল কারণ বুঝতে দুজনেরই কোন অসুবিধা হল না।

কিন্তু এও বুঝল, এটা আদেশ।

এ আদেশ মানতেই হবে।

সেই মোটর, তবে আজ মোটর নদীর ধার দিয়ে চলল।

কয়েকটা জাহাজও দীপু-তপুর চোখে পড়ল আর সেই সঙ্গে তাদের দুটো চোখ জলে ভরে উঠল।

কোনরকমে যদি একটা জাহাজে ওরা উঠতে পারত তাহলে ক্যাপ্টেনের হাতে-পায়ে ধরে যেমন করে হোক দেশে ফেরার ব্যবস্থা করত।

মোটর থামল। যেখানে থামল সেখানে কোন জেটি নেই। কাদাভর্তি জমি। কিছু সাম্পান মাঝখানে ঘোরাফেরা করছে।

আ লিম নেমে এদিক-ওদিক দেখল তারপর চাপাগলায়

ড্রাইভারকে কি বলল। ড্রাইভার বিচিত্র ঢংয়ে হর্ন বাজাতে শুরু করল। প্যাঁ প্যাঁ পোঁ। প্যাঁ প্যাঁ পোঁ।

বারকয়েক বাজাতেই মাঝদরিয়া থেকে একজন মাঝি সাম্পানের ওপর দাঁড়িয়ে, দুটো হাত মুখের পাশে দিয়ে চীৎকার করল, তারপরই জল কেটে কেটে সাম্পান ডাঙ্গার দিকে নিয়ে এল।

বাঁশের একটা খুঁটিতে সাম্পান বেঁধে মাঝি কাদা ভেঙে ওপরে উঠে আ লিমকে সেলাম করল।

আ লিম দীপু আর তপুকে দেখিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলল। মাঝি ঘাড় নাড়ল।

তারপর আ লিম দীপু আর তপুর দিকে ফিরে বলল।

তোমরা সাম্পানে ওপারে চলে যাও। ঘাটে একজন লোক থাকবে। তোমরা যেতেই জিজ্ঞাসা করবে, ওপারে চালের দর কি রকম? তোমরা বলবে, এপারের মতনই। ব্যস, তারপর লোকটা তোমাদের পথ দেখিয়ে যে বাড়িতে নিয়ে যাবে, সে বাড়ির মালিককে এই প্যাকেটটা দিয়ে আসবে। বুঝতে পেরেছ?

ঘাড় নেড়ে, আ লিমের কাছ থেকে মাঝারি সাইজের একটা প্যাকেট নিয়ে দীপু আর তপু মাঝির সঙ্গে নেমে গেল।

খুব সন্তর্পণে কাদার ওপর দিয়ে দীপু আর তপু সাম্পানে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে মোটর ছেড়ে দিল।

দীপু চুপিচুপি তপুকে জিজ্ঞাসা করল।

আমাদের ফেরার কি হবে?

তপু বলল, ভগবান্ জানেন। বোধ হয় ওপারের লোকটাই তার নির্দেশ দেবে।

ওপারে পৌঁছতে আধ ঘণ্টা লাগল।

ভাঙা একটা ঘাট। ইট বের-করা। কাছেপিঠে কেউ নেই।

দুজনে সমস্যায় পড়ল। তাহলে কে নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে?

মাঝি নামিয়ে দিয়েই সাম্পান নিয়ে সরে গেল।

দীপুর হাতে প্যাকেটটা ছিল। সার্টের মধ্যে।

দুজনে ঘাটের চাতালে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখল। কাউকে দেখতে পেল না।

অনেক দূরে কয়েকটা বস্তি। দু একটা কারখানাও দেখা যাচ্ছে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ওগুলো বোধ হয় চালের কল। বইতে দীপু আর তপু পড়েছিল বর্মাদেশ চালের জন্য বিখ্যাত।

কিন্তু লোক না থাকলে কি করবে এই প্যাকেট নিয়ে। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

ফিরেই বা যাবে কি করে! সাম্পান অনেক দূরে চলে গেছে।

মুশকিল হল তো!

তপু বলল।

ঘাটের কাছে বিরাট ঝাঁকড়া একটা বটগাছ। বড় বড় ঝুরি মাটিতে নেমেছে। নীচেটা অন্ধকার।

দুজনে এসে বটগাছতলায় দাঁড়াল।

তারপর একটু উঁকি দিয়েই তপু দীপুকে বলল।

ওই দেখ।

দীপু সেদিকে দেখেই ভ্রূ কোঁচকাল।

বটগাছের নীচে একজন বুড়ো মুচী। খুব বুড়ো। মুখের গালের মাংস ঝুলে পড়েছে। চোখে চশমা। চশমার ডাঁটি নেই, সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে জড়ানো। একমনে একটা চটিতে পেরেক ঠুকছে।

দীপু বলল, এ ছাড়া তো আর ধারেকাছে লোক দেখছি না।

তপু বলল, চল, ওর সামনে গিয়েই দাঁড়ানো যাক।

দুজনে মুচীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মুচী মুখ তুলল না। ওদের ছায়ার দিকে চোখ রেখে বলল।

চাউলকা ও তরফমে কেয়া দাম?

দীপু আর তপু দুজনেই সামান্য হিন্দী জানত। তাদের বাড়ির গয়লা হিন্দুস্থানী। তাছাড়া তাদের বাড়ির আশেপাশে কলকারখানা। সেখানে অনেক হিন্দুস্থানী শ্রমিক ছিল। তাদের কল্যাণে ওরা দুজনেই হিন্দী শিখেছিল।

দীপু বলল, এ তরফকা মাফিক একই হ্যায়।

এবার মুচী মুখ তুলে দুজনকে দেখল, তারপর জুতো সারাবার সরঞ্জাম বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দু-এক মিনিট, তারপরই মুচী চলতে আরম্ভ করল।

দীপু আর তপু পিছন পিছন চলতে লাগল।

একটু পরেই মুচী এত দ্রুত চলতে লাগল যে দীপু আর তপুর পক্ষে তাল রাখাই দুষ্কর হয়ে উঠল।

তপু বলল, চলা দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না মুচীটা এত বুড়ো।

দীপু চাপাগলায় বলল, কিছু বলা যায় না। সবই হয়তো ছদ্মবেশ।

পাকা সড়ক শেষ হয়ে কাঁচা পথ শুরু হল। দু পাশে জলা। ছোট ছোট কুঁড়ে। শুয়োর আর মুরগীর পাল চরছে।

এঁকে-বেঁকে অনেকটা চলার পর মুচী থামল।

একটা পোড়ো বাড়ি। ইটের ফাটলের পাশে পাশে বট অশথের চারা। পিছন দিকটা ধসে গিয়েছে। ইটের টুকরো সাজানো ছোট রাস্তা। পাঁচিল বোধ হয় একটা ছিল একসময়ে, এখন তার চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে কেবল ইটের চাঙড়।

একদম সিধা আন্দার চলা যাও। একদম আন্দার।

মুচী হাত প্রসারিত করে বাড়ির মধ্যেটা দেখিয়ে দিল।

দীপু আর তপু আশা করেছিল, মুচী আর দাঁড়াবে না। চলে যাবে।

হলও তাই। মুচী হনহন করে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকছে কি না এটা একবার ফিরেও দেখল না।

দীপু আর তপু আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকল।

চৌকাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই এক ঝাঁক পায়রা ঝটপট করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

ওরা একটু অপেক্ষা করে চৌকাঠ পার হল।

কেউ কোথাও নেই। ঘরদোরের ধুলোভরা অবস্থা দেখে মনে হয়, এ বাড়িতে অনেকদিন বোধ হয় কোন লোকের বাস ছিল না।

এমন এক জায়গায় আ লিম প্যাকেট দেবার জন্য কেন পাঠাল?

আরো ভিতরে ঢুকল।

একটা হলঘর। বড় একটা খাবার টেবিল। দু পাশে গোটা ছয়েক চেয়ার। টেবিল খালি। কোন খাবার জিনিস নেই।

হলঘর পেরিয়ে ওরা পাশের একটা ঘরে ঢুকল।

ছোট ঘর। এপাশে একটা ক্যানভাসের খাট। কোণের দিকে একটা চেয়ার। তার সামনে টেবিল।

দরজার কাছে দাঁড়াতেই দেখতে পেল।

একটা লোক চেয়ারে পিছন ফিরে বসে আছে। একটু যেন ঝুঁকে পড়েছে টেবিলের ওপর। বোধ হয় কিছু পড়ছে।

একেবারে তন্ময় হয়ে, কারণ দীপু আর তপুর পায়ের শব্দেও লোকটি ফিরল না।

দীপু বলল, কি করা যায়?

তপু বলল, চেঁচিয়ে ডাকব।

কি বলে ডাকবি?

তার চেয়ে এক কাজ করি।

কি কাজ?

দরজায় ঠকঠক করি, তাহলেই ফিরে দেখবে।

তাই ঠিক হল।

প্রথমে তপু, তারপর দীপু, শেষকালে একসঙ্গে দুজনে ঠকঠক করতে লাগল দরজায়।

লোকটার সাড়া নেই।

তাইত, লোকটা বসে বসে ঘুমাচ্ছে নাকি?

কিন্তু কি ঘুম রে বাবা, এত আওয়াজেও ঘুম ভাঙছে না!

আমাদের যে দেরি হয়ে যাবে। এতটা পথ হেঁটে ফিরতে হবে, তারপর নদী পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। কি করা যায়?

চল, আমরা এগিয়ে টেবিলের ওপর প্যাকেটটা রেখে আসি।

দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

অদ্ভুত ঘর। একটা জানলা পর্যন্ত নেই। টেবিলের ওপর ল্যাম্প জ্বলছে। খুব জোর পাওয়ার। দেয়ালে গোটা তিনেক ছবি, দুটো সরু মাদুর টাঙানো, মাদুরের ওপর প্রাকৃতিক দৃশ্য।

দুজনে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকটার ঝুঁকে পড়ে বসাটা যেন অস্বাভাবিক।

পরনে সার্ট আর প্যান্ট। পা খালি। লোকটার মুখটা দেখা গেল না।

এবারে সাহস করে দীপু লোকটাকে একটা ঠেলা দিল। মৃদু ঠেলা।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা কাত হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

চেয়ারটা ছিটকে পড়ল এপাশে।

দীপু আর তপু চীৎকার করে একদিকে সরে গেল।

লোকটা মারা গেছে।

দীপু কাঁপতে কাঁপতে কথাগুলো বলল।

কিন্তু মরেও এভাবে চেয়ারে বসে ছিল কি করে?

বোধ হয় চেয়ারের হাতলে কোনরকমে আটকে গিয়েছিল, ধাক্কা দিতে পড়ে গিয়েছে।

বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনের মনে সাহস হল।

তপু টেবিল ল্যাম্পটা নামিয়ে মেঝের ওপর নিয়ে এল।

লোকটা বোধহয় এদেশী। দুটো চোখ বিস্ফারিত। যেন কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে। অথচ কোথাও গুলির কিংবা ছোরার দাগ দেখতে পেল না।

তাহলে কি করে মরল লোকটা?

বিষে মৃত্যু হলে, দীপু আর তপু শুনেছিল যে, মৃত নীল হয়ে যায়। সে রকম তো কিছু হয়নি।

আর নয়, চল আমরা পালাই এখান থেকে।

তপু বাতিটা মেঝের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল।

চল।

দুজনে আস্তে আস্তে বাইরের দিকে এগোতে লাগল।

দুটো পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া তাদের এই প্রথম।

কোনরকমে মুক্ত আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে যেন বাঁচে।

যেতে যেতে তপু হোঁচট খেল। দেয়ালে টাঙানো মাদুরটা চেপে ধরে কোনরকমে টাল সামলাল।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য কাণ্ড।

সমস্ত দেয়ালগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল। ঠিক যেন ভূমিকম্প।

কাছে দড়াম করে একটা শব্দ হল।

কিসের শব্দ তখন ওরা বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারল চৌকাঠের কাছে গিয়ে।

বাইরে যাবার ভারী কাঠের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ!

দীপু আর তপু প্রাণপণ শক্তিতে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। চীৎকার করল।

দরজা এক ইঞ্চি ফাঁক হল না। বাইরে থেকে কেউ এল না সাহায্যের জন্য।

দুজনে আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল।

অন্য কোন দিক দিয়ে বাইরে যাবার পথ আছে কিনা তার খোঁজে এদিক-ওদিক দেখল। পাশে একটা খুব ছোট ঘর রয়েছে। আপাতত ঘুটঘুটে অন্ধকার।

দীপু টেবিল ল্যাম্পটা টেনে এদিকের ঘরে নিয়ে আসার চেষ্টা করল। ছোট তার। বেশীদূর আনা গেল না।

অল্প আলোতে যেটুকু দেখা গেল তাতেই দীপু আর তপুর আতঙ্কে দুটো চোখ কপালে উঠল।

কাঁচের ছোট, বড় জার। তার মধ্যে নানারকমের সাপ। কেউ চুপচাপ নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে, কেউ ফণা প্রসারিত করে কাঁচের ওপর ছোবল দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নীল বিষ গড়িয়ে পড়ছে।

এ দৃশ্য দেখে দীপু এত ভয় পেয়ে গেল যে তার হাত কেঁপে টেবিল ল্যাম্পটা আছড়ে পড়ল। মাটিতে পড়বার আগে সেটা কাছের একটা কাঁচের জারের ওপর পড়ল।

ছোট্ট জার, তার ভিতরের সাপটাও ছোট। হলদে রং, তার ওপর কালো কালো ফোঁটা।

কিন্তু জার থেকে বাইরে এসে সেই ছোট্ট সাপটা ল্যাজে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দুটো চোখ যেন জ্বলছে। লকলক করছে চেরা জিভ। ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ।

প্রথমেই সাপটা টেবিল ল্যাম্পটার ওপর ছোবল দিল। ল্যাম্পটা মাটিতে পড়ে ছিল, ছোবলের সঙ্গে সঙ্গে আরো গড়িয়ে গেল। তারটা সরে যাওয়াতে নিভে গেল।

ঘন অন্ধকার। কোথাও একটু আলো নেই। সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে বিষাক্ত, ক্রুদ্ধ সেই সাপ গর্জন করে বেড়াচ্ছে। অন্য জারের কাঁচে তার ল্যাজের আছড়ানি শোনা যাচ্ছে। সামনে যা পাচ্ছে, তাতেই বোধ হয় ছোবল দিচ্ছে।

সেই ঘরে দীপু আর তপু পাগলের মতন একদিক থেকে আর একদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল।

কিছু দেখা যাচ্ছে না। কোনরকমে যদি কোন জারের ওপর গিয়ে পড়ে, তাহলে আর দেখতে হবে না। বিষাক্ত দংশনে দুজনেই শেষ হয়ে যাবে।

আর চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেই মৃত্যু এড়াতে পারবে, এমন সম্ভাবনাও কম। সাপটা নিষ্ফল আক্রোশে সারাটা ঘর ছুটে বেড়াচ্ছে।

কোনরকমে পাশের ঘরে চলে যাবে তাও সম্ভব নয়। দরজার গোড়াতেই জারের ভাঙা কাঁচ আর টেবিল ল্যাম্প পড়ে রয়েছে। ছুটতে গিয়ে পায়ে কাঁচ ফুটলে, কিংবা তার জড়িয়ে গেলেও বিপদ্ কম নয়।

দীপু আর তপু ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ ছপাৎ করে একটা শব্দ।

দীপুর পাশের দেয়ালে সাপটা আছড়ে পড়ল।

মাগো! বলে দীপু লাফিয়ে উঠল।

লাফিয়ে উঠতেই দেয়ালে একটা হাতলে হাত ঠেকে গেল।

সেটা আঁকড়ে ধরে সে ঝুলতে লাগল।

পায়ের তলায় সাপটা গর্জন করে চলেছে।

তপু বেগতিক দেখে দীপুর কোমর জড়িয়ে দুটো পা গুটিয়ে নিল।

কিন্তু এভাবে ছোট একটা হাতল ধরে দীপু কতক্ষণ ঝুলে থাকবে! তার ওপর তপুর ভারও তার ওপর।

সাপটাও বোধ হয় ওদের সন্ধান পেয়েছে।

লাফিয়ে উঠে বার বার দেয়ালে ছোবল দিচ্ছে। প্রায় তপুর পায়ের কাছ বরাবর।

হাত দুটো পিছলে যাচ্ছে, তাই দীপু প্রাণপণ শক্তিতে হাতলটা আঁকড়ে ধরল।

হঠাৎ খট্ করে একটা শব্দ, তারপরই ঘড়ঘড় করে একটানা আওয়াজ। মনে হল দেয়ালটা আস্তে আস্তে যেন সরে যাচ্ছে।

কি হচ্ছে বোঝবার আগেই দীপু আর তপু গড়িয়ে পড়ল। দেয়ালের ওপাশে। আবার শব্দ করে দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তপু প্রথমে উঠে বসল।

জায়গাটা খুব অন্ধকার নয়। কোথা থেকে ম্লান নীলচে আলো আসছে।

তপু আস্তে আস্তে ডাকল।

দীপু, দীপু।

একটু দূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল।

উঁ।

শব্দ অনুসরণ করে হামাগুড়ি দিয়ে তপু এগিয়ে গেল। এত নীচু ছাদ, উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

দুটো বস্তার মাঝখানে দীপু পড়ে রয়েছে।

তপু কাছে গিয়ে গায়ে হাত ঠেকাতেই দীপু উঠে বসল।

বেশী লেগেছে ?

দীপু মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল।

না, আচমকা ছিটকে পড়ে কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

দুজনে পাশাপাশি বসল।

তপু বলল।

আমাদের সঙ্গে সাপটা তো এদিকে ঢুকে পড়েনি ?

দীপু একবার এদিক-ওদিক চেয়ে বলল।

বোধ হয় না। দেয়াল ফাঁক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পা দুটো ছুঁড়তেই মনে হল সাপটা পায়ের ধাক্কায় যেন ছিটকে গেল। খুব ঠাণ্ডা বরফের মতন একটা স্পর্শ।

কিন্তু এ জায়গাটা কি ?

কিছু বুঝতে পারছি না। একবার ঘুরে দেখা যাক।

সিঁড়ির মতন দুটো ধাপ। তারপর প্রশস্ত একটা হল।

একটা টেবিল, চারটে চেয়ার। পাশে একটা আলমারি।

দীপু আলমারি খুলে ফেলল।

পাঁউরুটি, বিস্কুট, টিনভরতি মাছ, সিরাপ, আরও নানারকমের জিনিস সাজানো।

দীপু আর থাকতে পারল না।

বলল, জায়গাটা পরে দেখব, আগে আয় খেয়ে নিই। খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছি।

দুজনে পেট পুরে খেয়ে নিল।

শরীর কিছুটা ঠিক হল। পেটের মধ্যে মাঝে মাঝে যে যন্ত্রণা হচ্ছিল, সেটা কমল। দীপু আর তপু দুজনেরই।

চল, এদিক-ওদিক দেখি এইবার।

আমার মনে হয়, এটা বোধ হয় ওদের লুকোবার জায়গা। কাদের ?

যারা এই সব গাঁজা আফিং কোকেনের ব্যবসা করে। সেইজন্য সারা বাড়িতে এত সব কলকবজা বসানো। পুলিস হানা দিলে এইখানে কিছুদিন লুকিয়ে থাকে।

লোকটাকে মারলে কে ?

দীপু বলল, কি জানি! দলের কেউ হয়তো। এসব ব্যবসায় ভাগ নিয়ে রেষারেষি হয়। বইতে পড়িসনি ?

তপু ঘাড় নাড়তে গিয়েই থেমে গেল। লাফিয়ে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ে বলল, সাপ, সাপ।

ঠিক পাশেই সোঁ সোঁ করে শব্দ। একটানা।

দীপুও তপুর মতন টেবিলের ওপর উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার নজরে পড়ে গেল।

ছাদ ফুঁড়ে একটা টিনের নল ওপরে উঠেছে। বাইরে থেকে বাতাস সেই নলের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, তারই সোঁ সোঁ আওয়াজ।

ব্যাপারটা বুঝলি তপু, সাপ নয়।

তবে ?

বিজ্ঞানের বইতে পড়িসনি, অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মাটির তলার এই সব কামরায় ওই নল দিয়ে বাতাস আসছে।

কিন্তু কোনরকমে যদি ওই বাতাস বন্ধ হয়ে যায় ?

তাহলেই আমরা খতম।

তপু টেবিল থেকে নেমে পড়ল। এখানে ছাদ খুব নীচু নয়, তারা কোনরকমে দাঁড়াতে পারে।

বলল, চল, এদিক-ওদিক ঘুরে দেখি, বের হবার কোন রাস্তা আছে নাকি।

দুজনে হাঁটতে লাগল। বেশী হাঁটতেও হল না। সামনেই বাধা। পাথরের শক্ত দেয়াল। অর্থাৎ, পথ বন্ধ।

দীপু বলল, তার মানে ?

তপু পাথরের দেয়ালের নানা জায়গায় ঘুষি মেরে দেখল। সবটাই নিরেট, কোথাও ফাঁপা নয়।

মেঝের ওপর বসে পড়ে তপু বলল।

তাহলে বুঝতে হবে বের হবার অন্য কোন পথ নেই। যেখান দিয়ে ঢুকেছিলাম, সেখান দিয়েই বের হতে হয়।

কিন্তু তা কি করে হবে, সে দরজা তো বন্ধ।

বন্ধ হোক, এদিক থেকেও খোলবার কোন কলকবজা নিশ্চয় আছে। বোধ হয় বিপদের আশঙ্কা দেখলে হাতল টেনে এই সুড়ঙ্গঘরে সবাই চলে আসত, কিছুদিন কাটিয়ে আবার কোনরকমে এদিক থেকে দেয়াল সরিয়ে ওদিকে

চলে যেত। চল, ওই দেয়ালের কাছে গিয়ে একবার দেখি।

দুজনে যেখান দিয়ে ছিটকে পড়েছিল, আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

এদিকে পাথর নয়, পালিশকরা কাঠের দেয়াল।

দীপু আর তপু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন হাতল বা বোতাম দেখতে পেল না।

ক্লান্ত হয়ে দুজনে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল।

দীপু বলল, আচ্ছা খাবার ঘর তো রয়েছে, কিন্তু লোকগুলো শোয় কোথায়?

দুজনেই এদিক-ওদিক দেখল।

প্রথমে আলো থেকে এসে আধো-অন্ধকারে দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল। এখন এখানে কিছুকাল কাটাবার পর চারদিক বেশ পরিষ্কার।

দীপুই এদিক-ওদিক দেখে বলল।

আমার মনে হচ্ছে এই নরম বস্তাগুলোর ওপরই বোধ হয় শুত। ভিতরে কি আছে কে জানে, বেশ নরম বলে মনে হচ্ছে।

দীপু আর তপু উঠে দাঁড়িয়ে বস্তাগুলো দেখল। কোণের দিকে গোটা তিনেক ছোট ছোট বস্তা। বোঝা গেল, এগুলো মাথার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর বড় বস্তাগুলো শোবার গদি।

এত নরম, ভিতরে কি আছে কে জানে।

দীপু টিপে টিপে দেখল।

দাঁড়া দেখছি আমি।

তপু খাবার ঘরে চলে গেল। আলমারির মধ্যে সে ছুরি কাঁটা চামচ দেখেছিল। একটা কাঁটা হাতে করে ফিরে এল।

কাঁটাটা সজোরে বস্তার এককোণে বসিয়ে দিতেই কালো গুঁড়ো হাতের ওপর ঝরে পড়ল।

সেগুলো নিয়ে আলোর নীচে গিয়ে দুজনে দাঁড়াল।

দেখেই বুঝতে পারল এগুলো কাঠের মিহি গুঁড়ো।

এইজন্যই এগুলোর ওপর ছিটকে পড়তে দুজনের বিশেষ লাগেনি।

এবার তপু বলল, এবার আমাদের কি কর্তব্য?

কি আর কর্তব্য! শুয়ে পড়া উচিত। নিশ্চয় অনেক রাত হয়েছে। অবশ্য এখানে ঘড়ি যখন নেই আমাদের কাছে, তখন রাত-দিন সবই সমান। তবে বিকালে আমরা প্যাকেট হাতে লোকটার ঘরে ঢুকেছিলাম, তারপর অনেক সময় কেটেছে। এখন যে রাত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

দুজনে দুটো বস্তার ওপর শুয়ে পড়ল। ছোট বস্তা মাথায় দিয়ে।

ভেবেছিল, শুলেই ঘুম আসবে, কিন্তু এল না। নানারকম চিন্তা মাথায় এল।

এমনও তো হতে পারে আর কোনদিনই দরজা খুলল না। ক্রমে ক্রমে খাবার সব শেষ হয়ে গেল, কিংবা বাইরের বাতাস কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে দীপু আর তপুর নিশ্চল দেহ বিদেশের এই অন্ধকূপে পড়ে থাকবে। কেউ কোনদিন খোঁজ পাবে না।

যদি দরজা খুলে যায়, তাহলে যারা খুলবে তারা দীপু আর তপুকে ছাড়বে না। কি করে এখানে এল তার কৈফিয়ত তলব করবে।

যদি প্রয়োজন বোধ করে, কিংবা সন্দেহ করে, তাহলে এদের মতন দুটো ছোট ছেলেকে শেষ করে দেওয়া একটা সমস্যাই নয়।

হঠাৎ কথাটা মনে হতেই তপু বিছানার ওপর উঠে বসল।

দীপু, দীপু, ঘুমালি?

দীপু ঘুমায়নি। একটা হাত চোখের ওপর রেখে আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

সে উত্তর দিল।

কিরে তপু?

সেই প্যাকেটটা আমরা কোথায় ফেলে এসেছি?

ওই লোকটার টেবিলের ওপর।

ওই প্যাকেটে কোনরকম চিহ্ন নেই তো?

কি জানি লক্ষ্য করিনি। কেন?

ভাবছি যদি কোনরকম সংকেতচিহ্ন থাকে, আর মৃত্যুর কিনারা করতে এসে পুলিসের হাতে ওই প্যাকেট পড়ে, তাহলেই সর্বনাশ।

কেন, সর্বনাশ কেন?

সর্বনাশ নয়? পুলিস হয়তো সেই সংকেতচিহ্ন অনুসরণ করে আ লিমকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

করুক, আমাদের কি।

ওদের দলে তো অনেক লোক থাকে। তাদের রাগটা থাকবে আমাদের ওপর। যদি এখান থেকে কোনরকমে উদ্ধারও পাই, তাহলেও আর নিরাপদে দেশে পৌঁছাতে পারব না। দলের লোক আমাদের শেষ করে দেবে।

তপু চুপ করে শুনল। কিছু বলল না। বলার মতন তার কিছু ছিলও না।

অনেক রাতে, কত রাতে জানবার উপায় নেই, ওদের

তপু পাগলের মতন কাঠের দেওয়ালে ঘুষি মারছে

মনে হল কাঠের দেয়ালের ওপাশে যেন কতকগুলো মানুষের চলার শব্দ পাওয়া গেল। কারা যেন জোরে জোরে হাঁটছে।

দীপু আর তপু দুজনেই উঠে বসল।

কিছু বলা যায় না, এখনই হয়তো কাঠের পার্টিশন ফাঁক হয়ে যাবে। সেই ফাঁক দিয়ে পিস্তল হাতে লোকেরা এপাশে ঢুকে পড়বে।

ঠিক যেমন রহস্যকাহিনীতে ওরা পড়েছে।

তারপর! তারপর কি হবে ওরা ভাবতে পারল না। ভাবতে সাহসই হল না।

দেশের বাড়ির কথাটা মনের সামনে ভেসে উঠল। সেখানকার আত্মীয়স্বজনের কথা।

কিন্তু না, কিছুক্ষণ পরে সব নিঃঝুম। আওয়াজ থেমে গেল।

দীপু আর তপু ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়ল।

দীপু যখন জাগল, তখনও তপু ঘুমাচ্ছে।

তপুকে আর ডাকল না। দীপু উঠে খাবার ঘরে গেল। জলের বোতল থেকে জল ঢেলে চোখ-মুখ ধুয়ে ফেলল।

ফিরে এসে দেখল তপুও উঠেছে।

দুজনে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার সারা এলাকাটা পর্যবেক্ষণ শুরু করল। একেবারে কোণে একটা স্নানের ঘরও আছে। বস্তা আড়াল ছিল বলে দেখতে পায়নি।

একভাবে দুটো দিন দুটো রাত কাটল।

অবশ্য দীপু আর তপুর হিসাবে। বাইরে দিন না রাত বোঝবার উপায় নেই।

তিন দিনের দিন বিপদে পড়ল। আলমারি খালি। খাবার সব শেষ। শুধু জলের বোতল রয়েছে।

দীপু কপাল চাপড়াল।

সর্বনাশ, কি হবে?

তপু কিছু বলল না।

দুজনেই বুঝতে পারছিল খাবার ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু দুজনেরই মনের গোপনে আশা ছিল, কিছু একটা হবে। ওরা হয়তো এই পাতাল থেকে মুক্তি পাবে।

কি হবে এইবার!

থালায় পাঁউরুটির গুঁড়ো পড়ে ছিল, দুজনে সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেল। সিরাপের বোতলে জল দিয়ে তাই পান করল।

বিকালে দুজনে আলমারির প্রত্যেকটি তাক ভাল করে খুঁজল।

সব পরিষ্কার। কোথাও একটি দানাও নেই।

একটু তাড়াতাড়ি দুজনে শুয়ে পড়ল।

ভোরে উঠে আর দাঁড়াবার শক্তি নেই।

বস্তায় হেলান দিয়ে দুজনে চুপচাপ বসে রইল।

এতদিন যে আশাটুকু নির্ভর করে বাঁচছিল, সেটাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মাটির নীচে এই অন্ধকূপে যে তাদের মৃত্যু—এ বিষয়ে আর তাদের কোন সন্দেহ নেই।

একসময়ে দুজনে উঠল।

জলের বোতলও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অবশ্য স্নানের ঘরের চৌবাচ্চায় তখনও জল রয়েছে। দরকার হলে সেই জলই পান করবে।

দুজনে একচুমুকে বোতলের জল শেষ করে ফেলল।

টিন আর বোতলগুলো আছড়ে ফেলল মাটিতে। একেবারে তলায় কিছু সিরাপ, কিছু জেলি লেগেছিল, আঙুল দিয়ে দীপু আর তপু যার নাগাল পাচ্ছিল না, কাঁচের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে তাই চাটতে লাগল।

খেতে খেতে একটু পরে নোনতা স্বাদ লাগতেই দুজনে চমকে উঠল।

হাত দিয়ে দেখল, ঠোঁট কেটে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে।

জল দিয়ে দুজনে ঠোঁট ধুয়ে ফেলল।

তারপর আবার ফিরে গিয়ে বসল বিছানায়।

কথা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শরীর ভীষণ দুর্বল।

অনেকক্ষণ পরে তপু বলল।

দীপু, কে আগে শেষ হবে কিছু ঠিক নেই। যদি আমি আগে যাই, আর কোনরকমে তুই মুক্তি পাস্, তাহলে দেখিস আমার দেহটা যেন শেয়াল-কুকুরে না খায়। একটা সদগতি হয়।

কান্নায় গলার স্বর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তপু আর কথা বলতে পারল না।

দীপুর চোখেও জল। দুটো ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

সারারাত দুজনে এপাশ-ওপাশ করল। চোখে একফোঁটা ঘুম এল না।

পরের দিন দীপু উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তপু পারল না।

সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইল।

দীপু বলল, কি মনে হচ্ছে জানিস তপু।

তপু কোন উত্তর দিল না। শুধু দুটো ভ্রূ তুলল।

যদি সুড়ঙ্গের মধ্যে না থেকে, ওপরে কোন জঙ্গলের ধারে এই অবস্থা হত, তাহলে গাছের একটা পাতাও আস্ত থাকত না। সব খেয়ে শেষ করতাম।

আবার দীপু খোঁজা শুরু করল।

শুধু আলমারির ভিতরটা নয়, সারা মেঝে।

যদি অন্য দিনের খাবারের একটু অংশও মেঝের ওপর পড়ে থাকে!

কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই।

নিজের জন্য দীপু অতটা ভাবছে না। ভাবছে তপুর জন্য। বয়সের অল্প ব্যবধান, ভাই হলেও দুজনে বন্ধুর মতন। ছেলেবেলা থেকে একভাবে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে।

যদি দুজনে একসঙ্গে শেষ হয়ে যায়, তাহলে ক্ষোভের কিছু নেই। একজনের চরম দুর্দশা আর একজনকে চোখে দেখতে হবে না।

কিন্তু তা কি হবে!

ঈশ্বর কি এত করুণাময় হবেন!

অন্ততঃ দীপু আর তপুর প্রতি ঈশ্বরের করুণা যে কম, সে পরিচয় তারা পেয়েছে এর আগে। কোনদিনই তিনি এদের প্রতি সদয় নন।

সদয় হলে তাদের এমন অবস্থা হবে কেন?

আচ্ছন্নের মতন দুজনে শুয়ে রইল।

মাঝরাতে হঠাৎ দুম দুম শব্দে দীপুর ঘুম ভেঙে গেল।

বিছানার ওপরে উঠে বসেই সে চমকে উঠল।

তপু উঠে পাগলের মতন কাঠের দেয়ালে ঘুষি মারছে।

তার চুল উস্কখুস্ক, দুটো চোখ লাল।

জড়ানো গলায় কেবল বলছে।

খোল, খোল, খোল।

দীপু বুঝতে পারল তপু প্রকৃতিস্থ নয়। অনাহারে তার মাথার গোলমাল হয়েছে।

দীপু লাফিয়ে গিয়ে তপুকে জড়িয়ে ধরল।

এই তপু, তপু, কি করছিস!

তপু কোন উত্তর দিল না। দীপুর দিকে ফিরেও দেখল না।

দেয়ালে অনবরত ঘুষি মারতে লাগল।

এত জোরে তপু ঘুষি মারছে, একটু পরেই তার হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।

দীপু তপুকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল দেয়ালের কাছ থেকে।

পারল না। তপুর গায়ে যেন অসীম শক্তি।

দীপু প্রাণপণ চেষ্টায় তাকে সরিয়ে আনার জন্য টানল।

দুজনেই জড়াজড়ি করে সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল।

পাছে গড়িয়ে আরো নীচে পড়ে যায়, সেই ভয়ে দীপু জোরে সিঁড়ির একটা ইট আঁকড়ে ধরল।

আশ্চর্য কাণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে ইটটা খসে পড়ল।

ফাঁকের মধ্যে চকচকে একটা হাতল।

কিছু না ভেবেই দীপু হাতলটা ধরে টানল।

ঘড়ঘড় শব্দে কাঠের দেয়াল ফাঁক হয়ে গেল।

দু-তিন মিনিট তপু আর দীপু কোন কথা বলতে পারল না। নির্বাক বিস্ময়ে সেই ফাঁকের দিকে চেয়ে রইল।

তপু ছুটে এপারে আসছিল, দীপু বাধা দিল।

দাঁড়া তপু, এখন যাসনি। আমি আগে উঁকি দিয়ে চারদিক দেখে আসি।

তপু বস্তায় হেলান দিয়ে বসল।

দীপু সাবধানে পা ফেলে দেয়ালের কাছে এল।

মুখ বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখল।

আশ্চর্য কাণ্ড, সমস্ত জার অদৃশ্য। সাপের চিহ্নমাত্রও নেই।

তার মানে, দীপু আর তপু যখন সুড়ঙ্গপুরীতে ছিল, তখন নিশ্চয় কেউ এসেছিল এখানে।

দীপু পাশের ঘরে গেল।

আরো তাজ্জব ব্যাপার!

মৃতদেহ নেই। সব পরিষ্কার।

দীপু আবার ফিরে গিয়ে ফাঁকের কাছে দাঁড়াল।

ভিতর দিকে চেয়ে ডাকল।

এই তপু, বাইরে চলে আয়।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তপুর চলার শক্তি ছিল না। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, কিন্তু মুক্তির আনন্দে তপু সব যন্ত্রণা ভুলল।

লাফিয়ে এপারে চলে এল।

চলে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি হল ?

দীপু জিজ্ঞাসা করল।

আচ্ছা ফাঁকটা বন্ধ হচ্ছে না কেন ? আমরা যখন ভিতরে ঢুকেছিলাম, তখন তো সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তপুর এই প্রশ্নের উত্তরে দীপু ভ্রূ কোঁচকাল।

যাকগে, যা ইচ্ছা হোক। চল, আমরা এখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করি।

তপু বলল, এখন নয়। আর একটু অন্ধকার হোক। কিছু বলা যায় না, কেউ হয়তো এ বাড়ির ওপর নজর রাখছে।

দীপু আর তপু এদিকের ঘরে এসে দাঁড়াল।

যেখানে মৃতদেহ পড়ে ছিল, সেখানে ঝুঁকে পড়ে দেখল। মেঝেটা যেন চকচক করছে। তেল পড়লে যেমন হয়।

এদিকে একটা ছোট ঘর।

সেখানে ঢুকেই দুজনে লাফিয়ে উঠল।

র‍্যাকের ওপর সারি সারি ডিম। খোঁজ করলে আরো কিছু হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

দেয়াল আলমারিটা খুলে দুজনে দেখল। কোথাও কিছু নেই।

র‍্যাকে দেশলাই পাওয়া গেল।

এ ঘর থেকে দীপু পুরোনো কাগজ যোগাড় করল। খালি টিন।

এক একজন গোটা চারেক করে ডিমসেদ্ধ খেয়ে একটু ধাতস্থ হল।

তারপর একেবারে কোণের ঘরে এসে দুজনে বসল।

তপু বলল, একদিন আমরা যে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম, সেই দিনই বোধ হয় কেউ এসে সাপসুদ্ধ জার আর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে।

কারা সরাবে ? পুলিসের লোক ?

পুলিসের লোক নাও হতে পারে। হয়তো যে লোকটা মারা গেছে, তাদের বিপক্ষ দলের কেউ। যাতে কেউ লাশ পরীক্ষা না করতে পারে, সেইজন্য।

তপু গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। দেখে দীপু জিজ্ঞাসা করল।

কিরে, কি ভাবছিস ?

আমি ভাবছি ফাটলটা বন্ধ হচ্ছে না কেন ? কলকবজা কি গোলমাল হয়ে গেল !

থাক খোলা, আমাদের কি !

উহুঁ, তপু মাথা নাড়ল, পরীক্ষা করে একবার দেখতে হচ্ছে।

সেকি রে, তুই আবার ওর মধ্যে ঢুকবি নাকি ?

আবার, মাথা খারাপ !

তপু উঠে এদিক-ওদিক ঘুরে একটা মোটা কাঠের টুকরো নিয়ে এল।

সেটা দিয়ে সজোরে সিঁড়ির ধাপের ওপর আঘাত করল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড় করে শব্দ। দেয়ালের ফাঁকটা বন্ধ হয়ে গেল।

তপু ঠিক সময়ে সরে এসেছিল।

সে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ঠিক তাই ভেবেছি।

কি ভেবেছিস ?

এদিক থেকে ছিটকে যখন আমরা ওদিকে গিয়ে পড়েছিলাম, তখন সিঁড়ির ওই ধাপের ওপর পড়ার জন্য দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধাপের ওপর ভার পড়লে ফাঁকটা বন্ধ হয়ে যায়, এইরকম কিছু কলকবজার ব্যাপার আছে।

ইতিমধ্যে বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে।

দীপু বলল, চল, এবার আমরা বেরিয়ে পড়ি।

তপু উঠে পড়ল।

দাঁড়া, বাকি ডিমকটা সঙ্গে নিই। কখন কি অবস্থায় থাকি কিছু বলা যায় না। সঙ্গে রসদ থাকা দরকার।

একটা কাগজের মধ্যে ডিমগুলো নিয়ে তপু দীপুর পাশে এসে দাঁড়াল।

কিছু বলা যায় না, আবার নতুন কোন্ বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়বে দুজনে। এ দেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা বিপদ্ চলেছে। প্রাণে যে বেঁচে আছে, এই যথেষ্ট।

এগোতে গিয়েই দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দরজা বন্ধ।

মনে পড়ে গেল, এ ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দীপু বলল।

এখন উপায়! কি করে বাইরে যাব!

এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে তপু বলল।

নিশ্চয় কোথাও কোন কলকবজা আছে। সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

কি করে করবি?

মনে করে দেখ, প্রথম এ ঘরে ঢুকে কে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

একটু পরেই তপুর নিজেরই মনে পড়ে গেল।

আমি হোঁচট খেয়েছিলাম, টাল সামলাতে দেয়ালের এই মাদুরটা আঁকড়ে ধরি, এই না?

দীপু ঘাড় নাড়ল।

তপু দেয়ালের মাদুরটা সরাল। ছোট একটা হাতল নীচের দিকে নামানো।

সে হাতলটা ওপর দিকে ঠেলে দিতেই কাজ হল।

কাঁপতে কাঁপতে দরজাটা খুলে গেল।

দুজনে আর এক তিল বিলম্ব না করে ছুটে বেরিয়ে এল।

মাঠের মধ্যে এসে এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখল।

ধারেকাছে কাউকে দেখা গেল না।

তপু বলল, এরপর কোথায় যাব?

দীপু বলল, আমাদের নদীর ওপারে যেতে হবে। শহরে। তারপর ভাগ্যে যা আছে, হবে।

চল।

মেঠো পথ ধরে দুজনে এগোল।

কয়েক পা গিয়েই তপু দাঁড়াল। দীপুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ওই যে ঝোপ দেখছিস?

দীপু ঘাড় নাড়ল।

সুড়ঙ্গপুরীর বাতাস বেরোবার নলটা ওর মধ্যে আছে, তাই চট্‌ করে কারো নজরে পড়ে না।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে আবার দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করল।

নদীর ধারে যখন এসে পৌঁছল, বেশ রাত হয়েছে।

কাছাকাছি একটাও সাম্পান নেই।

ঘাটের ওপর তপু আর দীপু বসল।

চোখ রইল জলের দিকে। যদি কোন সাম্পান চোখে পড়ে, ডাকবে।

আধঘণ্টার ওপর কিছু দেখতে পেল না।

একটা মোটরলঞ্চ তীরবেগে জল কেটে বেরিয়ে গেল।

তারপর ঢেউয়ের দোলার ওপর একটা সাম্পান দেখা গেল।

সাম্পানটা এদিকেই আসছে।

দুজনেই মাথার ওপর হাতটা তুলে চেঁচাতে লাগল।

মাঝি দেখতে পেয়েছিল। সাম্পানটা ঘাট বরাবর এনে রাখল।

এখানে সব মাঝিই ভারতীয়। চট্টগ্রামের অধিবাসী, কাজেই কথা বলতে কোন অসুবিধা হল না।

মাঝিকে দীপু বলল, আমরা ওপারে যাব।

সঙ্গে বড় কেউ নেই?

তপু ঘাড় নাড়ল, না।

ঠিক আছে, চলে এস।

সাম্পান যখন নদীর মাঝামাঝি, তখন দীপু জিজ্ঞাসা করল।

ওপারের নাম কি?

বৈঠা চালাতে চালাতে মাঝি বলল, ডালা।

তারপরই কি খেয়াল হতে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

তোমরা এদেশে নতুন বুঝি?

দীপু মাথা দোলাল, অর্থাৎ হাঁ।

মাঝি আবার প্রশ্ন করল।

এখানে থাক কোথায়?

দীপু একটু ঢোঁক গিলে বলল।

জেটির কাছে এক হোটেলে আছি।

কোন্ জেটি?

দীপু আর তপু উত্তর দেবার আগে মাঝি নিজেই বলল।

ব্রুকিং স্ট্রীট জেটির কাছে তো? বুঝেছি, রয়েল হোটেল।

দীপু আর তপু কথা বাড়াল না। বুঝতে পারল কথা বাড়ালেই বিপদে পড়বে।

সাম্পান এপারে ঘাটে এসে লাগল।

কাদায় একটা বাঁশ পুতে সাম্পান বেঁধে মাঝি বলল।

দাও, ভাড়াটা মিটিয়ে দাও। অনেক রাত হয়েছে।

তপু আর দীপু নিজেদের পকেট থেকে পয়সা বের করল। আট আনা আর চার আনা। সবসুদ্ধ বারো আনা। এই পয়সা নিয়েই তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

বারো আনা পয়সা মাঝির হাতে দিতেই সে রেগে উঠল।

তার মানে? এত রাতে পার করালাম, তাও দুজনকে। ভাড়া মাত্র বারো আনা!

আমাদের কাছে আর একটি পয়সাও নেই, বিশ্বাস কর।

দরদস্তুর না করে সাম্পানে ওঠ কেন? আমি দু টাকা ভাড়া চাই।

দীপু মাঝির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তুমি বরং আমাদের পকেটে হাত দিয়ে দেখ। যদি কিছু পাও, নিয়ে নিও।

মাঝি দুজনের দিকে ভাল করে দেখল, তারপর বলল।

ওই কাগজের ঠোঙায় কি?

তপু ভয়ে ভয়ে বলল, ডিম।

কটা?

গোটা আষ্টেক আছে।

দাও ওগুলো আমাকে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে মাঝি খপ্ করে তপুর হাত থেকে কাগজের ঠোঙাটা কেড়ে নিল।

বাঁশ থেকে দড়ি খুলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল।

যাও, যাও, নেমে পড়। আমি সাম্পান ছাড়ব।

অগত্যা দুজনে লাফিয়ে কাদার ওপর নেমে পড়ল।

কাদা ভেঙে রাস্তার ওপর এসে উঠল।

রাস্তা ফাঁকা। কোথাও কিছু নেই।

দীপু রাস্তার একপাশে বসে পড়ে বলল।

এখন উপায়?

উপায় আর কি! শহরের দিকে হাঁটা যাক। কোনরকমে যদি সেই জেটিতে গিয়ে পৌঁছতে পারি, আর দেখি কোন জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে ক্যাপ্টেনের হাতে-পায়ে ধরে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করব।

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

শহর তো অনেকটা পথ।

দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করল।

মাঝে মাঝে দু-একটা কুকুরের চীৎকার শোনা গেল। গোটাকয়েক কুকুর তাদের তেড়েও এল। ঢিল ছুঁড়ে দুজনে তাদের তাড়াল।

পথে বারদুয়েক বিশ্রাম করে নিল।

কিছুক্ষণ পরে দীপুর খেয়াল হল।

দেখ তপু, পিছনে একটা আলো দেখা যাচ্ছে।

তপু চেয়ে দেখল।

আলোটা স্থির নয়, চলমান।

দুজনে একপাশে সরে এসে দাঁড়াল। যাতে আলোটা এগিয়ে তাদের পাশ কাটাতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, আলোটা এগোল না। সমান দূরত্ব রেখে একভাবে জ্বলতে লাগল।

কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না তো?

তার আর আশ্চর্য কি!

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দুজনে আবার চলতে আরম্ভ করল।

এক জায়গায় অনেকগুলো গাছের জটলা। ডাল বেয়ে কিছু লতাগাছ উঠে জায়গাটা ঝুপসি অন্ধকার করে রেখেছে।

কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই দীপু আর তপুর কানে একটা গোঙানির শব্দ এল।

কোথায় যেন কে কাঁদছে?

দীপু বলল। রাত্রে শকুনের বাচ্চা ঠিক ওইরকমভাবে কাঁদে। তাড়াতাড়ি চল।

তাড়াতাড়ি যেতে গিয়েও কিন্তু পারল না।

দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

মানুষের গোঙানির শব্দ। যন্ত্রণায় কে যেন ছটফট করছে। খুব কাছে।

একবার দেখে এলে হয়।

তপু বলল।

আবার কোন বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ব।

দীপু সাবধান করে দিল।

উঁকি দিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি।

একটা কচুঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখেই দুজনে চমকে উঠল।

আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না। আবছা সব কিছু দেখা যাচ্ছে।

একটা লোক ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে চাপ চাপ রক্ত।

সেও বোধ হয় দীপু আর তপুকে দেখতে পেয়েছিল।

অনেক কষ্টে একটা হাত তুলে দুজনকে ডাকল।

একটু ইতস্ততঃ করে দীপু আর তপু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

মুখের নীচেটা মাফলার দিয়ে ঢাকা। দুটো চোখে যন্ত্রণার ছায়া।

হাত বাড়িয়ে দীপুর একটা হাত ধরল, আর একটা হাত প্রসারিত করে দিল তপুর দিকে।

তপু তার একটা হাত আঁকড়ে ধরল।

দুজনের সাহায্যে লোকটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে একটু দূরে দেখিয়ে জড়ানো গলায় কি বলল।

যেদিকে লোকটা আঙুল নির্দেশ করল সেদিকে চোখ দুটো কুঁচকে দুজনে দেখল। কতকগুলো গাছের ফাঁকে একটা সাদারঙের বাড়ি।

লোকটা ইঙ্গিত করে যা বলল, তাতে দীপু আর তপু এইটুকু বুঝতে পারল লোকটা ওই বাড়িতে যেতে চায়। আর সেজন্য তার দীপু আর তপুর সাহায্যের প্রয়োজন।

লোকটার যেমন অবস্থা, একলা হাঁটা তার পক্ষে অসম্ভব।

দীপু আর তপু লোকটার হাত নিজেদের কাঁধের ওপর

রেখে আস্তে আস্তে পা ফেলে রাস্তা ছেড়ে মাঠের ওপর দিয়ে চলতে লাগল। জোরে চললে পাছে লোকটার ঝাঁকুনি লাগে সেজন্য যথাসম্ভব সতর্ক হল।

বাড়ির কাছ বরাবর এসে তপু একবার পিছন ফিরে দেখল।

ঠিক ঝোপটার পাশে আলোটা স্থির হয়ে রয়েছে।

দীপুকে কথাটা বলতে গিয়েই তপু থেমে গেল।

লোকটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল।

তপুরই দোষ। সে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে দেখতে গিয়ে লোকটার হাতে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল।

বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু দীপু হাত রাখতেই খুলে গেল।

খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজনে ভিতরে ঢুকল না।

দরজা সম্বন্ধে দীপু আর তপুর ভয় ছিল।

তাই দুজনে দরজাটা ভালো করে পরীক্ষা করে তবে বাড়ির মধ্যে পা রাখল। হঠাৎ আবার দরজাটা না বন্ধ হয়ে যায়।

সে রকম কিছু হল না। একটা বড় সোফার ওপর লোকটাকে সাবধান শুইয়ে দিয়ে দুজনে বেরোতে গিয়েই বাধা পেল।

লোকটা হাততালি দিল।

ওরা ফিরতে হাতের ভঙ্গীতে জল চাইল। জল যে পাশের ঘরে পাওয়া যাবে তাও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল।

পাশে ছোট একটা ঘর। গ্লাস, প্লেট সাজানো। মাঝখানে টেবিল, চেয়ার। বোধ হয় খাবার ঘর।

তপু বলল, এ বাড়িটা বোধ হয় লোকটারই হবে, কিন্তু কে ওভাবে মাথায় চোট মারল?

দীপু গ্লাসে জল ভরতে ভরতে বলল, বোধ হয় ডাকাতরা আক্রমণ করে পয়সাকড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। দয়া করে প্রাণে মারেনি।

লোকটাকে জল দিয়ে যদি কিছু খেতে চাই, নিশ্চয় না বলবে না।

দেখা যাক।

দুজনে আবার এদিকের ঘরে এল। দীপুর হাতে জলের গ্লাস। পিছনে তপু।

এ ঘরে ঢুকেই দুজনে ভয়ে চীৎকার করে উঠল।

দীপুর হাত থেকে ঝনঝন শব্দে গ্লাসটা মেঝের ওপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

যে লোকটা কিছুক্ষণ আগে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে কাতরাচ্ছিল, সে যে এভাবে এর মধ্যে রিভলভার হাতে নিয়ে বসবে সেটা দীপু আর তপু ধারণাও করতে পারেনি।

কিন্তু আরো বিস্ময়ের কথা, এ লোকটার চেহারার সঙ্গে নদীর ওপারে পোড়োবাড়িতে চেয়ারের ওপর মৃত লোকটার চেহারার কোন প্রভেদ নেই।

তাহলে সে লোকটা কি মৃতের ভান করেছিল?

তাই বা কি করে সম্ভব!

গায়ে হাত ঠেকতেই লোকটা যেভাবে মেঝের ওপর ছিটকে পড়েছিল, সেটা জীবিত লোকের পক্ষে কোনরকমেই সম্ভব নয়।

দীপু আর তপু এগোবার চেষ্টা করতে গিয়েই থেমে গেল।

লোকটা ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল।

সাবধান, শয়তানের বাচ্চারা, আর এক পা এগোলেই খতম করে দেব। আমার রিভলভারে সাইলেন্সার লাগানো আছে। একটু শব্দ হবে না। শুধু সামান্য একটু ধোঁয়া, ব্যস, কাজ শেষ।

দুজনে দরজার গোড়ায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে আবার বলতে লাগল।

সত্যি কথা বল, আমার যমজ ভাইকে কে শেষ করেছে?

এবার দীপু আর তপু বুঝতে পারল। তাহলে যে লোকটা মারা গেছে, সে এর যমজ ভাই। তাই চেহারায় এমন মিল।

তপু কাঁপতে কাঁপতে বলল।

কে শেষ করেছে, আমরা কি করে জানব।

সে আর কথা শেষ করতে পারল না।

লোকটা মেঝের ওপর সজোরে বুট ঠুকল।

চোপরাও, মিথ্যাবাদী কেউটের ছানা! তোরা আ লিমের চর সেটা আমার জানতে বাকি নেই। ঠিক কিনা বল?

এবার দীপু মাথা নাড়ল।

না, আমরা কারুর চর নই। আমরা বিদেশে এসে বিপদে পড়েছি।

তাহলে পোড়োবাড়ির মধ্যে কি করতে ঢুকেছিলি?

আমরা একটা প্যাকেট নিয়ে গিয়েছিলাম।

কিসের প্যাকেট?

তা জানি না।

কে পাঠিয়েছিল?

দীপু আর তপু চুপ করে রইল।

লোকটা বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

চুপ করে থেকে বিশেষ লাভ হবে না। দুটো গুলিতে দুজনের খুলি ফাটিয়ে দেব। উত্তর দে।

তপু বলল।

আ লিম পাঠিয়েছিল।

এবার লোকটা প্রচণ্ডবেগে হেসে উঠল। পৈশাচিক হাসি। সে হাসিতে মনে হল বাড়ির জানলা-দরজাগুলোও যেন ঝনঝন করে কেঁপে উঠল।

তবু তোরা বলতে চাস. তোরা আ লিমের চর নস। আ লিম কেন প্যাকেট পাঠিয়েছিল জানিস ?

একটু থেমে, উত্তরের অপেক্ষা না করে, লোকটাই বলতে আরম্ভ করল।

প্যাকেট পাঠানো একটা ছল। তোদের এই জন্য পাঠিয়েছিল যে তোরা ফিরে এসে বলবি যে লোকটা মরে গেছে, তাই কাউকে প্যাকেটটা দিয়ে আসতে পারিসনি। লোকটা সত্যি মরেছে কিনা, সেই খবরটা শুধু আ লিম তোদের মারফত জানতে চেয়েছিল। তার নিজের যাবার সাহস ছিল না, পাছে পুলিসের হাতে পড়ে, কিংবা আমাদের হাতে পড়ে।

লোকটা জামার হাতায় মুখটা মুছে নিয়ে বলল।

ঠিক সময়ে খবর পেলে আ লিমের অবশ্য নিস্তারও ছিল না। আমি যে আবার একটু কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে খবর পেলাম, ভাইকে শেষ করে দিয়েছে। এ খবরও পেলাম দুটো পুঁচকে ছোঁড়া ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু বের হতে কেউ দেখেনি। এ কদিন তোরা কোথায় ছিলি ?

কোথায় ছিল বলতে গিয়েই দীপু থেমে গেল। তারা যে এদের পালাবার গুপ্ত সুড়ঙ্গ দেখেছে, সে কথা জানতে পারলে লোকটা হয়তো আরও খেপে যাবে।

হাতে তো রিভলভার রয়েইছে, আঙুলের একটু কারসাজি, ব্যস, তাদের দুটো দেহ মেঝেয় লুটাবে।

তাই দীপু একটু ভেবে নিয়ে বলল।

কি করব—চারদিকে সাপ। আমরা ভয়ে রান্নাঘরে ঢুকে বসে ছিলাম।

সাপ তো কাঁচের জারের মধ্যে।

বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ, তপু বলল, যেভাবে জারের ওপর ছোবল দিচ্ছিল।

হুঁ, লোকটাও যেন কি ভাবল, তারপর বলল।

আমি নদীর ওপারে কদিন পাহারা দিচ্ছি। প্রায় সারা দিন-রাত। জানি, একদিন তোদের এপারে আসতেই হবে। আজ তোদের বাগে পেয়েছি।

দীপু বলল, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমাদের কোন দোষ নেই। এসব ব্যাপারের আমরা কিছু জানি না। আমরা জাহাজ থেকে নেমে আ লিমের কবলে পড়েছি।

আবার লোকটা হাসল।

ছাদফাটানো হাসি।

বলল, ওসব মায়াকান্নায় আমি ভুলি না। তোদের নিস্তার নেই। আ লিমের দলের কারো পরিত্রাণ নেই। নে, কে তোদের ইষ্টদেবতা তার নাম কর। দু মিনিট সময় দিচ্ছি।

এবার দীপু আর তপু দুজনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমাদের কথা বিশ্বাস কর। আমরা তোমাকে একটুও মিথ্যা বলিনি।

চোপ। একটা কথাও নয়।

চমকে উঠে দীপু আর তপু পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

ইষ্টদেবতার নাম তপু আর দীপুর জানা নেই।

দীপুর চোখের সামনে তার বাবা আর মায়ের চেহারা ভেসে উঠল। তপুর মনে এল তার অসহায় মায়ের ছবি।

আর জীবনে কোনদিন তাদের সঙ্গে দেখা হবে না। তারা জানতেও পারবে না, কিভাবে বিদেশে বেঘোরে দুটি কিশোর প্রাণ হারাল।

হয়তো কাজ শেষ করে এই নরাধম দুজনের দেহ মাটিতে পুঁতে ফেলবে, তারপর মাংসের গন্ধে কুকুর-শেয়ালের দল সেই দেহ বের করে নিয়ে নিজেদের ভোজে লাগাবে।

হয়েছে। এবার দাঁড়া সোজা হয়ে।

রুক্ষ, কঠিন কণ্ঠস্বর।

দুজনে দুজনকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দুজনের চোখ জলে ভরতি। সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সব অস্পষ্ট।

আর দু-এক মিনিটের মধ্যে চোখের সামনে চিরদিনের মতন অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে।

দুম্।

আচমকা একটা শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একমাত্র বাতি নিভে গেল।

ভারী একটা জিনিস পড়ার আওয়াজ।

অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারল না। মনে হল দুটো লোক যেন ধস্তাধস্তি করছে।

প্রাণপণ বিক্রমে। মরণপণ করে।

অন্ধকারে দীপু হাত বাড়িয়ে তপুর হাতটা আকর্ষণ করল।

পালিয়ে যাবার ইঙ্গিত।

দুজনে আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

সন্তর্পণে দরজাটা ঠেলে বাইরে চলে এল।

বাইরে খুব অন্ধকার নয়। তরল জ্যোৎস্নায় সব কিছু প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

দুজনে ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

রাস্তার কাছ বরাবর এসে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তপু বলল।

না, রাস্তার দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমাদের কেউ না কেউ দেখে ফেলবে। তার চেয়ে আয় আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ি।

একটু ইতস্ততঃ করে দুজনে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

বিরাট কতকগুলো গাছ। বোধ হয় বট আর অশথ। বড় বড় ঝুরি নেমেছে ডাল থেকে। তলায় অনেক আগাছা।

যদি সাপখোপের উপদ্রব না থাকে তাহলে লুকাবার পক্ষে আদর্শ জায়গা।

রাস্তা বেশী দূরে নয়।

দুজনে গুঁড়ি দিয়ে একটা ঝোপের পাশে বসল।

দিনের আলো ফুটুক, তারপর রাস্তায় বের হবে।

বোধ হয় এক ঘণ্টারও বেশী।

দুজনে দেখল বাড়ির দিক থেকে একটা আলো এগিয়ে আসছে।

ঠিক এইরকম আলো ওদের অনুসরণ করছিল।

দুজনে বুকে হেঁটে হেঁটে রাস্তার ধারের একটা গাছের আড়ালে বসল।

কাছে আসতে বুঝতে পারল একটা সাইকেল।

এতক্ষণ সাইকেলটা খুব জোরে আসছিল, রাস্তার কাছে আসতেই তার গতি কমে গেল।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আরোহী কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখল, তারপর দ্রুতবেগে চলে গেল শহরের দিকে।

সাইকেল পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দীপু বলল।

লোকটাকে দেখেছিস ?

তপু ঘাড় নাড়ল।

হুঁ, আ লিম।

তার মানে, এ লোকটাও হয়তো খুন হল।

খুন ?

নিশ্চয়, লোকটাকে খুন না করে আ লিম বের হত না।

আ লিম আমাদের নিয়ে গেল না সঙ্গে করে ?

এতক্ষণ বোধ হয় বাড়িতে আমাদেরই খোঁজ করছিল। রাস্তায় এসেও এদিক-ওদিক দেখছিল আমাদের খোঁজে।

তপু বলল।

আমাদের দেখতে না পেয়েছে ভালই হয়েছে, আ লিমের

বাড়ির দিক থেকে একটা আলো এগিয়ে আসছে

ফাঁদে আর নিজেদের জড়াতে চাই না।

দীপু চোখ বন্ধ করে হাই তুলল।

ক্লান্তিতে দুজনের শরীর ভেঙে পড়ছে। চোখ খুলে রাখাই দুষ্কর।

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দুজনে চোখ বুজল।

ঘুম ভাঙল পাখির কলরবে। ভোর হয়েছে। রাস্তা দিয়ে দু-একজন লোক চলছে। সকলেরই মাথায় ঝুড়ি। ঝুড়িভরতি আনাজ তরকারি।

গ্রাম থেকে তরিতরকারি নিয়ে বোধ হয় শহরে যাচ্ছে। বিক্রির জন্য।

দুজনে উঠে রাস্তায় এল।

একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল।

শহর এখান থেকে কতদূর ?

লোকটা বর্মী, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হাত-মুখ নেড়ে কি বলতে বলতে চলে গেল।

বোঝা গেল এদের ভাষা লোকটা বুঝতে পারল না।

দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করল। পেটের মধ্যে আবার মোচড় দিচ্ছে। কিছু একটু খেতে পেলে হত।

ভাগ্য ভাল।

এবার যে লোকটা দুধের বালতি নিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল, তাকে হিন্দুস্থানী বলেই মনে হল।

দীপু জিজ্ঞাসা করল।

এখান থেকে শহর কতদূর?

কোন্ শহর?

তপু বলল, রেঙ্গুন।

নামটা সারেংদের মুখে জাহাজে সে শুনেছিল।

রেঙ্গুন? বিস্ময়ে লোকটা দুটো চোখ কপালে তুলল, তোমরা হেঁটে রেঙ্গুন যাবে নাকি? সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এ জায়গার নাম কেমেনডাইন। তার চেয়ে এক কাজ কর, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁহাতি একটা রাস্তা পাবে, সেটা ধরে গেলে স্টেশনে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে বরং ট্রেনে চেপে যাও।

লোকটা আর দাঁড়াল না। তীরবেগে ছুটে চলে গেল।

দীপু বলল, ট্রেনে তো চাপব, কিন্তু ভাড়া? শেষকালে হাজতে পুরবে।

তপু কি ভাবল, তারপর বলল, স্টেশনের কাছে হয়তো খাবারের দোকান থাকবে। আমাদের কাছে যা পয়সা আছে তাতে দু-একটা পাঁউরুটি নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিছু একটু পেটে না পড়লে চোখে অন্ধকার দেখছি।

স্টেশন পর্যন্ত আর যেতে হল না। পথেই পাওয়া গেল।

একটা টিনের চালা। গোটা কয়েক বেঞ্চ আর টেবিল পাতা। গোটা কতক লোক মগে করে চা খাচ্ছে। পোশাক দেখে শ্রমিকশ্রেণীর বলেই মনে হল।

কোণের দিকে একটা বেঞ্চে দীপু আর তপু বসে পড়ল। চায়ের অর্ডার দিতে গিয়েই মনে পড়ে গেল, তাদের কাছে একটি পয়সাও নেই। সব পয়সা সাম্পানের মাঝিকে দিয়েছে।

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল—এ রাস্তা দিয়ে দু-একটা লরি গেলে বড় ভাল হয়। থামিয়ে আমরা উঠে পড়ি।

তপু হেসে বলল, খিদিরপুরে যাওয়ার মতন?

দীপু ঘাড় নাড়ল। হুঁ।

কিন্তু এক ঘণ্টার ওপর অপেক্ষা করেও কোন লরির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। একটা গরুর গাড়ি এল, তরকারিতে ঠাসবোঝাই। তিলধারণের স্থান নেই।

সেটাতে ওঠা অসম্ভব।

বাধ্য হয়েই আবার হাঁটতে শুরু করল।

একটু পরেই ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল। মনে হয় এতক্ষণ বোধ হয় থেমে ছিল, এইবার ছাড়ছে।

তার মানে, স্টেশন খুব দূরে নয়।

সত্যিই তাই।

একটা বাঁক ঘুরতেই স্টেশন দেখা গেল। সামনে অনেকগুলো রিক্শা আর মোটরের ভিড়। কিছু লোকও ছোটাছুটি করছে।

দুজনে স্টেশনের এলাকার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা সান্ত্বনা, এখানে অনেক লোকজন রয়েছে, কেউ হঠাৎ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

দীপু আর তপু লোহার বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর চলে এল। অনেকগুলো বেঞ্চ পাতা রয়েছে। তার একটার ওপর গিয়ে বসল।

দীপুই বলল।

এখানে বসে ট্রেনের চলাচল লক্ষ্য করি। যে ট্রেনে দেখব ভিড় বেশী, সেটাতে চড়ে বসব। তাহলে বিনা টিকেটে শহরে গিয়ে পৌঁছাতে পারব।

তপু কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল।

অনেকগুলো ট্রেন এল, গেল, কিন্তু দুজনে সাহস করে চড়তে পারল না।

এদিকে বেলা বাড়ছে। এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে প্ল্যাটফর্মে!

কে তোমরা?

গম্ভীর আওয়াজে দুজনেই চমকে মুখ ফেরাল।

রেলের পোশাক পরা একজন টিকেট চেকার এসে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্রলোক বাঙালী। পরিষ্কার উচ্চারণ।

দীপু বলল, আমাদের পয়সা নেই, তাই ট্রেনে চড়তে পারছি না।

যাবে কোথায় তোমরা?

শহরে।

তার মানে রেঙ্গুনে। সেখানে কে আছে?

এবার দীপু আর তপু কথা বলতে পারল না। কি বলবে? কে আছে শহরে? কার কাছে তারা যাবে?

কি হল? একেবারে থেমে গেলে যে?

আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি, মানে বাংলাদেশ থেকে।

তোমাদের চেহারা দেখে সেই রকমই মালুম হচ্ছে। ওঠ, এস আমার সঙ্গে।

দীপু আর তপু দাঁড়িয়ে উঠল।

তপু বলল, কোথায়?

শ্বশুরবাড়ি নিশ্চয় নয়। গেলেই বুঝতে পারবে।

দুজনকে নিয়ে টিকেট চেকার প্ল্যাটফর্মের বাইরে এল।

টিকেটঘরের সামনে প্রহরারত একজন বর্মী পুলিস ছিল,

তাকে হাত নেড়ে ডাকল।

পুলিস আসতে তাকে চাপা গলায় ফিসফিস করে কি বলল।

পুলিস মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল।

টিকেট চেকারের কান বাঁচিয়ে দীপু বলল।

এবার উপায় ?

তপু মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, ঠিক আছে, পুলিসেই দিক। আর এভাবে ঘুরতে পারছি না। যা বলবার পুলিসের কাছেই বলব।

একটু পরেই পুলিস ফিরে এল। হেঁটে নয়, লাল একটা ভ্যানে চড়ে। ভ্যানের মধ্যে থেকেই দীপু আর তপুকে ইশারায় ডাকল।

দীপু আর তপু একটু ইতস্ততঃ করে ভ্যানে উঠে বসল।

দরজা বন্ধ হতে সব অন্ধকার। বাইরে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

শুধু এইটুকু বোঝা গেল, মোটর খুব দ্রুতবেগে বাঁকের পর বাঁক পার হচ্ছে।

একসময় ভ্যান থামল।

পুলিস নেমে দরজা খুলে দিল।

ছোট একতলা বাড়ি। সামনে কতকগুলো পুলিস ঘুরছে, গোটা দুয়েক মোটর সাইকেলও রয়েছে।

নামো। নামো।

পুলিসের হাত নাড়ার ভঙ্গীতে মনে হল নামতে বলছে। দীপু আর তপু নেমে পড়ল।

সামনের ঘরে বিরাটবপু একটি পুলিস অফিসার। তার কানে কানে পুলিস কি বলতেই সে হাত দিয়ে কোণের একটা ঘর দেখিয়ে দিল।

সেইদিকেই বোধ হয় হাজত। দীপু আর তপুকে হাজতে কাটাতে হবে।

ঠিকই তাই, এবার পুলিস দীপু আর তপুর সার্টের কলার ধরে টেনে নিয়ে চলল।

বাধা দিয়ে লাভ নেই, তাহলে নির্যাতন শুরু হবে।

দীপু আর তপু ভাবল, রাখুক হাজতে, আপত্তি নেই, শুধু যেন খেতে দেয়। না খেতে দিয়ে না মারে।

না হাজত নয়, ছোট একটা ঘর।

দরজা খুলে তার মধ্যে দুজনকে ঢুকিয়ে পুলিস সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল।

হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ।

হাসির শব্দে দুজনে চমকে মুখ তুলল, তারপর আর অনেকক্ষণ চোখ নামাতে পারল না।

কোণের দিকে একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে আ লিম।

দীপু বলল, সর্বনাশ, তাহলে সবটাই ফাঁকি। টিকেট চেকার, পুলিস সব নকল ? আমাদের ধরে আনার ফন্দি !

কোথায় পালিয়েছিলি শয়তানের বাচ্ছারা ? আ লিম বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

তপু বলল, আপনি যেখানে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে গিয়েছিলাম। তারপর বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম, আপনি তো কিছু করলেনও না।

চোপরাও, মিথ্যেবাদী, আ লিম গর্জন করে উঠল, সর্বনাশ করে এসেছিস। যে প্যাকেটটা দিয়েছিলাম, সেটা টেবিলের ওপর রেখে এসেছিস। সেই প্যাকেট পুলিসের হাতে পড়েছে।

দীপু আর তপু ভাবতে শুরু করল।

চেয়ারে বসা লোকটার কাছে গিয়ে প্যাকেটটা টেবিলের ওপরই তারা রেখে এসেছিল, তারপর লোকটা আচমকা মেঝের ওপর পড়ে যাওয়ার পর থেকে সব কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। প্যাকেটের কথা আর মনেই ছিল না। সেই প্যাকেটটা পড়েছে পুলিসের হাতে ?

কি, চুপ করে আছিস যে ?

দীপু বলল, লোকটা মারা গেছে দেখে আমরা এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে আর কিছু মনে ছিল না আমাদের।

মনে ছিল না আমাদের ! আ লিম ভেংচি কাটল, এতদিন আমার দলে রয়েছিস, কাজ করছিস আমার সঙ্গে,আর খেয়াল নেই যে প্যাকেটের ওপর আমার গুপ্ত আস্তানার ঠিকানা রয়েছে ?

এবার তপু প্রতিবাদ করল।

কতদিন আবার আছি আপনার সঙ্গে ? আমরা কি আপনার দলের লোক ? আপনি তো কদিন হল ভুলিয়ে আমাদের ধরে রেখেছেন।

দীপুও সঙ্গে সঙ্গে বলল।

আমাদের জাহাজে উঠিয়ে দিন, আমরা যে দেশের ছেলে সে দেশে চলে যাই। এসব ঝামেলা আমাদের ভাল লাগছে না।

আ লিম ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতে হাসতে বলল।

থানার মধ্যে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে খুব মিথ্যা কথা বলছিস। তবে, শুনে রাখ, এটা মোটেই থানা নয়। সব সাজানো ব্যাপার। আমার আর এক কারসাজি। মিথ্যা কথা বললে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বের হতে পারবি না।

দীপু অবাক্‌কণ্ঠে বলল, বারে, মিথ্যা বলেছি কিনা,

আপনি জানেন না? আমরা এ দেশে এসেছি দশ দিনও নয়। এ দেশের ভাষা জানি না, পথঘাট চিনি না। তার ওপর পদে পদে বিপদ্ ঘটছে। আপনি সে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে, সে তো বন্দুকের গুলিতেই খতম করে দিত আমাদের দুজনকে।

কোন্ লোকটা? আ লিম চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসল।

পোড়োবাড়িতে যে লোকটা মারা গিয়েছিল তার যমজ ভাই। সেই তো রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিল, ভান করে, আমরা তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে বিপদে পড়লাম।

আ লিম নির্বাক্। একটি কথাও বলল না।

তপু প্রায় কান্নাজড়ানো গলায় বলল, আপনার দুটি হাত ধরে মিনতি করছি আমাদের কোনরকমে জেটিতে পৌঁছে দিন। আমরা যেমন করে পারি ফেরবার ব্যবস্থা করব।

তপুর কথা শেষ হতেই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

আ লিম দাঁড়িয়ে উঠে দু হাতে নিজের মুখটা চাপল, তারপরই পাতলা রবারের মুখোসটা তার পায়ের তলায় খসে পড়ল।

কোথায় আ লিম! এ তো সম্পূর্ণ অন্য একটা লোক।

টকটকে গৌরবর্ণ, কোঁকড়ানো পিঙ্গল চুলের রাশ, তীক্ষ্ণ দু চোখের দৃষ্টি।

দীপু আর তপু আর্তনাদ করে পিছনে সরে গেল।

শোন, ভয় পেও না, জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, আমি আ লিম সেজে তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছে, তোমরা আ লিমের দলের নয়। ভয় দেখিয়ে আ লিম তোমাদের দিয়ে তার কাজ হাসিল করত। একটা বড় সুবিধা, তোমরা পথঘাট চেন না, এ দেশের ভাষাও জান না, কাজেই তোমরা প্রায় অন্ধ আর বোবা লোকের সামিল।

অনেক কষ্টে সাহসে ভর করে দীপু প্রশ্ন করল।

আপনি কে?

আমি গোয়েন্দা ম্যালকম। অনেকদিন থেকেই আমি আ লিমের দলের সন্ধানে রয়েছি। তোমাদের কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

বলুন।

পোড়োবাড়িতে যে একটা খুন হবে, আমি জানতাম, কিন্তু আমার পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে তো তোমাদের দেখতে পেলাম না। অথচ তোমরা বলছ, মৃত লোকটা চেয়ারের ওপর বসেছিল, তোমাদের ধাক্কায় মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে।

তপু বলল, আমরা গুপ্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিলাম।

গুপ্ত সুড়ঙ্গ? ওখানে গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে? গুপ্ত সুড়ঙ্গ যে আছে, তাই বা তোমরা জানলে কি করে? গোয়েন্দা ম্যালকমের চোখে যেন সন্দেহের ছায়া নামল।

দীপু বলল, আমাদের একবার নিয়ে চলুন সেখানে, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

ম্যালকম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, চল তাহলে।

তপু আর পারল না। বলেই ফেলল।

তার আগে কিছু আমাদের খেতে দিন। অনেকক্ষণ কিছু খাইনি।

ও, আমি ভারি দুঃখিত। এ কথাটা আমার মনেই ছিল না।

থানার একটা ঘরেই খাবার ব্যবস্থা হল। বেশ ভাল ব্যবস্থা।

আহার শেষ হতে তিনজনে থানার সামনে দাঁড়ানো মোটরে গিয়ে উঠল।

ম্যালকমই চালাল। পিছনের সীটে দীপু আর তপু।

সেই নদীর ধার। তিনজনে আবার সাম্পানে উঠল।

হাঁটাপথ ধরে গিয়ে পোড়োবাড়িতে উপস্থিত হল।

ম্যালকম হাতলের কারসাজি দেখল। তারপর তিনজনে সুড়ঙ্গপথে নেমে গেল। ম্যালকমের হাতে জোরালো টর্চ।

দীপু বলল, এই দেখুন, এই বস্তার বালিশে আমরা শুয়েছি।

ম্যালকম হাঁটু মুড়ে বসে কোমর থেকে ছোরা বের করে বস্তার গায়ে বসিয়ে দিল। ফুটো দিয়ে ঝুরঝুর করে কিসের গুঁড়ো ঝরে পড়ল।

ম্যালকম সেই গুঁড়ো হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখে বলল, এসব হচ্ছে কোকেন। নেশার জিনিস। এইগুলোর জন্যই এদের মধ্যে শত্রুতা।

কিসে শত্রুতা?

সব জানতে পারবে। এখানে আর কি দেখবার আছে বল?

ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখানো হল, তারপর তিনজনে ওপরে উঠে এল।

বাইরে বের হবার সময় ম্যালকম পকেট থেকে একটা বড় তালা বের করে দরজায় আটকে দিল।

তপু সব লক্ষ্য করে বলল, এর আগে দরজায় তালা দেননি কেন?

দিইনি তার কারণ, আমি জানতাম, যে প্যাকেটটা ফেলে গেছে, সে প্যাকেট নিতে আসবে। আমি আ লিমের

দলের কারুর অপেক্ষায় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। বাড়ির মধ্যে থেকে কদিন পরে তোমাদের বের হতে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমি তখন গুপ্ত সুড়ঙ্গপুরীর রহস্যের কথা জানতাম না। ভেবেই পাইনি কোথা থেকে তোমরা এলে। তাই তোমাদের পিছু নিলাম।

পিছু নিলেন?

হ্যাঁ, তোমরা পার হবার আগে অন্য ঘাট থেকে মোটর বোটে পার হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা আলো আমাদের পিছনে আসছিল।

হ্যাঁ, সেটা আমারই সাইকেলের আলো। তারপর লোকটা আহত সেজে তোমাদের যখন বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল, তখনও আমি দূর থেকে তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম। লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমিই তোমাদের বাঁচাই। লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে এসেছিলাম, তারপর গ্রেপ্তার করে হাজতে রেখে দিয়েছি।

তপু জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু লোকটা আমাদের গুলি করতে চেয়েছিল কেন? আমরা তো তার কোন ক্ষতি করিনি।

ম্যালকম হাসল, সে মস্ত বড় কাহিনী। চল থানায় ফিরে যাই, সেখানে গিয়ে তোমাদের সব বলব।

বিকালের দিকে থানার পাশে কোয়ার্টারের বারান্দায় তিনজন বসল। পাশাপাশি।

একটা ইজিচেয়ারে ম্যালকম। দুটো চেয়ারে দীপু আর তপু।

একটা চুরুট ধরিয়ে ম্যালকম বলতে আরম্ভ করল।

রেঙ্গুন শহরে দুটো দল আছে। একটা আ লিমের দল, আর একটা সোলেমানের দল। দুটো দলই আবগারী জিনিস পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে এদিক-ওদিক চালান দেয়। এ সব নিষিদ্ধ জিনিসের চালানের ব্যাপারে রেষারেষি থাকেই, সেই রেষারেষি থেকে খুন ও জখম হয়। কতকগুলো লোক আছে তাদের আফিং, কোকেন-এতেও ঠিক নেশা হয় না, তারা সাপের বিষ পর্যন্ত হজম করে।

সোলেমান সাপের বিষ দিয়ে বড়ি তৈরি করত, বিশেষ মহলে সেই বড়ির দারুণ চল ছিল। সোলেমানের যে যমজ ভাই ছিল সেটা আমরা জানতাম না, জানতে পারলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেত।

কেন? তপু জিজ্ঞাসা করল।

কারণ যতবারই এই সাপের বিষে কারো মৃত্যু হয়েছে, আমাদের সন্দেহ থাকলেও সোলেমানকে ধরতে পারিনি, কারণ সাক্ষীরা চেহারার যে বিবরণ দিয়েছে তাতে বেশ বোঝা গেছে যে সোলেমানই বড়ির প্যাকেট সে বাড়ির মালিককে দিয়েছে। সোলেমানকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে কয়েকবার, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে নির্ভুলভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে যে সেই সময় সে ঘটনাস্থল থেকে তিনশো কি দুশো মাইল দূরে ছিল।

কি করে? দীপু অবাক্ হল।

যখন এক জায়গায় সোলেমান বড়ির প্যাকেট দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে তার যমজ ভাই দুশো মাইল দূরের কোন শহরে জজ ম্যাজিস্ট্রেট সিভিল সার্জনদের একটা বিরাট পার্টি দিয়েছে। তাঁরা সবাই একবাক্যে বলেছেন যে সোলেমান সেই সময়ে তাঁদের মধ্যে ছিল। দুজনেই এক নাম ব্যবহার করত, এবং চেহারার এত মিল, যা তোমরা নিজেদের চোখেই দেখেছ, যে একজনকে আর একজন ভাবা খুবই স্বাভাবিক।

সোলেমানকে খুন করেছিল তারই এক সহকারী।

সহকারী? তপু জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ। আ লিম তাকে টাকা দিয়ে নিজের দলে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু কি করে মারল? তার দেহে তো কোন আঘাতের চিহ্ন দেখলাম না।

তোমরা আর কি করে দেখবে! আমাদেরই অনেক খোঁজ করে আঘাতের চিহ্ন বের করতে হয়েছিল। ডাক্তার মৃত্যুর কারণ বলেছিল বিষপ্রয়োগ। এমন তীব্র বিষ যে মুখে নিলে মুখ পুড়ে যাবার কথা। তারপর অনেক চেষ্টার পর ঘাড়ে একটা ছোট দাগ দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম ঘাড়ের শিরার ওপর কেউ ইনজেকশন দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু।

ম্যালকম একটু দম নিল, তারপর বলল।

সোলেমানকে যে আ লিমের লোক মেরেছে সেটা তার ভাই সন্দেহ করেছিল। তোমরা আ লিমের দলের লোক সেটাই তার বিশ্বাস, অবশ্য আমার নিজেরও তাই ধারণা ছিল। সেইজন্যই সোলেমানের ভাই তোমাদের খতম করে দিতে চেয়েছিল।

তাকে আপনি কি মেরে ফেলেছেন?

দীপু ভয়ার্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

না, না, ম্যালকম হাসল, আমরা পুলিস, আমরা মানুষ মারি না। বললাম যে তাকে হাজতে রেখেছি। অনেক কিছু কথা ইতিমধ্যে সে বলেও ফেলেছে।

কিন্তু আপনি আ লিমের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন কেন?

তপুর এই প্রশ্নের উত্তরে ম্যালকম আবার মুচকি হাসল,

তারপর বলতে লাগল।

যদি সত্যি তোমরা আ লিমের দলের হতে তাহলে আ লিমের কাছে সব কিছুই বলতে। এভাবে বার বার তার দলের লোক নও বলে আপত্তি করতে না। তোমাদের মুখের চেহারা, কথাবার্তার ধরন দেখেই বুঝতে পারলাম, তোমাদের আ লিম ধরে এনেছে। তার দলে অনেক ছোট ছোট ছেলে আছে তা জানতাম, আর এও জানতাম সে এইসব ছেলেদের বেশীদিন দলে রাখে না। কিছু কাজ করে নিয়ে শেষ করে দেয়। তোমাদেরও তাই দিত।

আমাদেরও দিত ?

হ্যাঁ দিত, কারণ সব গুপ্ত আস্তানার সন্ধান জানে এমন ছেলে বেঁচে থাক এটা সে চায় না। কোথায় কোথায় সে নিষিদ্ধ জিনিস চালান দেয়, এ সব জানে এমন লোক থাকুক, এটাও তার অভিপ্রায় নয়!

আ লিমকে ধরেছেন আপনারা ?

না, ম্যালকম আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, এখনও তাকে ধরা সম্ভব হয়নি। তার জুয়ার আড্ডায় একবার আমরা হানা দিয়েছিলাম, কিন্তু কাউকে ধরতে পারিনি। সকলে পলকের মধ্যে যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সেখানেও বোধ হয় কোন হাতলের কারসাজি ছিল।

দীপু আর তপু একসঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

হ্যাঁ, আপনাদের হামলার সময় আমরাও সেখানে ছিলাম। সেখানেও এক সুড়ঙ্গপথ আছে নদী পর্যন্ত।

ম্যালকম এবারে খুব মৃদু কণ্ঠে বলল।

সেই গুপ্ত আস্তানার সন্ধান সেবারেও একটি ছেলে দিয়েছিল। আ লিমের দলের ছেলে। জাতে বর্মী। বেচারী!

কেন, বেচারী কেন ?

তপু প্রশ্ন করল।

তাকে আমি তোমাদের মতনই নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলাম। বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম, যেন বাড়ির বাইরে না যায়। কিছুদিন ছেলেটি আমার কথা শুনেছিল, বাড়ির মধ্যেই ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার সাহস বাড়ল। প্রথমে বাগানে ঘুরে বেড়াত, একদিন বাড়ির বাইরে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি!

ফিরে আসেনি ?

না, জীবন্ত আর ফিরে আসেনি। দিন তিনেক পরে আমার নামে একটা পার্সেল এসেছিল। আমার এক বোন থাকে ইয়েমেদিনে, তার কাছ থেকে। খুলেই চমকে উঠেছিলাম।

কি ছিল তাতে ? দীপু জিজ্ঞাসা করল।

সেই ছেলেটির মাথা।

দীপু আর তপুর কণ্ঠ থেকে ভয়ার্ত স্বর বের হল।

সঙ্গে একটা চিঠিও ছিল। তাতে লেখা, আ লিম বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করে না।

চেয়ার ছেড়ে দীপু আর তপু ম্যালকমের দু পাশে এসে দাঁড়াল।

তপু বলল, তাহলে কি হবে? আমরা কি করে বাঁচব ?

ম্যালকম দুটো হাত প্রসারিত করে দুজনের পিঠে রাখল। বলল।

ভয় নেই, তোমরা যদি এ বাড়ির বাইরে না যাও তাহলে কোন ক্ষতি কেউ তোমাদের করতে পারবে না। আমি বাড়ির চারপাশে সাদা পোশাকে পাহারাও রেখেছি, তারা তোমাদের ওপর দৃষ্টি রাখবে।

আমরা আমাদের ঘর থেকেই বের হব না।

দীপু কাঁপা গলায় বলল।

ম্যালকম বলল, উপস্থিত কালই তো আমাদের সঙ্গে বের হতে হবে। সেই গুপ্ত আস্তানা আমরা চিনি, কিন্তু সুড়ঙ্গপথটা আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে।

দীপু আর তপুর বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে ম্যালকম আবার বলল।

কোন ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে বন্দুক পিস্তল নিয়ে কিছু পুলিস থাকে।

একটা কালো মোটর। ভিতরে ম্যালকম, দীপু আর তপু। সঙ্গে গোটা ছয়েক পুলিস। বন্দুক আর পিস্তল উঁচিয়ে।

খুব সাবধানে চারদিকে দৃষ্টি রেখে মোটর এগিয়ে চলল।

পথে কোন লোক কৌতূহলবশতঃ দাঁড়ালেই পুলিস চীৎকার করে তাদের হটিয়ে দিল।

অনেকটা যাবার পর ম্যালকম ড্রাইভারকে কি বলল।

পাশে নদী। এদিকে ঝাঁকড়া গাছের সার।

ম্যালকম বলল, ঠিক আছে, এটাই সেই আস্তানা, যেখানে একবার আমরা এসেছিলাম। এই তো আগাছার ঝোপ আর ইটের পাঁজা।

দীপু আর তপুর দিকে ফিরে ম্যালকম বলল, এবার আস্তে আস্তে নেমে এস তোমরা।

দীপু আর তপু নামতে যাবার মুখেই বিপর্যয়।

দারুণ একটা শব্দে আশপাশের মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল। ধূলার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

ম্যালকম আচমকা দীপু আর তপুর হাত ধরে শুইয়ে না দিলে মারাত্মক কাণ্ড হত। মোটরের জানলার কাঁচগুলো

ভেঙে চারদিকে ছিটকে পড়ল। সেই কাঁচের একটা খণ্ড শরীরে লাগলে খুবই বিপদ্ হত।

ম্যালকম নিজেও সটান শুয়ে পড়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে ম্যালকম উঠে বসল। এদিক-ওদিক দেখে সবাইকে বলল, উঠে পড়।

পুলিসরাও এদিক-ওদিক টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। এবার তারাও উঠে দাঁড়াল।

বেশ একটু দূরে কিছু লোকের জটলা। আওয়াজ শুনে এসে জড় হয়েছে, কিন্তু সাহস করে সামনে আসতে পারছে না।

দীপু বলল, কিসের শব্দ বলুন তো?

ম্যালকম লাফিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বলল।

বোমার। কেউ আমাদের লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল। ক্ষতি করতে পারেনি, কারণ বোমাটা আগেই ফেটে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ইটের পাঁজার ফাঁক থেকে তখনও অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া কমে যেতে ম্যালকম পুলিসদের দিকে ফিরে হুকুম দিল, এগিয়ে চল, কিন্তু খুব সাবধানে।

প্রথমে পুলিসের দল, তারপর ম্যালকম, সব শেষে দীপু আর তপু পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল।

ইটের পাঁজার পাশ দিয়ে একটু নেমেই থেমে পড়ল।

অল্প অল্প ধোঁয়া তখনও বের হচ্ছে। মেঝের অনেকটা জুড়ে কালো দাগ। নীচে দিয়ে নদীর ধারে যাবার গুপ্ত পথ খোলা রয়েছে।

ঠিক কালো দাগের পাশে বীভৎস একটা মূর্তি। মুখের কিছু অংশ উড়ে গেছে। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে স্থানে স্থানে।

তবু চেনা গেল। আ লিম।

ম্যালকম কিছুক্ষণ নীচু হয়ে মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করল, তারপর বলল।

আ লিম বোমাটা ছুঁড়তে গিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, অবশ্য আমাদের সৌভাগ্যবশত, বোমাটা ইটে ধাক্কা লেগে আবার ফিরে এসে তার গায়ের ওপরই পড়েছে। বোমাটা কি ভয়ংকর বুঝতেই পারছ। যার শব্দতরঙ্গে মোটরের কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, সে বোমাটা সরাসরি পড়লে আমাদের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না।

ম্যালকম কথা শেষ করে পুলিসদের দিকে চোখ ফেরাল। বলল।

অপরাধের ফল মৃত্যু। এতদিন ধরে এ লাইনে কাজ করে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।

সকলে আস্তে আস্তে নেমে মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

এইখানে জুয়ার আসর বসত। পুলিসে সেবার হামলা দেবার পর থেকে বোধ হয় আসর আর বসেনি।

দীপু বলল, গুপ্ত সড়ক তো দেখতেই পাচ্ছেন?

ম্যালকম ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আ লিম রাস্তা পরিষ্কার করেই রেখেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের খতম করে নদীপথে সে সরে পড়বে। নদীর ধারে নিশ্চয় যাবার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছিল। চল, নামি।

সকলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

নদীর বুকে গোটা তিনেক জাহাজ। একেবারে মাঝখানে। অনেকগুলো সাম্পান এখানে-ওখানে ভাসছে।

অনেক দূরে ছোট একটা কালো বিন্দু।

ম্যালকম পকেট থেকে দূরবীন বের করে চোখে লাগিয়ে দেখল, তারপর বলল, ঐ একটা মোটর-লঞ্চ ছুটে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। বোধ হয় এই মোটর-লঞ্চটাই এখানে অপেক্ষা করছিল। গোলমাল দেখে সরে পড়েছে।

সবাই ওপরে উঠে এল।

ম্যালকম একজন পুলিসকে ডেকে বলল।

তুমি হেড-কোয়ার্টারে চলে যাও। একটা ফটোগ্রাফার নিয়ে এসে আ লিমের ফটো তোলার ব্যবস্থা কর। আর একজন বারুদ-বিশারদকেও নিয়ে আসবে। বোমার টুকরোগুলো তুলে নিয়ে রিপোর্ট দেবে।

হঠাৎ তপুর মনে পড়ে গেল।

একবার ওপরে চলুন, এর পাশেই আমাদের আটকে রেখেছিল।

দীপু বলল, একটা চিতাবাঘও আছে ওখানে। ওদের কথা না শুনলে বলেছিল, আমাদের চিতাবাঘের মুখে ফেলে দেবে।

তাই নাকি? ম্যালকম বলল, চল তো দেখে আসি।

পুলিসরা রাস্তায় সার দিয়ে দাঁড়াল।

ভিতরে ঢুকল ম্যালকম, দীপু আর তপু।

ম্যালকম হাতের পিস্তলটা উঁচু করে ধরে রইল।

দরজায় বিরাট একটা তালা।

একবার টেনে দেখে ম্যালকম বেরিয়ে এসে একটা পুলিসকে ডাকল।

পুলিস কাছে আসতে তাকে নীচু গলায় কি বলতেই সে ছুটে মোটরের ভিতর থেকে চাবির গোছা নিয়ে এল।

ম্যালকম একটা দুটো করে কয়েকটা চাবি তালার মধ্যে

ম্যালকমের পিস্তল অগ্নিবর্ষণ করল।

ঘোরাতে ঘোরাতে শব্দ করে তালাটা খুলে গেল।

আনন্দে দীপু চীৎকার করে উঠল।

খুলেছে, খুলেছে।

দরজাটা ঠেলে দীপু ভিতরে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্জন। দীপুর মনে হল পীত রংয়ের একটা বিদ্যুৎ এক কোণ থেকে ছুটে এল।

সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় দীপু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

গুড়ুম।

ম্যালকমের পিস্তল অগ্নিবর্ষণ করল।

অব্যর্থ লক্ষ্য।

দীপু যখন চোখ মেলল, দেখল মাথার কাছে ম্যালকম আর তপু বসে।

ম্যালকম জিজ্ঞাসা করল।

কি, শরীর ঠিক হয়েছে?

ঘাড় নেড়ে দীপু উঠে বসতেই তার চোখে পড়ে গেল।

কোণের দিকে চারটে পা প্রসারিত করে চিতাবাঘটা পড়ে রয়েছে। মৃত।

ম্যালকম বলল।

তোমাদের বন্ধু আ লিম চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। বোমা হাতে জুয়ার আড্ডার মুখে নিজে অপেক্ষা করছিল। যদি আমরা প্রথমে এদিকে আসি, সেজন্য চিতাবাঘটাকেও খুলে রেখেছিল। আমি অবশ্য এ ধরনের কিছু একটা আন্দাজ করেছিলাম, সেইজন্যই পিস্তল নিয়ে তৈরি ছিলাম। দেখলে তো তোমরা ভাল করে, পাপ কখনও জয়ী হতে পারে না। পাপের পতন অনিবার্য।

ম্যালকম তন্নতন্ন করে এদিক-ওদিক সব খুঁজল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

বোঝা গেল, এটা শুধু আ লিমের বন্দীশালা। নতুন নতুন যাদের ধরে আনত, তাদের এই ঘরে আটকে রাখত। চিতাবাঘের ভয় দেখাত। চল, এবার বাইরে যাই।

তিনজনে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ম্যালকমের ইঙ্গিতে দুজন পুলিস বাঁশে বেঁধে চিতাবাঘের দেহটাও তুলে নিল।

ফেরবার সময় পুলিসের কালো মোটর নয়, ছোট একটা সবুজ মোটরে তিনজন ফিরল।

গাড়িতে উঠে ম্যালকম বলল।

মোটর বদলালাম। কারণ আমার মনে হচ্ছে আ লিমের অনুচরেরা সহজে ছাড়বে না। কালো মোটরের ওপর নজর রাখবে।

কেন, নজর রাখবে কেন?

তপু প্রশ্ন করল।

রাখবে, তার প্রথম কারণ, প্রতিশোধস্পৃহা। আমাকে খতম করার চেষ্টা করবেই। দ্বিতীয় কারণ, আ লিমের মৃতদেহ।

আ লিমের মৃতদেহ? কেন?

দীপু আশ্চর্য হল।

আমার মনে হচ্ছে, কিছু কাগজপত্র বা অন্য কিছু তার কাছে আছে, সে তো দলপতি।

তপু জিজ্ঞাসা করল।

কিন্তু আপনি তো আ লিমের দেহ সার্চ করেছেন?

ম্যালকম গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

তা করেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি।

তবে?

তপুর এ প্রশ্নের ম্যালকম কোন উত্তর দিল না। বাইরের দিকে চোখ মেলে চুপ করে বসে রইল।

যথাসময়ে মোটর থানার সামনে এসে দাঁড়াল।

দীপু আর তপু ম্যালকমের বাড়ির মধ্যে চলে গেল। ম্যালকম থানায় ঢুকল।

ম্যালকম যখন ফিরল, তখন বেশ রাত।

দীপু আর তপু খাওয়া শেষ করে বারান্দায় বসে ছিল, ম্যালকম ওপরে এল।

কি, তোমরা এখনও শুয়ে পড়নি?

আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

হুঁ।

গম্ভীর মুখে ম্যালকম একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে ম্যালকম বলল।

আমি যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হয়েছে।

দীপু আর তপু একসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল।

কি, কি হয়েছে?

কালো ভ্যানের ওপর আবার আক্রমণ হয়েছে।

আক্রমণ?

হ্যাঁ, ভিড়ের মধ্যে থেকে কে আবার ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল, কিন্তু এমন একটা ব্যাপার হতে পারে এ বিষয়ে আমি আগেই সজাগ করে দিয়েছিলাম, তাই বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। আ লিমের মৃতদেহ নিয়ে মোটর ঠিকই হাসপাতালে পৌঁছাতে পেরেছিল। তাছাড়া, আমার কাজও হয়েছে।

কি কাজ?

আ লিমের দেহ থেকে দরকারী কাগজ উদ্ধার করতে পেরেছি। হাঁটুর মাংস চিরে পকেটের মতন তৈরি করে একটা কাগজ লুকানো ছিল। ডাক্তারের সহায়তায় মাংস কেটে সে কাগজ সংগ্রহ করেছি।

নিজের শরীরের মধ্যে পকেট তৈরি করে?

হ্যাঁ, ম্যালকম হাসল, এটা অপরাধীদের একটা সাধারণ পন্থা। কয়েদীরা জেল থেকে এইভাবে পয়সাকড়ি বের করে নিয়ে আসে, যারা নিষিদ্ধ জিনিস চালান দেয়, তারা পুলিসের চোখ এড়াবার জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশে এইভাবে লুকানোর জায়গা তৈরি করে নেয়।

দীপু আর তপু সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

একটু পরে দীপু জিজ্ঞাসা করল।

যে কাগজটা পেয়েছেন, সেটা নিশ্চয় খুব দরকারী।

ম্যালকম হাসল।

হ্যাঁ, দরকারী বৈকি। খুব ছোট একটা ফিল্ম। খালি চোখে পড়াই যায় না। জোরালো লেন্সের সাহায্যে প্রজেক্টরের ওপর চড়িয়ে সামনের এক সাদা পর্দায় প্রতিফলিত করলাম। ঠিক যেভাবে সিনেমার ছবি দেখায়। লেখাগুলো বহুগুণ বর্ধিত হল। সব ঠিকানা। সারা ব্রহ্মদেশে যেখানে যেখানে আ লিমদের আস্তানা আছে, তার ঠিকানা। বুঝতেই পারছ এটা আমাদের পক্ষে কত দরকারী। ইতিমধ্যে গোপন টেলিগ্রাম চলে গেছে থানায়, থানায়। আজ গভীর রাত্রে হানা দিয়ে ধরপাকড় শুরু হবে।

ম্যালকম উঠে দাঁড়াল।

ব্যস, আর নয়। এবার উঠে পড়। রাত অনেক হয়েছে।

দিন তিনেক পর থানায় ডাক পড়ল দীপু আর তপুর।

ম্যালকম বসে ছিল। তার পাশে এক পুলিস অফিসার।

অফিসারটি ওদের নাম, ধাম, অভিভাবকের নাম সব লিখে নিল।

সব হয়ে যেতে ম্যালকম বলল।

তোমাদের সাহায্যের জন্যই আমাদের অভিযান অনেকাংশে সফল হয়েছে। আ লিমকে জীবন্ত ধরতে পারিনি বটে, কিন্তু তার অনেক শাগরেদ ধরা পড়েছে। অনেক নিষিদ্ধ জিনিস আমাদের হাতে এসে গেছে।

সরকার পুরস্কারস্বরূপ তোমাদের দুজনকে কিছু টাকা দেবেন। তাছাড়া তোমাদের দেশে ফিরে যাবার সব খরচও সরকার বহন করবেন।

দেশে ফিরে যেতে পারব!

দীপু আর তপু দুজনের চোখে জল এসে গেল। মাথা নীচু করে তারা দাঁড়িয়ে রইল।

টাকাটা পরের দিনই হাতে এল।

কম নয়। এক একজনের ভাগে দুশ। এত টাকা একসঙ্গে দীপু আর তপু কোনদিন দেখেনি।

ম্যালকম কাছে এসে দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

শোন, তোমাদের কয়েকটা কথা বলি। এভাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে তোমরা কতখানি অন্যায় করেছ, আশা করি এখন বুঝতে পারছ। ভাগ্য ভাল যে বেশী বিপদের মধ্যে পড়নি। মারাত্মক কিছু হয়ে যেতে পারত। লেখাপড়া শিখে, বড় হয়ে দেশভ্রমণে বের হওয়া উচিত। এভাবে চুপিচুপি বাড়ি থেকে পালিয়ে, জাহাজ কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে, বিদেশে এলে কি হয়, তার স্বাদ তোমরা ভালভাবেই পেলে। এবার বাড়ি গিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, পাপের পথ সর্বদা পরিহার করবে, কারণ পাপের ফল কি সেটা নিজেদের চোখেই দেখে গেলে।

কাল সকালেই তোমাদের জাহাজ ছাড়বে। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি, কোন অসুবিধা হবে না। আমি থাকতে পারব না। আজ রাত্রেই একটা কাজে আমাকে শহরের বাইরে যেতে হবে। গুড-বাই!

দীপু আর তপু ম্যালকমের প্রসারিত হাতটা একে একে

আঁকড়ে ধরল।

তপু বলল, বিদেশের বন্ধু, বিদায়!

সত্যিই কোন অসুবিধা হল না।

একজন পুলিস অফিসার সঙ্গে করে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে গেল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। বোধ হয় দীপু আর তপুর সম্বন্ধে।

এ জাহাজের নাম, এস. এস. অ্যাঙ্গোরা।

আবার তিন দিন নীল সমুদ্রের ওপর ভেসে যাওয়া জীবন।

দুজনে ডেক থেকে ডেকে ঘুরে বেড়াল। ক্যাপ্টেন এসে তাদের পিঠ চাপড়াল।

বলল, তোমরা বীর বালক। বিরাট একটা বদমাইশের দলকে ধরতে সরকারকে সাহায্য করেছ।

সারেংরা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

তিন দিন পর স্থলের রেখা দেখা গেল। বোঝা গেল মাটিমায়ের কি দুর্বার আকর্ষণ। সবাই সার দিয়ে দাঁড়াল রেলিং ধরে।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হল গাছপালা, বাড়িঘর, কলকারখানা।

জল আর নীল নয়, ঘোলাটে। আশপাশে অনেক স্টীমার, জেলে ডিঙ্গি দেখা গেল।

নিজের দেশ, নিজের জন্মভূমি।

রেলিংয়ে মাথা ঠেকিয়ে দীপু আর তপু প্রণাম করল।

মাথা তুলেই দুজনে অবাক্।

জেটি দেখা যাচ্ছে। জেটির বারান্দাভর্তি লোক।

তার মধ্যে দীপুর বাবাকে দেখা গেল। তিনি আকুলদৃষ্টিতে জাহাজের দিকে দেখছেন।

দীপু আর তপু রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল। অস্ফুটকণ্ঠে দীপু বলল, বাবা। তপু বলল, জেঠু। তারপর চোখের জলে সামনের পৃথিবী অস্পষ্ট হয়ে গেল।

প্রশ্ন

গৌরী দেবী

মাগো আমায় গল্প যখন বলিস্
মন ছুটে যায় পক্ষিরাজের পিছু,
অজগর, যার মাথায় মণি জ্বলে,
তাকেই ভাবি, আর ভাবিনা কিছু!

কোথায় মা তুই দেখেছিলি বল্
তেপান্তরের ঘন সবুজ মাঠ,
কোথায় গেলে দেখতে পাব মাগো,
কাঠুরিয়া কাটছে বনে কাঠ?

পক্ষিরাজের বাড়ী কোথায় মাগো,
কোন্‌খানেতে কোন্ সে মেঘের ফাঁকে?
দুপুর বেলায় স্তব্ধ যখন পাড়া,
মেঘের বুকে ঘুমিয়ে সে কি থাকে?

পরীর দেশ কি দেখেছিস মা তুই?
চাঁদের দেশে তাদের নাকি বাড়ী?
রাত্রিবেলা ঘুমের বুড়ী সেজে,
ঘুম পাড়িয়ে যায় সে তাড়াতাড়ি!

দুয়োরাণী গরীব তোমার মত,
গল্প শুনে তাই যে মনে হয়,
বনের ধারে দেখেছো মা তাকে?
তোমার সাথে লুকিয়ে কথা কয়?

ভাবছি আমি দুয়োরাণীর কথা,
চোখ দুটি তার করছে ছলো-ছলো,
মাটির ঘরে জ্বলছে প্রদীপখানি
কুটীর-পাশে নদীর কলোকলো!

আমি যদি সেইখানেতে গিয়ে,
বসি মাগো দুয়োরাণীর কোলে,
কান্না সেকি ভুলবে আমায় পেয়ে?
নানা রকম গল্প-কথা বলে?

বলব তাঁকে, চলো আমার সাথে,
থাকবে আমার গরীব মায়ের ঘরে;
সেখানেতে তোমার মত আমার
গরীব মায়ের নিতুই আঁখি ঝরে।

দু'টি মায়ের ছিন্ন আঁচল ধরি
মুছিয়ে দেব কাতর চোখের জল,
দু'টি মায়ের মাঝখানেতে শুয়ে
বল্‌ব শুধু, গল্প আমায় বল্!—

বাশুলীর দেউলে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চারদিকে চষা ক্ষেত,—মাঝখানে একটুকরো চৌকো জমি পতিত রয়েছে এ-গাঁয়ের সৃষ্টি থেকেই! ছেলেরা চিরদিনই হাডুডু আর বুড়ীচি খেলে থাকে সেখানে। আজও এই বিকেল বেলা গোটাত্রিশেক বাচ্চার হৈ-হল্লায় জায়গাটা সরগরম।

ও-কোট থেকে ছুটন্ত মোষের মত ধেয়ে এল শেৎলা। এ-কোটের নীরু মধু হেবো নীলমণিরা তীরবেগে পিছিয়ে চলে গেল চার কোণে চার জন, কুঁজো হয়ে হাঁটুর উপরে হাত রেখে চোখা নজরে দেখতে লাগল তার গতিবিধি। শেৎলার মুখে অবিরত একটানা ডাক হা-ড়্-ডু-ডু-ডু-ডু—উ-উ-উ—-ড-ডু-উ-উ। এই ডাক তাকে একদমে ডেকে যেতে হবে, যতক্ষণ সে বিপক্ষের এলাকায় আছে। দম যদি ফুরিয়ে যায়, তাহলে নীরু মধুদের দলের যে-কেউ তাকে ছুঁয়ে মো'র বা মরা করে দিতে পারে। আর দম থাকতে থাকতে ওদের কাউকে ছুঁয়ে শেৎলা যদি নিজের কোটে পালিয়ে আসতে পারে, তাহলে মো'র হল সেই অভাগা। হাডুডু খেলার এই রকমই নিয়ম।

দামাল ছেলে এই শেৎলা। দুর্জয় সাহস তার; তেমনি তার গায়ের জোর। আর দম? সে যেন ফুরোতেই চায় না। নিশুতি রাতে কালকাসুন্দির মাঠের ওপার থেকে শোনা যায় রেলগাড়ির শব্দ। ঝকা-ঝক-ঝকা-ঝক-ঝক্কর! ঝকা-ঝক-ঝকা-ঝক-ঝক্কর! 'ঝক্কর'গুলোই ঘুমন্ত ছেলেদের কাঁথা-মুড়ি-দেওয়া কানের ভিতর জোর করে সেঁধিয়ে পড়ে যেন। শেৎলারও একটানা হা-ডু-ডু'র ভিতর থেকে এক একটা 'উ' যেন মাঝে মাঝে ছিটকে বেরিয়ে আসে ঐ ঝক্করের মত। তাই শুনে কোটের চার কোণে নীরু মধু হেবো নীলমণিরা চমকে ওঠে চারজনেই। প্রত্যেকেই ভাবে—এই আমারই উপর ঝাঁপিয়ে বুঝি পড়লো এসে মোষটা।

এ-কোটের ছোট ছোট ছেলেরা প্রথম থেকেই লুকিয়ে পড়েছে দলপতি নীরু মধুদের পিছনে। তাদেরই লাইনে

আর তার পরেই সেই পায়ে এক ছোবল!

দাঁড়িয়ে নয়-দশ বছরের একটা বাচ্চা নজর রেখেছে শেৎলার উপর। নাম তার ক্ষেতু, এ-গাঁয়ের ছেলে সে নয়, কুটুমবাড়ি বেড়াতে এসে বিকেল বেলা খেলার মাঠে নেমে পড়েছে। ছেলেটা ভারি তুখোড়, সে হঠাৎ 'দমচুরি, দমচুরি' বলে চেঁচিয়ে উঠে হাওয়ার বেগে ছুটে এল শেৎলাকে ছুঁয়ে দেবার জন্যে।

দমচুরি মানে?—মানে এই যে শেৎলার আগের দম ফুরিয়ে গিয়েছে, এবং কৌশল করে সে নতুন দম নিয়ে নিয়েছে, যা এ খেলার নিয়ম অনুযায়ী সে নিতে পারে না।

দমচুরি! অন্য কেউ বুঝতে পারেনি যে কখন কীভাবে শেৎলা দম চুরি করেছে। কিন্তু ক্ষেতু যখন ঐ রব তুলে ছুটে এল শত্রুকে পাকড়ে ফেলার জন্য, তখন এ-দলের পোনেরোটা ছেলে মার-মার রবে লাফিয়ে এল একসাথে।

আর শেৎলা? সে এমন হকচকিয়ে গেল যে পালিয়ে নিজের কোটে চলে আসার কথা মনেই পড়ল না তার। এই তার চৌদ্দ বছর বয়স, হা-ডু-ডু খেলছে সে আজ

পুরো পাঁচ বছর। এমন জোচ্চুরির বদনাম তাকে এর আগে কেউ দিতে পারেনি। আজ কিনা ভিন্-গাঁয়ের একটা ছেলে এসে তাকে খেলার মাঝখানে অপমান করে বসল?

লজ্জায় দুঃখে রাগে সে এমন দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে ছুটে পালানোর সুযোগ তার পালিয়ে গেল। চোখের পলকে একটা গোটা দল এসে চেপে ধরেছে তাকে; সেই পাহাড়ের বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি তার নেই। হা-ডুডুর আওয়াজ তার মুখে আর ফোটে না, ঘাড় গোঁজ করে সে মোর স্বীকার করে নেয়।

খেলা চলতে থাকে। নিজের কোর্টের ও-মাথায় বসে আগুনচোখে তাকিয়ে থাকে মরা শেৎলা। নজরটা তার ক্ষেতুর ওপরে। ওকে আজ সে দেখে নেবে। শেৎলা করে দমচুরি? সে চোর? যে-কথা কেউ বলতে পারেনি এতদিন, সেই কথা বলে ঐ ক্ষুদে ছেলেটা পার পেয়ে যাবে? ভাঙুক আগে খেলা! শেৎলা ছাড়ছে না ওকে।

খেলা যখন ভাঙল, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। দক্ষিণপাড়ার পথ ধরেছে ক্ষেতু, তারই মত আরও গোটাকতক ছেলের সঙ্গে। শেৎলা গড়িমসি করে। নীরু মধু হেবোরা ডাকাডাকি করে—"বাড়ি যাবিনে শেৎলা?"

"যাবো রে যাবো। তোরা এগো না!" বলে শেৎলা পাশ কাটায়। নীরুরা খলখল করে হেসে ওঠে—"লজ্জা হয়েছে বাবুর, দমচুরি ধরা পড়ে। বলে চোরের দশদিন, সাধুর একদিন। ধন্যি ছেলে ঐ ক্ষেতু। স্যাঙাতের যে এ-বিদ্যে আছে, আমরা তো কোনদিন ভাবতে পারিনি।"

শেৎলা রুখে ওঠে—"কী বিদ্যে রে কী বিদ্যে? যা-তা একটা বদনাম দিলেই হল—? হেরে যাবি জেনে একটা মিছেমিছি বদনাম দিয়ে চেপে ধরলি—"

নীরু মুখের উপর জবাব দিল—"হেরে গেলাম কই? দম তোর থাকুক আর যাক, আমরা যখন তোকে আটকে ফেললাম, তখনই তুই হারলি। নিজের ঘরে ফিরে আসতে পারতিস যদি, তাহলে তোর এ সব ওকালতি চলত। কিন্তু—তুই দিব্যি গেলে বলতো শেৎলা, দমচুরি তুই করিসনি? তুই যদি বলিস যে ক্ষেতু ভুল করেছে—"

শেৎলা সে-কথার জবাব না দিয়ে যা-মুখে-আসে গালাগালি দিতে লাগল নীরুদের, তা দেখে তারা বিরক্ত হয়ে চলে গেল গাঁয়ের পানে। থাকুক হতভাগা একা মাঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে। ভূতে ঘাড় মটকাবে যখন মজাটি টের পাবে বাছাধন।

কিন্তু ভূতের অপেক্ষায় মাঠে দাঁড়িয়ে রইল না শেৎলা। নীরুরা চোখের আড়াল হওয়ামাত্র সে ছুটল দক্ষিণপাড়ার পথে, যেদিকে ক্ষেতু গিয়েছে আরও কয়েকটা ছোট ছেলের সঙ্গে। ছুটে গেলে ওদের ধরে ফেলতে কতক্ষণ? আর ধরে ফেলতে পারলে উত্তমমধ্যম দিতেই বা বাধা কি? ওর সঙ্গে যারা আছে, তারাও ওরই মত বাচ্চা। শেৎলাকে তারা রুখতে পারবে না। আর তারাও তো এ-গাঁয়েরই ছেলে! তারা ক্ষেতুর পক্ষে শেৎলার সঙ্গে লড়তে আসবে কেন?

ছুট! ছুট! শেৎলা তীরের মত ছুটল আলের উপর দিয়ে। মাঠ পেরিয়ে বাগান, সেই বাগানের ভিতরই ওদের ধরে ফেলা চাই। তা নইলে পাড়ার ভিতর হামলা করায় ফ্যাসাদ আছে। ক্ষেতুর মামাবাড়ির লোকেরা ধারেকাছে থাকতে পারে।

কিন্তু বাগান যে শেষ হয়ে এল! ঐ যে খানিকটা আগেই দেখা যায়—জোছনায় ধবধব করছে বাশুলীর দেউলের সাদা গম্বুজ। ওর ওপাশেই মিত্তিরদের বাড়ি, লোক গিজগিজ করছে ওখানে। নাঃ, করতে যদি কিছু হয়, তা এই বাশুলীর দেউলের এপাশেই করতে হবে। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে শেৎলা ছুটল ওদের পিছনে।

একটু এগিয়ে গেলেই ধবধবে জোছনা, কিন্তু এখানটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সুঁড়িপথের দু'ধার থেকে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের ডাল এসে মিলেছে শেৎলার মাথার উপরে, নিজের হাত-পা পর্যন্ত চোখে পড়বার উপায় নেই। তবু আন্দাজের উপর ভরসা করে শেৎলা ছুটেছে, আর পথ ভুল হবারও তো কোন উপায় নেই! ঠিক সমুখেই তো কথা কইতে কইতে চলেছে ক্ষেতুরা।

এই এসে গিয়েছে শেৎলা। আর কয়েক পা।

কিন্তু সে কয়েক পা আর এগুনো হল না শেৎলার। হঠাৎ কী একটা ঠাণ্ডামত ঠেকলো তার পায়ের তলায়, আর তার পরেই সেই পায়ে এক ছোবল!

চীৎকার করে ছুটে গিয়ে ক্ষেতুদের দলের ঘাড়ের উপর পড়ল শেৎলা, আর দলের সবগুলো ছেলে হাউমাউ করে উঠল দারুণ ভয় পেয়ে।

"ওরে গন্‌শা, ওরে পীতেম্বর, আমি তোদের শেতলদা রে, আমায় সাপে কেটেছে রে, সাপে কেটেছে!"—ডুকরে উঠল শেতল।

আর সেই ছেলেগুলো? "ওরে বাপ্ রে" বলে দুদ্দুড় করে দৌড়তে লাগল সব একসাথে। সাপ? কোথায় সাপ? এই অন্ধকারে দেখা যায় না তো কিছুই! প্রত্যেকে ভাবে—শেৎলাকে ঘায়েল করে এবারে সাপটা তার দিকেই ধেয়ে আসছে হয়ত ফণা তুলে। আপনি বাঁচলে বাপের

নাম! শেতলদার কথা কে ভাবে?

শেৎলাও দৌড়োতে গেল ওদের সাথে। কিন্তু তার পা যে আর উঠতে চায় না। চিন্ চিন্ করে একটা ব্যথা উঠছে কামড়ের জায়গা থেকে, মাথার ভিতরটা করছে ঝিমঝিম। "ওরে বাবারে, মরে গেলাম রে!"—বলে সেইখানে অন্ধকারে পথের পরে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল শেৎলা।

হঠাৎ কে তার গায়ে হাত দিল—মিষ্টিগলায় বলল—"ভয় কি শেতলদা? সাপে কামড়ালেই মানুষ মরে না। হয়ত এ-সাপটার বিষই নেই। তুমি আমার হাতখানা ধরে তোমার ঘায়ের জায়গাটার ওপর রাখো তো! আমি পটি বেঁধে দিই আগে!"

ছেলেটা কে, সেকথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই শেৎলা ধরল তার হাত, খুব ছোট ছেলেরই হাত বলে মনে হল। হাতখানা নিজের পায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে প্রশ্ন করল—"কী দিয়ে বাঁধবি? এখানে দড়ি কোথা?"

"দড়ি—করে নিচ্ছি"—বলতে বলতেই ছেলেটা ফরফর করে কি যেন ছিঁড়ে ফেলল। কী ছিঁড়ল? পরনে তার হাফপ্যান্ট, তা এত সহজে ছেঁড়া যায় না, আর সেটা তো এখনো তার পরনেই রয়েছে—টের পাচ্ছে শেৎলা। তবে হয়ত গায়ের জামা। কিন্তু জামা গায়ে দিয়ে তো কেউ খেলতে আসেনি আজ! না না, এসেছিল! একটা মাত্র ছেলে এসেছিল। ভিন্‌গাঁয়ের ছেলে বলে খালি গায়ে মাঠে আসতে বোধ হয় তার লজ্জা করেছিল। শেৎলার হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। সে ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বলল—"তুই—তুই কি ক্ষেতু?"

"আমায় ধরো না অমন করে শেতলদা! ভাল করে বাঁধতে দাও।" গায়ের জামাটা থেকে লম্বা লম্বা ফালি ছিঁড়ে নিয়ে চট্ করে পাকিয়ে সেই অন্ধকারেই নয়-বছরের ক্ষেতু শক্ত করে দুটো গেরো বাঁধল শেৎলার পায়ে। কামড়ের উপরেই একটা, আর হাঁটুর উপরে আর একটা।

ওদিক থেকে ততক্ষণে আলো নিয়ে লোকজন এসে পড়েছে। আসতে আসতেই তারা জল্পনা শুরু করে দিয়েছে রসুলপুরের ক্যাঙ্গলা ওঝাকেই ডাকা উচিত, না ফকিরহাটের কাত্তিক বেদেকে। দু'জনেই না কি সাপের বিষ নামাবার ওস্তাদ, ধন্বন্তরি বললেই হয়।

শেৎলাকে নিয়ে আপাততঃ বাশুলীর দেউলেই তুলল সবাই। সেখান থেকে খবর পাঠানো হল ওর বাড়িতে। ইতিমধ্যে একজন এসে খবর দিল—শেৎলার বরাত ভাল, কাত্তিক বেদে এই গাঁয়েতেই হাজির আছে আজ, তার বেয়াইবাড়ি নেমন্তন্ন খেতে এসেছে। খবর পৌঁছেও গিয়েছে তার কাছে, এল বলে সে। সাপের কামড়ের খবর পেলে ওঝাদের সেখানে আসতেই হয়, এটা নাকি মা-মনসার আদেশ।

কাত্তিক বেদের চেহারা দেখলে তাকে ধন্বন্তরির বদলে মনে হয় যমদূত। গাঁট্টা পালোয়ান, মিশ্‌কালো গায়ের রং, মুখে অগুন্তি বসন্তের দাগ। মাথায় লম্বা চুলে জবাফুল গোঁজা, চক্ষু দু'টি সেই জবাফুলেরই মত লাল। সে এসেই চেঁচিয়ে উঠল—"এ কী করেছ? বাঁধন খুলে দাও শীগগির! খোল! খোল!"

পাড়ার মাতব্বর মিত্তির মশাই দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তিতভাবে বললেন—"বাঁধন খুলবে ওস্তাদ? ডাক্তারেরা কিন্তু বলে—বাঁধন থাকলে বিষ উপরে উঠতে পারে না।"

দাঁত খিঁচিয়ে কাত্তিক জবাব দিল—"তাহলে ডাক্তার ডাকলেন না কেন? আমায় যখন এনেছেন, আমার হুকুমমত কাজ হবে। খোল বাঁধন শীগ্‌গির, নইলে ঘা পচে উঠবে এক্ষুণি।"

ওঝার ধমকে মিত্তির মশাই ঘাবড়ে গেলেন বোধ হয়—তিনি একবার শুধু কিন্তু-কিন্তুভাবে বললেন—"ওর বাবা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হতো না?"—এই বলে তিনি পিছনে সরে গিয়ে মন্দিরের রোয়াকে বসে পড়লেন। ওঝা জনতার দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে নিয়ে নিজেই এগিয়ে এল শেৎলার পায়ের বাঁধন খুলবার জন্য। কিন্তু তাকে আর হাত দিতে হল না বাঁধনে। পিছন থেকে তার লম্বা চুল জোরে টেনে ধরল একটা বাচ্চা ছেলে, সে ক্ষেতু।

"কে র‍্যা?"—বলে যমদূতের মত রক্তচক্ষু তুলে হুংকার করে ফিরে দাঁড়াল কাত্তিক। ভদ্দরলোকের ছেলে দেখে হঠাৎ গায়ে হাত দিতে ভরসা পেল না, কিন্তু হাত ধরে এমন নাড়া দিল যে ক্ষেতুর মনে হল হাতখানা তার কাঁধ থেকে ছিঁড়ে আসতে চাইছে।

"তুমি আমার চুল ধরলে যে ছোকরা?"

"তুমি বাঁধন খুলছ যে?"—ক্ষেতু সমান তেজে জবাব দিল—"'শেতলদা'র বাবা এসে না বলা পর্যন্ত তুমি বাঁধন খুলতে পাবে না। যদি খোল, আর তাতে রোগী যদি মারা পড়ে, তোমায় ফাঁসি যেতে হবে মনে রেখো!"

"এমন রোগীর চিকিৎসা আমি করি না"—বলে কাত্তিক বেদে রেগে হনহন করে বেয়াইবাড়ি চলে গেল।

অনেকে গজগজ শুরু করে দিল—"এমন ওঝাটাকে

ছেড়ে দেওয়া হল—এ কাজটা কেমন হল?”

একজন পড়ল ক্ষেতুকে নিয়ে—“তুমি অন্য গাঁয়ের ছেলে, তোমার এত সরফরাজির দরকার কি হে বাপু? রোগীটার ভালমন্দ যদি কিছু হয়—?”

“ভাল হবে কি মন্দ হবে তা জানি না, কিন্তু সাপের কামড়ের রোগীর প্রথম চিকিৎসাই হল বাঁধন দেওয়া। এ কথা আমার বইয়ে লেখা আছে, আপনারা পড়ে দেখবেন!”—বলতে বলতে কাপড়ের ফালির বাঁধনের উপরে দড়ি দিয়ে আরও শক্ত করে বাঁধতে লাগল ক্ষেতু।

শীতলের বাবা এসে পড়লেন এতক্ষণে, একেবারে হরিশ ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তার এসেই দেখলেন—ক্ষেতু বাঁধনের উপরে শক্ত করে বাঁধছে আবার। তিনি ব্রাভো বলে পিঠ চাপড়ে দিলেন তার—“এ ছেলেটি তো খুব করিতকর্মা দেখছি! কিন্তু কামড়ের এত পরে এ-বাঁধন কি আর কোন কাজ দেবে?”

“বাঁধন আমি কামড়ের এক মিনিটের ভিতরই দিয়েছিলাম। ঐ কাপড়ের ফালির বাঁধন। পুরোনো কাপড় পাছে হঠাৎ ছিঁড়ে যায়, সেই ভয়ে আবার নতুন করে দড়ি দিয়ে বাঁধছি এখন।”

“বুদ্ধিমান ছেলে তুমি। শেৎলা যদি বাঁচে ঐ বাঁধনের জোরেই বাঁচবে।” বলতে বলতে ব্যাগ খুলে ছুরি বার করলেন ডাক্তার।

সদ্য সদ্য সুচিকিৎসার ফলেই হোক, কিংবা হয়ত সাপটা সাংঘাতিক রকমের বিষধর ছিল না বলেই হোক, শীতল ভাল হয়ে উঠল এ-যাত্রা। তবে পায়ে কাটাকুটি হয়েছিল বলে বাড়ি থেকে সে বেরুতে পারল না দিন পোনেরো। যেদিন প্রথম বেরুলো, সেই দিনই দেখা গেল তাকে দক্ষিণপাড়ায়, ক্ষেতুর মামাবাড়িতে। কিন্তু ক্ষেতু নেই। শীতলের দুর্ঘটনার পরের দিনই তাকে নিজের গাঁয়ে চলে যেতে হয়েছে। কারণ তার বাবা হঠাৎ খুব অসুখে পড়ে ছেলেকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছেন।

বড়ই হতাশ হল শেৎলা। যার জন্য জীবনটা তার বাঁচল, তার সঙ্গে শেষ দেখাও হল না একবার? মনের কৃতজ্ঞতাটা জানানোও হল না? আর নিজের মনের পাপ প্রকাশ করে বলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া—তার সুযোগও পেল না শীতল?

হ্যাঁ, সেই মনের পাপ তাকে বড় পীড়া দিচ্ছে। সে তো সেই সন্ধ্যেয় ক্ষেতুকে মারতেই এসেছিল দক্ষিণপাড়ার বাগানে! মারতে এসে নিজে মরতে বসেছিল, প্রাণ পেয়ে গেল সেই ক্ষেতুরই কল্যাণে! বয়সে তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, কিন্তু কী তার জানাশোনা, কী তার উপস্থিত বুদ্ধি, আর কী তার তেজ! সাপের নামে আর দশটা ছেলে ছুটে পালিয়েছিল সেই অন্ধকার রাতে, পালায়নি একা ক্ষেতু। নিজের গায়ের জামা ছিঁড়ে গেরো বেঁধে দিয়েছিল—সে ঐ ক্ষেতু। কাত্তিক বেদে যখন তাকে মেরে ফেলার ফিকিরে ছিল, তখন তার চুলের মুঠি ধরে নিরস্ত করেছিল ঐ একরত্তি ছেলে ক্ষেতুই। তার সঙ্গে দেখা হল না আর?

সত্যিই আর দেখা হল না। দিন কতক পরে শেতলের বাবা তাকে পাঠিয়ে দিলেন দূরের এক শহরে, আত্মীয়বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শেখবার জন্য। সেখান থেকে মাঝে মাঝে সে বাড়ি আসে, এসে হয়ত শোনে ক্ষেতু মামাবাড়ি এসেছিল মাস দু'য়েক আগে। দু' দিন ছিল, খেলার মাঠে এসে খেলাধুলোও করেছিল। শেৎলার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল কিনা, কারও তা মনে নেই। একটা অভিমানে ছেয়ে আসে শেতলের অন্তর। সে আর কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না, সন্ধ্যের পরে গিয়ে বসে বাশুলী মন্দিরের রোয়াকে। চোখ বুজে সেদিনকার সেই ঘটনা আগাগোড়া মনে করবার চেষ্টা করে—ঐখানটায় শোয়ানো হয়েছিল তাকে। ঐখানে এসে দাঁড়িয়েছিল যমদূতের মত কাত্তিক বেদে। ঐখানে দাঁড়িয়ে ক্ষেতু সেই যমদূতকে ধমক দিয়েছিল—“তোমাকে ফাঁসি যেতে হবে, মনে রেখো!”

দীর্ঘ দিন কেটে গেল—তা প্রায় বছর বারো। এলো সেই বিশেষ বৎসরটি, ভারতের ইতিহাস যাকে কোনদিন ভুলতে পারবে না। ১৯৪২ সাল। রক্তে রাঙা হয়ে গেল শহরের রাজপথ, গুলি চলল পাড়াগাঁয়ের বাঁশবাগানে। ইংরেজের পুলিস খানাতল্লাশী চালাতে এসে ছেলেদের পিটিয়ে লাশ করল, মেয়েদের করল অসম্মান।

এমনি সময়ে শেতল একদিনের জন্য এল নিজের গাঁয়ে। সে দারোগা; এই অঞ্চলেই একটা কাজ পড়েছে তার। তারই মাঝে এক ফাঁকে গ্রামটা ঘুরে যাওয়া—বুড়ো মাকে একবার দেখে নেওয়া—বাশুলীর দেউলে পাঁচ মিনিট বসে যাওয়া—

বাশুলীর দেউলের উপর মোহ তার এখনও যায়নি। ঐখানে ক্ষেতু তার প্রাণ দিয়েছিল, যে ক্ষেতু আজ একজন বড়দরের অ্যানার্কিস্ট। যার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে আজ চার বচ্ছর হল। যে এই দিন সাতেক আগে কার্লাইল সাহেবকে গুলি করে খুন করেছে শহরের বড়রাস্তায় দিনে দুপুরে।

খুন করে সে একশোটা পুলিসের লোকের সমুখ থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছে, যেমন সে চিরদিন যায়।

বসে বসে ভাবছে শীতল দারোগা। বাশুলীর দেউলের রোয়াকে বসে ভাবছে—আর যে দেখা হয়নি ক্ষেতুর সঙ্গে, ভালোই হয়েছে। দেখা হলে শীতল কী করবে এখন? সে দারোগা, ক্ষেতু খুনী অ্যানার্কিস্ট। দেখা না হয়—সেই ভাল। তবু—তবু—

কখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে টের পায়নি শীতল দারোগা। আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে, এটা হঠাৎই খেয়াল হল তার। চাঁদের দিকে তাকাতে গিয়েই বারো বছর আগেকার সেই ছবি আবার ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে। সেদিনও এমনি জোছনা ছিল এই রোয়াকে। এইখানে সে সটান শুয়ে পড়েছিল—সাপে-কাটা রুগী। আর কাত্তিক বেদের চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে ধমকাচ্ছিল নয় বছরের ক্ষেতু—"ফাঁসি যাবে তুমি।"

আশ্চর্য! শীতলের মুখ থেকে তার অজান্তেই বেরিয়ে এল সেই বারো বছর আগেকার ধমক—"ফাঁসী যাবে তুমি!"

আরও আশ্চর্য! ঠিক সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা হাসি কে-যেন হেসে উঠল তার পিছনেই। ঝট্‌ করে মুখ ফিরিয়ে শীতল একেবারে আড়ষ্ট। ক্ষেতু! বারো বছর পরে দেখা, কিন্তু এ ক্ষেতু না হয়ে যায় না।

ক্ষেতু তার সামনে? দারোগার সামনে খুনী অ্যানার্কিস্ট? হুলিয়ার আসামী?

"তোমার কি মাথার পিছনেও দুটো চোখ আছে নাকি দারোগা মশাই? অবাক করলে যা হোক!"—বলে খুব হাসতে লাগল ক্ষেতু। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে গলাটা খুব-খানিকটা কর্কশ করে বলতে লাগল—"আমি ফাঁসি যাব, সে আর আশ্চর্য কি শেতল দারোগা? সে তো আমার মত লোকের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি!—কিন্তু তোমার? দমচুরি দিয়ে যে জীবন শুরু হয়েছিল, তার স্বাভাবিক পরিণতি তো উপকারীকে ফাঁসিতে লটকানোতেই, কী বল? তা ধরো আমায়! আমার আর পালাবার শক্তি নেই আজ। তিন দিন পেটে কিছু যায়নি। কালকাসুন্দির মাঠের মাঝখানে সাইকেলটা ভেঙে গেল। ভাবলাম মামাবাড়িতে ঢুকে দুটো খেয়ে রাতটা ঘুমিয়ে ভোরবেলা পালাব আবার। মাঠটা পেরুতে পেরুতে ধুঁকছিলাম ক্ষিধেতে। ভেবেছিলাম এই রোয়াকে একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর মামাবাড়ি ঢুকব। তা, বরাত আজ বিরূপ, তুমি এসে বসে আছ বাশুলীর দেউলে। রায়বাহাদুর হওয়া এবারে আর ঘোচায় কে তোমার?"

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে হাঁফাতে থাকে ক্ষেতু। আর শীতল দারোগা? কাঠ হয়ে বসে থাকে তার সামনে।

হাঁফটা থেমে এলে ক্ষেতু বলে—"কী? হাতকড়া বার করছ না যে? পিস্তল-টিস্তল নেই আমার কাছে!"

এতক্ষণে শীতলের কথা ফোটে। "যাও ক্ষেতু, মামাবাড়ি গিয়ে খেয়ে নাও, ঘুমোতে যেও না। খেয়েই চলে এস এখানে।"

অবাক হয় ক্ষেতু। "এখানে না এসে আমি যদি ওদিক দিয়ে পালাই?"

"পারবে না পালাতে, পুলিস আছে মোড়ে মোড়ে। পালাবার পথ যদি এখনো থাকে, তো সে এই কালকাসুন্দির মাঠ দিয়েই। খেয়ে এসো। এই আমার সাইকেল রয়েছে, পালাও।"

"তুমি আমায় ছেড়ে দেবে?"

"দমচুরি আমি সেদিনও করিনি ভাই, আজও করব না। জীবনদাতাকে ফাঁসিতে লটকাবো না।"

ক্ষেতু একবার তার মুখের দিকে তাকাল, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল মামাবাড়ির দিকে। শীতল ঠায় বসে আছে সেই রোয়াকে।

প্রায় এক ঘণ্টা বাদে ফেরে ক্ষেতু। শীতল সাইকেল দেখিয়ে দেয়। তারপর টেনে ধরে ক্ষেতুর একখানা হাত—"তোমার কথা সেইদিন থেকে একদিনের তরেও ভুলিনি ক্ষেতু।"

ক্ষেতু বলল—"আমিও এখন থেকে আর তোমার কথা একদিনের তরেও ভুলব না।"

সাইকেল নিয়ে মাঠের দিকে বেরিয়ে গেল ক্ষেতু।

দিন পোনেরো বাদে পলাতক ক্ষেতুর হাতে পড়ল একখানা খবরের কাগজ। একটা খবর তাকে চমৎকৃত করে দিল একেবারে। শীতল দারোগা নিজে যেচে গিয়ে পুলিস সাহেবের কাছে একরার করেছে ক্ষেতুকে নিজের ইচ্ছেয় ছেড়ে দেওয়ার কথা। চাকরি থেকে সে তো বরখাস্ত হয়েছেই, হয়ত তার জেলও হবে।

এর মানে? এর মানে এই যে ইংরেজ সরকারের চাকুরে হিসাবে নিজের কর্তব্য করেনি শীতল। সে-অপরাধের সাজা সে যেচে নিয়েছে।

আজ ক্ষেতুর সত্যি বিশ্বাস হল—দমচুরির অভ্যাস শীতলের ছিল না।

বারুদ-ভরা বই

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পেন্সীল্‌ভেনিয়ার এক ছোট ষ্টেশন। প্রায় সারা রাত জেগে ষ্টেশনমাষ্টার তাঁর আফিসের কামরায় ইজি-চেয়ারে ক্লান্ত দেহটি মাত্র এলিয়ে দিয়েছেন, এম্‌নি সময় মেয়েদের বিশ্রাম-কক্ষ হতে হঠাৎ কতকগুলো শিশুর কান্না তাঁর কানে ভেসে এলো।

প্রথমে কিছুক্ষণ তা অবহেলা করবার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। কারণ, সারাজীবনে তিনি যাত্রী তো কম দেখেননি! কেউ হাসবে, কেউ কাঁদবে, এতে আর নতুনত্ব কি আছে? কাজেই দৈনন্দিন জীবনের এসব ঘটনাকে উপেক্ষা করাই সঙ্গত। চেষ্টাও তিনি করেছিলেন, কিন্তু মনে হলো, কান্নার মাত্রা যেন ক্রমশঃই চড়া হয়ে উঠছে!

অগত্যা, তাঁকে যেতেই হলো। ব্যাপার কি তার অনুসন্ধান তাঁকে করতেই হবে।

—"কে আপনি? এখানে যে মেছোহাট মিলিয়ে বসেছেন! ব্যাপার কি? কি নাম আপনার?"

ষ্টেশনমাষ্টার এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি প্রশ্ন করে বসলেন!

হঠাৎ ষ্টেশনমাষ্টারের আগমনে মহিলাটি খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে তাঁর দিকে মুখ তুলে বললেন, "আমি—আমি—আমার নাম মিসেস্‌ হ্যারিয়েট বীচার ষ্টোয়ে। আমি ভোরের আপ্‌-গাড়ীর অপেক্ষা করছি। কি করবো স্যার, আমি এই ছেলেমেয়েদের কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। আমায় ক্ষমা করবেন স্যার!"

—"না, না, ওসব ক্ষমা-টমার কথা আমার কাছে হবে না। হয় এখান থেকে বেরিয়ে যান, নয়তো ওদের শান্ত করুন।"

অতি অসহায় ও করুণভাবে মহিলা তাকালেন তাঁর দিকে। বললেন, "চেষ্টা তো খুবই করছি, কিন্তু পারছি না কিছুতেই। আর, ওদেরই বা কি দোষ দিব বলুন! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আর আজ শীতটাও বড্ড কন্‌কনে। কাজেই শান্ত হচ্ছে না কিছুতেই—"

—"তা হলে বেরিয়ে যান, এক্ষুণি বেরিয়ে যান।"

ষ্টেশনমাষ্টারের বজ্র-আদেশ সেই 'ওয়েটিং-রুমে'র এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

মহিলাটি অতি অসহায়ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কি যে করবেন তিনি, কিছুই ঠিক করতে পারলেন না।

মহিলার এই মৌন ভাব দেখে, ষ্টেশনমাষ্টারের ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি তক্ষুণি ভেঙে গেলো! তিনি এবার আরো উচ্চস্বরে বললেন, "কি, যাবেন আপনি? স্বেচ্ছায় যাবেন? না, বের করে দিতে হবে লোক দিয়ে?"

হতভাগিনীর দু'চোখ দিয়ে এবার জলের ধারা নেমে এলো। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অভিভূতভাবে বললেন, "ক্ষমা করবেন স্যার! আর বড় জোর আধ ঘণ্টা। তার পরই আমার গাড়ী এসে যাবে, আর আমিও চলে যাব। এই সামান্য সময়টা—"

—"এই কুলী! কুলী! চাপ্‌রাশী!—"

ষ্টেশনমাষ্টারের আহ্বানে কুলীরা এসে গেলো চার-পাঁচ জন। তারপর প্রভুর আদেশে তারা যে কাজ করে বস্‌লো, সে রকম ঘটনা পৃথিবীতে বিরল না হলেও মানবতা কোন দিনও তার পোষকতা করেনি!

মহিলার শত কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও, ষ্টেশনমাষ্টারের নিষ্ঠুর আদেশে কুলীর দল তাঁর জিনিষপত্র সব কিছু ওয়েটিং-রুমের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, ছেলেমেয়েগুলিকে টেনে-হিঁচড়ে বসিয়ে দিল প্ল্যাটফর্ম্মের উন্মুক্ত হাওয়ার মধ্যে, তারপর মহিলার সম্মুখে এসে সোজা দাঁড়িয়ে বললো, "যাও, বাইরে বেরিয়ে যাও। নয়তো অপমানিত হবে।"

অপমান? অপমানের আর বাকিই বা ছিল কতটুকু? তবু, পাছে তারা বলপ্রয়োগে তাঁকেও হাত ধরে টেনে বার করে দেয়, এই আশঙ্কায়, মহিলা নতমুখে ও নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

চোখে তাঁর তখনো অজস্র জলের ধারা!—

শিশুদের কান্না ওতে থামেনি বটে, বরং দ্বিগুণ ভাবে বেড়েই চল্‌ছিল, তবু অসহায় দুর্ব্বলকে লাঞ্ছিত করেই প্রবলের পরম তৃপ্তি!

দরিদ্রা মহিলাও সেদিন এই চরম অভিজ্ঞতাই লাভ

করলেন যে,—প্রবল যে, সে চিরদিনই দুর্ব্বল দরিদ্রকে আঘাত করবার ফিকির খুঁজে বেড়ায়, অসহায় দুর্ব্বলকে বাঁচতে দেওয়া বা তাকে তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া প্রবলের উদ্দেশ্য নয় একেবারেই!

কিন্তু—এর কি কোন প্রতিকার নেই?

মহিলার মনে-প্রাণে বুঝি সেদিন সর্ব্বপ্রথম এক ক্ষুব্ধ ঝটিকার উত্তাল হাওয়া অন্তস্তলে বইতে সুরু করেছিল!

মিসেস্ ষ্টোয়ের মনে সেদিন তাঁর গত জীবনের কথা উদয় হয়েছিল কিনা জানি না; কিন্তু হলেও তা যে একেবারেই অস্বাভাবিক নয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

মিসেস্ ষ্টোয়ে খুব উচ্চশিক্ষিতা না হলেও লেখাপড়া জানতেন। শুধু তাই নয়, প্রথম জীবনে তিনি এক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজও করেছিলেন। কিন্তু পরে কেমন করে তাঁর ভাবুক মনের মধ্যে এক কপর্দ্দকহীন শিক্ষিত অধ্যাপকের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, আর তার ফলে তিনি সেই অধ্যাপককে বিয়ে করে চির-দারিদ্র্য বরণ করে নেন।

তারপর ধীরে ধীরে কত বছর কেটে যায়, আর তিনি একে একে সাতটি সন্তানের জননী হয়ে দারিদ্র্যকে ক্রমশঃই তাঁর অন্তরঙ্গ সাথী করে নিয়েছিলেন।

নিঃস্ব দরিদ্রের আবার মান-সম্মান কেন থাকবে? মিসেস্ ষ্টোয়েরও তাই মান-সম্মান লাঞ্ছিতই হচ্ছিল দিনের পর দিন! ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার থেকে কুলীরা পর্য্যন্ত তাই তাঁকে অপমান করে, ষ্টেশনের কামরা থেকে বের করে দিতে সাহসী হয়েছিল!

মিসেস্ ষ্টোয়ে তাঁর এই অভিজ্ঞতাকে ভুললেন না একবারও, তিনি তাঁর মনের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে গেঁথে রেখে দিলেন সেই অভিজ্ঞতা!

সুদূর অতীতের কথা হলেও, সেযুগেও সংবাদপত্রের অভাব ছিল না। মিসেস্ ষ্টোয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই সব খবরের কাগজ পড়তেন, আর সংবাদ সংগ্রহ করতেন পৃথিবীর কোথায় কোন্ অংশে দুর্ব্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার অবাধে চলে আসছে!

খবর শুনতেন তিনি—আমেরিকার দক্ষিণ অংশে ত্রিশ লক্ষ নিগ্রো ক্রীতদাস শ্বেতাঙ্গ মনিবদের ঘরে ঘরে নির্ম্মম অত্যাচার মাথায় নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে!

এ খবরও তাঁর অজানা রইলো না যে, একমাত্র নিউ-অর্লিয়েন্সের হাটেই, প্রতিবছর শীতকালে সাত হাজার নর-নারীকে ছাগল-ভেড়ার মতো কেনাবেচা করা হয়। মানুষ মানুষকে পণ্যদ্রব্যের মতো কেনাবেচা করবে আর সেই সব সদ্য-কেনা নর-নারীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে বসবে ও কঠিন অত্যাচারে ঐসব ক্রীতদাস-দাসী অথর্ব্ব-পঙ্গু হয়ে অবশেষে ইহলোক পরিত্যাগ করে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবে, এই দুঃসহ অবস্থার চিন্তা তাঁকে প্রায় অভিভূত করে তুললো!

১৮৫১ সালের এক শীতের প্রভাতে গির্জ্জায় গির্জ্জায় যখন প্রভু যীশুখৃষ্টের প্রার্থনা হচ্ছিল, তেমনি সময় মিসেস্ ষ্টোয়ের চোখের সম্মুখে যেন এক করুণ দৃশ্য ফুটে উঠলো!

জাগ্রত অবস্থায়ই স্বপ্ন দেখলেন তিনি, এক শ্বেতাঙ্গ মনিব তার বৃদ্ধ ক্রীতদাসকে নির্ম্মমভাবে ক্রমাগত চাবুক মেরে যাচ্ছে! হতভাগার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলো, তার দেহের সর্ব্বত্র যেন রক্তের নদী বয়ে যেতে সুরু করলো! কিন্তু আশ্চর্য্য, হতভাগ্যের মুখ থেকে তবু একটা কাতরোক্তি বা অভিসম্পাত ফুটে বেরুলো না!

যন্ত্রণায় মুখ তার কুঁকড়ে গেলো বটে, নিষ্করুণ কশাঘাতে দেহ তার মাঝে মাঝে স্পন্দিত ও সঙ্কুচিত হয়ে আকুলি-বিকুলি খাচ্ছিল বটে, কিন্তু আর্ত্তনাদ বা সাহায্যের আবেদনে নিজেকে সে হীন করে তুললে না একবারও! অথবা নির্দ্দয় মনিবের বিরুদ্ধে একবারও সে ঈশ্বরের দরবারে কোন বিচার প্রার্থনা করলে না।

সে বরং তার অত্যাচারী মনিবকে ক্ষমা করবার অনুরোধই জানিয়েছিল ঈশ্বরের কাছে!

চম্‌কে গেলেন মিসেস্ ষ্টোয়ে! মনে তাঁর জেগে উঠলো এক শাশ্বত জিজ্ঞাসা। ভাবলেন তিনি, সুসভ্য আমেরিকানদের এই কি তবে ভবিষ্যৎ? উৎপীড়িত দুর্ব্বলের অভিসম্পাত নিয়ে, মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত আমেরিকানরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে কয়দিন? আর এই লাঞ্ছিত অপমানিত হতভাগ্যের দলই বা তাদের অত্যাচারী মনিবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রভু যীশুর জয়ধ্বনি করবে কেমন করে? তা ছাড়া, স্বর্গের দেবতাই বা এমন পৈশাচিক অত্যাচার সহ্য করবেন কত কাল? প্রবল কি দুর্ব্বলের ওপর চিরদিনই এম্‌নি ধারা অত্যাচার চালিয়ে যাবে, আর অসহায় দুর্ব্বলের দল তা নীরবে সহ্য করে যাবে চিরকাল?

এমনি কত প্রশ্নই সেদিন মিসেস্ ষ্টোয়ের বুকের দুয়ারে যেন হাতুড়ি পিট্‌তে সুরু করে দিলে! তিনি অর্দ্ধ-উন্মাদিনীর মত প্রবলের অত্যাচার কল্পনা করে উত্তেজিত হতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি হাতে তাঁর কলম তুলে নিলেন, তারপর কল্পনায় বিভোর হয়ে ক্রীতদাস-দাসীদের ওপর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নির্ম্মম অত্যাচার-কাহিনী তাঁর সেই কলমের মুখে

ফুটিয়ে তুলতে সুরু করলেন!

স্থির করেছিলেন তিনি, স্বামীর উপার্জ্জনের সঙ্গে নিজের লেখা সেই পুস্তক-বিক্রীর অর্থ মিলিয়ে, হয়তো কিছু সচ্ছল-ভাবেই সংসার চালাতে সমর্থ হবেন!

সম্ভবতঃ এর বেশী আর কিছু সেদিন তিনি আশা করতে পারেননি! দু'বেলা দু'মুঠো আহার মাত্র—তবে একটু সচ্ছলভাবে! ব্যস্, শুধু এই পর্য্যন্ত!

স্বামী তাঁর লেখার খানিকটা পড়ে, উৎসাহ দিয়ে বললেন, "বেশ হচ্ছে, চালিয়ে যাও।"

দিনরাত পরিশ্রম করে মিসেস্ ষ্টোয়ে তাঁর বই শেষ করলেন। তারপর এক প্রকাশকের সঙ্গে বন্দোবস্ত অনুসারে, এক সাময়িক কাগজে তা ধারাবাহিকভাবে বেরোতে লাগ্‌লো।

প্রায় আট মাস তা চল্‌লো, কিন্তু শেষকালে এমন হলো সেই কাগজের চাহিদা যে, প্রকাশক আর চাহিদা অনুযায়ী কাগজের সংখ্যা বাড়িয়ে ছাপাতে পারেন না! ফলে, কাগজ বেরোলে অনেককেই হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

দেখতে দেখতে সারা আমেরিকায় এক যুগান্তর উপস্থিত হলো! মিসেস্ হ্যারিয়েট্ বীচার ষ্টোয়ের লেখা "টম্‌কাকার কুটীর" (Uncle Tom's Cabin) সকলেরই মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে পড়লো।

ক্রীতদাসের দল দেখলো, এ যে তাদেরই ছবি! তাদেরই ব্যথা-বেদনা, তাদেরই চোখের জল, এর প্রতিটি অক্ষর অভিষিক্ত করে রেখেছে! তারা লেখিকাকে আশীর্বাদ করলো মনে-প্রাণে!

অত্যাচারী দাস-ব্যবসায়ীরা দেখলো, আর দেখলো উৎপীড়ক শ্বেতাঙ্গ প্রভুর দল, যে নির্ম্মম অত্যাচার তারা করে এসেছে এতদিন, তা আর পাঁচিল-ঘেরা রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে নেই তো! তা এখন পৃথিবীর প্রকাশ্য দরবারে প্রতিনিয়ত মাথা খুঁড়ে বিচারের দাবী জানাচ্ছে!

তা ছাড়া, ক্ষমতার আসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত, আর যথার্থ সুসভ্য মানুষ বলে যাঁরা গৌরব বোধ করতেন, তাঁরা দেখলেন, মানবতা বিপন্ন হয়ে উঠেছে ধনী দাস-ব্যবসায়ীদের নির্ম্মম অত্যাচারের ফলে। শুনলেন তাঁরা, অগণিত ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর দল যন্ত্রণায় অধীর হয়ে, তাদের আর্ত্ত চীৎকারে সুসভ্য মানব-সমাজের শান্তি ব্যাহত করছে! কাজেই এখনই তার কোন প্রতিকার করা প্রয়োজন!

এর ফলে আমেরিকার পথে-ঘাটে জেগে উঠলো এক ঘরোয়া বিদ্রোহ। কেউ চাইলো, ক্রীতদাসের ব্যবসা জিইয়ে রাখতে হবে, নইলে তাদের টাকা আসবে কোত্থেকে? আর কেউ চাইলো, না, না, মানুষ বিক্রীর এই জঘন্য ব্যবসা তুলে দিতে হবে চিরকালের জন্য! নইলে এত রক্তপাত ও আর্ত্তনাদ আর সইতে পারা যায় না!

কাজেই এক তুমুল বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হলো! অর্থলোলুপ পৈশাচিক ব্যবসার সঙ্গে অশ্রুসিক্ত মানবতার লড়াই সুরু হয়ে গেলো!

অবশেষে দীর্ঘদিন পরে লড়াই যখন শেষ হলো, আমেরিকার ক্রীতদাস-মহলে তখন জেগে উঠলো বিপুল উল্লাস! তারা কেউ আর তখন ক্রীতদাস নয়, কেউ আর কারো তাঁবেদার নয়! আইনের বলে তারা ফিরে পেয়েছে তাদের অধিকার,—স্বাধীন মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার!

সকলেই তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, কোথায় সেই মহিলা যাঁর লেখা 'টম্‌কাকার কুটীর' এমন এক অসাধ্য সাধনে ইন্ধন জুগিয়েছিল? কাজেই পেন্‌সীল্‌ভেনিয়ার ষ্টেশনে একদিন যে লজ্জাকর হীন ঘটনাটি ঘটেছিল মিসেস্ ষ্টোয়েকে কেন্দ্র করে, তার মাত্র কয়েক বছর পর, সেই মহিলাই যখন আবার কোন জরুরী কাজে রেলগাড়ীতে চেপে এক জায়গা থেকে অপর এক জায়গায় যাচ্ছিলেন, উৎসুক জনতা তখন পথিমধ্যে কয়েকবার তাঁর গাড়ী থামিয়ে, তাঁর দর্শন লাভ করে পরম কৃতার্থ বোধ করেছিল!

এমন কি, বিদেশে—ব্রিটেনে পর্য্যন্ত, উৎসুক জনতার হাত থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য পুলিশকে তাঁর গমন-পথের দু'পাশে দড়ি বেঁধে, তাঁকে রাস্তা করে দিতে হয়েছে!

"আঙ্কল টমস্ ক্যাবিন" বা "টম্‌কাকার কুটীর" এ পর্য্যন্ত বিক্রী হয়েছে প্রায় তিন কোটি। আর দাস-ব্যবসায়ের প্রথা বন্ধ করবার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একদিন যে ঘরোয়া যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছিল, এই একখানি মাত্র বইই ছিল তার প্রধান কারণ।

কিন্তু নিয়তির কথা বলতে পারে কে? কলম যাঁর দেশের বুকে এম্‌নিভাবে একদিন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তাঁর নিজের বেলায়ও বুঝি সেই আগুনই জমা হয়ে ছিল অদূর-ভবিষ্যতের জন্য!

অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে তাঁর এক ছেলে যেদিন অকালে মারা গেলো, মিসেস্ ষ্টোয়ে সেই দিন থেকেই হলেন উন্মাদিনী! ১৮৯৬ সালেও দেখা গেছে আশী বছরের এক বৃদ্ধা রাজপথে যে কোন তরুণকে তার বুকে চেপে ধরে, নিজের হারানো ছেলে মনে করে, অভিভূতভাবে তাকে চুমু খাচ্ছে!—

চাঁদ ও ভূত

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

চাঁদে মানুষ প্রথম পা দিয়েছে বলে সেদিন আমাদের আপিসের ছুটি হয়ে গেল টিফিনের সময়। পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রায় সবাই তাই মুগ্ধ, বিস্মিত, হতচকিত!

ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আলোচনা চলে। সকলের মুখে এককথা! ট্রামে, বাসে, রাস্তায়, ঘাটে, হাটে-বাজারে, রেস্তোরাঁয়—কোথায় নয়? আগের দিন সারারাত জেগে রেডিও খুলে চন্দ্রলোক অভিযানের এই রোমাঞ্চকর ধারাবিবরণী শুনেছে অনেকে, যেমন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নরনারীরা শুনেছে।

সেদিন বিকেলে লেকের ধারে বসে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছিলুম। আজও পর্যন্ত এমন সংগতি হলো না যে একটা অলওয়েভ রেডিও কিনতে পারি! তাহলে সারা বিশ্বের শ্রোতাদের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে আমিও কাল রাত্রে বিশ্বলোকের এই হর্ষপুলকিত আনন্দোৎসবের অংশীদার হতে পারতুম। কি হতভাগ্য আমার!

হঠাৎ আমার চিন্তাধারায় ছেদ পড়লো। পিছন দিকের বেঞ্চি থেকে কে একজন বলে উঠলেন, দেশের লোকগুলোর কি সব মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি মশাই? কাল সারারাত কি হল্লা! একটু ঘুমতে পারলুম না। আজ আবার ইস্কুল-কলেজের ছুটি দিয়েছে, অনেক আপিসের নাকি হাফ-হলিডে হয়ে গেছে। তারপর কতগুলো কাগজের স্পেশাল বেরিয়েছে, দুপুর থেকে তাদের চেঁচামেচির চোটে প্রাণ যায়। না হয় চাঁদে মানুষ গেছে! তাতে কার কি উপকারটা হবে শুনি? বিজ্ঞানের অগ্রগতি না গুষ্টির পিণ্ডি! যেখানে নিত্য অশান্তি, রোগ-শোক, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অশিক্ষা, অনাহার—একটা নয়, অন্তহীন সমস্যা যেখানে, বিজ্ঞানীরা উন্নতি করার কিছু খুঁজে না পেয়ে, হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা খরচ করে ছুটলো কিনা চাঁদ থেকে একমুঠো ছাইপাঁশ আনতে!

কে একজন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এই মাটির মানুষ চাঁদে গিয়ে হাঁটছে, এটা কোনদিন চোখে দেখে যাবেন, ভাবতে পেরেছিলেন কি? এর জন্যে আপনার থ্রিল হচ্ছে না?

—এর চেয়ে অনেক বেশী থ্রিলিং ঘটনা আমাদের এই দেশে ঘটে, নিত্য ঘটছে, কে তার খবর রাখে! ভদ্রলোকের মুখের ওপর হঠাৎ একটা থাপ্পড় মেরে যেন তাঁকে থামিয়ে দিলেন তিনি।

একটা বেঞ্চিতে ওঁরা পাঁচজন বসেছিলেন। সবাই বৃদ্ধ এবং অবসরপ্রাপ্ত। আপাততঃ বেকার। কারুরই কোন কাজকর্ম নেই। তাই কেউ ক্ষিদে করার জন্যে, কেউ বা বাতের কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে সান্ধ্যভ্রমণের পর একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে সবকিছুই আলোচনা করেন। এই সব ভ্রমণসঙ্গীদেরও নিজস্ব এক একটি দল আছে, যাঁরা ভিন্ন বেঞ্চিতে না বসে, গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করে বসেন। নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসমত।

তাই প্রথম বক্তার মুখের কথা থামতেই অপর সকলে একসঙ্গে তাঁর চোখের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। তাঁদের সকলের চোখেই বিস্ময়। অর্থাৎ চাঁদে যাওয়ার চেয়ে আরো বেশী থ্রিলিং ঘটনা, সে কিরকম?

প্রথম বক্তা এবার নিজের কথার জের টেনে আনলেন,—এই যে মানুষ, যারা পৃথিবীতে এত কাণ্ডকারখানা করছে, তারা যেই মরলো আর সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরিয়ে গেল! এসব ফুটুনির কথা অনেক শুনেছি ওদের মুখে, একে কি বিশ্বাস করতে বলেন?

সবাই নীরবে যখন পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন তখন তিনি বললেন, শুনলে আপনাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে মশাই। এ বানানো গল্পকথা নয়। একেবারে চোখে দেখা। সত্যি ঘটনা।

—ওঃ, ভূত দেখেছেন! একজন বলে উঠলেন।

বক্তার কণ্ঠ এবার ঝেঁজে উঠলো।—অত সস্তার জিনিস নয় যে 'ভূত' বলে কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন। ভূত কি, কেন আসে, কোথায় থাকে, কোথায় যায়—বলুক তো দেখি আপনাদের এই সব বৈজ্ঞানিকরা। সায়েন্সের উন্নতির অনেক কথা তো শুনেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত মানুষের জীবনের এতবড় একটা দিক অন্ধকারে ঢাকা পড়ে রয়েছে,

অথচ এ নিয়ে কারুর কোন মাথাব্যথা নেই!

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতে একটা শ্লোক আওড়ালেন, 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনায় কুতঃ!' অর্থাৎ কিনা যে দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সে আবার ফিরে আসবে কোথা থেকে!

—ও বললে শুনছি না। ওসব বোগাস্ গোঁজামিল অনেক শুনেছি। এ একেবারে সত্যি ঘটনা। কেবল আমার নাতি চোখে দেখেনি, আরও অনেকেই দেখেছে। এমন কি আশ্রমের মহারাজ পর্যন্ত দেখেছিলেন। কাজেই ওটা কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার জিনিস নয়। আপনাদের এই সায়েন্স এখানে ফেলিওর, তাই বলুন।

শুনুন তাহলে ঘটনাটা। আমার নাতি রাজেন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে ক্লাস সেভেন্-এ পড়ে। দুর্দান্ত ডানপিটে ছেলে। আর তেমনি সাহসী। ভয়ডর কাকে বলে জানে না। পাড়াগাঁয়ে থাকতো। কোনরকমে তাকে লেখাপড়ায় মন বসাতে না পেরে শেষে সেখান থেকে এনে বিদ্যাশ্রমের স্কুলে ভর্তি করে দেয়। বোর্ডিংয়ে মহারাজদের কড়া শাসনে থাকলে যদি পড়াশুনায় মন বসে।

শুধু তাই নয়, চরিত্রগঠনের পক্ষে যেমন এর সুন্দর আবহাওয়া তেমনি সুন্দর পরিবেশ। ছাত্রাবাসের ঘরগুলি ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। চতুর্দিকে ফল-ফুলের বাগান। মহারাজরা নিজে তাদের খাওয়াদাওয়া থেকে লেখাপড়া সবকিছুর তত্ত্বাবধান করেন।

এক একটি ঘরে চারজন করে ছাত্র থাকে। চারজনের চারটি স্বতন্ত্র খাটিয়ায় বিছানা।

মাস কয়েক পরে আমার নাতিকে দেখতে গিয়ে তার বাবার মনে হয়, ছেলেটা যেন একটু রোগা হয়ে গেছে। তাই একটা টনিক কিনে দিয়ে বলে আসে রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে যেন দু'চামচ করে খেয়ে শোয়। কিন্তু হতভাগা ছেলেটা এমনি যে ওই ওষুধটা খাবার কথা একদিনও তার মনে থাকে না। খেয়ে এসেই শুয়ে পড়ে বিছানায়।

এদিকে কয়েকদিন পরে যখন খেয়াল হলো, তাকের ওপর থেকে বোতলটা নামিয়ে দেখে, অনেকটা খালি। কে খেলে এতটা ওষুধ?

ওর যে তিনজন রুম্‌মেট তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলে। তারা তিনজনেই দিব্যি গেলে বললে, মাইরি বলছি, আমরা ওতে হাতও দিইনি। কিছু জানি না।

নিশ্চয়ই কেউ হাত দিয়েছে, নইলে এতটা ওষুধ কমলো কি করে? তবে কি এ ঘরে অন্য কেউ আসে যখন ওরা থাকে না? ক্লাসে পড়তে যায়, কিংবা মাঠে খেলাধুলা করে? মেট্রনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে।

মেট্রন ওই আশ্রমেরই প্রবীণ ব্রহ্মচারী। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন লোকের সেখানে ঢোকার হুকুম নেই। তিনি মুচকি হেসে বলেন, এ তোমার বন্ধুবান্ধবদের কীর্তি। তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়, তখন এই কাজ করে।

খাবারদাবার কোন ছেলের বাড়ি থেকে পাঠালে অবশ্য কেড়েকুড়ে চুরিচামারি করে বন্ধুবান্ধবরা খেয়ে নেয় এবং সে কার্য সে নিজেও করেছে। তবে ওষুধ কেউ কারো লুকিয়ে খেয়ে নিয়েছে এটা শোনেনি কখনো। এই প্রথম।

যাই হোক, মহারাজ তার মনে ওইরকম একটা সন্দেহ জাগিয়ে দেওয়াতে সে মনে মনে স্থির করলে, রাত্রে না ঘুমিয়ে বিছানায় ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে। চোর হাতেনাতে ধরবেই ধরবে।

গভীর রাত ঝাঁঝাঁ করছে। বিদ্যাশ্রমের উঁচু পাঁচিল ঘেরা ওই বিরাট চৌহদ্দির মধ্যে বোধহয় একটা প্রাণীও জেগে নেই। সবাই ঘুমচ্ছে।

ঢং করে দূরে কোন কারখানার পেটাঘড়িতে একটা বাজলো। নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে সেই শব্দটা একটু একটু করে দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে গেলে আস্তে আস্তে বালিশের ওপর মাথা তুলে, জানালা দিয়ে ঘরে আসা বাইরের অস্পষ্ট আলোতে সে দেখলে তার বন্ধুরা সবাই ঘুমচ্ছে। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। তার চোখের পাতাদুটোও যেন জুড়ে আসছিল। একবার ভাল করে হাত দিয়ে চোখদুটো ঘষে নিয়ে, মাথাটা যেমন নিঃশব্দে বালিশ থেকে তুলেছিল তেমনিভাবেই আস্তে আস্তে আবার রাখলো। শুধু মুখটা এবার ডানদিক থেকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে নিলে। ডানদিকের বড় জানালাটার ভেতর দিয়ে কালো কালো গাছের মাথা দেখা যাচ্ছিল।

একটু পরে। রাত তখন বোধহয় খুব বেশী হলে দেড়টা, হঠাৎ তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠলো। দেখে, একটা আধবুড়ো গোছের লোক, মাথায় টাক, চোখে কালো সেলের চশমা, গলায় একটা কম্‌ফর্টার জড়ানো, ওষুধের শিশিটা থেকে ওষুধ ঢেলে খেয়ে আবার তাকের ওপর শিশিটা তুলে রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চেঁচাতে পারলো না। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলো। মনে হলো কে যেন তার গলাটা চেপে ধরেছে।

পরদিন সকাল হতেই সে মেট্রনের ঘরে গিয়ে বললে, দেখুন একটি বাইরের লোক আমাদের ঘরে ঢুকে রাত্রে চুপিচুপি ওষুধ খেয়ে যায়, আমি কাল দেখেছি।

—সেকি! বাইরের কোন লোকের ত এখানে ঢোকার কোন উপায় নেই। আমাদের গার্ড রয়েছে। সারারাত সে পাহারা দেয়। তাছাড়া বাইরে থেকে কোন লোক শুধু তোমার ওই ওষুধ খাবার লোভে রাতের বেলা তোমরা ঘুমিয়ে পড়লে ঘরে ঢুকতে যাবে এ কখনো হতে পারে? তুমি ঘুমের ঘোরে হয়ত স্বপ্ন দেখেছো।

—না, মহারাজ, আমি স্পষ্ট দেখেছি লোকটাকে।

—আচ্ছা, কি রকম দেখতে বল তো?

—টাকমাথা, আধবুড়ো, চোখে কালো সেলের চশমা, গলায় একটা কম্‌ফর্টার জড়ানো—লোকটা বোধ হয় অসুস্থ, ভাবভঙ্গি দেখে যেন মনে হলো।

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি মুহূর্ত কয়েক চুপ করে কি ভাবলেন, তারপর বললেন, দেখো, এ কথা নিয়ে তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব বা অন্য কারুর সঙ্গে আলোচনা করো না। আমি আজ থেকে তোমাদের আট নম্বর ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

দু'নম্বর ঘর ছেড়ে ওরা আট নম্বর ঘরে চলে এলো সেদিনই। দু'নম্বর ঘরটা খালিই পড়ে রইলো।

তারপর থেকে অবশ্য ওদের ঘরে সে লোক আর ঢোকেনি এবং ওষুধও শিশিতে ঠিক যেমনকার তেমনি ছিল।

বোধহয় সাত কি আটটা দিন পরে। একদিন গভীর রাত্রে বাথরুমে যাবার জন্যে সে উঠলো। বাথরুমটা ছিল বারান্দার এক কোণে। সেখানে যেতে হলে দু'নম্বর ঘরটার সামনে দিয়ে ঘুরে যেতে হয়।

কিন্তু দু'নম্বর ঘরটার কাছে যাওয়ামাত্র সে চমকে উঠলো। দেখে সেই লোকটা শুয়ে আছে একটা খাটিয়ার ওপর, আর দরজাটা খোলা।

ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটে এলো তার ঘরে। বন্ধু তিনজনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে, এই শীগ্গির আয়, সেই লোকটা...

সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে বেরিয়ে এলো তার সঙ্গে। কিন্তু ভোঁভাঁ। কেউ কোথাও নেই। দু'নম্বরের দরজায় একটা তালা ঝুলছে।

সেদিন ওর বন্ধুরা সবাই মিলে ওকে ভীতু, কাওয়ার্ড বলে গালাগাল দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক এর দুটো দিন পরে ওর বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে যে সাহসী, রাতে সে বাথরুমে যেতে গিয়ে চীৎকার করতে করতে ঘরে ছুটে এলো। বললে, মাইরি তোর কথাই সত্যি। ভয়ে তার সারা দেহ তখন রোমাঞ্চিত। গলার স্বর কাঁপছে। বললে, তুই যেমন

হাঁ, ঠিক এই চেহারা দেখেছি।

বলেছিলিস ঠিক হুবহু তেমনি লোকটাকে দেখতে। মাথায় টাক, কালো চশমা চোখে, গলায় কম্‌ফর্টার জড়ানো, দেখি খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছে!

—চল দেখি, বলে তখুনি সবাই বেরিয়ে এলো বটে কিন্তু ঠিক আগের দিনের মতই হতাশ হলো। দেখে দু'নম্বর ঘর তালাবন্ধ। কেউ ত্রিসীমানায় নেই।

পরদিন ওরা মেট্রনের ঘরে গিয়ে বললে, মহারাজ, দু'নম্বর ঘরে ভূত আছে।

—চুপ চুপ! বলে মহারাজ তাদের মুখে হাত চাপা দিলেন।—একথা একবার রটে গেলে আর কেউ এ ছাত্রাবাসে থাকতে চাইবে না। তোমাদের এই বিদ্যাশ্রমের বদনাম হয়ে যাবে!

—কিন্তু মহারাজ, এর কোন একটা ব্যবস্থা না করলে—

—আচ্ছা, এর একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। তোমরা শুধু মুখ বন্ধ করে রাখ কয়েকটা দিন, কেমন?

এই পর্যন্ত বলে বক্তা এবার একটু থামলেন। তারপর বার দুই কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বললেন, ঠিক তার পরদিন আমার নাতি ও তার সেই বন্ধু যে দেখেছিল সেই লোকটাকে, দুজনকে সঙ্গে করে মহারাজ হাঁটতে হাঁটতে ওখান থেকে দু'মাইল পথ গিয়ে একটা প্রকাণ্ড পুরনো আমলের বড়লোকের বাড়ির ফটকে ঢুকলেন। ফটকের একটা মাথা খানিকটা ভাঙা, আর একটা মাথার ওপর একটা সিংহের মূর্তি। সিংহের সামনের একটি পা

ভেঙে গেছে, লেজের প্রান্তভাগটাও নেই। ফটক দিয়ে ঢুকলেই একটা বিরাট বাগান, তাতে আম কাঁটাল জাম জামরুল নানারকমের ফলের গাছ, এবং তারি ভেতর দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেই সাবেকী ধরনের চকমেলানো দু'মহল বাড়ি। ইট বার করা, চুন বালি খসে পড়েছে, ছাদের কার্নিসের ওপরে বেশ বড় বটগাছ গজিয়ে উঠেছে। এককালে যে কোন এক ধনীর অট্টালিকা ছিল তার চিহ্ন সর্বত্র বর্তমান।

মহারাজকে সদর দরজার কাছে দেখেই একজন বুড়োমত মালী ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। মহারাজ বললেন, গিন্নীমার সঙ্গে একবার দেখা করবো, একটু খবর দাও। এই গিন্নীমাই বাড়িসমেত ওই জমিটা বিদ্যাশ্রমকে দান করেছিলেন।

একটু পরেই তিনি তাঁদের ভেতরে ডেকে পাঠালেন।

মহারাজ বললেন, একটু বিশেষ ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, কিছু মনে করবেন না!

—না না, সেকি! বলুন, কি দরকার! বলে তিনি মহারাজের মুখের দিকে তাকালেন।

—আচ্ছা, আমাদের আশ্রমের ছাত্রাবাস যে বাড়িটায়, সেখানে কি কোন লোকের মৃত্যু হয়েছিল?

—এতদিন পরে একথা কেন প্রশ্ন করছেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি মহারাজ? ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর যেন কেমন করুণ শোনালো।

মহারাজ তখন ছাত্রদুটিকে দেখিয়ে, তারা চাক্ষুষ করেছিল যা যা, তাঁকে নিবেদন করলেন।

ভদ্রমহিলা সব শুনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমরা একটু আমার সঙ্গে ভেতরে এসো তো বাবা, বলে তাদের নিয়ে তাঁর শয়নকক্ষে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে দেওয়ালজোড়া একটা বিরাট তৈলচিত্র সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো ছিল।

তারা দুজন ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠলো, হ্যাঁ, ঠিক এই চেহারা দেখেছি। এমনি মাথায় টাক, এই চশমা, ঠিক এইরকম গলায় কম্ফর্টার জড়ানো।

ভদ্রমহিলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আবার বৈঠকখানা ঘরে ফিরে এলেন। তারপর মহারাজকে বললেন, ওরা যাঁকে দেখেছে উনি আমারই স্বামী। ওই বাগানবাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়, বিনা চিকিৎসায়। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে সে ওষুধ খেতে না দিয়ে মেরে ফেলে তাঁর এই বিপুল বিষয়সম্পত্তি হস্তগত করার লোভে। কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু তিনি যে অনেক আগেই আমার নামে সব উইল করে দিয়েছিলেন সে খবর তারা জানতে পারেনি। তাঁর আত্মা তাই এখনো ওষুধ খাবার জন্যে ঘুরে মরছে। আহা, ওষুধ খেলেই ভাল হয়ে উঠবেন, রোগ সেরে যাবে, মনে মনে কত আশা করেছিলেন! বলতে বলতে থেমে গিয়ে আঁচল দিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল মুছতে লাগলেন ভদ্রমহিলা। তারপর মহারাজকে বললেন, দেখুন তাঁর আত্মার যাতে মুক্তি হয় তার জন্যে শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি যা কিছু করতে হয় এবং তার জন্যে যত খরচ লাগে আমি দেবো, আপনারা তার ব্যবস্থা করুন। আমি যাদের হাতে টাকা দিয়ে গয়াতে পাঠিয়েছিলুম ওঁর পিণ্ডদান করতে, তারাও তাহলে ফাঁকি দিয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে। নইলে এখনো কেন তাঁর আত্মা এইভাবে ওখানে ঘুরছে!

বক্তা এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেলেন।

তখন সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, তারপর কি হলো বলুন!

—সেটাই তো সবচেয়ে বিস্ময়কর। মহারাজরা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আনিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন যাগযজ্ঞ অনেক কিছু করলেন ঠিক সেই ঘরে। এবং বললে বিশ্বাস করবেন না, তার পর থেকে প্রায় এক বছর কেটে গেছে, কেউ কোনদিন ভয় পায়নি, বা সেই মূর্তিকে দেখেনি।

—তাই নাকি? একজন বলে উঠলেন।

তখন ভদ্রলোক বললেন; বিদ্যাশ্রম তো কাছেই, বেশী দূর নয়। ইচ্ছে করলে একদিন গিয়ে মহারাজকে জিজ্ঞেস করে আসতে পারেন। তিনি সাধুসন্ন্যাসী মানুষ, মিথ্যা বলবেন না কখনই। বলেই কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ একটু চড়িয়ে দিয়ে বললেন, বিজ্ঞানের জয়গানে তো সবাই পঞ্চমুখ, কিন্তু এর কি কোন এক্সপ্লানেশন দিয়েছেন আপনাদের এইসব বৈজ্ঞানিকরা? অথচ মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় জিজ্ঞাসা আর কি থাকতে পারে!

এই বলে ভদ্রলোক চুপ করলে, তাঁর সঙ্গীরাও আর কোন জবাব না দিতে পেরে মৌন হয়ে রইলেন। কিন্তু আমার মনের মধ্যে সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল! ভদ্রলোক যা বললেন তা যেমন সত্যি, তেমনি চন্দ্রলোকে মানুষের এই পদার্পণ, এর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা আর কি হতে পারে? তাহলে কি বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে এই পরলোকতত্ত্ব? তাই বিজ্ঞান আজও এর কোন হদিস করতে পারেনি?

কে জানে!
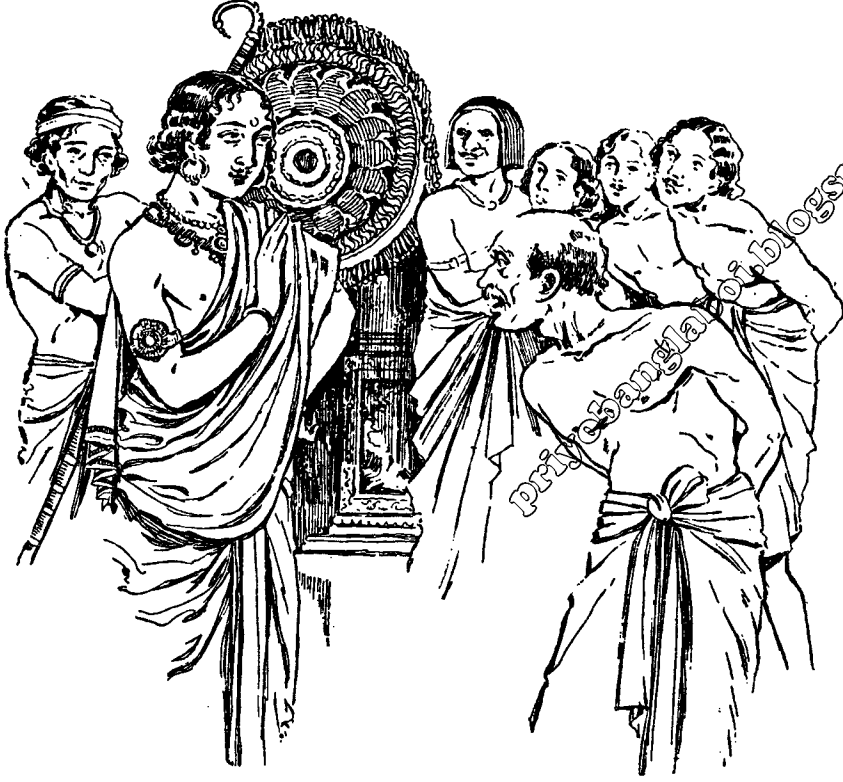
রাতের ঘণ্টা

অনুপমা দেবী

রাণী! আমার বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে,—গৌড়ের রাজা বল্লেন রাণীকে।

রাণী তখন তিলক কাটছিলেন। রাজার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—বল কি! ঠাণ্ডা লেগেছে, আর তুমি দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছ! যাও, এক্ষুণি গিয়ে শুয়ে পড়।

সে কি? কাজকর্ম্ম ছেড়ে এখন শুয়ে পড়তে হবে! কী যে বল তুমি! সভায় কত কাজ বাকী রয়েছে। আর তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে, এ আমার একটা মনের ভুল; ঠাণ্ডা হয়তো সত্যি লাগেনি,—রাজা বল্লেন রাণীকে।

চোখ দু'টো বড় করে রাণী বল্লেন, হুঁ! রাত-দিন তোমার ঐ এক কথা। কাজ—কাজ—কাজ! বলি, রাজা বাঁচলে তো রাজ্য! ঠাণ্ডা লাগলে কি হয়, তা জান? সর্দ্দি হয়, সর্দ্দি হতে জ্বর, জ্বর হতে মৃ...রাণী বড় করে জিব কাটেন।

রাজা প্রতিবাদ করে বলতে গেলেন, শোন...রাণী...; এমন সময় নাক তাঁর শুড়্ শুড়্ করে উঠল, আর সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত আওয়াজ, তারপরই হ্যাঁচ্ছো...

ব্যস, সব দ্বন্দ্ব গেল মিটে। রাণীরই হল জিৎ।

পায়ে গরম জলের বোতল, বুকে পুলটিস্, গায়ে তিনটি লেপ আর পাশে তিন বাটি গরম পাঁচন নিয়ে রাজা বিছানায় শুয়ে রইলেন।

রাণী এসে বল্লেন,—নাও! এবার ভাল করে ঘুমাও, সব রোগ সেরে যাবে।

ঝাড়া দু'ঘণ্টা ঠিক দুপুরে ঘুমিয়ে রাজা যখন বিকালে ঘুম হতে উঠলেন, সব ঠাণ্ডা লাগা তাঁর কোথায় চলে গেছে! শরীরটা তাঁর বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠেছে।

রাজা নফরকে হুকুম দিলেন, জল দাও বাথ্রুমে, চান করব। নফর জল দিলে চান করে পোশাক পরে রাজা গিয়ে সভায় বসলেন কাজ করতে।

কাজ সেরে অন্য দিনের মতই রাতে রাজা এলেন শুতে।

শুলেন, কিন্তু ঘুম এলো না।

ডান পাশ ফিরলেন, বাঁ পাশ ফিরলেন, উপুড় হলেন, বেঁকে শুলেন। কিন্তু ঘুম আর আসে না। শেষে ঘুমের

আশা ছেড়ে, অন্ধকারে চোখ ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলেন। চোখ চেয়ে একবার একথা ভাবেন, আবার সেকথা ভাবেন, আর সবচেয়ে বেশি ভাবেন, সেই কথা—কেন ছাই মরতে দুপুরে ঘুমিয়ে ছিলাম!

এমনি করে অনেকক্ষণ কাটল। তারপর গৌড়ের এক মন্দিরে ঘণ্টা বাজা সুরু হল। ঘণ্টা বাজে ঢং, রাজা গোনেন এক, ঘণ্টা বাজে ঢং, রাজা গোনেন দুই, এইভাবে এগার বার ঢং বেজে ঘণ্টা থামল। রাজা গুণে ভাবলেন এগারটা বাজল।

কেউ কথা বললে তার না থামা অবধি অন্য কারও কথা বলতে নেই। রাজ্যের ঘণ্টাগুলিও হয়তো ভদ্রতার এই নিয়ম মেনে চলে। তাই একটা মন্দিরের ঘণ্টা বাজা যখন শেষ হয়, তখন সুরু হয় অন্য মন্দিরের ঘণ্টা বাজার পালা। প্রথমটির পরে আর একটি মন্দির থেকে ঢং-ঢং করে এগার-ঘণ্টা বাজল। এইভাবে গৌড়ের মন্দিরের ঘণ্টাগুলি এক এক করে বাজা শেষ হতে, রাজা ভেবে বল্লেন, এতক্ষণে এগারটা বাজা শেষ হল।

ঘণ্টা থেমে গেল। কতকক্ষণ সময় কেটে গেল, যেন এক যুগ। তারপর একটা ঘণ্টা বাজল ঢং, আর একটি বাজল ঢং, তারপর ঢং...ঢং...। এইভাবে একটির পর একটি করে সব মন্দিরের ঘণ্টা এক একবার বেজে থামল।

রাজা বললেন, সাড়ে এগারোটা বাজল।

তারপর অনেক, অনেকক্ষণ বাদে আবার ঘণ্টা বাজতে সুরু হল। রাজা জেগেই ছিলেন। তিনি গুণতে আরম্ভ করলেন। শেষ ঘণ্টায় রাজা ভেবে ঠিক করলেন, এইবার রাত বারটা বাজা শেষ হল।

ঠিক সময়ে বারটা বেজেছে কিনা দেখবার জন্যে রাজা বালিসের তলা থেকে সোনার ঘড়িটি বার করলেন। অন্ধকার ঘরে ঘড়িটি একবার ডানদিকে ফেরান, একবার বাঁদিকে ফেরান, শেষে ঘরের এক কোণে চাঁদের একফালি কিরণে দেখেন, বারটা বেজে গেছে।

ঘড়িতে তখন বারটা বেজে পাঁচ।

বালিসের তলায় ঘড়িটি রেখে, আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুমোবেন কি, চোখ তাঁর আরো বড় হয়ে খুলে রইল। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল! কত সব অদ্ভুত চিন্তা যে তখন তাঁর মাথায় আসছিল, ভেবে রাজা নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন।

এমন সময় হঠাৎ এক উদ্ভট চিন্তায় রাজা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠেন, কোলের উপর বালিস টেনে নিজের মনে বলতে থাকেন, এটা কি হল? যখন একবার ঢং হয়, তখন বাজে একটা, না হয় অন্য কিছুর সহিত আধটা, অর্থাৎ সাড়ে একটা কিছু। যখন এগার বার ঢং হয়, তখন বাজে এগারটা। কিন্তু কোন্ ঢং-এ ঠিক এগারটা বাজে—প্রথম ঢং-এ, না শেষের ঢং-এ, না মাঝের কোন একটা ঢং-এ?

রাজা কিছুতেই ঠিক করতে পারেন না, কোন্ ঢং-এ ঠিক এগারটার সময় হয়।

দারুণ চিন্তায় রাজার মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়। প্রথম ঘণ্টা যখন বাজে তখন যদি এগারটা বাজে; তাহলে সেটি থামবার পর যেগুলি বাজে তারা নিশ্চয়ই ভুল সময় জানিয়ে দেয়।

আমার রাজ্যে ঘণ্টা বেজে ভুল সময় জানাবে, এ চলবে না—এর একটা কিছু সুরাহা করতে হবে—

রাত গড়িয়ে যায়। রাজা আর ভাবতে পারেন না, বালিসে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

সকালে ঘরে রোদ এসে পড়তে রাজার ঘুম ভাঙ্গে। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙ্গে রাজা উঠবেন ভাবছেন, এমন সময় একটা মন্দিরের ঘণ্টা বাজা সুরু হল, ঢং—ঢং—ঢং।

রাতের কথা রাজার মনে পড়ে। তিনি বলেন, আজ এর একটা ব্যবস্থা না করলে চলবে না।

সকালে রাজা সভায় এলেন। এসেই মন্ত্রীকে বললেন রাজ্যের সব পুরোহিত আর ঘণ্টা-বাদকদের এক সভা ডাকতে। মন্ত্রী সেকথা বললেন তাঁর সহযোগীকে, সহযোগী বললেন প্রধান কেরাণীকে, তাঁর প্রধান বুড়ো কেরাণী ভার দিলেন সবচেয়ে নতুন যে ছোট কেরাণী, তার উপরে।

খাগের কলম সরু করে নতুন কেরাণী রাজার আদেশ মক্স করে দিল। বুড়ো কেরাণী দেখে নাক সিটকে বললেন, তোমার বয়সে আমি আরো ভাল লিখতুম, এই বলে দিলেন সেটি মন্ত্রীর সহযোগীর হাতে।

লেখা পড়ে রাজা খুব খুশী। বার বার পড়ে তাতে শীলমোহর করে দিলেন।

তাতে লেখা ছিল, যেখানে যত মন্দির আছে তাদের সকলকার পুরোহিত ও ঘণ্টা-বাদকরা যেন বেলা বারটার আগে রাজসভায় এসে হাজির হয়। নাহলে রাজার কোপে তাদের...।

রাজাদেশ ঘোষণা করে দেবার পর যেখানে যত মন্দির ছিল সেখানকার সব পুরোহিত এসে রাজসভায় জমা হতে লাগল। তাদের সঙ্গে ঘণ্টা-বাদকেরাও এসে হাজির হল।

রাজার আদেশ পেয়ে সকলেই বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছে। কেউ ভাবছে, আমার সেই গোপন কাজটা রাজার নজরে

পড়েনি ত! কেউ ভাবছে, আমার সেই টাকা চুরির কথাটা রাজার কানে ওঠেনি ত! এইভাবে যে যার দুর্ব্বলতার কথা মনে মনে আলোচনা করছে।

বেলা যখন ঠিক বারটা তখন রাজা সকলকে বললেন,—আপনারা আমার একটা কথা শুনুন। এই বলে রাজা খানিক থেমে পকেট হতে তার ঘড়ি বার করে দেখে আবার তা পকেটে রেখে বললেন, আপনাদের এখানে আসতে বলার এক গুরুতর কারণ ঘটেছে। এখন ক'টা বেজেছে বলুন ত?

এই কথায় যাদের সঙ্গে ঘড়ি ছিল তারা নিজেদের ঘড়ি দেখতে লাগল। যার ঘড়ি নেই সে আড়চোখে পাশের লোকের ঘড়ি দেখে নিল। তারপর যে যা দেখেছে চেঁচিয়ে রাজাকে জানিয়ে দিল।

বারটা বাজতে দু'মিনিট।

বারটা বেজে দু'মিনিট।

ঠিক বারটা।

বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট।

ঘড়ি আমার বন্ধ।

এইভাবে বিভিন্ন সময় ঘোষণার ফলে একটা হট্টগোল বেধে উঠল। নিজের ঘড়ি ভুল, একথা স্বীকার করতে কেউই রাজী হল না।

এমন সময় রাজা সব গোলমাল থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ, ঠিক ক'টা বেজেছে?

প্রায় দুপুর হয়ে এল—দুকূল বাঁচিয়ে একজন জবাব দিলে।

রাজা বল্লেন,—ভাল, এবার তবে আমার কথাটা শুনুন।

রাজার কথায় সকলে একেবারে চুপ হয়ে গেল। সেই সময়ে পকেটে রাখা ঘড়িগুলির টিক্ টিক্ শব্দও যেন তাদের কাণে আসতে লাগল। সে শব্দটি তাদের হৃৎপিণ্ডেরও হতে পারে। কোন্‌টি বলা শক্ত!

ঢং ঢং করে বারটার ঘণ্টা বাজতে সুরু হল কোন মন্দিরে।

একটি শেষ হতে আর একটি। এমনি করে, কোনটি জোরে, কোনটি আস্তে, কোনটি দ্রুত, কোনটি ধীরে, সব মন্দিরের ঘণ্টাগুলির বাজা শেষ হল।

তখন রাজা সকলকে বললেন, আপনারা কি কিছু লক্ষ্য করলেন?

ভারী মিষ্টি—কেউ বলে।

ঠিক সময়ই বেজেছে—দ্বিতীয় জন বললে।

রোজই যেমন আজও তেমন—তৃতীয় ব্যক্তি বলে।

থামুন! দোহাই! দোহাই!—রাজা তাদের বাধা দিয়ে প্রশ্ন করেন, আপনাদের মধ্যে কেউ কি দয়া করে জানাবেন, ঘড়ির কি দরকার?

সময় দেখবার জন্যে নিশ্চয়, মহারাজ!

ঘড়ি যদি সময় ঠিক না জানায়, তাহলে ঘড়ি কি ঠিক চলছে বলে ধরতে হবে?

না, হুজুর।

ঠিক সময়ই যদি ঘড়ি জানাবে, তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘণ্টা বাজে কেন?

এই প্রশ্নে পুরোহিতরা সকলে যে যার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। রাজা যে কখনও এই প্রশ্ন করবেন সে কথা তারা কখনও ভাবতে পারেনি। কিন্তু চুপ করে থাকলে চলবে না, রাজার কথার একটা উত্তর দিতেই হবে।

তখন কোণে-বসা বুড়ো পুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, মহারাজ! আপনার প্রশ্নের উত্তর কেবল আমিই হয়তো দিতে পারি। গৌড়ে আমিই সব থেকে বৃদ্ধ পুরোহিত। তাছাড়া বহুদিন আমি মন্দিরে চাকরি করছি। তাই সকলে মিলে ঠিক করেছে, আমার মন্দিরের ঘণ্টাই প্রথম বাজবে। তারপর অন্যান্য পুরোহিতদের বয়স অনুযায়ী তাদের মন্দিরের ঘণ্টাগুলি বাজতে থাকবে।

তাছাড়া, হুজুর, আপনার বাগানে যে সূর্য্য-ঘড়ি আছে, দুপুরের রোদে তার সঙ্গে আমার ঘড়ি মিলিয়ে রাখি। সময়ের ভুল হবার জো কোথায়?

আমার কথা শুনে হুজুর বোধহয় এবার বুঝতে পারলেন ঘণ্টা কেন বিভিন্ন সময়ে বাজে।

না, বুঝলুম না—পুরোহিত থামতে না থামতে রাজা বলে ওঠেন। এরকমের ঘড়ি বাজা কোন কাজের নয়। একটা ঘণ্টা বাজাই যথেষ্ট।

হুজুর কি আদেশ করেন—সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করে।

সব ঘড়ি ও ঘণ্টা আজ হতে একসময়ে একসঙ্গে বাজবে। আর আজ রাত বারোটা হতে এই কাজ সুরু হবে, এই আমার আদেশ—রাজা থামলেন।

জো হুজুর!—রাজার আদেশ, না মেনে আর উপায় কি!

সে রাতে রাজা একটু আগেই শুতে গেলেন। রাজ্যের এটা-সেটা কাজ নিয়ে সারাদিনের খাটুনি, তাছাড়া ঘণ্টা বাজার ব্যবস্থা করতে কিছুটা উপরি খাটুনি হয়েছে। রাজা বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

ধীরে ধীরে গৌড়ের সব লোক ঘুমিয়ে পড়ে। খুট্ করে এক বাড়ীর আলো নিবে যায়, কারো সদর বন্ধ হয়। চারিদিক স্তব্ধ হয়ে আসে। রাজপথে একটা কুকুর ডেকে ওঠে। স্তব্ধতার মাঝে কুকুরের সেই ডাক এমন বিকট হয়ে ওঠে যে, নিজের ডাক শুনে ভয়ে কুকুর দুপায়ে লেজ গুটিয়ে ভোঁ-দৌড়। কেবল মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নগর-রক্ষকের পায়ে চলার খট্ খট্ শব্দ।

এমন সময় হঠাৎ কান-ফাটান এক বিরাট শব্দ উঠল। মনে হল কালবৈশাখীর বাজ যেন আকাশ ভেঙ্গে পৃথিবীর বুকে এসে পড়েছে। সেই শব্দে যেন গৌড়ের ঘর-বাড়ী সব কেঁপে উঠল। লোকের মনে হল, হয়তো ভূমিকম্প, হয়তো কিছু বিস্ফোরণ হয়েছে, আর হয়তো বা পৃথিবীর ধ্বংস সুরু হয়েছে।

ঝপাঝপ জানলা খোলা সুরু হল। ভয়ে মানুষ যে যেখানে ছিল ছুটে এসে পথে দাঁড়াল।

সেই শব্দে রাজাও তাঁর বিছানা হতে মেঝেতে ছিট্‌কে পড়ে চিৎপটাং। ভাবেন, হল কি? সভা ডাকবেন কি সৈন্য ডাকবেন, ঠিক করতে না পেরে শেষটায় রাণীকে ডেকে বসলেন। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে রাণী তখন রাজার ঘরের দিকেই ছুটে আসছিলেন।

প্রথম শব্দের পর হল দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় চতুর্থ করে বাজের মত ভীষণ কান-ফাটান শব্দ পর পর বারো বার হয়ে একদম চুপ করে গেল। শব্দের প্রতিধ্বনি তখন ডুং ডুং করে মাঠে ঘাটে গড়াতে গড়াতে ধীরে ধীরে বহু দূরে চলে গেল। গৌড় ঠাণ্ডা হল, কিন্তু গৌড়বাসী হল না।

এই অদ্ভুত শব্দের কারণ কি, তা' না জেনে গৌড়ের লোকেরা শান্ত হবে না। রাস্তার ধারে ধারে, হাটে-মাঠে তার ফিস্‌ফিস্ করে, শেষে দল বেঁধে তারা রাজপ্রাসাদের উঠোনে এসে জড়ো হয়। তাদের গুন্‌গুনুনির শব্দ ভাসতে ভাসতে ক্রমে রাজার কানে এসে লাগে।

রাণী রাজাকে বললেন, একবার জানলা দিয়ে দেখে এস, কি ব্যাপার। রাজ্যশুদ্ধ লোক যে এসে হাজির হয়েছে!

বারান্দায় বেরিয়ে এসে জানলা খুলে রাজা দেখেন, প্রজারা সব উঠোনে জড়ো হয়ে কী যেন বলতে চাইছে। রাজা তখ্‌খুনি সেই বারান্দা হতে বললেন, বন্ধুগণ! গৌড়ের অধিবাসিগণ! আজ গৌড়ের উপর এক ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু ভয় পাবেন না। আমার প্রাণ থাকতে গৌড়ের কোন অমঙ্গল হতে দেব না। আপনারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। কাল মন্ত্রীসভায় আমরা স্থির করব কি করা উচিত। আপনারা বাড়ী যান, আমি আপনাদের রক্ষা করব।...না, দাঁড়ান, ঐ এক দূত আসছে। দেখি ও কি বলে।

দূত এসে প্রণাম করে বললে, মহারাজ! এইবার হয়ত আপনি খুসী হয়েছেন। গৌড়ের সব ঘণ্টা আজ একসঙ্গে বেজেছে।

ওঃ ঐ ভীষণ কান-ফাটান শব্দ তাহলে ঘণ্টার—প্রজারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাড়ীমুখো হল।

দূতের কথা শুনে রাজা তো একবারে হতভম্ব! তাঁর মুখ থেকে একটা কথাও বেরুল না। তারপর কিছুক্ষণ যেতে আমতা আমতা করে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাইত!

রাণী যখন শুনলেন, সেই কান-ফাটান বিকট শব্দ হয়েছে রাজার আদেশেই, তখন তাঁর গায়ের সব রক্ত গিয়ে মাথায় উঠল—মেজাজটা তাঁর ভীষণ ক্ষেপে গেল। রাজার দিকে চেয়ে তিনি বললেন,—তোমার কি সব বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে? ঘণ্টার উপর যত ওস্তাদি! ঘণ্টা আগে যেমন বাজত সেই রকমই বাজবে। শান্তিতে যে একটু ঘুমোব তারও কি জো নেই? তারপর বিড়বিড় করে বললেন, হাতের ঘণ্টা নিয়ে না লাফিয়ে তোমার গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে নাও, ভালোই মানাবে।

এই বলে গস্‌গস্ করে রাণী গেলেন শুতে।

রাজা রইলেন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে। আর রাণীর আদেশে ঘণ্টা সেই আগের মতই বাজতে থাকল।

রুরুর আয়ু-দান

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বহুকাল পূর্ব্বে ভৃগুবংশে একজন মুনি ছিলেন—তাঁর নাম চ্যবন। চ্যবনের পুত্র ছিলেন প্রমতি, তাঁর সঙ্গে অপ্সরা ঘৃতাচীর বিয়ে হয়। ঘৃতাচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রুরু। বালককাল থেকে রুরু শুধু পিতামাতার নয় সমস্ত মুনিদেরই অতি আদরের পাত্র ছিলেন। দেখতে ছিলেন তিনি যেমনি সুন্দর, তেমনি প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন তিনি। শাস্ত্র পাঠ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তিনি সমস্ত মুনি-বালকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হতেন।

একদিন যৌবনে রুরু মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমের নিকট দিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় প্রমদ্বরা নামে এক সুন্দরীকে দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। দেখা মাত্রই তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন প্রমদ্বরাকে জীবন-সঙ্গিনী করবেন। সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরে এসে তাঁর বয়স্যদের কাছে সে কথা জানালেনও। তাঁরা আবার রুরুর ইচ্ছা জানালেন তাঁর পিতা প্রমতিকে।

প্রমতি পুত্রের মনোভাব জেনে সানন্দে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন মহর্ষি স্থূলকেশের কাছে। স্থূলকেশ ত এই প্রস্তাব শুনে আনন্দে আকুল, বললেন, এ আমার মহা-সৌভাগ্য যে রুরু আমার কন্যার পাণি-প্রার্থী। আমি তার সঙ্গে বিবাহ দিতে প্রস্তুত, আগামী শুক্লপক্ষের শুভলগ্নেই প্রমদ্বরার সঙ্গে রুরুর বিবাহ দেব।

প্রমতি আনন্দিত হয়ে ফিরে গেলেন নিজের আশ্রমে, রুরুর কাছে জানালেন সে কথা। রুরুও অধীর আগ্রহে শুক্লপক্ষের অপেক্ষা করতে থাকলেন।

মহর্ষি স্থূলকেশও যেন এতদিন পরে নিশ্চিন্ত হলেন। প্রমদ্বরা যদিও তাঁর কন্যা ছিল না তবুও তাঁরই ওপর ওর লালন-পালনের ভার পড়ে গিয়েছিল নিতান্ত অতর্কিতে ও এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে।

মহর্ষি স্থূলকেশ বিবাহ করেননি—তিনি চিরদিনই তপ জপ নিয়ে থাকতেন। একদিন তাঁর অনুপস্থিতিতে অপ্সরা মেনকা তাঁরই আশ্রমের দ্বারে একটি সুন্দরী নবজাত কন্যাকে ফেলে রেখে চলে যায়। স্থূলকেশ আশ্রমে ফিরে এই বালিকাকে এরকম অসহায় অবস্থায় দেখে আদর করে লালন-পালন করতে থাকেন এবং পিতা ও মাতার স্নেহ দিয়ে তার মন ভরিয়ে তোলেন। অপূর্ব্ব সুন্দরী বলে তিনি কন্যার নাম রেখেছিলেন—প্রমদ্বরা। প্রমদাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য নিয়ে প্রমদ্বরা যখন যৌবনে উপনীত হল তখন তাকে প্রথম দেখেই রুরু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপরই তিনি তাকে বিবাহ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, সে কথা আগেই বলেছি।

বিবাহের দিন আসন্ন—এমন সময় একদিন হঠাৎ বনের মধ্যে এক বিষাক্ত সর্প প্রমদ্বরাকে দংশন করলে। মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রমদ্বরার বিবর্ণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। প্রমদ্বরা সেই সময়ে সখিদের সঙ্গে স্নান করতে যাচ্ছিল—তারা প্রমদ্বরার অবস্থা দেখে হাহাকার করে উঠলো। মহর্ষি স্থূলকেশ ছুটে এলেন সেখানে, কিন্তু কন্যা তখন বিগতপ্রাণ হয়ে চিরনিদ্রা আশ্রয় করেছে।

সংবাদ গেল রুরুর কাছে। উন্মাদের মত ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন তিনি প্রমদ্বরার মৃতদেহ। রুরুর অশ্রান্ত কান্নায় আকৃষ্ট হয়ে আশ্রমের চারিধার থেকে অন্যান্য মুনি-ঋষিরা ছুটে এলেন সেখানে, কিন্তু সেই মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখে তাঁরাও আত্মসংবরণ করতে পারলেন না—চোখের জলে তাঁদেরও বুক ভেসে যেতে লাগলো। বনভূমি জুড়ে বিলাপের রোল উঠলো।

দেবদূত এসে দাঁড়িয়েছেন প্রমদ্বরাকে নিয়ে যাবার জন্যে, রুরু ভাবী পত্নীর দেহ দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন—না, না, আমি নিয়ে যেতে দেব না প্রমদ্বরাকে। আমি যদি সত্য তপশ্চারণ করে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করে থাকি, সেই পুণ্যবলে আমি আমার প্রিয়াকে সঞ্জীবিত করে তুলবো...আমি এভাবে এত শীঘ্র পৃথিবী থেকে তাকে বিদায় দিতে পারবো না।

দেবদূত ম্লান হাসি হেসে বললেন—রুরু, তুমি জ্ঞানবান হয়েও এ কি কথা বলছো? মানুষ মৃত হলে আর জীবন ফিরে পায় না—অথচ তুমি তারই জন্য অসম্ভব প্রার্থনা করছো। প্রমদ্বরার আয়ু শেষ হয়েছে, তাই এ সংসারে তার থাকা অসম্ভব।

রুরু কাতর হয়ে বলে উঠলেন—তাহলে কি কোন উপায় নেই?

দেবদূত বললেন, উপায় অবশ্য একটি আছে, কিন্তু—

দেবদূতের কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই রুরু সাগ্রহে বলে উঠলেন—বলুন কি উপায় আছে, তা যত কঠোর, যত দুঃসাধ্যই হক, আমি তা পালন করবো।

দেবদূত বললেন—ভৃগুনন্দন, তুমি যদি নিজের আয়ুর অর্দ্ধভাগ তোমার প্রিয়াকে দান করতে পার, তাহলে সে পুনর্জ্জীবিতা হতে পারে।

তৎক্ষণাৎ রুরু হাতযোড় করে বলে উঠলেন—হে পরম দেবতা, যদি তুমি সত্য হও, তাহলে আমার একান্ত প্রার্থনা, আমার আয়ুর অর্দ্ধভাগ নিয়ে আমার প্রিয়ার পুনর্জ্জীবন দান কর, মৃত্যুশয্যা থেকে সে উঠে দাঁড়াক।

তখন দেবদূত ধর্ম্মরাজ যমকে গিয়ে নিবেদন জানালেন যে আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে প্রমদ্বরা পুনরায় জীবন লাভ করতে পারে—রুরু তাঁর আয়ুর অর্দ্ধভাগ তাকে দান করেছেন।

যম স্বীকৃত হতেই প্রমদ্বরা ভূতল থেকে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করল। আবার আশ্রমে আনন্দের প্রবাহ বয়ে গেল। শুভদিনে রুরু ও প্রমদ্বরার বিবাহ হয়ে গেল।

কিন্তু সেদিন থেকে রুরু সর্পকুলকে ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

(২)

রুরু সর্ব্বদা একটি দণ্ড নিয়ে বনমধ্যে যেতেন এবং যখনই নিরীহ, বিষাক্ত যে-কোন সাপকে দেখতে পেতেন তখনই দণ্ডাঘাতে তাকে বিনাশ করতেন। একদিন বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এক নিরীহ ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সাপকে দেখে রুরু যেমনি তাঁর দণ্ড তুলেছেন অমনি সে করুণ স্বরে বলে উঠলো—তপোধন, আমি নির্ব্বিষ ডুণ্ডুভ সাপ, আমি তোমার কোন অনিষ্টও করিনি, তবু তুমি আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছ কেন?

রুরু বললেন—আমার প্রিয়তমাকে তোমাদেরই জাতির একজন অকারণে দংশন করেছিল, তাই আমার প্রতিজ্ঞা আমি সর্পকুলকে ধ্বংস করবো।

ডুণ্ডুভ বললে—আমরা কিন্তু সে জাতীয় সর্প নই, আমাদের দ্বারা মানুষের কোন অনিষ্ট হয় না জেনো। তাছাড়া ভাগ্য-বিড়ম্বনায় আমি ব্রাহ্মণ হয়েও সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাকে হত্যা করে তোমার কোন লাভ হবে না।

রুরু বিস্মিত হয়ে গেলেন তার কথা শুনে, বললেন—পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলে তুমি? তবে তোমার এ অবস্থা হল কেন?

ডুণ্ডুভ বললে—একদিন খেলাচ্ছলে খগম নামে আমার এক সঙ্গীকে যজ্ঞের সময় তৃণের তৈরী সর্প দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম, তার ফলে খগম ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় অভিশাপ দিয়ে বলেন, যজ্ঞের সময় আমাকে তুই যে বীর্য্যহীন সর্প দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছিস, অমনি নির্বীর্য্য সর্প হয়ে ডুণ্ডুভ বংশে তুই ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবি।

সেই অভিশাপের ফলেই আজ আমার এই অবস্থা। তবে অভিশপ্ত হবার পর আমি তাঁর কাছে যখন ক্ষমা চাই তখন তিনি বলেছিলেন—প্রমতি-পুত্র রুরুর সঙ্গে যদি কখনও তোর পরিচয় হয় তাহলে তুই শাপমুক্ত হবি।

রুরু বললেন—আমিই তো প্রমতি-পুত্র রুরু।

ডুণ্ডুভ তৎক্ষণাৎ সর্প কলেবর ত্যাগ করে নিজ কলেবর ধারণ করলেন। আর যাবার সময় বলে গেলেন—হে ব্রাহ্মণ, কয়েকটি কথা তোমায় বলে যাই। এটুকু জেনো—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আর ব্রাহ্মণদের সে ধর্ম্ম সর্ব্বদা পালনীয়। তুমি আমার আয়ু হরণ করতে এসে আয়ু দান করেছ, এতেই তোমার মহত্ত্ব বিকশিত হয়ে উঠেছে, তুমি যথার্থ ব্রাহ্মণের কাজ করেছ। শাস্ত্র বলেন, ব্রাহ্মণরা হবেন শান্ত, বেদবেদাঙ্গ-বেত্তা ও সর্ব্বজীবের অভয়প্রদ। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা ও বেদবাক্য পালনই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব ও প্রজাপালন—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। অতএব তুমি ঐ দণ্ড পরিত্যাগ কর। আমার জীবনদাতার যথার্থ হিতার্থী হয়েই আমি এই কথাগুলি তোমায় বলে যাচ্ছি।

এই কথা বলে সেই নবকায়প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ বনপথ দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

বন্ধু
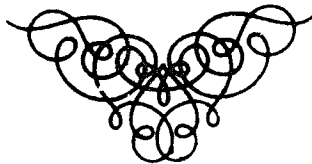
শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

ভস্তুর হাতে খুড়োমশাই কড়কড়ে একটা একশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, যে করে হোক, যে কোনো বাজারে গিয়ে হোক ভালো মাছ কিছু যোগাড় করো। হঠাৎ মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা ত' করতে হবে।

খুড়োমশায়ের কথা শুনে ভস্তু যেন অগাধ জলে পড়ে গেল। এত ভোরে মাছ আনতে ছুটতে হবে? এই সময়টায় সে টুলুর হাতে তৈরী এক কাপ চা আমেজ করে একটু একটু চেখে অনেকক্ষণ ধরে পান করে। সকালবেলার সেই বাদশাহীটা আজ তার কপালে নেই।

আজ যখন টুলুরই বিয়ে তখন আর ওকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

প্রত্যহের প্রাতঃকালীন বাদশাহী মাথায় থাক, ভস্তু তাড়াতাড়ি সার্টটা মাথা দিয়ে গলিয়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডেল পায়ে গুঁজে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

গলিটা পেরিয়ে বড়রাস্তায় পড়ে ট্রামের দিকে এগুতেই একেবারে জহরের সামনাসামনি পড়ে গেল।

জহর ওদের ক্লাসে পড়ে। পড়াশোনায় একেবারে খাঁটি জহর। কিন্তু খুব গরীব ঘরের ছেলে। খুব কষ্ট করে তার পড়াশোনা চালায়। বই কিনতে পারে না, তাই বন্ধুবান্ধবদের বই চেয়ে নিয়ে নকল করে নেয়। কিন্তু তাতে তার পড়া ভালোভাবে তৈরী হয়ে যায়। যত নকল করে পাঠ্য বই পড়া যায়, বানান ভুল তত কম হয়। মাস্টারমশাইরাও বলেন, যত পড়বি, তার দ্বিগুণ লিখবি। তাহলেই বেশী নম্বর পাবি পরীক্ষায়।

ভস্তু তাকিয়ে দেখলে, জহরের উস্কখুস্ক চুল, সারা রাত হয়ত জেগে কাটিয়েছে, তাই চোখ দুটো ফোলা আর লাল।

ভস্তুকে পথের মাঝখানে দেখতে পেয়ে জহর ওর দুটি হাত জড়িয়ে ধরল। বললে, ভস্তু, আমি তোর কাছেই যাচ্ছিলাম—

ভস্তু জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি জহর? সব খুলে বল আমাকে।

জহর জবাব দিলে, বাবা অনেকদিন থেকেই ভুগছেন। সারারাত তাঁর শিয়রে জাগতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা চলবে এমন কোন সংগতি নেই। আজ আবার আমার পরীক্ষার ফী দেবার শেষ দিন। ইস্কুলের মাইনেও কিছু বাকি পড়েছে। এতদিন অফিস কিছু বলেনি। কিন্তু এইবার সব কিছু শোধ করে না দিলে ত' পরীক্ষা দেয়া হবে না। একটা বছরই আমার নষ্ট হবে।

ভস্তু তাড়াতাড়ি বললে, না না, একটা বছর নষ্ট হলে চলবে কেন?

তারপর একটুখানি থেমে জিজ্ঞেস করলে, তা, কত টাকা তোর দরকার?

জহর উত্তর দিলে, আশি টাকার কিছু কম লাগবে—তাই তোর কাছেই যাচ্ছিলাম—

ভস্তু তার সার্টের পকেটের ভেতর একশ টাকার কড়কড়ে

নোটটা বেশ ভালো করে আঙুল দিয়ে উলটে-পালটে অনুভব করলে।

এক্ষুণি জহরের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে সে। কিন্তু এ টাকা দিয়ে টুলুর বিয়ের মাছ কিনতে হবে।

খুড়োমশায়ের সংসারে মানুষ হচ্ছে ভন্তু। টুলু সেই খুড়োমশায়েরই একমাত্র মেয়ে। আজ হঠাৎ তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। খুড়োমশাই তাকে একশ টাকা দিয়েছেন—যেমন করে হোক মাছ যোগাড় করতে হবে। নইলে বরযাত্রীদের কাছে মান-সম্মান থাকবে না। এমন কি টুলুর বিয়ে পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে!

এ কাজ ভন্তু কিছুতেই করতে পারে না।

টুলু তার আদরের বোন।

তা ছাড়া খুড়োমশায়ের অবস্থাও ত' বিশেষ ভালো নয়। অনেক কষ্টে তিনি সংসার চালান। আর সেই সংসারে আশ্রয় পেয়েই ভন্তু মানুষ হচ্ছে।

অন্যদিকে জহরের কথাও তাকে ভাবতে হবে। জহর ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ছেঁড়া কাপড়, তালিমারা সার্ট, উষ্কখুষ্ক চুল, ফোলা চোখ! খানিকক্ষণ আগে সে কাঁদছিল কিনা তাই বা কে জানে!

জহর পড়াশোনায় সত্যি জহর, ক্লাসে সবার সেরা। তার একটা বছর নষ্ট হবে? তাহলে সে আর বন্ধু কি? বন্ধুর কাজ তাকে করতেই হবে।

আগুপিছু কোনো কিছু না ভেবে পকেট থেকে সেই একশ টাকার কড়কড়ে নোটটা ভন্তু আঙুল দিয়ে তুলে নিয়ে জহরের হাতে গুঁজে দিলে। বললে, শীগগির যা, আগে তোর বাবার জন্যে ওষুধ-পথ্যির ব্যবস্থা কর। তারপর ইস্কুলে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে দে।

জহর ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। বললে, তুই আমায় বাঁচালি ভন্তু। বন্ধুর কাজ করলি তুই। তোকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই!

ভন্তু উত্তর দিলে, ধন্যবাদ তোকে দিতে হবে না—তাড়াতাড়ি আগে ছুটে যা—

জহরের দু'চোখ জলে ভরে এলো। সে তাড়াতাড়ি সেই চোখের জল গোপন করবার জন্যে ছুটে বাড়ির দিকে চলে গেল।

এইবার ভন্তু একেবারে একা পড়ে গেল।

একবার মনে হল—তার আশেপাশে কেউ নেই। কলকাতা শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়েও মনে হল, সে যেন একটা নির্জন অন্ধকার বনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

আর একবার তার মনে হল—সে কেবলি চিন্তার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। কোথায়ও কূলকিনারা নেই! সারা দেহ ডুবে গেছে, মাথাও ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। নাকে-মুখে জল ঢুকছে...এক্ষুণি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে...

কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ত' চলবে না...

টুলুর হাসিখুশী মুখখানা তার মনের পটে ভেসে উঠল।

একটা উপায় বের করতেই হবে।

না না, টুলুর বিয়েতে সে কোনো মতেই বিঘ্ন-সৃষ্টি করতে পারে না!

হঠাৎ তার মনে হল নির্মলের কথা। নির্মল বড়লোক মামার একমাত্র ভাগনে।

ওর কোনো অভাব নেই।

নির্মল তার মামার সব সম্পত্তি পাবে।

কিছুদিন আগে নির্মলের মামা দমদমের দিকে পুকুরসহ একটি বড় বাগান কিনে নিয়েছেন।

নির্মল অনেকদিন ভন্তুকে অনুরোধ করেছে সেই বাগানবাড়িতে গিয়ে ওর সঙ্গে পুকুরে মাছ ধরতে।

আজ যাবে, কাল যাবে করে ভন্তুর আর সময় হয়নি।

ভন্তু ভেবে দেখলে, আজ তার মাছ ধরবার সময় এসেছে।

তাড়াতাড়ি একটা চল্‌তি ট্রামে সে উঠে বসল। নির্মলদের বাড়ি তাকে যেতে হবে—

ভাগ্য ভালো যে, নির্মলদের বাড়িতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওকে পাওয়া গেল!

কিন্তু নির্মল তখন বেরিয়ে যাচ্ছে।

নির্মল আবার ওদের ফুটবলের টিমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ভন্তু ওকে রওনা হবার পথে আটকে দিয়ে বললে, আজ আর ফুটবল টিম নয়, আজ দমদমের সেই বাগানবাড়িতে মাছ ধরা।

ভন্তুর কথা শুনে নির্মল ভারি অবাক হয়ে গেল।

বললে, হঠাৎ মাছ ভাজা খাবার ইচ্ছে হল বুঝি? তা আমাদের বাড়িতেই অনেক মাছ ভাজা আছে। খাবার মধ্যে শুধু মামা আর আমি! তাহলে ভন্তু টেবিলে বসে যা,—গরম গরম মাছ ভাজা আর চা—! ঠাকুরকে এক্ষুণি ডেকে বলে দিচ্ছি—

ভন্তু বললে, না রে নির্মল, মাছ ভাজা নয়। সেই তোদের দমদমের বাগানবাড়ির পুকুরে মাছ ধরতে হবে। দুটো ছিপ নিয়ে নে, তারপর ওখানে গিয়ে চটপট মাছ ধরতে হবে—

নির্মল বললে, এতদিন তোকে সাধ্য-সাধনা করেছি,

আউটিং-এ যেতে হলে জীপগাড়িই ভালো।

কিন্তু সময় হয়নি বাবুর! আজ ঘুম থেকে উঠেই একেবারে মৎস্য-যাত্রা করতে হবে? বলি ব্যাপারটা কি শুনি?

ভন্তু উত্তর দিলে, যেতে যেতে সব কথা বলবো, এখন—

"ওঠো জয়রথে তব
জয়যাত্রায় যাও গো—"

রথ বাইরে প্রস্তুতই ছিল। নির্মলদের জীপ গাড়ি।

নির্মল বললে, বাইরে আউটিং-এ যেতে হলে জীপ গাড়িই সব চাইতে ভালো। চল,—কুইক্ মার্চ—

মাছ ধবার ছিপ, সব রকম সাজ-সরঞ্জাম, মাছ রাখবার আধার সব কিছু নিয়ে দুই বন্ধু জীপে উঠে পড়ল।

নির্মল বললে, ড্রাইভার নিয়ে কাজ নেই। কতক্ষণ দেরি হবে কে জানে! আমি নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। নির্মল নিজে স্টিয়ারিং-এ বসল।

জীপ দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো দমদমের দিকে—

গাড়ি চালাতে চালাতে নির্মল ভন্তুর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলে, আসল কথাটা এইবার খুলে বল ত' ভন্তু! তুই যে হঠাৎ মাছ ধরতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিস এমন ত' মনে হয় না! কার দায় উদ্ধার করতে হবে শুনি?

ভন্তু খানিকটা ইতস্ততঃ করে, কয়েকটা ঢোক গিলে বললে, দেখ নির্মল, কিছু মাছের দরকার হয়ে পড়েছে হঠাৎ...মানে একটা বিয়ের ব্যাপারে...না পেলে একটা গোলমালের সৃষ্টি হবে! হয়ত বিয়েটা ভেঙেই যেতে পারে।

হো-হো করে হেসে উঠল নির্মল। বললে, তাই বল! কিন্তু বন্ধু, ছিপ দিয়ে মাছ ধরলে ত' সে সমস্যার সমাধান হবে না। পুকুরে জাল ফেলতে হবে—

ভন্তু চোখ দুটো কপালে তুলে বললে, সর্বনাশ! এখন তাহলে উপায়?

নির্মল বললে, আমি ত' তোর বন্ধু। কাজেই একটা সমস্যা যখন এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন তার সমাধানও করতে হবে। কিন্তু কার বিয়ে আটকে গেল শুনি?

ভন্তু তখন সব কথা নির্মলকে খুলে বললে। জহরকে বাঁচাবার জন্যেই যে সে এই কাণ্ড করেছে, সে কথাও সে গোপন করলে না। এখন তার বোনের বিয়েতে যে কি গোলমাল হয় কে জানে!

ওর কাহিনী শুনে নির্মল খানিকটা চুপ করে রইল। তারপর বললে, দেখ ভন্তু, আমরা কথায় কথায় বলি, ও আমার বন্ধু। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুত্ব যে কাকে বলে তুই তাই আজ বুঝিয়ে দিলি। চল আমার সঙ্গে,—একটা সমস্যার সমাধান যখন হয়েছে, তখন আর একটা সমস্যার সমাধানও করতে হবে। আমাদের বাগানে দুটি মালী আছে। ওদের কাছে জাল আছে। সেই জাল দিয়েই পুকুরের মাছ ধরা যাবে—

নির্মল তার জীপের গতি দ্রুততর করলে।

বাগানে পৌঁছে দেখা গেল দুটো মালীর ভেতর একটি লোক দেশে চলে গেছে। একজন শুধু বাগান পাহারায় আছে।

নির্মল বললে, কাজ হাসিল করা নিয়ে কথা। একটি মালী, আর আমরা রয়েছি দু'জন। গামছা পরে আমরাও নেমে যাবো ওর সঙ্গে।

মালীকে ডেকে নিয়ে দুই বন্ধুতে মালকোঁচা মেরে কাজে লেগে গেল।

পুকুরে বেশ ভালো মাছ ছিল। কিন্তু চালাক মাছগুলি কেবলি গভীর জলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

নির্মল বললে, ওপর থেকে কাজ হবে না। আমাদেরও সত্যি জলে নেমে মালীকে সাহায্য করতে হবে।

এইবার আসল গামছা পরে গভীর জলে ডুব দেয়া। জালটা ঠিক জায়গামতো ফেলা হচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি

রাখা আর হাতে হাতে সাহায্য করা।

সারা দিনের শেষে বেশ কয়েকটি বড় রুই মাছ ধরা পড়ল।

ছোট মাছগুলি আবার পুকুরে ছেড়ে দিয়ে নির্মল বড় রুইগুলিই বাছাই করে নিলে।

ভস্তু বললে, এতেই যথেষ্ট হবে। এখন আমরা ফিরি চল—

ফিরতি পথে নির্মল বললে, আচ্ছা ভস্তু, একটা কাজ ত' তুই এখনো করলি না? ভুলে গিয়েছিস বুঝি?

ভস্তুর ভুরু দুটি কুঁচকে গেল।

সে নির্মলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কোন্ কাজটা বল ত'! আসল সমস্যার ত' সমাধান করে দিলি!

নির্মল ভস্তুর পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বললে, বা-রে! তোর বোনের বিয়ে আজ! আর আমাকে নেমন্তন্নই করলি না।

ভস্তু বললে, তুই সত্যিকারের বন্ধুর কাজ করেছিস! আমার মনের কথা কি আর বুঝতে পারবি নে!

নির্মল আবার হো-হো করে হেসে উঠল, বললে, যা,—তোকে কথা দিচ্ছি, তোর বোনের বিয়েতে আমি পরিবেশন করবো—

ইতিমধ্যে খুড়োমশায়ের বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে।

একশ টাকা নিয়ে ভস্তু কোথায় উধাও হল? কেউ কেউ মন্তব্য করলে, আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস নেই। হয়ত নগদ একশ টাকা হাতে পেয়ে শ্রীমান সোজা বোম্বাই রওনা হয়েছে—'তারকা' হবার জন্যে।

আবার কেউ ফোড়ন কাটলে, থানায় একটা খবর দিয়ে রাখা ভালো। যদি টাকাটা উদ্ধার করা যায়!

এমন সময় নির্মলের জীপে করে ভস্তু মাছ নিয়ে এসে হাজির। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে সবাই।

ইতিমধ্যে বন্ধুদের ভেতর যে নাটক অভিনীত হয়ে গেল, সে কথা কেউ জানতে পারল না!

জন্মদিনের উপহার

বুদ্ধদেব বসু

"বলো তোমার জন্মদিনে
কী উপহার আনবো কিনে?"
"লাল শাড়ি, রেশমি জামা,
বেগনি রঙের শায়া,
আর শিউলি-ঝরা শেষরাতের
শুকতারার মায়া।"

"লাল শাড়ি, রেশমি জামা
মিলবে দোকানে,
শুকতারার শিউলিতলা
পাবে কোনখানে?"

"শুকতারার শিউলিতলা
না যদি পাও,
লাল শাড়ি, রেশমি জামা
যাও, নিয়ে যাও।"

"এই দ্যাখো এই ঢাকাই শাড়ি,
টুকটুকে লাল শায়া!"

"কই শিউলিতলার শেষরাতের
শুকতারার মায়া?"

সব্যসাচী

(১)

"রাজা টারজান! রাজা টারজান!"

মহারণ্যের হৃদয় ভেদ করে আকুল কাকুতি ওঠে হাজার জাতের লক্ষ প্রাণীর কণ্ঠ থেকে—"তুমি যেও না রাজা! যেও না আমাদের ছেড়ে—"

মহামহীরুহের চারতলার মগডালে দাঁড়িয়ে বৃক্ষান্তরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে টারজান, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সেই আর্ত হাহাকার শুনে।

নীচুপানে তাকাল একবার বিষণ্ণ নয়নে। কী করে ওরা জানল যে টারজান আজ শেষ বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে আফ্রিকার অরণ্য থেকে? সে ত কাকপক্ষীকেও বলেনি কিছু!

তা না বলুক। ত্রিকালদর্শী মার্কণ্ড প্যাঁচা আছে না ঐ আদ্যিকালের যজ্ঞডুমুরের কোটরে! কাল গভীর রাতে ডানা মেলে সে একবার অরণ্যরাজ্যে টহল দিতে বেরিয়েছিল। টারজান তখন মহাজম্বু গাছের তেতলার তেডালায় শুয়ে সুখনিদ্রায় অচেতন। প্যাঁচার চেঁচামেচি সে শুনতে পায়নি।

উড়তে উড়তে প্যাঁচা প্রথমে গিয়েছিল সিংহ পাড়ায়—"তোদের রাজা যে দেশ ছেড়ে চলল—সে খবর রাখিস ন্যুমার বাচ্চারা?"

সর্দার-সিংহ ঝুটেল ন্যুমা তখন সবেমাত্র একটা গোটা জেব্রাকে উদরস্থ করে গুহায় ফিরেছে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে, তার ঠোঁটচাটা বন্ধ হয়ে গেল মার্কণ্ড প্যাঁচার কথা শুনে।

"তুমি বল কি বুড়ো জ্যাঠা? রাজা কখনো দেশ ছেড়ে যায়? কিসের দুঃখে যাবে শুনি?"

"দুঃখু আছে রে বাপু, দুঃখু অঢেল আছে।"—প্যাঁচা ডানা মেলতে মেলতে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে যায় ঝুটেল ন্যুমার পানে—"তবে এককথায় তা তোকে ত বোঝাতে পারব না! আর যেতেও হবে আমায় ঢের জায়গায়—খবরটা ত দিয়ে দিই সবাইকে, তার পরে যা হবার হোক!"

হতভম্ব ঝুটেল ন্যুমার পানে আর না তাকিয়ে উড়তে উড়তে মার্কণ্ড গিয়ে ঢুকল গরিলা পাড়ায়, যেখানকার ঝোপঝাড়ের ভিতরে সৃষ্টির পর থেকে এযাবৎ কোনদিন সূয্যিমামার এক কণা আলো ঢোকেনি।

এককালে টারজানের প্রজাদের ভিতর কিছু-কিঞ্চিৎ বেয়াড়া ছিল এই গরিলারাই, মাঝে মাঝে রাজার হুকুম অমান্য করতেও ভয় পায়নি তারা। কিন্তু ইদানীং—টারজান আগুন-নদীতে স্নান করে আসবার পর থেকে—কী-জানি-কেন ওরা অতিরিক্ত রকম ভক্ত হয়ে পড়েছে রাজার।

টারজান চলে যাবে শুনে তারা সবাই একবাক্যে বলে উঠল—"আমরাও যাব তাহলে। যেখানে আমাদের রাজা, আমরাও সেখানে।"

পাড়ায় পাড়ায় খবর ছড়িয়ে দিয়ে ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কণ্ড এসে তার কোটরে ঢুকল। ততক্ষণে সারা বনে উঠেছে তুমুল আলোড়ন। হাজার জাতের লক্ষ প্রাণী সমবেত হয়েছে মহাজম্বুর তলায় তলায়।

আকুলকণ্ঠে যে যার ভাষায় চীৎকার করছে—"যেও না, যেও না রাজা আমাদের ছেড়ে—"

চারতলার মগডালে দাঁড়িয়ে টারজান বুঝি আর চোখের জল রুখতে পারে না। এই লক্ষ হৃদয়ের ভালবাসা—এ কি অবহেলায় উপেক্ষা করে যাওয়ার জিনিস?

অথচ না গিয়ে তার উপায় নেই।

পরশু রাতে আহ্বান এসেছে—যেতে হবে টারজানকে।

পরম নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রায় ডুবে ছিল টারজান এই মহাজম্বুরই তেতলায়। বাতাস বইছিল ঠিক ততটুকু শৈত্য নিয়ে, আফ্রিকার নিদাঘের জ্বালা প্রশমিত করবার জন্য যতটুকু দরকার।

হঠাৎ দারুণ শীত করে উঠল টারজানের। জীবনে কখনও এমন শীত সে অনুভব করেনি। বরফ যে কী জিনিস, তা যদি ওর জানা থাকত, তাহলে ওর বুঝতে দেরি হত না যে যেখান থেকে ঝলকের পর ঝলক মৃত্যুশীতল হাওয়া এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে ওর দেহে, সে-দেশ এক চিরতুষারের দেশ। ধড়মড় করে উঠে বসল টারজান মহাজম্বুর তেতালায়।

শুধু হাওয়াই যে আসছে তা নয়। সেই হাওয়াতে ভর করে আসছে একটা কণ্ঠস্বর। শুরুতে সে-স্বর ছিল একান্ত ক্ষীণ, শোনা যায় কি যায় না। কিন্তু ক্রমশঃ তা জোরালো হয়ে উঠছে, রূপ নিচ্ছে একটা আর্ত আহ্বানের—

সে-আহ্বান যে টারজানের উদ্দেশ্যেই, তাতে সন্দেহ নেই। "কোথায় তুমি কালো আফ্রিকার শ্বেতপুরুষ? অগ্নিস্নানে পরিশুদ্ধ অজর অমর অরণ্যদেবতা, তুমি কোথায়? আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাও, এ চিরতুহিনের দেশে আমি আর কতদিন নির্বাসনে থাকব?"

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল টারজানের। এ-স্বর যে তার পরিচিত! স্বল্পদিনের পরিচয় হলেও তা যে অবিস্মরণীয় হয়ে গেঁথে রয়েছে তার জীবনে!

গজমতী রানী! এ-আহ্বান গজমতী রানীর না হয়ে যায় না।

কিন্তু—গজমতী রানীকে সে কি নিজের চোখে ঝলসে কুঁকড়ে মরে যেতে দেখেনি ন্যুন্দুর পাহাড়ের তলার ভূগর্ভে? আগুনস্নান থেকে উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই?

সেদিন যা প্রহেলিকার মত দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, অন্ত তা আর বুঝতে বাকি নেই টারজানের। একবার স্নানে অমরত্ব লাভ, দুইবার স্নানে অমরত্বের বিনাশ। প্রথমবার অগ্নিস্নানের পর গজমতী অক্ষুণ্ণ যৌবন ভোগ করেছিল পাঁচ হাজার বৎসর, আরিমানও ভোগ করেছিল হাজার বৎসরের মত। কিন্তু—

কিন্তু দ্বিতীয় স্নানের পরমুহূর্তেই দুজনেরই আকস্মিক মৃত্যু।

টারজান—টারজানও ইদানীং ভাবতে শুরু করেছিল—গজমতীহীন এ-জীবন বয়ে বেড়ানোর মধ্যে যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নেই। একে শেষ করে দেওয়াই ভাল।

শেষ করে দেবার সহজ উপায়—একমাত্র উপায় আছে ঐ ন্যুন্দুর পাহাড়ে আর একটিবার যাওয়া, আগুন-তরঙ্গিণীতে আর একটিবার ঝাঁপিয়ে পড়া—ব্যস, তাহলেই সব জ্বালার অবসান, পলকের ভিতর অমরতার বিলোপ।

ঠিক এই সংকটের ক্ষণে এল নিশীথ রাতের আহ্বান, কে জানে কোন্ সুদূরতম অজানা দেশ থেকে হারিয়ে-যাওয়া গজমতী রানীর বেদনাবিধুর কণ্ঠস্বর।

"আমায় ত মাঝে মাঝে এমনি বিদেশে যেতে হয়। এবার তোমরা অধীর হচ্ছ কেন বন্ধুরা? আমি আবার আসব। আবার আসব। আবার আসব।"

মহাজম্বুর মগডাল থেকে নীচুপানে এই সান্ত্বনার সম্ভাষণ পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষান্তর লক্ষ্য করে লাফ দিল টারজান। বুকের ভিতরটা ব্যথায় রক্তাক্ত হয়ে উঠলেও বিলাপে ভেঙে পড়া পৌরুষের চিহ্ন নয়।

যেতে হবে ন্যুন্দুর পাহাড়েই। একটিবার যেতেই হবে। একটি মহামূল্য বস্তু সেখানে রয়েছে। অন্ততঃ থাকবার কথা। সে-বস্তুটি পাওয়া দরকার টারজানের।

সে-বস্তুটি আর কিছু নয়, গজমতী রানীর পরিত্যক্ত জাদুদণ্ড। মৃত্যুর মুহূর্তে টারজানের কানে একটি মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিল গজমতী। সে-মন্ত্র এখনও দিব্য স্মরণ করতে পারে টারজান। জাদুদণ্ডকে ইচ্ছামত পরিচালনা করবার শক্তি রাখে ঐ মন্ত্র।

মন্ত্রটি তখন শুনেছিল টারজান, কিন্তু দণ্ডটি হাতে তুলে নিয়ে আসার প্রবৃত্তি হয়নি ওর। বনচর টারজান জাদুর শক্তি দিয়ে করবে কী? দেহের শক্তিই তার সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

সেদিন অবহেলায় পরিত্যাগ করে এসেছে যাকে, আজ তারই সন্ধানে আবার তাকে ন্যন্দুর পাহাড়ে ছুটতে হচ্ছে। প্রয়োজন হতে পারে ওকে। গজমতী কোন্ সুদূর দেশে, পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে, কোন্ মহাসমুদ্রের পারে নবজন্ম গ্রহণ করেছে, তা ত জানে না সে!

সে-রাতে হাওয়া বইছিল কনকনে ঠাণ্ডা। সেই হিমেল হাওয়ায় ভর করে ভেসে এসেছিল গজমতীর ক্রন্দন।

এতে কি টারজান এই বুঝবে যে গজমতীর এ-জন্মের অবস্থান হল কোন-এক চিরতুষারের দেশে?

তা যদি হয়, তাহলে টারজানের সেখানে যাওয়ার উপায় কী? অরণ্যচর টারজানের চিরদিনের গতিবিধি হল মহামহীরুহদের চারতলার ডালে ডালে। গজমতীর দেশে যাওয়ার পথে যদি অরণ্য না থাকে? রুক্ষ পাহাড়ের উপর দিয়ে, উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে, তেপান্তর মরু পেরিয়ে যদি যেতে হয় তাকে?

ঐ জাদুদণ্ডই দিতে পারে তাকে সে দুর্গম পথে চলবার শক্তি। ওটি তার একান্তই চাই।

ন্যন্দুর পাহাড়ের পথ তার চেনা। মহারণ্যের চারতলার সড়ক বেয়ে বেয়ে হাওয়ার মত স্বচ্ছন্দেই সে এগিয়ে চলেছে। গতি তার দ্রুত, বিরতি শুধু দিনের আহার আর রাতের নিদ্রাটুকুর প্রয়োজনে। সময় নষ্ট করা টারজানের স্বভাব নয়, বিশেষ করে বর্তমান ক্ষেত্রে ত একটা মুহূর্তও মূল্যবান্ তার কাছে।

মূল্যবান্—কারণ গজমতী রানী তাকে ডেকেছে। মরে গিয়েছিল গজমতী টারজানের চোখের সমুখেই, তার কুঁকড়ে-যাওয়া মর্কটের দেহের মত দেহপিণ্ডটাকে নিজের হাতে সমাধি দিয়েছিল টারজান সেই টিলার আকারের প্রস্তরচূড়ার নীচে, যার মাথার উপরে দাঁড়িয়ে ভক্ত ন্যন্দুরদের উপর রানী তার হুকুম জারি করত আগের দিনে।

মরে গিয়েছিল, কিন্তু সে আবার এসেছে নিশ্চয়। এসেছে রক্তমাংসের দেহ নিয়েই, মানুষের পৃথিবীতে। এসেছে টারজানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই। সেই প্রতিশ্রুতিই ত সে দিয়ে গিয়েছিল! "আসব আমি। অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর! আবার আমি আসব।"

এসেছে সে। কিন্তু কোথায়?

গজমতীর আহ্বান সে শুনেছে, কিন্তু পায়নি পথের কোন নির্দেশ। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—কোন্ দিকে সে জন্মগ্রহণ করেছে, তার কোনো ইঙ্গিত পায়নি টারজান।

তবে হ্যাঁ, ঐ বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়া যদি কোন ইঙ্গিত হয়, তবে সে আলাদা কথা। বাস্তবিকপক্ষে,

ধড়মড় করে উঠে বসল টারজান মহাজম্বুর তে-ডালায়।

সে-হাওয়ার ঝলকটা সত্যিই ত একটা অনৈসর্গিক ব্যাপার এই আগুন-তাতা মধ্য-আফ্রিকায়!

ভাবনাটা কিছুতেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না টারজান। চারতলার সেই আধা-বায়ুপথে উড়তে উড়তে ছুটতে ছুটতে ক্রমাগতই সে ভাবছে। গজমতীকে খুঁজে খুঁজে সারা পৃথিবী যদি তাকে সাতবার পরিক্রমা করে আসতে হয়, তাও সে করবে।

কিন্তু, হ্যাঁ, এইখানেই তার ভাবনা। গজমতীকে খুঁজে বার করবার পর কী আকারে টারজান দেখবে তাকে? রূপৈশ্বর্যে মণ্ডিতা অনিন্দ্যযৌবনের অধিকারিণী দেবীমূর্তিতে, না কুঁকড়ে-যাওয়া মর্কটের মূর্তিতে?

শেষেরটা যদি হয়? সে-চিন্তাতেও শিউরে ওঠে বেচারী। তা যদি হয়, এক দুর্বহ ভবিষ্যৎই যদি এসে গ্রাস করে টারজানকে?

না, শিউরে উঠলেও পিছিয়ে আসার কথা কল্পনা করতে পারে না সে। প্রতিশ্রুতির পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। গজমতী কি একতরফা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে গিয়েছে ফিরে আসবার? না, তা নয়।

তা নয়। স্পষ্ট ভাষায় প্রতিশ্রুতি না দিক, টারজানও নিজের পক্ষ থেকে দিয়েছে বইকি একটা প্রচ্ছন্ন অঙ্গীকার!

আকারে ইঙ্গিতে মুমূর্ষু গজমতীকে বুঝতে দিয়েছে বইকি যে সেও গজমতীর ফিরে আসার আশায় পথ চেয়ে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

অনন্তকাল অপেক্ষা কিন্তু করতে হয়নি। অল্প প্রতীক্ষার পরেই গজমতীর প্রত্যাবর্তনের আভাস পেয়েছে টারজান।

এক মাসেরও বেশী মহাদেশ-জোড়া মহারণ্যের মগডালে মগডালে কেটে গিয়েছে টারজানের। অবশেষে একদিন অদূরে সে ন্যান্দুর পাহাড়ের চূড়া দেখতে পেল গাছের উপর থেকে।

ঐ—ঐ গিরিচূড়ার উপরেই আরিমান তাকে টেনে তুলেছিল ক্রুদ্ধ ন্যান্দুরদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য। ঐখানেই হয়ত আরিমানের খটখটে হাড়গুলো এখনও দিনের পর দিন রোদ্দুরে পুড়ছে। তাকে সমাধি দেওয়ার দায় ত কারও ছিল না!

চোখ ফেরাতেই সেই শিলাস্তূপ চোখে পড়ল, যার নীচে টারজান সমাধিস্থ করেছিল গজমতী রানীকে। কী আশ্চর্য! কয়েকটা ন্যান্দুর এখনও না খাঁড়া উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে টিলার পাশে পাশে! আশ্চর্য এই আদিম মহাজন্তুগুলোর প্রাণের টান!

ওখানে একবার যেতে হবে। গজমতীর সমাধিটি একবার দেখবার জন্যই যেতে হবে। নতুন জন্মের গজমতী এখনও স্বপ্নের বস্তু হয়ে রয়েছে, কিন্তু যে-গজমতীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল প্রত্যক্ষ, তার দেহাবশেষ ঐ যে ঐখানে শায়িত রয়েছে, টারজানেরই হাতে-খোঁড়া কবরের আশ্রয়ে।

হ্যাঁ, যেতে হবে ওখানে। কিন্তু সেটা পরে। এখনকার প্রথম করণীয় হল সেই জাদুদণ্ডখানির উদ্ধার, যা দুর্বলা অবলা গজমতীকে করেছিল অজেয় শক্তির অধিকারিণী। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যথেচ্ছ ভ্রমণের দিয়েছিল অবাধ স্বাধীনতা, ন্যান্দুর আর পিশাচপক্ষীর মত অতিকায় জন্তুদানবগণের উপর হুকুম চালাবার ক্ষমতা অর্পণ করে দুর্জয় ঐন্দ্রজালিক আরিমানেরও করেছিল ঈর্ষার পাত্রী।

সে জাদুদণ্ড ত থাকবার কথা ন্যান্দুর পাহাড়ের গভীর অন্দরে। যেখানে আগুন-তরঙ্গিণী তরঙ্গ তুলে তুলে অহর্নিশ নৃত্য করে চলেছে, যুগপৎ জীবন আর মৃত্যু পরিবেষণ করে করে।

থাকবার কথা, কারণ গজমতীর হাতেই সেটা ছিল, যখন সে টারজানকে নিয়ে যায় অগ্নিস্নান করাবার উদ্দেশ্যে। টারজানের স্নান যখন হয়ে গেল, তখন নিজেও সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুন তরঙ্গে। ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় সে কি আর দণ্ডখানি তীরে রেখে যায়নি?

যদি না গিয়ে থাকে? যদি দণ্ড হাতে নিয়েই সে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে থাকে? তাহলে ত সেটা পুড়ে যাওয়ার কথা! অথবা আগুনের দাহিকাশক্তি প্রতিরোধ করার শক্তি তার যদি থাকে, তাহলে ঐ আগুন তরঙ্গের লেলিহান কুণ্ডলীর তলায় ত সেটা এখনও পড়ে থাকবার কথা!

সর্বনাশ! তাই যদি সে পড়ে থেকে থাকে এতদিন, টারজানের সাধ্য কি সেখান থেকে তাকে তুলে আনবার! দ্বিতীয়বার আগুনে ঝাঁপ খাওয়ার অর্থ যে কী, তা ত সে জানে। আরিমান মরেছে, গজমতীও মরেছে! টারজানও কি মরতে প্রস্তুত?

না, নিজেকে প্রতারণা করে লাভ নেই কিছু। মরতে টারজান এখনও প্রস্তুত নয়! গজমতী নেই বটে, কিন্তু আফ্রিকাজোড়া মহারণ্যনিচয়ের হাজার আকর্ষণ এখনও অবিরত টানছে মহারণ্যের একচ্ছত্র সম্রাটকে! এই ত সেদিন তার বিদায়ক্ষণে সিংহ গরিলা চিতা হিস্‌টাদের এক বিশাল জনতা গগন বিদীর্ণ করে কেঁদেছিল, "যেও না রাজা, যেও না" বলে!

পাহাড়ের অন্দরে ঢুকবার রাস্তা টারজান জানে। ন্যান্দুরেরা যে-রাস্তা খুলে দিয়েছিল পাথরের দেয়াল ভেঙে ফেলে, গজমতী সেই পথ দিয়ে ঢুকেই উদ্ধার করে এনেছিল টারজানকে বিষবাষ্পের গ্রাস থেকে। সে পথ ভোলেনি টারজান।

আশা আর নৈরাশ্যের দোলায় দুলছে টারজানের অন্তর। ঐ জাদুদণ্ডখানি—তা সে পাবে কি পাবে না? না পেলে—

না পেলে সব আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে তাকে। গজমতীর কাছে পৌঁছানোর শক্তি তার কখনও হবে না, পেশীর শক্তি তার যত বেশীই হোক।

এই সেই অলিন্দ, ঐ সেই শয়নকক্ষ আরিমানের। কী আশ্চর্য! চামড়ার বিছানা এখনও তেমনি পাতা রয়েছে কক্ষের ভিতর, তার পায়ের দিকে এখনও পাথরের পাত্রে খানিকটা অঙ্গার আর ছাই! অতীত দিনের জীবননাট্যকে অতীত বলে বিশ্বাস করাই যেন শক্ত হচ্ছে।

যত তাড়াই থাকুক, এই ঘরের দরজায় একবার না দাঁড়িয়ে পারল না টারজান। দাঁড়িয়েই তাকিয়ে দেখল শয্যার দিকে। তাকিয়েই সে চমকে উঠল দারুণ বিস্ময়ে।

শুধু বিস্ময়? না, তা বললে সত্যের হবে অপলাপ। ভয় কাকে বলে টারজান কোন দিন জানে না। ও-শব্দটার অর্থ কী, তা অনুভব করে বুঝবার মত ক্ষেত্র কোনদিন দেখা দেয়নি তার জীবনে। কিন্তু এটা কী? এই আকস্মিক

নতুনতরো অনুভূতি?

এই যে চওড়া বুকের নীচে সুস্থ সবল হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পরক্ষণেই যেন নিঃসাড় হয়ে গেল। এই যে বলিচিহ্নবিহীন মসৃণ ললাটে হঠাৎ বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল, এই যে কটির নীচে থেকে অধো-অঙ্গ হঠাৎ যেন অনড় পাথরে পরিণত হয়ে গেল তার, এটা কী?

এ যদি ভয় না হয়, তবে কী এটা?

আত্মচিন্তার ধারাকে বিশ্লেষণ করে দেখার মত মনের স্থৈর্য তার নেই সেই মুহূর্তে, সে শুধু কাঠের পুতুলের মত নিস্তব্ধ নিশ্চল হয়ে তাকিয়েই রইল সেই শয্যার দিকে।

হাঁ—আরিমান শুয়ে আছে তার শয্যায়ই। কিন্তু রক্তমাংসের আরিমান নয়, শুধু আরিমানের পরিপূর্ণ কঙ্কালটি। সবচেয়ে বিভীষিকার ব্যাপার এই যে কঙ্কালটা যে আরিমানেরই তাতে এতটুকু ভুল হওয়ার জো নেই, কারণ তার সেই সুবৃহৎ কুঁজটি পিঠের যে অংশে ছিল জীবদ্দশায়, সেই অংশে মেরুদণ্ডের মোটা হাড় ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে এখনও পর্যন্ত।

(২)

টারজান না হয়ে অন্য কেউ হলে ভিরমি যেত এতক্ষণ।

কিন্তু টারজানও কি ঠিক প্রকৃতিস্থ আছে? না, তা নেই।

সাধারণ অবস্থায় একটা কঙ্কাল খুব একটা বিভীষিকার জিনিস নয়, বিশেষ করে সাহসী লোকের পক্ষে। অনেক অনেক কঙ্কাল এর আগে দেখেছে টারজান, এতটুকু দুর্বলতা আসেনি তার মনে।

কিন্তু, আরিমানের কঙ্কাল যে হাসছে! ওর আঁকাবাঁকা কালচে দাঁতগুলো জুড়ে একটা সুস্পষ্ট বিদ্রূপের হাসি। এ বিদ্রূপ কি টারজানকে লক্ষ্য করেই?

টারজানের খামখাই মনে হচ্ছে একটা কথা। আরিমান যেন তাকেই বলতে চাইছে—"মরে গিয়েছি বলে আমি একেবারে বাতিল হয়ে যাইনি বৎস! তোমার সঙ্গে এখনও আমার অনেক বোঝাপড়া বাকি রয়েছে।"

হাঁ, এই অশিব পরিবেশ যে-কোন মানুষের পক্ষেই অসহনীয় হত। টারজানও অতিকষ্টেই নিজেকে খাড়া রেখেছে এতক্ষণ। কিন্তু আর সে পেরে উঠছে না। দেহমনের এই অবসাদকে এক্ষুণি ঝেড়ে ফেলে দেওয়া দরকার।

একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে সে চাঙ্গা করে তুলল খানিকটা, তারপরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চাইল সেই অভিশপ্ত কক্ষ থেকে।

একবার শেষ দৃষ্টি দিল ঐ অলক্ষুণে কঙ্কালের দিকে। আর তক্ষুণি প্রথম নজর পড়ল একটা কালো খাটো লাঠির দিকে। কঙ্কালের বাঁ হাতের মুঠিতে আলতোভাবে ধরা রয়েছে লাঠিখানা।

এ কি আরিমানের সেই জাদুদণ্ড? এক পলক স্থির হয়ে রইল টারজানের দুই চক্ষু ওর উপর। আর কী ভয়ানক! জাদুদণ্ডটা আপনা থেকে সরে সরে বেরিয়ে আসতে লাগল কঙ্কালের হাত থেকে।

টারজান আর দাঁড়াল না। ছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পেত আরিমানের জাদুদণ্ড একটা কালো সরীসৃপের মত এঁকেবেঁকে ঠিক তার পিছনে পিছনেই আসছে অভ্রান্ত লক্ষ্যে।

টারজান ছুটে চলেছে। ডাইনে বাঁয়ে আর তাকানো নয়। সেই শয়তান আরিমান আর রক্তমাংসের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে নেই, তা ঠিক, কিন্তু তার শয়তানী বুদ্ধি আর অমোঘ ইচ্ছাশক্তি এখনও জলজ্যান্ত বিদ্যমান রয়েছে ঐ জাদুদণ্ডের ভিতরে।

সে-দণ্ড কী না অনিষ্ট করতে পারে টারজানের!

গজমতী অবশ্য মরবার আগে বলে গিয়েছিল আরিমানের শেষ মুহূর্তের অনুতাপের কথা। গজমতীকে প্রবঞ্চনা করার জন্য অনুতাপ। কিন্তু টারজানের সন্দেহ হচ্ছে—পাপের জন্য অনুতপ্ত হলেও, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করতে পারেনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ ঐন্দ্রজালিক।

ঐ যে তার কালচে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্রূপের কুটিল হাসি, টারজানের পক্ষে এ কখনও শুভ হতে পারে না।

গজমতীর জাদুদণ্ডটি হস্তগত করতে পারলে সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াবে না এই পাহাড়ের অন্ধকূপে।

ছুটতে ছুটতে দুই সুড়ঙ্গের মোড়ে এসে পড়েছে টারজান, এখান থেকে নিম্নমুখী পথ বেয়ে আগুননদীতে নামতে হবে। তার পিছনে এখনো সেই কালো সরীসৃপের মত জাদুদণ্ড আরিমানের।

ছুটতে ছুটতে গভীর থেকে আরও গভীরে নামছে টারজান—পাতালনদীর গর্জন শুনতে পাচ্ছে একটু একটু করে। প্রথমে ক্ষীণ, পরে স্পষ্ট, ক্রমশ প্রচণ্ড। তার পিছনে এখনো ছুটে আসছে সেই কালো আগুনশিখার মত জাদুদণ্ডটা।

ছুটতে ছুটতে ঐ যে চোখে পড়ে আগুনঢেউয়ের রক্তাভা। হাওয়া অত্যধিক গরম। সমুখে ঐ সেই নদী, যাকে জীবননদী বা মৃত্যুনদী যে-কোন নামেই ডাকা যায়।

ছুটতে ছুটতে সেই স্থানটিতে এসে পড়ল টারজান যেখান থেকে গজমতী তাকে জোর করে নামিয়ে দিয়েছিল আগুনতরঙ্গে। এইখানে দাঁড়িয়েছিল টারজান, ঠিক এইখানে। সেদিন গজমতী ছিল তার পাশে, আজ নেই।

হঠাৎ একটা উদ্বেল শোকোচ্ছ্বাস টারজানকে অভিভূত করে ফেলল যেন। আগুননদীর সৈকতে দাঁড়িয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে বেদনাহত মৃগশাবকের মত।

কিন্তু একী! অপরিসীম মানসিক বিভ্রান্তির ভিতরও টারজান অনুভব করছে একটা জিনিস। কে তাকে পিছন থেকে ঠেলছে যেন। মৃদু মৃদু আদরের ছোঁয়া লাগছে যেন পিঠে। একটা নিদারুণ চমক খেল টারজান।

গজমতী কি ফিরে এল আবার? ঠিক এমনি করেই ত সেবার গজমতী পিছন থেকে ঠেলেছিল তাকে, আগুনতরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য।

পলকের জন্য সব ভুল হয়ে গেল টারজানের। অমিতশক্তিধর বনের রাজা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব ভুলে গেল। সর্বগ্রাসিনী মৃত্যুরূপিণী বিভ্রান্তির কোলে সে ঢলে পড়ছে। এক পা এক পা করে সে এগিয়ে যাচ্ছে আগুনের লহরে অঙ্গ ঢেলে দেবার জন্য।

আর এক পা। পরের বারের পদক্ষেপেই তাকে আগুনের ভিতর নিয়ে ফেলবে। যে আগুন আগের বারে ছিল চিরজীবনদায়িনী সুধা, আর এবারে এনে দেবে অনিবার্য আকস্মিক মৃত্যু।

পা ফেলতে যাচ্ছে টারজান, হঠাৎ কী-একটা জিনিস নাগপাশের মত জড়িয়ে ধরল সেই পা।

চমকে পিছিয়ে এল টারজান। চোখ মেলে চাইল এতক্ষণে। দেখে তার পা জড়িয়ে বেয়ে উঠছে একটা ছোট্ট কালো সাপ।

সাপ দেখে ভয় পাওয়ার মানুষ টারজান নয়। সে নীচু হয়ে সাপটাকে ধরে তুলল পা থেকে।

আর কী আশ্চর্য! সাপ আর সাপ নেই, এ ত শুধু কালো একখানা শক্ত কাঠের লাঠি! এই সোজা কঠিন কাষ্ঠখণ্ড লতার মত হয়ে কীরকম করে তার পা জড়িয়ে ধরেছিল এক্ষুণি!

লাঠি হাতে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনের চাপটাও উবে গিয়েছে, কেউ আর নদীর দিকে ঠেলছে না টারজানকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই টারজান দেখে দ্রুতবেগে এঁকে-বেঁকে কালো সরীসৃপের মত একটা জিনিস উপরমুখী পথ বেয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে দুই সুড়ঙ্গের মোড়ের দিকে।

আরিমানের জাদুদণ্ড ঐ ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে টারজান-নিধনের প্রথম প্রয়াস বাধা পেয়েছে গজমতীর দিক থেকে।

গজমতীর জাদুদণ্ডই শেষ মুহূর্তে সজাগ করে দিয়েছে টারজানকে। আগুননদীর সৈকতে, ঠিক অগ্নিরেখার উপরেই গজমতী দণ্ডটিকে স্থাপন করেছিল, নিজে নদীতে নামবার আগে।

সেইখানেই সে পড়ে ছিল একইভাবে এই দীর্ঘদিন। পড়ে ছিল গজমতীর শেষ কামনা স্মরণে রেখে। সে-কামনা এই—"আমার স্বামীকে তুমি রক্ষা করবে সযত্নে।"

রক্ষা সে করেছে।

টারজানেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এই পাতালগহ্বরে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে নেমেছিল, পূর্ণ হয়েছে তা। গজমতীর জাদুদণ্ড এই তার হাতের ভিতর। এই দণ্ডকে ইচ্ছামত পরিচালনা করবার মন্ত্র গজমতী তাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বক্ষণে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

টারজানের নিজস্ব দৈহিক শক্তিই পৃথিবীর পশুবলের কাছে দুর্জয়। তার সঙ্গে যুক্ত হল গজমতীর মন্ত্রশক্তি। এটার প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই।

প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে টারজানের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হয়েছে দেহমুক্ত আরিমানের অশিবশক্তি। সে শক্তির প্রতীক ঐ কালো সরীসৃপের মত পলায়িত জাদুদণ্ডটা।

একবার পালাতে বাধ্য হয়েছে বলে সে যে আর অনিষ্টের চেষ্টা করবে না, তা ত নয়! মৃত্যুর পরেও আরিমান মর্মান্তিক বিদ্বেষ পোষণ করছে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে। তার প্রথম চিহ্ন—কঙ্কালের মুখের ব্যঙ্গ হাসি, দ্বিতীয় চিহ্ন—অতর্কিতে টারজানকে আগুননদীতে নিক্ষেপের চেষ্টা।

টারজান অতঃপর সতর্ক হয়ে। সযত্নে রাখবে গজমতীর জাদুদণ্ডকে।

সে আর দাঁড়াল না। জাদুদণ্ড হাতে নিয়ে তাকে উপরমুখে উঠতে হল। বাঁয়ে ঘুরে আরিমানের কক্ষের দিকে আর সে যাবে না। সোজা উপরে উঠে যাবে ন্যান্দুর পাহাড়ের চূড়ায়, সেখান থেকে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার এই দণ্ডের উপর।

ন্যান্দুর উপত্যকার মাঝখানে সেই নিঃসঙ্গ টিলা।

তার পায়ের নীচে একটা কবর, তাতে শ্যামদূর্বার আস্তরণ। লাল-সাদা ভুঁইচাঁপা ফুল মাথা তুলেছে সেই ঘাসের ভিতর দিয়ে।

কবরের আশেপাশে ন্যুন্দুরযূথের ভিড়। বিরাট কলেবর। সিংহের মত মুখ, গণ্ডারের মত খাঁড়া, মহামাতঙ্গের মত দেহ, কেবল তাতে শুঁড়ের অভাব।

এরা রোজ আসে তাদের রানীর সমাধির পাশে। একবার করে প্রদক্ষিণ করে সমাধিকে, আর একবার করে উচ্চ বৃংহণে কাঁপিয়ে তোলে আদিগন্ত বিস্তীর্ণ উপত্যকা।

প্রদক্ষিণরত ন্যুন্দুরেরা লক্ষ্য করেনি—ন্যুন্দুর পাহাড়ের চূড়া থেকে একটা কালোরং বিদ্যুৎশিখা ছুটে এসে পড়ল টিলার মাথায়, আর তাদের অগোচরেই টিলার গা বেয়ে নেমে পড়ল ন্যুন্দুরদের মাঝখানে।

যখন নামল, তখন আর তার চেহারা বিদ্যুৎশিখার বা জাদুদণ্ডের মত নয়, সে তখন নবরূপ ধারণ করেছে—শতেক ন্যুন্দুরের মধ্যে অন্যতম মহান্যুন্দুর, আকারে আয়তনে উপস্থিত যে-কোন ন্যুন্দুরের চাইতে প্রায় দেড়গুণ বড়।

প্রদক্ষিণ শেষ করে শতকণ্ঠে গর্জে উঠল ন্যুন্দুরেরা হস্তিভাষায়—"জয় গজমতী রানীর জয়! আবার এসো রানী, আবার এসো!"

হঠাৎ দুই-চারটি ন্যুন্দুর নবাগত অতিকায়কে সম্বোধন করে বলে উঠল—"তুমি কে হে? তোমায় ত আগে দেখিনি!"

তাদেরই পিঠ-পিঠ আর কয়েকজন প্রশ্ন করল—"তুমি যে জয়ধ্বনিতে যোগ দিলে না বড়!"

নবাগত তিক্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—"জয়ধ্বনিতে যোগ দেওয়ার কথা তোলাই মিছে। রানীর হত্যাকারী তোমাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির, তাকে সাজা দেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে অকারণে 'জয় জয়' করে চেঁচানোর কোন মানে হয় নাকি?"

রানীর হত্যাকারী? মোটাবুদ্ধি ন্যুন্দুরেরা এই আজগুবী শব্দ দুটি শুনতে পেয়েই দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ক্রোধে এবং জিঘাংসায়। এমনধারা ক্ষেপে গেল তারা যে নবাগত ন্যুন্দুরের পরিচয় দ্বিতীয়বার কেউ আর জিজ্ঞাসা করল না।

"রানীর হত্যাকারী? কোথায়? কোথায়?"—তারা চক্রাকারে ঘুরতে লাগল সবাই মিলে কোন্ দিকে সেই হত্যাকারী তাই ঠাহর করবার জন্য। বলা বাহুল্য কাউকে তারা দেখতে পেল না।

"একবার তাকে দেখিয়েই দাও না, সাজা দিই কি না দিই তা হাতেকলমে দেখতে পাবে।"—সবাই মিলে একসুরেই গর্জন করে।

হাঁদা হাঁদা জন্তুগুলোর মগজে একথাটা ঢুকল না যে রানী যে হত্যাকারীর হাতে নিহত হয়েছিল, এমন কথা এই দীর্ঘ যুগের মধ্যে এর আগে ত একবারও কেউ উচ্চারণ করেনি! কাজেই নবাগতকে ও-কথা নিয়ে কেউ জেরা করতে এগিয়ে এলো না।

"দেবে ত সাজা? ঐ তাকিয়ে দেখ ন্যুন্দুর পাহাড়ের মাথার দিকে। ওখানে একটা মানুষ দেখতে পাচ্ছ ত? ঐ সেই হত্যাকারী। মনে পড়ে সেই অনেক—অনেক বছর আগে রানী একদিন সকালে আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর এক পরম শত্রুকে ন্যুন্দুর পাহাড় থেকে ধরে আনবার জন্য?"

পাহাড়চূড়ার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শতেক ন্যুন্দুর বলে ওঠে—"মনে পড়ে বইকি। কিন্তু সে শত্রুর সঙ্গে ত পরে রানীর মিতালি হয়ে গিয়েছিল!"

"মিতালি না ছাই!"—গর্জে ওঠে নবাগত। "ও সেই শয়তান আরিমানের কারসাজি। সে, কেমন করে জানি না, রানীর সঙ্গে দোস্তি পাকিয়ে দিয়েছিল ঐ শত্রুর। সেই দোস্তির সুযোগ নিয়েই ঐ সাদা দুশমন আমাদের রানীকে আগুনে ঠেলে ফেলে দেয়। এর আগে, খোলাখুলি শত্রুতা করতে গিয়ে আরিমান কোনদিন পেরে ওঠেনি রানীর সাথে।"

"ঠিক ঠিক!"—গর্জে ওঠে সমস্বরে একশোটা ক্রুদ্ধ ন্যুন্দুর। ন্যুন্দুর পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়েই টারজান শুনতে পায় গজমতীর সমাধির চারিধার ঘিরে দাঁড়িয়ে একটা গোটা ন্যুন্দুর পল্টন আকাশ-বাতাস মথিত করে ফেলেছে প্রলয়গর্জনে।

হস্তিভাষা টারজান জানে, কিন্তু অত দূর থেকে ন্যুন্দুরদের বক্তব্যটা সে শুনতে পাচ্ছে না। মেজাজ ওদের তেতে রয়েছে তা অবশ্য বোঝা যায়, কিন্তু কারও তপ্ত মেজাজের ভয়ে সংকল্প ত্যাগ করার পাত্র ত টারজান নয়!

গজমতীর জাদুদণ্ড তার হাতে। তাকে সে মন্ত্র পড়ে হুকুম করল—"আকাশপথে আমায় পার করে দাও এই বৃক্ষবিহীন উপত্যকা, নামিয়ে দাও টিলার মাথায়।"

সাঁ সাঁ করে অমনি একটা ঝড় উঠল, শুধুমাত্র ন্যুন্দুর পাহাড় থেকে টিলা পর্যন্ত স্থানটুকু আলোড়িত করে। সেই ঝড়ের মাথায় উড়তে উড়তে পলকের ভিতরেই সাত ফুট মানুষটা টিলার মাথায় গিয়ে নামল।

তাকে নামতে দেখেই নবাগত মহান্যুন্দুর চেঁচিয়ে উঠল—"ঐ! ঐ যে সেই হত্যাকারী!"

তখন সে কী নারকীয় কাণ্ড শুরু হল সেখানে! আকাশ ফেটে যেতে লাগল বৃংহণের পর বৃংহণে। পৃথিবী কাঁপতে

আঘাতের পর আঘাত বজ্রশক্তিধর অঙ্কুশের।

লাগল পাহাড়প্রমাণ শতেক ন্যুন্দুরের দাপাদাপিতে। নবাগত মহান্যুন্দুর ধেয়ে গিয়ে খাঁড়া বসিয়ে দিল টিলার গায়ে।

ন্যুন্দুরের খাঁড়ার আঘাত ক্রমাগত পড়তে থাকলে ছোটখাটো পাহাড়ও ক্রমশ গুঁড়িয়ে যেতে পারে, এ অভিজ্ঞতা আছে টারজানের।

ইচ্ছা করলে তার আগেই সে আকাশপথে এ স্থান ত্যাগ করতে পারে। জাদুদণ্ড এখনও তার হাতেই রয়েছে।

কিন্তু স্থানত্যাগের আগে নীচের ঐ শ্যামদূর্বায় ঢাকা সমাধিটি একবার স্পর্শ করা যে চাই টারজানের! এত কাছে এসে, সে ঐ কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারগুলোর ভয়ে সংকল্প ত্যাগ করে পালাবে?

জন্তুজানোয়ারের কাছে পরাজয় স্বীকার? সারা জীবনে টারজান তা করেনি কখনও। আজ করবে?

গজমতীর জাদুদণ্ড তার হাতে। সে দণ্ড তাকে অধিকারী করেছে এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের। চর্মচক্ষে যা দেখা যায় না, সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে সে তা বুঝতে পারছে।

ঐ যে মহান্যুন্দুরটা, অতিকায় জানোয়ারটা উন্মত্ত রোষে বার বার ছুটে এসে টিলার গোড়ায় খাঁড়ার ঘা দিচ্ছে, ওটা কি সত্যি সত্যিই অন্য ন্যুন্দুরদের মত একটি সাধারণ না, কদাপি নয়। টারজানের চোখে ওর স্বরূপ ধরা পড়ে গিয়েছে। ন্যুন্দুরের মেদ-মাংস, সিংহবদন, গণ্ডারের খাঁড়া সত্ত্বেও ওর ছদ্মবেশ উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছে ঐন্দ্রজালিকের সমুখে।

আরিমানের জাদুদণ্ডটিই টারজান-নিধনের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলছে এই ন্যুন্দুরবাহিনীকে।

জিঘাংসায় পূর্ণ হয়ে গেল টারজানের অন্তর।

তার আদেশে গজমতীর জাদুদণ্ড পরিণত হল বজ্রশক্তিধর একখণ্ড অঙ্কুশে। আর সেই অঙ্কুশ হাতে নিয়ে টারজান লাফিয়ে গিয়ে পড়ল আততায়ী ছদ্মবেশীর মাথায়।

আঘাতের পর আঘাত বজ্রশক্তিধর অঙ্কুশের। মহান্যুন্দুরের মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল, যন্ত্রণায় অধীর হয়ে সে টারজানকে মাথায় নিয়েই আকাশে উঠল আর্তনাদ করতে করতে।

টারজান আর এক লাফে নেমে এল সমাধির উপরে। আশেপাশে তার শতেক ন্যুন্দুর, মহাকায় মাতঙ্গযূথ।

কিন্তু তাদের দৃষ্টি সেই মুহূর্তে টারজানের দিকে নেই। সবাই অতিকষ্টে ঘাড় তুলে আকাশপানে চেয়ে দেখছে তাদেরই মত একটা মহান্যুন্দুর উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে হাওয়ার রাজ্যে।

ন্যুন্দুরদের মোটা মাথায় এই পরমাশ্চর্য ব্যাপারটার অর্থ কোনমতেই প্রবেশ করল না। ন্যুন্দুর জাতের ক্ষমতা অনেক, তা তারা জানে। কিন্তু ওড়ার ক্ষমতাও তাদের আছে, এটা তাদের অজ্ঞাত ছিল এতদিন।

তারা তখনও হাঁ করে উপরপানে তাকিয়ে আছে, সমাধির মৃত্তিকা স্পর্শ করে গজমতীর স্মৃতিকে ততক্ষণে অর্চনা করে নিয়েছে টারজান।

এইবার, ন্যুন্দুর উপত্যকায় তার কর্তব্য শেষ। সে এবার অজানার পথে পাড়ি জমাবে, গজমতী রাণীর সন্ধানে।

(৩)

ন্যুন্দুরেরা হাঁ করে আকাশপানে তাকিয়েই আছে, টারজান কারও গা ঘেঁষে, কারও পেটের তলা দিয়ে নিঃশব্দে ফাঁকা মাঠে বেরিয়ে এল। এখান থেকে ঢিল ছুঁড়লে গজমতীর পরিত্যক্ত প্রাসাদে গিয়ে পড়ে। ঐ বুঝি তার গোড়ায় সেই পূর্বপরিচিত মহাকপি দুটোকে দেখা যায়। কিন্তু সেদিক পানে গেল না টারজান।

কী হবে ওখানে গিয়ে? পূর্বস্মৃতি জেগে উঠে খানিকটা ব্যথাই শুধু দেবে নতুন করে। তা ছাড়া, নষ্ট করবার

মত সময় কই টারজানের হাতে?

জাদুদণ্ড তার হাতে। এই দণ্ডই এখন গজমতীর প্রতিনিধি যেন। ও যদি পথ নির্দেশ করে দেয়, ও যদি সে-পথে চলবার উপায় এনে দেয় হাতের মুঠোতে, তবেই টারজান খুঁজে বার করতে পারবে গজমতীকে। তা নইলে কোন আশা নেই, দুনিয়ার সেরা শক্তিমান্ টারজান এ-ব্যাপারে একান্ত অসহায়।

ফাঁকায় এসে সেই জাদুদণ্ডটিকে মুখের কাছে তুলে ধরল—যেন প্রিয় বন্ধুর কানে কানে কথা কইছে, এইভাবে পরম সমাদরে চুপিচুপি বলল—"কোথায় আছেন রানী এ-জন্মে, তা কি জানো তুমি? পারো আমায় সেখানে নিয়ে যেতে?"-

জাদুদণ্ডটি উপর-নীচে দুলতে লাগল, যেন সম্মতি জানাচ্ছে মাথা ঝাঁকিয়ে। যেন সে বলছে—"জানি জানি। রানী যেখানেই যান না কেন, তাঁর পূর্বজন্মের জাদুর শক্তি অবিশ্যি তাঁকে খুঁজে বার করতে পারবে। সে-শক্তির আধার হচ্ছি আমি। সঠিক মন্ত্রটি পড়ে যে আমাকে সজাগ করে তুলতে পারবে, তাকে আমি যেমন করে হোক নিয়ে যাব রানীর কাছে।"

সে-মন্ত্র রানীই মৃত্যুকালে দিয়ে গিয়েছে টারজানকে। টারজান তা উচ্চারণ করতে কালবিলম্ব করল না এতটুকু।

আর, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে শোনা যেতে লাগল একটা অস্পষ্ট সাঁ সাঁ শব্দ। যেন মহামহীরুহদের চারতলার মগডালে মগডালে কালবৈশাখীর ঝাপট লাগছে এসে, একটার পর একটা। টারজান শক্ত করে জাদুদণ্ডটি আঁকড়ে ধরে রইল।

একটু অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই টারজানের। পিশাচপক্ষীদের সে দেখেছে, তাদের পিঠে সওয়ার হয়ে আকাশ পাড়িও সে দিয়েছে সেবারে, আবার কি সেই অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে নাকি?

সাঁ সাঁ শব্দটা ক্রমশ নিকটে আসছে, আরও নিকটে, আরও, আরও। একটা উত্তাল আলোড়ন উঠেছে হাওয়ার রাজ্যে। অমন প্রখর সূর্যের আলো দেখতে দেখতে নিবে গেল। ন্যুন্দুরেরা—অত বড় সব মহাকায় মহাজন্তুরা—ভয় পেয়ে সচল পর্বতমালার মত দুলতে দুলতে যথাসম্ভব ত্রস্তপায়ে হাবসী পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে।

উপত্যকার উত্তর সীমার ঐ হাবসী পাহাড়েই ওরা থাকে। ওখানে গিয়ে পাহাড়তলির অরণ্যে মাথা গুঁজবার জন্যই ব্যস্ত ওরা। গজমতী রানীর জীবদ্দশায় ওদের ভয়ডর কিছু ছিল না। তার জাদুর শক্তি ঝড়ঝাপটা বজ্রপাত থেকেও রক্ষা করত তার ভক্ত প্রজা এই ন্যুন্দুরদের।

ন্যুন্দুরেরা পালাচ্ছে। ঝড়টা এসে পড়ল। প্রলয়ঘূর্ণির আকারে এল সেই চীন-দরিয়ার টাইফুন দশ-বিশ হাজার মাইল পেরিয়ে। এসে তোলপাড় করে দিল গোটা ন্যুন্দুর উপত্যকাটাকে চোখের পলকে।

টারজানকে সশরীরে তুলে নিল সেই টাইফুন। তুলে নিল দুই-চারটা পলায়মান ন্যুন্দুরকেও। ঘূর্ণির ভিতর হাওয়া যেন জ্বলন্ত চুল্লীর উপরকার সুরুয়ার মত ফুটছে, ফাটছে, পাক খাচ্ছে।

টারজান দম বন্ধ করে আছে। জাদুদণ্ড যেন তার কানে কানে বলছে—"এ তোমার ভালোর জন্যই। তুমি ভয় পেয়ো না।"

আর একবার পাক খেয়ে মাথা উঁচু করবার সঙ্গে সঙ্গেই টারজান অনুভব করল সে শক্ত একটা-কিছুর উপর আশ্রয় পেয়েছে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে বুঝবার জো নেই আশ্রয়টা কী জাতীয়।

যা হোক—টাইফুনের উলটিপালটির ভিতর নিরালম্ব অবস্থায় ক্রমাগত ডিগবাজি খাওয়ার চাইতে যে-কোন আশ্রয়ই কামনার বস্তু। টারজান প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল এই শক্ত জিনিসটাকে।

একটানা প্রলয়গর্জন তুলে মহাঝটিকা ফিরে চলেছে উত্তর-পুব দিকে। বিস্ময় বোধ করে টারজাম। এমনভাবে দিক্ পালটাতে কোন ঝড়কে সে দেখেনি এর আগে। তার পরই বিস্ময় কেটে যায় তার। এ-ঝড় ত আর সত্যিকার ঝড় নয়, ইন্দ্রজালের কারসাজি। এর পক্ষে সবই সম্ভব।

ঝটিকাগর্জনের ফাঁকে ফাঁকে পায়ের তলায় ও আবার কী শোনা যায়? একটা কানফাটানো কল্লোলধ্বনি। জল! জলের আওয়াজ! তাহলে কি সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে টারজান?

ঝড় বইতেই থাকে। সমুদ্রের উপর দিয়ে, পাহাড়ের উপর দিয়ে, শ্যামল সমতলের উপর দিয়ে টারজানকে বহন করে নিয়ে যায় এই জাদুর ঝটিকা। টারজানের নিজের সাধ্য ছিল না স্বকীয় চেষ্টায় এ দুর্গম পথ অতিক্রম করা।

আর কী প্রচণ্ড গতিবেগ এই ঝড়ের! টারজানের ত মনে হল অর্ধেক পৃথিবী সে ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছে ঘূর্ণিঝঞ্ঝার পাখায় চড়ে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় হাওয়ার এই দাপটের ভিতর; টারজানের যে-বুকের উপর দিয়ে হাতী হেঁটে যায় খেলার ছলে, সে বুকও ফেটে যেতে চায় দম নিতে না পেরে।

হঠাৎ যেন শীত করে উঠল।

গায়ে লাগে সেই রকম ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক, যে-রকমটা

লেগেছিল সেই রাতে গজমতীর আহ্বান কানে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে।

কোন হিমেল পর্বত পার হয়ে যাচ্ছে নাকি টারজান?

শীত বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে। শীতে কাতর হয়ে পড়ে টারজান। এক-একবার ভাবে গায়ের রক্ত বুঝি জমে গেল শিরার ভিতরে। অবশেষে, এইভাবে অপঘাত মৃত্যু বরণ করতে হবে নাকি অপরাজেয় টারজানকে?

"ধৈর্য ধর, আর বেশীক্ষণ নয়"—কানে কানে কে যেন বলে ওঠে টারজানকে। জাদুদণ্ডটি বুকের ভিতর আগলে রেখেছে, এ আশ্বাস এসেছে তারই কাছ থেকে।

কতক্ষণ ধরে ঝড়ের পাখায় পৃথিবী পর্যটন করছে সে, কোন আন্দাজই নেই তার। এক-একবার মনে হয় দুটো দিন রাত্রি অন্তত। গোটা আফ্রিকা মহাদেশ পার হয়ে এসেছে, উড়ে এসেছে ভারতীয় দরিয়ার উপর দিয়ে, অতিক্রম করেছে প্রথমে গাঙ্গেয় উপত্যকা, তার পরে ধরণীর মেরুদণ্ডস্বরূপ বিশাল হিমাচল।

যতই বিদ্যুতের বেগে টাইফুন তাকে বহন করে এনে থাকুক, দুটো দিনের কমে এত পথ কখনই পাড়ি দিতে পারেনি।

ওকি? আকাশে আলোর আভাস যেন?

রাত্রির আঁধার কেটে যায়, ঝড় থেমে আসে। ধীরে ধীরে নামতে থাকে টারজান বাহন-সমেত।

কিন্তু শীত যে আরও বেড়ে যাচ্ছে! হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসে! "ধৈর্য ধর! আর একটু সহ্য কর!"—বুকের ভিতর শুয়ে আশ্বাস দেয় জাদুদণ্ড।

আকাশ আলো হয়ে উঠেছে। প্রথমে আকাশ, তার পরে পর্বতের চূড়া, তারও পরে একটা সংকীর্ণ উপত্যকা।

তার বাহনকেও এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পায় টারজান। অবাক্! হতভম্ব! এ যে একটা ন্যান্দুর!

টারজানকে যেমন মাটি থেকে সশরীরে তুলে এনেছে ঘূর্ণিঝড়, তেমনি তুলে এনেছে এই অতিকায় জন্তুটাকেও।

ঝড়ের পিঠে সওয়ার হয়ে দুই দিন বসে আদ্ধেক পৃথিবী পেরিয়ে আসার পরেও টারজান দিব্য বেঁচে আছে, কিন্তু এই পাহাড়প্রমাণ দেহের অধিকারী মহাজানোয়ারটা মারা পড়েছে পৃথিবীর মাটির সংস্পর্শ হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই। তার মৃতদেহের উপর সওয়ার হয়ে টারজান আরামে দীর্ঘ পথ পার হয়ে এল।

মারা পড়েছে অত বড় শক্তিমান্ জন্তুটা, কারণ, দেহের শক্তি তার যতই থাক, মনের শক্তি তার কিছুই ছিল না। মন জিনিসটাই যার অতি নীচু স্তরের, মনের শক্তি তার আসবেই বা কোথা থেকে?

উপত্যকার মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শীত যেন একেবারে আড়ষ্ট, পঙ্গু করে ফেলতে চাইছে টারজানকে। কোনরকমের একটা আচ্ছাদন যে একান্তই চাই! এক্ষুণি চাই! তা নইলে আফ্রিকার মানুষ টারজানের ত একদণ্ডও বাঁচা অসম্ভব এই বরফের রাজ্যে!

চারিদিকে তাকায় টারজান। নাঃ, গায়ে চড়াবার মত কোন কিছুই চোখে পড়ে না। জাদুদণ্ডও নীরব। তার কাছ থেকে অনেকক্ষণ আসেনি কোন পরামর্শ।

এদিক্ ওদিক্ ছুটোছুটি খোঁজাখুঁজি করবার সময় নেই। গায়ের রক্ত জমে যাচ্ছে ওদিকে। টারজানের মাথায় একটা ঝিলিক মেরে গেল—অকল্পনীয় একটা উপায় চোখে পড়েছে তার।

কটিতে ছোরা তার চিরসঙ্গী। সেই ছোরা হাতে নিয়ে সে ধরাশায়ী ন্যান্দুরের পেটে বসিয়ে দিল। সে কি সহজে ঢুকতে চায়? পাথরের মত শক্ত, নিরেট মনে হয় সে-চামড়া। অনেক জোরাজুরির ফলে তবে ছোরা বিঁধল ন্যান্দুরের পেটে।

পেটের একটা দিক্ থেকে সমস্ত চামড়াটাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিল টারজান। তারপর সেই চামড়ার ভিতর-পিঠটা ছোরা দিয়েই চেঁছে মুছে পরিষ্কার করে নিল খানিকটা।

চমৎকার চাদর হয়েছে একখানি। টারজান কালবিলম্ব না করে সেই গরম চাদরখানি আপাদমস্তক গায়ে জড়িয়ে ফেলল। উপরের পিঠটা ত পরিচ্ছন্নই ছিল, সেইটাই লেপটে রইল গায়ে। বাইরে পড়ল রক্তমাখা ভিতরের দিক্‌টা, তা পড়ুক, শীতটা ত কাটুক।

গন্ধ? কাঁচা রক্ত-মাংসের গন্ধ সওয়া আছে টারজানের। ও জিনিস খেয়েও থাকে পরিতোষের সঙ্গে। সুতরাং গায়ে রক্তমাখা চামড়া রয়েছে একখানা, তার দরুন অস্বস্তি বোধ করবার পাত্র টারজান নয়!

রোদ্দুর উঠছে। উপত্যকার কোথাও আর আবছা অস্পষ্টতা নেই। ঝকমক করছে পর্বতসানু, পর্বতচূড়া। পুলকিত হয়ে উঠল টারজান এখানকার পরিবেশ দেখে। সারা উপত্যকা ঘন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। পাহাড়ের গা মাথা সর্বত্র মহামহীরুহদের জটলা।

এসব গাছ আফ্রিকায় দেখেনি টারজান। মন্দার দেবদারু শাল শিশু, ফার পাইন সেডার বার্চ। মাঝে মাঝে যোজনজোড়া ডালপালা ছড়িয়ে এক-একটা হাজারবছরের ওক বৃক্ষ।

কিন্তু গাছেদের জাতিগোত্র যা-ই হোক, ওরা যে গাছ,

এইতেই টারজান খুশী। অরণ্যেরই জীব সে। বৃক্ষহীন স্থান, তা সে প্রান্তরই হোক আর পর্বতই হোক, তার পক্ষে অসুবিধার জায়গা।

এই যে চারিদিকে দিগন্তবিসারী মহারণ্য—এ যেন চিরপরিচিত বন্ধুর মত হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে টারজানকে। ঐসব গাছের চারতলার ডালে উঠে বসলে টারজান শত শত্রুরও অধৃষ্য; ওখানে বসে মানুষ এবং জানোয়ার সবাইকে সে সমানভাবে উপেক্ষা করতে পারে।

ক্ষুধা পেয়েছে বিষম। অনাহারে কেটেছে দুই বা তিন দিন। ন্যুন্দুর পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার আগে সে একটা হরিণ মেরে মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করে নিয়েছিল, তারপর থেকে ঘটনার প্রবাহ এত দ্রুততালে বইছে, আহারের কথা মনে করবার ফুরসত সে পায়নি।

কিন্তু এখন ত আর সে-কথা ভুলে থাকবার উপায় নেই! বিপদের মেঘকে কেটে যেতে দেখে প্রসুপ্ত জঠরানল শিখা বিস্তার করে নাড়িভুঁড়ি পুড়িয়ে দিতে চাইছে। কিছু-একটা খাদ্য চাই এক্ষুণি।

হরিণ? বন্যবরাহ? অভাবপক্ষে বুনো মোষ বা চমরী গরুর বাচ্চা? শেষের দুটো জন্তু ধাড়ী হলে তাদের মাংস টারজানের রোচে না, বড় যেন ছিবড়ে ছিবড়ে লাগে।

এদিকে ওদিকে তাকায় টারজান, কিছু চোখে পড়ে না। মাথায় আসে দুশ্চিন্তা। শীত যেখানে এত বেশী, ওসব জানোয়ার হয়ত মিলবেই না এদেশে। মুশকিল! তাহলে টারজান খাবে কী? গাছের পাতা? কী মুশকিল!

বুকের ভিতর শুয়ে আছে গজমতীর জাদুদণ্ড। অথচ সেও নড়ে না। কোন হদিস সে বাৎলায় না। অথচ ইচ্ছে করলে ঐ দণ্ডটা কী না সৎ পরামর্শ দিতে পারে মানুষকে! ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সবই ত ওর জানা! গজমতী রানীর পাঁচ হাজার বছর আয়ুষ্কালের জমানো বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা ওরই কাছে ত গচ্ছিত রয়েছে!

টারজান ক্রমে বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে সবকিছু ব্যাপারের উপর। খাবার মিলছে না, এ কেমনধারা জায়গা এটা?

চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে কী?

টারজান দ্রুত পা চালিয়ে দিল। হাতের নাগালেই ঝোপঝাড় নেই, খানিকটা গেলে তবে বনের শুরু। ঐ বনই টারজানের লক্ষ্য।

ফাঁকা প্রান্তর কিছু সমতল নয়। এবড়োখেবড়ো পাথরে ভর্তি। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে ছোটখাটো আগাছা মাথা তুলেছে বইকি।

দড়ি গিয়ে গলায় বাধল একটা জন্তুর।

কচুর ডাঁটির মত ডাঁটিওয়ালা ছোট একরকম গাছ অগুন্তি হয়ে আছে। ডাঁটি কচুর মত, কিন্তু পাতাগুলি গোল। দুটি-তিনটির বেশী পাতা নেই কোন গাছে।

অনেক গাছেরই গোড়া খুঁড়ে উপড়ে ফেলেছে কেউ। টারজানের মনে হল শূকরজাতীয় কোন জন্তু। শূকরেরাই ত গাছের গোড়া খুঁড়ে মূলগুলো তুলে তুলে খায়।

একটা গাছ ওপড়ানোই পড়ে আছে, আর তার মূলটা রয়েছে অক্ষত। টারজান তাকিয়ে দেখল। মাংস যদি না-ই মেলে শীঘ্র, আপাততঃ শেকড়বাকড় খেয়ে ক্ষিধেটার কিছু পরিমাণে নিবৃত্তির চেষ্টা করা যাক না।

জন্তুজানোয়ারে যা খায়, তা বিষ হতে পারে না নিশ্চয়ই। আর এ-শিকড় যে কেউ-না-কেউ খেয়েছে, তাও ত নিঃসন্দেহ! ওপড়ানো গাছ অনেক রয়েছে ইতস্তত, কারও পাতা শুকিয়ে গিয়েছে, কারও এখনও তাজা। কিন্তু শিকড় কোন গাছেই নেই, ঐ একটাতে ছাড়া।

অর্থাৎ, খেয়েছে কেউ ঐসব গাছের শিকড়।

টারজানও খাবে। ঐ একটা গাছের শিকড়। গাছটা ছোট, হাতখানিকের বেশী উঁচু নয়, ডাঁটিও সরু, কিন্তু শিকড়টা সে-আন্দাজে বড়। টারজানের হাতের মত মোটা, লম্বাও

অন্তত আধ হাত।

যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ। মূলটা তুলে নিয়ে ছোরা দিয়ে তার উপরের ছাইরঙ্গা খোসাটা ছাড়াতে লাগল টারজান।

আর সেই মুহূর্তে ঘটল একটা অঘটন।

জাদুদণ্ডটি বুকের সঙ্গে লেগে ছিল টারজানের। হঠাৎ সেটা ছিটকে বেরিয়ে এল, আর এত জোরে আঘাত করল টারজানের হাতে যে ছোরাখানা হাত থেকে খসে পড়ল মাটিতে!

টারজান অবাক্ হয়ে তাকাল জাদুদণ্ডের দিকে। এ দণ্ড তার পরম বন্ধু। গজমতীর শুভেচ্ছার প্রতীক সে। সে চাইছে না যে টারজান এই শিকড়টা খাক।

কারণ একটাই হতে পারে। সে-কারণ এই যে টারজানের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হবে ও শিকড়। হয়ত বিযাক্তও হতে পারে।

অনিচ্ছা থাকলেও টারজান ফেলে দিল শিকড়টা। আবার পা চালিয়ে দিল বনের দিকে। জাদুদণ্ড আবার উঠে এসে তার বক্ষলগ্ন হল।

একটু দূরেই বনের শুরু। একটা ঝোপড়া উঁচু গাছে উঠে পড়ল টারজান। কেন উঠল? গাছে ওঠা অভ্যাস বলেই উঠল। এখন গাছে উঠে সে বিশ্রাম করবে না, গাছে উঠে চারদিকের দৃশ্যটা দেখে নেবারও সুবিধে নেই এখানে, কারণ নজর আটকে চারদিকেই উঁচু পাহাড় খাড়া হয়ে আছে।

আর এসব গাছে লম্বা ডালপালা নেই যে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে, পথ চলার সুবিধার জন্য।

তবু সে উঠল। বেয়ে বেয়ে অনেক উঁচুতেই উঠল সে।

যা আশা করেনি তাই দেখতে পেল। বনের মাঝে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা, আর সেখানে চার পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দশ-বারোটা অতিকায় জন্তু।

গায়ে লম্বা সাদা লোম। ভালুক বলেই মনে হয় যেন। আফ্রিকার কোন কোন পাহাড়েও ভালুক দেখেছে টারজান, তবে তারা কালো। আর তাদের কলেবর এত বৃহৎ নয়।

এই দশ-বারোটা ভালুকের মত জীব মাটি খুঁড়ছে সমুখের পা দিয়ে। খুঁড়ে তুলছে কচুর মত ঐ গাছগুলি। তার শিকড় চিবিয়ে খাচ্ছে কচমচ করে।

শূকরে নয়, ভালুকে খায় তাহলে ঐ শিকড়।

তা ভালই হয়েছে। ভালুকে শিকড় খাক, টারজান ভালুক খাবে। কটিতে ঘাসের দড়ির ল্যাসো রয়েছে, গাছের উপর থেকে সেই দড়ি সুকৌশলে নিক্ষেপ করল টারজান।

ঘুরতে ঘুরতে দড়ি গিয়ে গলায় বাধল একটা জন্তুর। আর অমনি বিকট এক হু-হু-হু-হু চীৎকার করে সেই ভালুকটা লাফিয়ে উঠল মাটি থেকে। উঠল দুই পায়ে খাড়া হয়ে।

টারজান স্তম্ভিত। জন্তুগুলো ভালুক নয়। মানুষ। অর্থাৎ নাক মুখ হাত পা সব মানুষের মত, কিন্তু লম্বায় দশ-বারো হাত এক-একটা। আর লম্বা লোমে ডাকা তাদের বপুগুলি টারজানের মত পালোয়ানের দেহেরও চারগুণ মোটা।

সেই দশ-বারোটা লোমশ অপমানব খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে হু-হু-হু-হু রবে চীৎকার শুরু করল একসাথে, আকাশ ফাটিয়ে।

(৪)

এর জন্য প্রস্তুত ছিল না টারজান।

জন্তুজানোয়ার মেরে সে খেয়ে থাকে। তাও সব জন্তু নয়। যেমন, সে হাতী খায় না, সিংহ খায় না, খায় না সাপের মাংসও।

আর মানুষ? রাম কহো! নিজে মানুষের মাংস খাওয়া দূরে থাকুক, আফ্রিকার কালো জাতের সেই সব লোক, যারা নরমাংসভোজী, তাদের সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না এই কারণেই।

এখন, তিন দিন উপোসের পর, শিকারের গলায় ফাঁস পরাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখতে পেল যে শিকারটা অন্য-কোন জাতীয় জীব নয়, একান্তই মনুষ্যজাতীয়।

মানুষ ছাড়া এদের আর কিছুই বলতে পারে না টারজান। হোক দশ বা বারো হাত লম্বা, হোক মোটা নাদাপেটা হাতীর মতন, থাকুক সারা গায়ে ভালুকের মত লোম, এরা যে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, একথা টারজান হলফ নিয়ে বলতে রাজী।

আর জীবজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান টারজানের যত, অন্য কার ততটা আছে? সারাজীবন ধরে জন্তুর সমাজেই সে বসবাস করেছে, তাদের সঙ্গেই ওঠা-বসা, তাদের সঙ্গে কখনো ভাব করা, কখনো লড়াই করা, ক্ষিধে পেলে তাদেরই ধরে ধরে খাওয়া—জন্তুসমাজের বাইরে এক মুহূর্তের জন্য পা ফেলবার উপায় নেই তার।

সেই সারাজীবনের অভিজ্ঞতায় টারজান বুঝতে পারছে—ঐ হু-হু করে বিটকেল আওয়াজ করছে যে দশ-বারোটা নতুনতরো প্রাণী, তারা মানুষজাতীয় ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এ-অঞ্চলের জলবায়ুর হয়ত এমন কোন গুণ বা দোষ আছে, যাতে মানুষ অমনিই লম্বা-চওড়া হয়ে যায়। আর লোম? শীতের দেশে সৃষ্টির শুরু থেকে যারা বাস করছে, তাদের গায়ে লোম গজাবে, এতে আর অবাক্ হবার কী আছে?

যে কারণে ভালুকের গায়ে লোম গজায়, এদেরও গজিয়েছে সেই কারণেই। লোমের জন্য এরা হেয় হতে পারে, কিন্তু তার জন্য এদের মানুষ-পদ-বাচ্য হওয়া আটকাতে পারে না।

তা হোক ওরা মানুষ, তাতে অন্য অবস্থায় এতটুকু আপত্তি হত না টারজানের। বর্তমান ক্ষেত্রে মুশকিল হয়েছে—টারজান তাহলে খায় কী? মানুষের মাংস খাওয়ার কথা ত ভাবতেও পারে না সে।

অবশ্য ভাবতে পারলেই যে খেতে পারবে, এমন কথা নেই। ঐ বিরাট বিরাট জীব—ওদের ধরে এনে মেরে খাওয়া অত সোজা ব্যাপার নয়। ওদের হু-হু-হু-হু ক্রুদ্ধ গর্জন আকাশ ফাটিয়ে ফেলছে যেভাবে, তাতে টারজান যদি টারজান না হয়ে অন্য কেউ হত, এতক্ষণ ভিরমি খেতো ভয়ে।

একটা জীবের গলায় দড়ির ফাঁস লেগে রয়েছে তখনও। এটা দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে ফাঁস লাগানো যতটা সোজা, ফাঁস খোলা ততটা নয়, টারজানের পক্ষে।

ফাঁসের পাশে যে ধরা পড়েছে, তাকে কাছে টেনে এনে হাত দিয়ে খুলে না নিলে, সে ঘাসের দড়ির গেরো খুলবার অন্য কোনও উপায় নেই।

আর ঐ বিরাট জীবটাকে টেনে আনা—সে ত অসাধ্য ব্যাপার।

টারজান নিজে যাবে ওর কাছে, সেও অসম্ভব। গেলেই ঐ বারোটা নরদানব একসাথে জাপটে ধরবে টারজানকে। ওরা যে রেগে আগুন হয়ে আছে, তা ত ওদের হু-হু গর্জনেই প্রকাশ।

একটা জীব হলে টারজান মুখোমুখি এগিয়ে যেতে ভয় পেত না, কারণ ওরা কলেবরে টারজানের দেড়গুণ হলেও, এক বিষয়ে ওরা দুর্বল। হাতে ওদের অস্ত্র নেই, টারজানের আছে ছোরা।

আর ঐ ছোরার কল্যাণে শৈশব হতে কত দুশমনকে যে টারজান ঘায়েল করেছে, তার ত ইয়ত্তা নেই। সিংহ, গরিলা, ন্যুহিস্‌টা, ন্যুন্দুর—না কী?

কিন্তু ছোরা দিয়ে একজনকেই বাগানো যায়, ততক্ষণে বাকিগুলো টারজানকে পিষে ফেলবে না?

এক একটা গরিলার চেয়েও ওরা প্রত্যেকে দ্বিগুণ শক্তি ধরে, তা ওদের বপু আর পেশী দেখলেই ত বোঝা যায়!

দড়িগাছটার আশা কি ত্যাগই করতে হবে শেষে? দুটি মাত্র অস্ত্র টারজানের সঙ্গে, দড়ি আর ছোরা। তার মধ্যে দড়ি যদি যায়, টারজানের একখানা হাত খসে যাওয়ার সামিল সে-ক্ষতি।

এ-অঞ্চলে কোথায় আফ্রিকার লম্বা ঘাস, যা দিয়ে ঐরকম আর একগাছা দড়ি সে বুনবে?

টারজানের ক্ষিধে-তেষ্টা মাথায় উঠেছে, দড়ির উদ্ধার কীভাবে হয়, সেই চিন্তাই ওর একমাত্র চিন্তা এখন।

সে চিন্তার সমাধান করে দিল ঐ জীবেরাই। ওদের একটা এসে দাঁত দিয়ে কাটতে লাগল ফাঁসের দড়ি। গেরো খোলার একমাত্র উপায়ই ওরা জানে—কেটে দেওয়া। আর, কাটবার একমাত্র হাতিয়ার দাঁতই ওদের!

টারজান স্তম্ভিত সে দাঁত দেখে। আফ্রিকার কালো জাতদের বর্শা সে দেখেছে, হাতে নিয়ে নাড়াচাড়াও করেছে কখনো-কখনো। সেই বর্শারই এক একটা ফলা যেন এক একটা দাঁত।

তেমনি গোড়ার দিকে চওড়া, আগার দিকে সূচালো, প্রায় সেই ফলার মতনই লম্বা এক একটা দাঁত।

হাতী যে দড়ি সহজে ছিঁড়তে পারে না, দেখতে দেখতে কুর কুর করে সেই জীবটা কেটে ফেলল তা। টারজান অপেক্ষায় ছিল, কেটে দুখানা হওয়ামাত্র সে নিজের হাতের অংশটা টেনে নিয়ে এল নিজের কাছে।

প্রায় সবটাই উদ্ধার হয়েছে, হাত তিনেক একটা টুকরো ছাড়া। কিন্তু সর্বনাশও ঘনিয়ে এসেছে সেই সঙ্গে।

এতক্ষণ আততায়ীর সন্ধান করেনি ঐ জীবেরা। এবার দড়িটার গতিপথ লক্ষ্য করতে গিয়েই তারা গাছের মাথায় দেখতে পেল টারজানকে।

এক মুহূর্ত তারা বিস্ময়ে নিস্তব্ধ। তারপর নীচু গলায় কী সব কথাবার্তা চলল তাদের, সে এক দুর্বোধ্য ভাষা। চিতাবাঘের গলা থেকে বিশ্রামের মুহূর্তে একরকম ঘড়ঘড় আওয়াজ সে শুনেছে অনেক সময়। এ যেন সেই ঘড়ঘড়ির আওয়াজ।

ওর অর্থ বুঝবে, সে সাধ্য নেই টারজানের।

হঠাৎ ঐ জীবগুলোর একটা মুখ তুলে উপরপানে চাইল। টারজানের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ক্রুদ্ধস্বরেই যেন কী প্রশ্ন করল। দুর্বোধ্য ভাষায় সেই শব্দটা টারজানের কানে যেন শোনালো—"ইয়েটি"।

ও যেন টারজানকে জিজ্ঞাসা করছে—"ইয়েটি?"

টারজান কী বলবে? যে-প্রশ্নের মানে বোঝা যাচ্ছে না, তার উত্তর কী দেবে?

কিন্তু উত্তর না দিলেও ওরা সেটা খারাপভাবে নিতে পারে। কিছু কিঞ্চিৎ জ্ঞানবুদ্ধি ওদের মগজে থাকলে, তাই দিয়ে ওরা টারজানের নীরবতাকে অসৌজন্য বলে ধরে নিতে পারে!

তা যদি হয়, তবে তাতে ব্যাপার আরো ঘোরালো হবে।

ওরা টারজানের দিকে তাকিয়ে আছে বারো জোড়া ডাগর ডাগর চক্ষু মেলে। সে-চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, হিংস্র। আফ্রিকার বুনো মোষ একবার তেড়ে এসেছিল টারজানকে, সেই মুহূর্তে এইরকম দৃষ্টি টারজান তার চোখে দেখেছিল।

তারা তাকিয়ে রয়েছে। শুধু উত্তরের প্রতীক্ষায় নয়, চক্ষু বিস্ফারিত করে টারজানের আকার-অবয়ব লক্ষ্য করছে।

লক্ষ্য করে করে ওদের মাথায় শেষ পর্যন্ত হয়ত সিদ্ধান্ত এলো একটা। ওরা সমস্বরে হেঁকে উঠল আগের সেই একটি শব্দই। ইয়েটি! একবার নয়, বার বার তারা গর্জে উঠতে লাগল ঐ কথা বলে—"ইয়েটি! ইয়েটি!"

টারজানের দিকে আঙ্গুল দেখায়, আর পরস্পরকে সহাস্যে বলে 'ইয়েটি'। তারপর গোদা গোদা হাত তুলে টারজানকে হাতছানি দেয় আর ডাকে—ইয়েটি! ইয়েটি!

টারজান ভাবছে। অবয়বের দিক দিয়ে টারজানের সঙ্গে এই বারোটা জীবের তফাত মাত্র দুটি। এক, ওদের গায়ে লম্বা লোম রয়েছে, টারজানের নেই। দুই, ওরা দশ-বারো হাত লম্বা, টারজান মাত্র সাড়ে চার হাত।

তাছাড়া আর তফাত কিছুমাত্র নেই। ওরা লক্ষ্য করেছে সেই সাদৃশ্য। অবশ্য সাদৃশ্যটা এত স্পষ্ট যে তা লক্ষ্য করতে কিছুমাত্র বিচারবুদ্ধি দরকার হয় না।

যাই হোক, সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ওরা জিজ্ঞাসা করেছে—"তুমিও কি ইয়েটি?"

টারজানের অনুমান যদি সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, ঐ জীবগুলো নিজেদেরও ইয়েটি নামে অভিহিত করে থাকে।

তাই তারা ইয়েটি ইয়েটি করে চীৎকার করছে এখন, পারস্পরিক পরিচয়ের প্রয়োজনেও বটে, টারজানকে আশ্বাস দেওয়ার এবং কাছে আসবার নিমন্ত্রণ জানাবার জন্যও বটে।

টারজান এখন কী করে? ওদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করবে? করে গাছের মাথায় বসে থাকবে? নামবার ত উপায় নেই, নামলেই ওদের হাতে পড়া অনিবার্য। এবং ওরা যদি রেগে থাকে, হাতে পেলে কী না করতে পারে ওরা?

হায়, আফ্রিকার অরণ্য! সেখানে হলে বৃক্ষারূঢ় টারজানকে ধরা কি এই জবড়জঙ্গ না-মানুষ না-গরিলাদের সম্ভব হত? গাছের মগডালে মগডালে এতক্ষণ সে কোথায় চলে যেত।

এ ছাই পাহাড়ে গাছ যদি বা আছে, তার ডালগুলো এতটুকু এতটুকু। রাজপথের মত চলাচলের জন্য তা যে কেউ ব্যবহার করবে, তার উপায় নেই।

কী করা যাবে? টারজান মনস্থ করল নেমেই পড়বে। এর চেয়েও মারাত্মক জীবজন্তুর সান্নিধ্যে ত সে আগেও এসেছে শতবার! বেঁচেই ত ফিরেছে! এবারে যদি মরণ ঘনিয়ে এসে থাকে ত আসুক।

কিন্তু কেমন করেই বা মরণ আসবে? সে না চীরজীবন-দায়িনী আগুনতরঙ্গিণীতে স্নান করে অমর হয়েছে?

মনে পড়তেই অকুতোভয় টারজান গাছ থেকে নেমে পড়ে ইয়েটিদের সম্মুখীন হল।

অমনি সেই বারোটা ইয়েটি এসে ঘিরে ধরল তাকে। কেউ তার কাঁধে চাপড় মারে, কেউ তাকে টেনে বুকের কাছে আনতে চায়। ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হয় তারা টারজানকে নিজেদের জাতেরই কোন বালক বলে ধরে নিয়েছে। বালক, নইলে মাথায় মাত্র সাড়ে চার হাত হবে কেন? বারো হাত না হয়ে?

আর, গায়ে লোমের অভাব? সেটাই ওদের খানিকটা মাথাব্যথার কারণ হয়েছে, তা বোঝা যায়। তবে, ওরা অনেক জিনিসই বোঝে না, আর বোঝে না বলে আপসোসও করে না। বুনোদের স্বভাবই হল যা পেয়েছে তাইতে তুষ্ট থাকা।

ধরাছোঁয়ার বাইরেকার জিনিস ধরবার বা আয়ত্তে আনবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ওরা করে না। করলে ত ওরা সভ্যই হয়ে যেত!

আদর-আপ্যায়নের পালা চলতে চলতেই ওরা টারজানকে নিয়ে চলতে শুরু করেছে। অর্থাৎ ওদের চলার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের চাপে পড়ে চলতে হচ্ছে টারজানকেও।

বনের সীমানা যেদিকে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে মিশেছে, সেইদিকে ওরা এগিয়ে চলেছে টারজানকে নিয়ে। একটা চিন্তা টারজানের মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠতেই ও অস্থির হয়ে উঠল। এই ইয়েটিরা কি তাকে বন্দী করে রাখবে?

সে না গজমতী রানীর আহ্বান পেয়ে তাকেই খুঁজতে এসেছে? গজমতীরই জাদুদণ্ড না এখনও তার বুকের ভিতর লেগে রয়েছে?

জাদুদণ্ডের কথা মনে পড়তেই সে স্বস্তিবোধ করল। সাধ্য কি এই ইয়েটিদের যে তাকে বন্দী করে রাখবে? মন্ত্র উচ্চারণ করে আদেশ করলে এক্ষুণি আবার ঝড় তুলবে এই জাদুদণ্ড, উড়িয়ে নিয়ে যাবে টারজানকে এই নরপশুদের নাগালের বাইরে।

অথবা টারজান সেরকম আদেশ যদি করে, সে-ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে এই ইয়েটিগুলোকেই। ঐ অবস্থায়ও টারজানের হাসি পেতে লাগল একটা কথা ভেবে। ঘূর্ণিঝড় যদি এই ইয়েটিদের ঝাড়েবংশে উড়িয়ে নিয়ে মধ্য-আফ্রিকার মহারণ্যে ফেলে, ওদের দশা হবে কী?

ঐ লম্বা লম্বা লোম নিয়ে সেখানকার আগুনতাতা আবহাওয়ায় জ্বলে মরবে যে ওরা!

কিন্তু চিন্তায় ছেদ পড়ল এইবার। বন এসে পাহাড়ের গায়ে ঠেকেছে। সানুদেশও ঘন বনে ঢাকা। ঐ একইরকম লম্বা লম্বা গাছ, ডালপালা কম এবং খাটো খাটো।

সানুদেশে এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে একটা চওড়া ফাটল। তারই মধ্যে দিয়ে এক একটা করে ইয়েটি ভিতরে ঢুকে পড়ছে। জনা তিনেক ঢুকবার পরে টারজানকে ঠেলে এগিয়ে দিল পশ্চাদ্বর্তী ইয়েটিরা।

চিরদিনই কৌতূহল বেশী টারজানের। পৃথিবীটা নানা রহস্যে ভরা। মানুষের কর্তব্য, দায়িত্ব এবং আনন্দ হচ্ছে সেই সব রহস্যের উদ্ঘাটন করা। টারজান সাধ্যমত সে কাজ করে এসেছে প্রতি ক্ষেত্রে।

এই গুহার ভিতরকার রহস্য তাকে জানতে হবে। সে কোন আপত্তি না করেই প্রবেশ করল সেই অজানা জন্তুদের বাসস্থানে।

একটা পূর্ণবয়স্ক ইয়েটি কোনমতে প্রবেশ করতে পারে, এইরকম চওড়া সে ফাটল। সেইরকমই সংকীর্ণ সুড়ঙ্গপথ দিয়ে বেশ খানিক দূর যেতে হল। তারপর হঠাৎই একটা প্রশস্ত গুহায় প্রবেশ করল ওরা।

গুহাটা প্রশস্ত বললে কিছুই বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ওটা অতিবিশাল। আফ্রিকার কালো মানুষদের একটা গোটা গ্রাম ঐ গুহার ভিতর ঢুকিয়ে রাখা যায়।

গুহার ভিতরে আরও অনেক ইয়েটি রয়েছে। তারা গলার ভিতর সেই ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে এসে ঘিরে ধরল টারজানকে। কয়েকটা বাচ্চা ইয়েটি এসে পাশে দাঁড়াতেই টারজান আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল—গায়ের লোম যদিও তাদের বয়স্কদের মতই বড় বড়, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে তাদের চেহারা ঠিক সাধারণ মানুষের মত, উচ্চতাও টারজানের সমানই তাদের।

একটা শিকড় খাচ্ছিল কামড়ে কামড়ে।

এদের একজন একটা শিকড় খাচ্ছিল কামড়ে কামড়ে। সে বন্ধুত্ব করবার জন্য তার অর্ধেকটা ভেঙে টারজানের হাতে দিল। খাদ্য দেখে টারজানের যে-ক্ষুধা বিলকুল ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে আবার সহসা জেগে উঠে খোঁচাতে লাগল টারজানের পেটের ভিতর।

কিন্তু খাওয়া কি উচিত হবে? এ ত সেই শিকড়, যা নিজে মাটি থেকে তুলে একবার সে খেতে গিয়েছিল বনের ভিতর, আর সঙ্গে সঙ্গে জাদুদণ্ড তার হাতের উপর আঘাত করে তা ওকে ফেলে দিতে বাধ্য করেছিল।

না, এ-শিকড় ও খেতে পারে না। টারজান মাথা নেড়ে হাত গুটিয়ে নিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে গুহার ভিতরকার পঞ্চাশটা ইয়েটি হু-হু-হু-হু করে গর্জন করে উঠল। খাবার প্রত্যাখ্যান করে টারজান তাদের অপমান করেছে। তারা সেই বর্শার ফলার মত দাঁত খিঁচিয়ে এমনভাবে এগিয়ে এল, যেন টারজানকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে এক্ষুণি। টারজান কোনরকমে ছুটে বেরুলো তাদের ভিড়ের ভিতর থেকে। কিন্তু বরাত তার মন্দ, ছুটে যেদিকে বেরুলো, সেটা গুহার পিছন দিক্, দরজা সেখান থেকে উলটো দিকে।

সব-পিছনে একটা পাথরের বেদি দেখা যায়। টারজান

সেইটি লক্ষ্য করেই দৌড়োলো।

ইয়েটিরা তা দেখে সমবেত কণ্ঠে গর্জে উঠল। তারাও ছুটে আসছে। টারজান উঠে পড়ল বেদির উপরে। সেখানে—

জীর্ণশীর্ণ কুঁকড়ে-যাওয়া এক তেরকেলে বুড়ী বসে আছে। ইয়েটি? না, ইয়েটি নয়। এর গায়ে লোম নেই। উপরন্তু, এ মুখ চেনা। একবার মাত্র দেখা, বহুদিন আগে, অল্পকালের জন্য। তবু—

তবু চেনা, বড়-বেশী চেনা। টারজান চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে নৈরাশ্যে বিস্ময়ে আশঙ্কায়—"রানী! রানী! তুমি এখানে!"

(৫)

আনন্দ—কারণ গজমতীর দেখা পেয়েছে টারজান।

নৈরাশ্য—কারণ গজমতীর এবারকার আবির্ভাব ঘটেছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর মূর্তিতে নয়, বিশুষ্ক বিশীর্ণ মর্কটের আকারে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে গজমতীর যে-আকৃতি সে দেখেছিল, পাঁচ হাজার বছর বয়সের পেষণে জরাগ্রস্ত, সেই কদর্য আকৃতি নিয়েই সে ফিরেছে পৃথিবীতে।

এ মর্মান্তিক নৈরাশ্যের জ্বালা টারজান হঠাৎ সইতে পারল না। জীবনে দুই-একবার কাফরীরা তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার উপক্রমও করেছিল, আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলেও উঠেছিল তার অঙ্গ ঘিরে, কিন্তু সে-রকম সময়েও কোনদিন জ্ঞান হারায়নি টারজান, কিন্তু আজ তা হারাল।

সেই বিশীর্ণা অতিবৃদ্ধার পায়ের তলায় যখন জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ল টারজান, সেই বৃদ্ধা করুণ নেত্রে একবার চাইল তার পানে।

তারপর সে দৃষ্টি ফেরাল ইয়েটিদের দিকে। ইয়েটিরা তখন আর খাড়া দাঁড়িয়ে নেই। মাটিতে শুয়ে পড়েছে মুখ ঢেকে। বুড়ী আয়বাঙ্গির চোখের দিকে চোখ রেখে দাঁড়াবার সাহস অতি-বড় দুর্ধর্ষ ইয়েটিরও নেই।

তারা জানে এই আয়বাঙ্গিই সারা পৃথিবী সৃষ্টি করেছে, জন্ম দিয়েছে ইয়েটিদেরও, মাটির বুকে কচুর শিকড় লুকিয়ে রেখেছে তাদের খাওয়ার জন্য, এই আয়বাঙ্গিই।

আবার এই আয়বাঙ্গিই এক এক সময় রেগে ওঠে অকারণে। তখন ঘূর্ণিঝড়ে বড় বড় শাল দেওদার মাটির বাঁধন ছিঁড়ে আকাশে উড়ে যায়, ভেঙে পড়ে পাহাড়ের চূড়া, বরফের তলায় চাপা পড়ে ইয়েটিরা ঝাড়েবংশে মারা পড়ে।

আয়বাঙ্গি চিরদিন এমনি বুড়ী, হাজার হাজার বছর ধরে এই বুড়ী তাদের কখনো পালন, কখনো পেষণ করছে। সাধারণতঃ সে এক টুকরো পাথর ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু কদাচিৎ কখনো, ভয়ানক কিছু অন্যায় যখন ইয়েটিরা করে বসে, তখন ওই পাথর-বুড়ী জেগে উঠে ভ্রূকুটি করে তাকায়। আর ইয়েটিরা কেউ মরে বরফে জমে, কেউ মরে পাহাড়ের ধ্বসের তলায় চাপা পড়ে, আর অন্যেরা মরে কচুর শিকড় খুঁজে না পেয়ে।

সেই আয়বাঙ্গি আজ জেগেছে। ক্রুদ্ধনেত্রে তাকিয়েছে ইয়েটিদের দিকে। আর তাদের কে রক্ষা করে? মরবে, নিপাত যাবে যেখানে যত আছে ইয়েটি, আয়বাঙ্গির সন্তান।

টারজান ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পাচ্ছে। একটা অব্যক্ত হাহাকার যেন তার বুকটা জুড়ে আথালপাথাল করছে, একটা দুর্নিবার ক্রন্দন যেন তার হৃদয় মথিত করে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কিন্তু হাহাকারকে বুকের ভিতর চেপে, ক্রন্দনকে চোখের ভিতর ফেরত পাঠিয়ে টারজান উঠে বসল। বসে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধারূপিণী গজমতীর দিকে।

কিন্তু, বৃদ্ধা হোক, নবীনা হোক, এ-গজমতী কি জ্যান্ত? না, তা ত মনে হয় না। একে যে একান্তই পাথরের মূর্তি বলে মনে হয়! টারজান মূর্তির হাত ধরল, টিপে টিপে দেখতে লাগল রক্তমাংসের উষ্ণতা কোমলতা তার ভিতর আছে কি না।

ইয়েটিদের কণ্ঠ থেকে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ এলো—'আয়বাঙ্গি!' কত যে ভয়, কত যে কাকুতি, আর তার সঙ্গে কতখানি যে নির্ভর জড়িয়ে আছে সে-সম্ভাষণে, তা ইয়েটিভাষা না জেনেও টারজান বুঝতে পারল অনায়াসে।

টারজান টিপে টিপে দেখেছে আয়বাঙ্গির সর্ব অবয়ব। পাথর! পাথর! জ্যান্ত মানুষ এ নয়।

অথচ এই পাথরের আহ্বানেই সুদূর আফ্রিকা থেকে ঘূর্ণিঝড়ে সওয়ার হয়ে টারজানকে আসতে হয়েছে, এই পাথরের পাথুরে চোখের দৃষ্টিতে অসন্তোষের ঝলক দেখে পঞ্চাশটা বারো-হাত-লম্বা ইয়েটিদানব মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এখনো খাবি খাচ্ছে—

এ কী প্রহেলিকা!

বুকটা ব্যথায় গুমরে ওঠে ঘনঘন। টারজান হাত দিয়ে চেপে ধরে বুক। আর তক্ষুণি চমকে ওঠে। জাদুদণ্ড কোথায় গেল? জাদুদণ্ড? নেই, বুকের ভিতর লুকোনো ছিল যে পরম নিধি, তা আর নেই। অজ্ঞান হয়ে যখন সে গড়িয়ে পড়েছিল এই পাথরের পায়ের তলায়, তখন এই পাথরই

সে-জাদুদণ্ড আত্মসাৎ করেছে।

অন্য কে নিতে পারে? আয়বাঙ্গির ঠিক পায়ের তলায় এসে এ অপকর্ম করবার সাহস কোন ইয়েটির হতে পারে না। আর ইয়েটিরা চুরি করবে, এটা অবিশ্বাস্য।

জন্তুজানোয়ারে হত্যা করে, চুরি করে না কখনও। আর মানুষের আকারবিশিষ্ট হলে কী হবে, ইয়েটিরা ত জন্তু ছাড়া কিছু নয়!

তাহলে? তাহলে আয়বাঙ্গি নিজেই নিয়েছে।

নিয়ে থাকলে তাতে আপসোস কী? ও ত ওরই জিনিস! যতক্ষণ ওর সাহায্য টারজানের দরকার ছিল, ততক্ষণ টারজানের কাছে ওটা রেখেছিল আয়বাঙ্গি। এখন যখন সে ফেরত নিয়েছে, তখন বুঝতে হবে ওর আবশ্যক আপাততঃ ফুরিয়েছে টারজানের কাছে।

হাঁ, এতদিন দরকার ছিল বইকি! মর্মান্তিক দরকারই ছিল। ঐ জাদুদণ্ড না হলে আরিমানের মায়াজাল কাটিয়ে সে প্রাণে বাঁচতে পারত না। ঐ জাদুদণ্ড না থাকলে সে আফ্রিকার অরণ্য থেকে হিমালয়ের দুর্গম গুহায় ইয়েটিরাজ্যে পৌঁছোতে পারত না।

ঐ জাদুদণ্ড না থাকলে হয়ত ও ইয়েটির খাদ্য কচুর শিকড় খেয়ে এতক্ষণ ইয়েটি বনে যেত। আকারে না হোক, অন্ততঃ জ্ঞানবুদ্ধির দিক দিয়ে। অন্ততঃ কচুর শিকড় সম্বন্ধে জাদুদণ্ডের নিষেধের অন্য কোন অর্থ টারজান এখনো করে উঠতে পারেনি।

টারজান যায়নি। ইয়েটি গুহাতেই রয়ে গিয়েছে। ইয়েটিরা তাকে সমীহ করে চলে এখন। তারা অন্য কিছু বুঝুক বা না বুঝুক, এটা তাদের ঐ নিরেট মগজে ঢুকেছে যে আয়বাঙ্গির বিশেষ অনুগৃহীত জীব এই ক্ষুদে ইয়েটিটা।

নইলে আয়বাঙ্গির পাথরের বেদির উপর পা তুলে দিয়েও কেউ বেঁচে থাকে নাকি আবার? আয়বাঙ্গির গা ও টিপে টিপে দেখেছে, ইয়েটিদের চোখের সামনে। কোন ইয়েটি যে অতখানি স্পর্ধা করেও আকাশ থেকে ঠিকরে পড়া আগুনের ঝিলিকে পুড়ে না মরে, তা বাহান্ন পুরুষের ভিতর শোনেনি ইয়েটিরা।

হাঁ, দস্তুরমত সমীহ করে ওরা টারজানকে। টারজান নিজের খেয়াল-খুশিমত ঘোরে-ফেরে, যখন ইচ্ছা গুহা থেকে বেরিয়ে যায়, যখন ইচ্ছা গুহায় ফিরে আসে, তারা ব্যস্ত হয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়ায়।

গুহাতেই রাত্রি যাপন করে টারজান, কারণ বাইরে দুঃসহ শীত ত বটেই, তাছাড়া বাইরে আয়বাঙ্গি নেই। হোক আয়বাঙ্গি এই মুহূর্তে শুধু একটা পাথরের মূর্তি মাত্র তবু রাজমতীরই শেষ জীবিত মুহূর্তের মূর্তি ওটি। কদর্য হলেও তার প্রিয়।

বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায় টারজান, ইয়েটি উপত্যকা থেকে দূরে দূরে।

খাদ্যজীব অমিল নয় সে সব জায়গায়। প্রায় এক প্রহরের পথ পাহাড় বেয়ে নেমে গেলে একটা মালভূমি পাওয়া যায়, তাতে ছোট ছোট কালো কালো হরিণ চরে দল বেঁধে।

ঘাসের দড়ি দিয়ে সেই হরিণ সে রোজ একটা করে ধরে আর খায়। সে মাংস ইয়েটি গুহায় আনে না। কারণ ওরা যে নিরামিষাশী, সেটা আন্দাজ করেছে টারজান। ওদের বাসস্থানে মাংসের আমদানি করতে গেলে কী অঘটন ঘটে বসবে আবার, কে বলতে পারে।

মালভূমিটাতে রোজ একবার যেতেই হয় খাদ্যের প্রয়োজনে। যেতে এক প্রহর, আসতে এক প্রহর। আরও দুই প্রহর সময় হাতে থাকে টারজানের। কারণ সন্ধ্যা না হলে সে ইয়েটি গুহার বদ্ধ দুর্গন্ধ আবহাওয়ায় প্রবেশ করে না।

অন্তরেও অশেষ উদ্বেগ, হাতেও অফুরন্ত সময়। মালভূমিটার চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখে টারজান।

উপরদিকটা সমতল বটে, কিন্তু উচ্চতায় আশপাশের পর্বতমালার চাইতে খাটো নয়। এই মুহূর্তে এখানে বরফ জমে নেই বটে, কিন্তু সে শুধু এই কারণে যে ভারতীয় ঋতুর হিসাবে এখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। আর একটা মাস বাদেই নতুন বছরের নতুন বরফ পড়তে শুরু হবে, আর যেটা পড়বে সেটা জমতেই থাকবে।

বরফ নেই, কিন্তু হাওয়া যেটা বয়ে যায় মালভূমির উত্তর থেকে দক্ষিণে, সেটা বরফের মতই কনকনে ঠাণ্ডা। ন্যান্দুরের চামড়াটা শুকিয়ে শক্ত হয়েছে, সেটাকে পাথর দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে যথাসম্ভব মোলায়েম করে গায়ে চড়ায় টারজান, ইয়েটি গুহা থেকে বেরিয়ে এদিকপানে আসবার সময়।

সেই চামড়া গায়ে দিয়ে একদিন টারজান উত্তরমুখে হাঁটতে শুরু করল। ওদিকের প্রান্তসীমা সে দেখে আসবে। দক্ষিণে ইয়েটি উপত্যকা, তা সে জানে। আজ উত্তর দিকটা দেখে আসবে, কাল পুব, তারপর পশ্চিম।

হাঁটছে ত হাঁটছেই। এরকম খোলা জায়গায় হাঁটতে অভ্যস্ত নয় টারজান। গাছের মাথায় মাথায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলতেই সে ভালবাসে ও ভাল পারে। তাতে সে আরাম

পায়, গতিও হয় তার দ্রুত।

এ-মালভূমিতে দেওদার পাইন সেডারের অভাব নেই। ওক গাছ চোখে পড়ে এক-আধটা। হায়, যদি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুধু ওকই জন্মাত এখানে! তাহলে পায়ে হাঁটার ঝকমারি থেকে রেহাই পেত টারজান।

এক জায়গায় একটা ওক দাঁড়িয়ে আছে অমনি। বিরাট গাছ, সন্দেহ নেই। তার গুঁড়িটার বেড় পঞ্চাশ হাতেরও বেশী হবে। কত যে ডাল, কত দূরে দূরে যে ছড়িয়ে আছে, হিসাব করে শেষ করা যায় না। টারজান দূর থেকে মুগ্ধ হয়ে গাছটা দেখতে লাগল।

আফ্রিকার অরণ্যের শ্রেষ্ঠ বনস্পতিদের সমানই এটা পরিধি আর উচ্চতায়। কিন্তু নিছক একা। চারিধারে, যতদূর নজর চলে, আর নেই ওক গাছ। অন্য কোন গাছও নেই এই রকম ডালপালাওয়ালা।

টারজান মালভূমির শেষ পর্যন্ত যাবে মনস্থ করে বেরিয়েছে, কিন্তু এই গাছটাতে একবার চড়ে দেখবার জন্য তার মন আনচান করতে লাগল। এর চারতলার ডালে ডালে খানিকটা লাফঝাঁপ করে এলে হাত-পাগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠবে খানিকটা। ওগুলো ত আড়ষ্ট মেরে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে টারজান অতবড় গাছটার মাঝামাঝি চড়ে বসেছে। নীচে থেকেই তাক করেছিল তেতলার একটা প্রশস্ত তেডালার উপর। সেটা প্রায় নাগালের ভিতর এসে পড়েছে। ঐখানে উঠে একবার আরাম করে বসবে টারজান, চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, আগে যেমন সে দেখত তার আফ্রিকার অরণ্যরাজ্যে।

তেডালার উপর মাথা তুলেছে টারজান। বসবার জন্য তৈরী হচ্ছে, হাত-পা ছড়িয়ে।

হঠাৎ দেখে—তেডালাটা ত শূন্য নয়!

একটা মানুষ সেখানে বসে আছে। বসে আছে ঠিক সেই ভঙ্গী নিয়ে, শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বার আগে চিতাবাঘ যে ভঙ্গী নেয়। টারজানকে দেখেই যে তার এই রণং দেহি ভাব, তা বুঝতে এতটুকু দেরি হল না টারজানের।

লোকটার রং হলুদ, নাক থ্যাবড়া, চোয়াল উঁচু। ক্ষুদে ক্ষুদে গোল গোল চোখে হিংস্র দৃষ্টি। হাতে বাঁকা ছোরা বাগিয়ে টারজানের উপর সে লাফিয়ে পড়ে আর কি!

টারজান বিদ্যুৎবেগে তার ছোরাসমেত হাতখানা চেপে ধরল। সে বজ্রহস্তের পেষণে হলদে মানুষটা যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল একটা অদ্ভুত নাম উচ্চারণ করে—

সে নাম হল—'আয়বাঙ্গি'।

সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন অতি নিকটেই একটা খটাখট শব্দ, আর দেখতে দেখতে প্রথম মানুষটার পিছনে দ্বিতীয় একটা মানুষ দেখা দিল। হুবহু একই রকম আকৃতি, মুখ-চোখে একই রকম হিংস্রতা, বাড়তির ভাগ এর হাতে একখানা খাটো বর্শা।

সে এসেই সেই বর্শা তাক করল টারজানের দিকে।

হলুদ মানুষ দুটো রয়েছে তেডালার উপরে, টারজান তখনও তেডালার নীচে। সে হিসাবে খানিকটা অসুবিধার মধ্যে রয়েছে টারজান।

কী জানি একটা লড়াই-ই যদি লড়তে হয় এই ওক গাছের মাথায় বসে তাহলে সর্বপ্রথমে তো দরকার এই অবস্থানগত অসুবিধাটা দূর করা। টারজান সেই দিকেই তৎপর হল।

বাঁ হাত দিয়ে তেডালার নীচের একটা সরু ডাল সে আঁকড়ে ধরেছে, ডান হাত দিয়ে ধরা রয়েছে প্রথম দুশমনের ছোরাসমেত হাত। হঠাৎ সেই হাতখানা ছেড়ে দিল টারজান।

ছেড়ে দিল, কিন্তু সে শুধু হাতের বদলে কাঁধটা ধরবার জন্য। ধরেও ফেলল মানুষটা কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই।

আর ধরেই ক্ষান্ত রইল না। কাঁধ ধরে এক হাতেই মানুষটাকে শূন্যে উঁচু করে তুলল। আবার তুলেও ক্ষান্ত রইল না, মানুষটাকে ছুঁড়ে মারল পিছনের দুই নম্বর দুশমনের গায়ের উপর।

দুই নম্বর দুশমন শেষ মুহূর্তে বর্শা ছুড়েছে টারজানকে লক্ষ্য করে। বলা বাহুল্য টারজান পর্যন্ত সে-বর্শা পৌঁছালো না। বিঁধে গেল এক নম্বর দুশমনের পিঠে।

আর তখুনি বর্শাবিদ্ধ এক নম্বর গিয়ে দড়াম্ করে পড়ল দুই নম্বরের ঘাড়ে। ফলে তেডালার আশ্রয় থেকে ঠিকরে পড়ল ওরা দুই দোস্ত ঘুরপাক খেতে খেতে, চীৎকার করতে করতে, ওক গাছের একেবারে তলায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। লোক দুটো হয়ত মরে গিয়েছে, নয়ত বা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। টারজান তেডালায় উঠে আরাম করে বসে পর্যবেক্ষণ করছে। পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে এখানে।

ঐ দুই নম্বর লোকটা হঠাৎ কোথা থেকে এসে আবির্ভূত হয়েছিল? আবির্ভাবের ঠিক আগে খটাখট শব্দ একটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটাই বা কী?

খুঁজে বার করতে কষ্ট হল না কিছু। প্রশস্ত তেডালার ভিতরটা একটা ত্রিভুজের মত। তার কোন বাহুই দশ হাতের কম লম্বা নয়। এই প্রশস্ত ত্রিভুজের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফোকর। তার মুখ খোলাই আছে, যদিও মুখ বন্ধ

করার কবাট পড়ে আছে পাশেই।

ঐ ফোকর দিয়ে গাছের ভিতর থেকে উদয় হয়েছিল দুই নম্বর দুশমনের, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

টারজান এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। ফোকরের ভিতর কাঠের সিঁড়ি একটা। গাছের গা কেটে কেটেই সিঁড়ির ধাপগুলি তৈরী। এ ত ওস্তাদ মিস্ত্রীর কাজ, দেখা যাচ্ছে।

সোনাপাহাড়ের রাজবাড়িতে ঢের দিন অতিথি ছিল টারজান, কাজেই মিস্ত্রীদের কারিগরি তার অপরিচিত নয়।

সিঁড়ি রয়েছে, সিঁড়ি বেয়ে লোক উঠেছে, সুতরাং ভিতরে একটা ছোটখাটো লোকবসতি থাকা খুবই সম্ভব। টারজান কি তা না দেখে ফিরে যাবে?

না, কদাপি না। কৌতূহল তো রয়েছেই, একটা বিশেষ কারণও ঘটছে এই বৃক্ষকোটরের রহস্যটি উদ্ঘাটন করবার।

যখন প্রথম দুশমনের ছোরাসমেত হাত চেপে ধরেছিল টারজান, লোকটা চেঁচিয়ে উঠেছিল। কী বলে চেঁচিয়েছিল? আয়বাঙ্গির নাম উচ্চারণ করে।

এখন এক আয়বাঙ্গিকে সে দেখেছে ইয়েটি গুহায়। এখনও সেই আয়বাঙ্গির পাষাণমূর্তির পাশে সে রাত্রিবাস করছে প্রত্যহ। সেই আয়বাঙ্গির সঙ্গে এই গেছো আয়বাঙ্গির সম্পর্ক আছে কি না কিছু, তা তো জানতেই হবে!

দ্বিধা না করে টারজান নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। সাবধানে, সন্তর্পণে। অজানা স্থান, অন্ধকার বৃক্ষকোটর। যত নামছে ততই সে-আঁধার গাঢ় থেকে গাঢ়তর।

প্রশস্ত স্থান গাছের গুঁড়ির মধ্যে। ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি নেমেছে। কতদূর নামল টারজান, মোটামুটি একটা আন্দাজ করার চেষ্টা সে করে যাচ্ছে। একসময় তার মনে হল যে মাটির কাছ-বরাবর এতক্ষণে এসে পড়ার কথা।

আর তার পরেই টারজানের চোখে পড়ল আলো। পোড়া চর্বির গন্ধ নাকে আসছে। মানুষের কণ্ঠস্বর কানে আসছে। কে একজন যেন চেঁচিয়ে কাকে ডাকল—"আয়বাঙ্গি! আয়বাঙ্গি!"

(৬)

টারজান চমকে উঠল, একথা বললে কিছুই বলা হয় না।

চমকাবার চাইতে অনেক বেশী সঙ্গীন অবস্থা হল তার। সে রীতিমত স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ইয়েটিদের গুহাতেও আয়বাঙ্গি, এই হলদে মানুষদের বৃক্ষকোটরেও আয়বাঙ্গি?

আয়বাঙ্গি কি সর্বব্যাপিনী নাকি?

মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফোকর।

টারজান ভেবে পায় না কিছু। তবে, ভেবে না পেলেও কর্তব্য স্থির করতে তার এক মুহূর্তও দেরি হল না। শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এই ব্যাপারের।

আয়বাঙ্গির ভক্ত যদি হয় এখানকার মানুষ, তাহলে ত সে এখানে নিরাপদ। কারণ আয়বাঙ্গি যে তার উপরে সদয়, তার প্রমাণ ত সে আগেই পেয়েছে! ইয়েটির আক্রমণে যে রক্ষা করেছিল, সে কি আর হলদে মানুষদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবে না?

হলদে মানুষ! হলদে মানুষ! কথাটা মনে মনে আওড়ায়, আর মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে যায় টারজানের।

মানুষ সে এযাবৎ দুরকমই দেখেছে। সাদা মানুষ আর কালো মানুষ। জঙ্গলের ভাষায় টারমাঙ্গানি আর বোমাঙ্গানি। ঐ দুই জাত ছাড়াও যে হলদে আর এক জাতের মানুষ দুনিয়ায় আছে, তা আজই সে সর্বপ্রথম জেনেছে।

জেনে খুশী হয়নি একেবারেই। সাদা আর কালোতেই যথেষ্ট মারামারি চলেছে এতদিন, আবার যদি হলদেরা এসে ভিড় করে সেখানে, সুখের হবে না সেটা।

টারজান নিজে সাদা, কিন্তু কালোর উপর কোন বিদ্বেষ

তার নেই কোনদিন। কিন্তু বিদ্বেষ না থাকলেও কালোদের শত্রুতা তাকে করতে হয়েছে। অনেক সময় প্রাণপণ শক্তি দিয়েই করতে হয়েছে। ঘটনাচক্র এমনভাবে আবর্তন করেছে যে শত্রুতা না করে তার উপায় ছিল না।

ফল কিছু ভাল হয়নি। কালো মানুষ অনেক মরেছে টারজানের হাতে, আবার সাদা টারজানও অনেক অনেক বার কালোদের হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছেছে।

ফিরতে যে পেরেছে সেই দোরগোড়া থেকে, সে শুধু এই কারণে যে সে জঙ্গলের রাজা, জঙ্গলের অধিবাসী হাজার জাতের ছোট-বড় জানোয়ার সবাই প্রাণপণে চেষ্টা করেছে তাদের রাজাকে রক্ষা করবার জন্য।

কিন্তু এবার জঙ্গলের সে অনৈসর্গিক শক্তি টারজানের পিছনে নেই। ভক্ত প্রজা গরিলা সিংহ চিতা ও লেঙ্গুরদের সে ফেলে এসেছে পৃথিবীর ওপিঠে। বিপদের দিনে আর তাদের সাহায্য পাবে না টারজান।

অথচ বিপদ হয়ত আসন্ন। এই গাছটাতে উঠেই সে এখানকার হলদে মানুষদের শত্রু করে ফেলেছে। এই দুটো মানুষকে সম্ভবত হত্যাই করেছে। যদি কোনরকমে প্রাণে তারা বেঁচে গিয়ে থাকে, টারজানের তাতে সুবিধে হবে না। তারা বেঁচে ফিরলে টারজানের দুশমনি করবে চিরদিন।

এক ভরসা আয়বাঙ্গি। আয়বাঙ্গি তাকে রক্ষা করতে পারে। ইয়েটিগুহায় করেছে, এখানেই বা কেন করবে না?

টারজানের নিজের মনই তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দেয়। ইয়েটি গুহায় সে কাউকে হত্যা করেনি, কিন্তু এখানে করেছে।

"আয়বাঙ্গি! আয়বাঙ্গি!"—আহ্বান আসছে ক্রমাগত।

গাছের কোটরের লোকেরা ডাকছে গাছের তেতালার লোকদের। আয়বাঙ্গি তাদের দেবতার নামই নয় শুধু, সম্ভবতঃ সংকেত বাক্যও।

উপর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে খটাখট শব্দে জনা দুই হলদে লোক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। টারজান তখন কোটর থেকে বেরিয়ে একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখতে পায়নি লোক দুটো।

ওদের পায়ে কাঠের পাদুকা। কাঠের সিঁড়ির উপরে তারই খটাখট আওয়াজ আগেও শুনেছে টারজান, এবারও শুনছে।

ওরা উপরে উঠে যখন সাথীদের পাবে না, তখন হয়ত গাছ থেকে নেমে তলায় খুঁজবে। খুঁজলেই দুটো দেহ পাবে, হয় মৃত, নয় মৃতবৎ। সঙ্গে সঙ্গে তারা খবর নিয়ে আসবে এই পাতালপুরীতে।

এখানে নিশ্চয় অনেক হলদে মানুষ আছে, চারিদিকে কথাবার্তার গুঞ্জন শোনা যায়। মানুষের অস্তিত্বের হাজার পরোক্ষ প্রমাণ চোখে না দেখেও দূর থেকে অনুভব করা যায়।

তারা যখন বর্শা হাতে নিয়ে ঘিরে ফেলবে টারজানকে, আয়বাঙ্গি তাকে রক্ষা করবে ত? কী উপায়ে রক্ষা করবে?

দেখা যাক, কী উপায়ে করে। সেইটিই দেখতে চায় টারজান। রক্ষা করুক না করুক, খোদ আয়বাঙ্গিকে দেখতে চায় একটিবার। এখানে সেই তেরকেলে বুড়ী—জরাগ্রস্ত কুশ্রী জীবটা কী পরিবেশে কী অবস্থায় আছে, সেটা সে দেখতে চায়।

আয়বাঙ্গিই যে সেই পূর্বজন্মের গজমতী রানী, তাতে ত টারজানের কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য দারুণ রহস্যে আবৃত তার এখানকার জীবন। তার সমাধান টারজানকেই করতে হবে।

না যদি করে, তবে তার এখানে আগমনের সার্থকতা কোথায়?

উপর থেকে একটা শোরগোল শোনা গেল। অবশ্য দুটো লোকের পক্ষে যতটা শোরগোল করা সম্ভব ততটাই। কিন্তু তাইতেই উচ্চকিত হয়ে উঠল পাতালপুরী।

দূর দূর থেকে মানুষ ছুটে আসছে। অন্ধকার থেকে আলোকে। গাছের কাছাকাছি আলো জ্বলছে। মাটির সরাতে ইয়েটির চর্বি পুড়িয়ে সে-সব আলো জ্বালানো হয়। তাই আলো যতক্ষণ জ্বলে, বীভৎস দুর্গন্ধে চারিপাশ পূর্ণ হয়ে যায়।

যেখানে টারজান আছে, সেখানটা ঐ আলোকের গণ্ডীর ঠিক বাইরে। সহসা নজরে পড়বার মত স্থান সেটা নয়, কিন্তু তল্লাসের সময় সে জায়গা নিরাপদ থাকবে বলে আশা করা যায় না।

অতএব নিরাপদ আশ্রয় একটা সময় থাকতে খোঁজা দরকার।

যেদিকে একটু আঁধার, সেইদিকেই ছুটে যাচ্ছে টারজান। আঁধারে আঁধারে গাছের গোড়া থেকে বেশ একটু দূরে গিয়ে পড়ল সে।

ওদিকে বৃক্ষকোটর থেকে নেমে পড়েছে হলদের দল। দুর্ঘটনার কথা আর অজানা নেই। মারা গিয়েছে দুটো লোকই, অর্থাৎ টারজানের সেই এক নম্বর আর দুই নম্বর দুশমন।

উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, চর্বির আলোর অনিশ্চিত আভায়

হলদে মানুষদের আস্ফালনের হাস্যকর আভাস, আর ছুটতে ছুটতে সকলেরই একটা বিশেষ স্থানের দিকে দৌড়।

টারজান বিপদে পড়েছে। যেখানটাতে সে আশ্রয় নিয়েছে, লোকগুলো দৌড়ে আসছে সেই স্থানটি লক্ষ্য করেই। আলোর পর আলো এসে জমায়েত হচ্ছে সেখানে, ফলে জায়গাটা আর আবছা অন্ধকার নেই, বেশ উজ্জ্বলভাবেই আলোকিত হয়ে উঠেছে।

এতক্ষণে টারজান দেখতে পেল এই পাতালপুরীর ছাদ। মাঝে মাঝে পাথরের স্তম্ভ, আর সেই স্তম্ভের মাথায় একটা পাথরের ছাদ। যতদূর দৃষ্টি চলে, টারজান সেই ছাদের সীমা দেখতে পেল না।

আবার টারজান মনে মনে বাহবা দিল এই হলদে জাতের কারিগরদের। মাটির তলায় একটা নগর গড়ে তোলা আনাড়ী মিস্ত্রীর কাজ নয়।

ছাদের গায়ে চর্বির আলো ঝুলছে, জ্বলছে লম্বা লম্বা ভুতুড়ে ছায়া ফেলে ফেলে। সেই আলো-আঁধারির কোলে কোলে অন্ততঃ দুশো লোক জমা হয়েছে, সেটা টারজানের বুঝতে কষ্ট হল না।

অনুসন্ধানের জন্য যে দুটো লোক গাছ থেকে নেমেছিল, তারা চাক্ষুষ যা দেখে এসেছে তারই বিবরণ দিল বোধহয়।

টারজান তাদের কথা একবর্ণও বুঝতে পারছে না, কিন্তু হলদে শ্রোতারা যে রীতিমত ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হয়ে উঠছে, এটা আর তার না বুঝে উপায় নেই।

ওরা কী বলছে, ওদের ভাষা না বুঝেও তা স্পষ্ট অনুমান করা যায়।

"কোথায় সে আততায়ী, যে আয়বাঙ্গির মন্দিরে হানা দিয়ে দু'দুটো সন্তানকে হত্যা করে গেল আয়বাঙ্গির? আনো তাকে ধরে, পুড়িয়ে মারো এক্ষুণি, তৃপ্ত হোক আয়বাঙ্গির প্রতিহিংসা।"

চেঁচামেচি চলল অনেকক্ষণ। তারপর দল বেঁধে সবাই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। খুঁজতে বেরুলো আততায়ীকে। সে-আততায়ী যে ইতিমধ্যে তাদেরই আস্তানায় ঢুকে বসে থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা স্বপ্নেও মনে করতে পারল না তারা।

পাতালপুরীতে লোক খুব অল্পই রইল মনে হয়। নিঝুম পুরীর মত স্তব্ধ সব। টারজান আবিষ্কারের অভিযানে বেরিয়ে পড়ল।

ঐখানটাতেই এসে পাতালপুরীর বাসিন্দারা জমায়েত হয়েছিল কেন? কী বৈশিষ্ট্য আছে ঐ জায়গাটার?

সকলের আগে পরখ করে দেখতে হবে সেইটাই।

পিছন ফিরে দিল ভোঁ দৌড়।

কাছে যেতেই চোখে পড়ল ছোট একটা মন্দির। সোনাপাহাড়েও মন্দির দেখেছিল টারজান। তার সঙ্গে এ মন্দিরের মিল খুব কম। তার একটা চূড়া, এর অনেকগুলো। সেই অনেকগুলো চূড়া আবার থাকে থাকে সাজানো।

ছাদটা যেন কয়েকটা তলা-বিশিষ্ট। প্রথম তলা থেকে দ্বিতীয় তলা ছোট, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়, তৃতীয় থেকে চতুর্থ—এইরকম।

প্রত্যেক তলায় চার কোণে চারটি চূড়া; ছাদের চর্বির আলো যে সব চূড়ার উপরে পড়েছে, অপূর্ব তাদের কারুকার্য। টারজান ও-জিনিসের সমজদার নয়, তবু বার বার না তাকিয়ে পারল না সেই সৌন্দর্যের দিকে।

এই মন্দির ওদের জমায়েতের জায়গা। কী আছে এ মন্দিরের ভিতরে? আয়বাঙ্গির মূর্তি কি?

টারজান দুরুদুরু বুকে মন্দিরে প্রবেশ করল। এর ভিতরেও আবছা আলো বেরুচ্ছে মাটির সরা থেকে। ছাদে, মেঝেতে সর্বত্র সেই সরা বসানো। কিন্তু সরাতে যে জিনিস জ্বলছে, সেটা চর্বি নয়।

পোড়া চর্বির গন্ধ এখানে পাওয়া যায় না, তার বদলে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা একটা সুগন্ধ। টারজানের জানবার

কথা নয়, কিন্তু এ বস্তুটা চমরী গাইয়ের ঘি।

টারজানের জানবার কথা নয়, কারণ ঘি-পদার্থটির ব্যবহার আফ্রিকাতে নেই, এমন কি সোনাপাহাড়ের ধনী সমাজেও না।

আয়বাঙ্গির বাসস্থানে পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই এই গন্ধ-দীপ জ্বালবার ব্যবস্থা, তাতে সন্দেহ কী?

টারজান ঢুকে পড়েছে মন্দিরে। নিশ্চিত প্রত্যাশায় চারিদিকে চাইছে। কই আয়বাঙ্গির সেই থুত্থুড়ো চেহারা? চামড়া ঝুলে-পড়া, মাথায় অল্প কয়েকগাছি শণের নুড়ির মত চুল, দিনের বেলায় প্যাঁচার মত ঘোলাটে চোখ, সেই মর্কটবুড়ীর মূর্তিখানি কই?

না ত! কোথাও নেই সে মূর্তি!

প্রশস্ত একখানা কামরা, ঐ গুটিকতক দীপাধার ছাড়া কোন আসবাব তার ভিতরে নেই। একটিমাত্র দরজা, যা দিয়ে প্রবেশ করেছে টারজান। ভিতরে হাওয়ার চলাচল নেই, নিশ্বাস নিতে কষ্টই হয় একটু।

হতবুদ্ধি হয়ে টারজান ভাবছে কোন্ দিকে যাবে এবার!

হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার। ঠিক তার পিছনে।

ধাঁ করে ঘুরে গেল টারজান। একটা নারী এসে ঢুকেছে ঘরে। হলদে রং এরও। নারী বলে অনুমান করা এইজন্য সম্ভব হচ্ছে যে মুখে এর কেশের লেশ নেই। এর আগে যেসব হলদেদের দেখা গিয়েছে, প্রত্যেকেরই মুখে খাটো খাটো পাতলা লালচে গোঁফদাড়ি কিছু কিছু দেখেছে টারজান।

চীৎকার করেই সেই নারী পিছন ফিরে দিল ভোঁ দৌড়। দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গেই কী সব বলতে বলতে যাচ্ছে তার দুর্বোধ্য ভাষায়।

অবশ্যই এই কথা বলছে যে "কোথায় গেলি বোকা মরদেরা! যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস, সে তোদের ঘরে ঢুকে বসে আছে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।"

টারজান বিশেষ ব্যস্ত হল না। পাতালপুরীতে লোক বেশী নেই বলেই তার বিশ্বাস। টারজানের তারা করবে কী?

যে দুইশোর মত মানুষ দুশমনকে খুঁজতে বেরিয়েছে, তারা হঠাৎ শুনতে পাবে না এই নারীর চীৎকার। শোনেও যদি, ফিরেও যদি আসে, তাদের একা হাতে আটকে ফেলবার উপায় টারজানের হাতেই আছে।

ধীরেসুস্থেই বেরুলো টারজান মন্দির থেকে।

কয়েকটা মানুষ ছুটোছুটি করছে সেইখানটাতে, যেখানে একটু আগে পাতালবাসী হলদেদের জমায়েত ঘটেছিল পূর্ণশক্তিতে।

এদের ছুটোছুটির ভাবখানা দেখে কিন্তু মনে হয় না যে এরা সাহস করে আক্রমণ করতে পারবে টারজানকে। মিহি কণ্ঠস্বর শুনে কতকগুলিকে টারজান নারী বলে ধরে নিল, আর কাঁপা কাঁপা আওয়াজ থেকে অন্য কয়েকজনকে অনুমান করল বুড়ো বলে।

না, এরা আক্রমণ করবার সাহস রাখে না। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে পরস্পরকেই শলাপরামর্শ দিচ্ছে কেবল। হঠাৎ এক বুড়োর কাঁপা আওয়াজের ভিতর থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে কানে বাজল টারজানের—

"ইয়েটি! ইয়েটি!"

হকচকিয়ে গেল টারজান। ইয়েটি এখানে কোথায়?

কিন্তু সতর্ক হতে হয়। আফ্রিকার নানা জনপদে সে আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছে। পোষা সিংহ লেলিয়ে দেওয়া শত্রুর ব্যাপারে—সে ত নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার সেখানে।

এখানে যদি এদের পোষা ইয়েটি থাকে? সেই বারো হাত উঁচু অপমানবেরা যদি দল বেঁধে তাকে হত্যা করতে আসে? ইয়েটি উপত্যকায় সে আক্রমণ থেকে উদ্ধার করেছিল বুড়ী আয়বাঙ্গি।

এখানে—যদিও এরা আয়বাঙ্গির নাম মাঝে মাঝেই উচ্চারণ করছে—কোথায় এখানে আয়বাঙ্গি? এত খুঁজেও ত বুড়ীর শণের নুড়ির টিকি এ পর্যন্ত চোখে পড়ল না।

তাহলে কে রক্ষা করবে তাকে?

টারজান খোলা প্রাঙ্গণটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গিয়ে ওক গাছের মূলের কাছাকাছি দাঁড়াল, কোটরে উঠবার দরজাটি আগলে।

এইখানে লড়াইয়ের সুবিধাজনক জায়গা। বেকায়দা দেখলে কোটরে ঢুকে পড়া এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাওয়া।

উপর থেকে যদি হলদেরা নামে, এইখানে দাঁড়িয়ে এক একটাকে ধরা আর গলা টিপে মারা। সরু সিঁড়ি দিয়ে একটার বেশী দুটো ত আর একসাথে নামতে পারছে না!

তবে যদি এদিক থেকে ইয়েটি আসে এবং ঠিক সেই সময়েই উপর থেকে হলদে দুশমনেরা নামে, তবে অবশ্য মুশকিল বটে। সে অবস্থায় বিপদ্ই ঘটবে।

কিন্তু অতশত ভেবে লাভ নেই। দুঃসাহসের ব্যাপারে যখন নামা গিয়েছে, প্রাণের আশঙ্কা ত খানিকটা আছেই। কবেই বা না ছিল? এমন একটা দিনের কথাও টারজান মনে করতে পারে না, যেদিন কোন-না-কোনভাবে জীবন

যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না তার।

আঙ্গিনার লোকেরা তখনও 'ইয়েটি ইয়েটি' করে চীৎকার করছে। এইবার ইয়েটিরা এল বুঝি!

একটা অস্পষ্ট কলরব মন্দিরের পিছন দিক্ থেকে শোনা যায়। ঘুরঘুট্টি আঁধার সেদিকটাতে। কিন্তু টারজানের চোখ ত আঁধারে দেখতেও অভ্যস্ত!

এক মুহূর্ত সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই টারজান আঁধারের ভিতর কয়েকটা দানবীয় মূর্তিকে ছুটে আসতে দেখতে পেল।

ওরা ইয়েটি না হয়ে যায় না।

মুহুর্মুহুঃ ক্রুদ্ধ গর্জন তাদের মুখে। হু-হু-হু-হু-উ-উ। এ-গর্জন ইয়েটি গুহায় শুনেছিল টারজান।

ধমনীতে রক্ত জমিয়ে দেওয়ার মত গর্জন। টারজান ভিন্ন অন্য কেউ হলে গর্জন শুনেই মূর্ছা যেত।

টারজান শুধু বৃক্ষকোটরের ভিতরে ঢুকে দাঁড়াল। যাতে ইয়েটিরা একজনের বেশী একসময়ে আক্রমণ করতে না পারে।

একেবারে ভিতরপানে অদৃশ্য হয়ে টারজান যদি সিঁড়ির উপর উঠে দাঁড়াত, ইয়েটিরা নাগালই পেত না তার। কারণ বৃক্ষকোটরের দরজা এত ছোট যে তার ভিতর বারো হাত লম্বা, হাতীর মত মোটা একটা ইয়েটির দেহ ঢুকবার কোন উপায়ই নেই।

কিন্তু সিংহ গরিলা ড্রাগন দমন করে এসে টারজান আজ কি ইয়েটির কাছে হার মানবে? ইয়েটি গুহায় সেদিন হার মেনে পালিয়েছিল শুধু এই কারণে যে সে ছিল একা, ইয়েটিরা ছিল একটি পল্টন।

আজও ওরা দলে ভারী আছে। কিন্তু এই কোটরের মুখে ওরা এক একজন করে টারজানের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

আর, এক একজন করে এগিয়ে এলে ইয়েটিও যে সিংহ গরিলা ড্রাগনের মতই টারজানের সমুখে অসহায়, টারজান তা আজ ইয়েটিদের বুঝিয়ে দেবে।

একটা টর্নাডোর মতই ধেয়ে এল গোটা পাঁচ-ছয় ইয়েটি।

টারজান লুকোয়নি—ঠিক দোরটি আগলে দাঁড়িয়ে আছে। যে ভাগ্যহীন ইয়েটিটা তার মুখোমুখি হাজির হল সর্বপ্রথম, টারজানের ছোরা আমূল বিদ্ধ হল তার উদরে।

পেট দু'হাতে চেপে ধরে সেটা মাটিতে বসে পড়তেই দ্বিতীয় ইয়েটি তার মাথার উপর দিয়ে টপকে সামনে এসে পড়ল।

টারজানের ছোরা সাপের ছোবলের মত তারও উদরে ছোবল মারতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময়ে কোমলমধুর বীণানিন্দিত স্বরে কে যেন ডেকে উঠল—"টারজান! টারজান! টারজান!"

(৭)

"টারজান! টারজান! টারজান!"—

এ-কণ্ঠস্বর ত অচেনা নয় টারজানের! অল্পদিনের জন্য ও-স্বর শুনবার সুযোগ টারজানের হয়েছিল। তাও অনেকদিন আগে।

তবু ওর ঝংকার সে ভোলেনি—

স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সে চেঁচিয়ে উঠল—"কোথায় তুমি গজমুক্তা রানী, কোথায় তুমি?"

থুত্থুড়ে বুড়ী আয়বাঙ্গির গলা থেকে এ-স্বর বেরোয়নি, তা হলফ করে বলতে পারে টারজান।

"কোথায় তুমি, কোথায় তুমি" বলতে বলতে টারজান নিশ্চয়ই আবার পাতালপুরীতে ঢুকে পড়ত, সমুখে বারো-হাত-লম্বা ইয়েটিরা তাদের লোমশ দেহের প্রাচীর খাড়া করে না রাখলে।

কিন্তু আশ্চর্য বলতে হবে—ইয়েটিরা ধীরে ধীরে পিছু হটছে, বেত্রাহত কুকুরের মত। কেন? কেন?

হটে আসবার জন্য কেউ ত তাদের আদেশ করেনি!

একক টারজানের ভয়েতেই তারা পালিয়ে যাচ্ছে, এমনটা বিশ্বাস করার মত কারণও ত কিছু দেখা যাচ্ছে না! এই কয়েক মুহূর্ত আগেও ত তারা রীতিমত মারমুখী হয়ে চড়াও হতে যাচ্ছিল ওর উপরে! একজন সাংঘাতিক জখম করে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরেও!

তবে হঠাৎ তাদের এরকম ভাবান্তরের কারণ কী?

কারণ বুঝতে দেরি হল না। সমুখের দিকে মাটিতে দৃষ্টি পড়ল টারজানের, হয়ত ভূপতিত ইয়েটিটার কাতরানি শুনেই।

মাটিতে একটা কালো সাপ এঁকে বেঁকে ঘুরছে ফিরছে খেলা করছে। আর তার দেহ থেকে বেরুচ্ছে একটা জ্বালা।

বরফের দেশের জীব ইয়েটিরা সে-জ্বালা সইতে পারছে না, হতবুদ্ধি হয়ে পিছু হটছে তাই।

ভূশায়ী আহত ইয়েটিটাও দুই হাতে পেট চেপে ধরে হামা দিয়ে দিয়ে অতি কষ্টে সঙ্গীদের অনুসরণ করছে। দুই-একবার পিছন ফিরে টারজানের দিকে যে-দৃষ্টি সে হানল, তাতে হিংসার পরিমাণ বেশী, না বিস্ময়ের, তা বোঝা শক্ত।

টারজানের বুঝতে বাকি নেই, এই কালো সাপটি আসলে

কী। এ সেই জাদুদণ্ড না হয়ে যায় না, যা ইয়েটি গুহায় অচেতন হয়ে পড়ার পরে সে হারিয়েছিল। আয়বাঙ্গির জিনিস আয়বাঙ্গিই নিয়েছিল বুড়ীর আকার ধারণ করে।

এখন সেই আয়বাঙ্গিই তা ফিরিয়ে দিচ্ছে। নবীনা গজমতীর আকারে সমুখে দর্শন দিয়ে নয়, গজমতীর কণ্ঠস্বরের আড়াল থেকে তাকে সম্ভাষণ করে।

টারজান শিশুর মত অবুঝ হয়ে উঠল হঠাৎ। অভিমান করে বসল গজমতীর উপরে। তার জাদুদণ্ড হাতে তুলে নেবার কোন চেষ্টাই করল না। ভাবটা এই—যে নিজে দেখা দেবে না, তার সাহায্যের কোন দরকার আমার নেই।

অনাদৃত জাদুদণ্ড কিন্তু ইয়েটিদের পিছনে গেল না, টারজানের হাতের নাগালের ভিতরেই ঘুরপাক খেতে লাগল ক্রমাগত।

মন্দিরের ভিতর থেকে তখন নারী আর বৃদ্ধেরা কেবলই ককিয়ে যাচ্ছে 'আয়বাঙ্গি, আয়বাঙ্গি' বলে। ইয়েটিদের পল্টন পরাভূত হয়ে পালাবার পরে তারা আত্মরক্ষার আর কোন পথই চোখে দেখছে না।

হঠাৎ বৃক্ষকোটর থেকেও বহুকণ্ঠে হুংকার শোনা গেল আয়বাঙ্গির নাম নিয়ে। যারা আততায়ীকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারাই ফিরে এসেছে। ব্যর্থ প্রয়াসের ক্রোধ ফুটে ফুটে বেরুচ্ছে তাদের গর্জনে।

টারজান এখন কী করবে? মন্দিরের দিকে যেতে মস্ত বাধা রয়েছে। ঐ ইয়েটিরা। এখানে জাদুদণ্ড আছে তার পৃষ্ঠরক্ষার জন্য, সেখানেও থাকবে যে তার ত নিশ্চয়তা নেই। আয়বাঙ্গির মতলব ত টারজান জানে না কিছু।

সুতরাং এখানে থেকে যাওয়াই উচিত। এক একটা করে হলদেরা নামবে সিঁড়ি দিয়ে, আর টারজান তার গলা টিপে সাবাড় করে দেবে।

নামছে তারা। টারজানও তৈরী হয়ে আছে।

এবার টারজানের স্থান ঠিক দরজার মুখে। ছোরা কটিতে বদ্ধ।

দুখানা শালদণ্ডের মত দুই বাহু সমুখে প্রসারিত শত্রুকে আঁকড়ে ধরবার জন্য।

নেমেছে একজন। মুখে মামুলী রব—'আয়বাঙ্গি! আয়বাঙ্গি!' ঐ একটা শব্দ দিয়ে হতভাগ্যেরা কখন যে কী অর্থ প্রকাশ করতে চায়, তা ওরাই জানে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই তার গলায় একটা সাঁড়াশির লৌহপেষণ; গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুল ক্ষণিকের জন্য। তার পরেই নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে গেল টারজানের পায়ের তলায়।

ঠিক ওর পিছনে যে আসছিল, সে শুনল ঐ ঘড়ঘড়ি আওয়াজ, তারপর ধপাস্ করে একটা ভারী জিনিস পড়ার আওয়াজও সে পেলো।

এই হলদেরা স্বভাবতঃই ভারি সন্দিগ্ধ। অস্বাভাবিক দুটো শব্দ শুনেই সতর্ক হয়ে গেল দ্বিতীয় লোকটা। সমুখে নজর চলে না। একে কোটরের ভিতর আলো মোটেই নেই, তায় দরজা দিয়ে পাতালপুরীর চর্বির আলোর আভা যে আসবে একটু-আধটু, তারও উপায় নেই, কারণ দ্বারপথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে টারজান।

দ্বিতীয় হলদেটা সাবধান হয়ে গেল। প্রথমে একটা ডাক দিল পুরোবর্তী সাথীকে। শব্দটা ঠিক ধরতে পারল না টারজান, কিন্তু ওটা যে সম্বোধন, তা বোঝা কঠিন হল না।

বলা বাহুল্য সে-ডাকে উত্তর দিল না কেউ। তখন পশ্চাদ্বর্তীদের সম্বোধন করে সে কী যেন বলল আবার। অমনি পিছনে উঠল একটা হাউমাউ কলরব।

টারজান অনুমান করছে—এইবার যে আসবে, সে আসবে বর্শা বাগিয়ে। তার জন্য প্রস্তুত হল সে। ভূপতিত হলদেটার দেহ সে মাটি থেকে তুলে ঢালের মত করে ধরল।

পরক্ষণেই একটা শব্দ। এ-শব্দও টারজানের চেনা। কোন জন্তুর দেহে সজোরে অস্ত্র বিঁধিয়ে দিলে যেরকম খচখচ আওয়াজ হয় একটু, তেমনি সংক্ষিপ্ত একটা গা-গুলিয়ে-তোলা আওয়াজ।

টারজান হাতের দেহটাকে দাঁড় করিয়ে দিল দোরগড়ায়, মারুক ওরা কত বর্শার খোঁচা মারবে এতে। নিজে শুধু পিঠের দিকে ধরে রইল দেহটাকে, যাতে গড়িয়ে না পড়ে।

হলদেরা বোকা নয়। তারা বুঝে ফেলেছে দুশমনের চালাকি। কিংকর্তব্য স্থির করবার জন্য ওদের কর্তা সবাইকে ডাকাডাকি করছে কোটর থেকে বেরিয়ে গাছের তলায় সমবেত হওয়ার জন্য।

সেখানে যখন তারা সমবেত হল, একটা মানুষ কথা কয়ে উঠল কর্তার আগেই। সে দাঁড়িয়ে ছিল এমন জায়গায়, যেখানে অন্ধকারটা অতি গাঢ়। তার মুখ কেন, কোন অবয়বই কারও চোখে পড়ছে না।

লোকটা বলছে—"এ-সময়টা ঝড়বৃষ্টির নয়। একটু আগেও আমরা আকাশে এক কণা মেঘও দেখিনি। কিন্তু এখন দেখ চেয়ে!"

সবাই তৎক্ষণাৎ গাছের ছায়া থেকে সরে এসে খোলা আকাশের দিকে তাকাল। কী আশ্চর্য! ঘন কালো মেঘে

আকাশ একেবারে ছেয়ে গিয়েছে, মাঝে মাঝে তা থেকে আগুনের চাবুকের মত ঠিকরে বেরুচ্ছে বিদ্যুৎশিখা।

ঐ লোকটাই আবার হেঁকে উঠল—"এ-লক্ষণ ভালো নয়। আমি গুনে দেখলাম এক্ষুণি বাজ পড়ে এই এতকালের এত বড় ওক গাছটি আমাদের পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন আর সিঁড়ি দিয়ে নামবার আমাদের দরকার হবে না। পাতালপুরী পর্যন্ত গভীর কূপের সৃষ্টি হবে একটা। আমরা লাফ দেব আর বাড়ি পৌঁছে যাব!"

এ কীরকম রসিকতা! হলদেরা ভয় যত না পেল, রেগে গেল তার চেয়ে বেশী। লাফ দেব আর বাড়ি পৌঁছে যাব? ওক গাছ ছাই হয়ে গেলে নীচের বাড়িঘর থাকবে নাকি?

তাদের এত সাধের এতকালের আশ্রয় ধ্বংস হয়ে যাবে? গুনে দেখেছে লোকটা? কে ও লোক? নাম কী ওর?

ওকে কেউ আগে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। কুঁচকে-যাওয়া মুখ, ঝুলে-পড়া চামড়া, পিঠে পেল্লায় একটা কুঁজ। গায়ের রংও তাদের মত হলদে নয়।

"কে তুমি?"—ধমকে ওঠে হলদেদের কর্তা—"সত্যি কথা বল। নইলে চামড়া তুলে ফেলব পিঠ থেকে।"

এ-ধমকের উত্তরে সে একটা কালো সাপ ছুঁড়ে মারল ঐ বুড়ো কর্তার মুখের উপর। তার ছোবলে নাক মুখ চোখ উঁচু নীচু সব কিছু লেপটে একশা হয়ে গেল কর্তার। সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

হলদের জাত ভীরু নয়, তারা নেতার এই দুর্গতি দেখে রুখে দাঁড়াল একজোট হয়ে, যদিও হঠাৎ একটা কালো সাপের আবির্ভাব ঘটতে দেখে ভয় তারা বিলক্ষণই পেয়েছিল।

কুঁজো লোকটাকে ঘিরে ধরল তারা বর্শা উঁচিয়ে। মুখে তাদের অনর্গল অং-বং আওয়াজ, তারস্বরে শাসিয়ে যাচ্ছে অপয়া কুঁজোকে।

একটা অট্টহাসি হেসে তাদের মাঝখান থেকেই আরিমান অদৃশ্য হয়ে গেল। এ কুঁজো যে আরিমানের আত্মা ছাড়া আর কিছু নয়, ঐ কালো সাপ যে আরিমানের সেই জাদুদণ্ড, এও কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

মাঝখান থেকে শত্রু উবে গেল কর্পূরের মত, হলদেদের ত হতভম্ব হওয়ার কথাই। কিন্তু হতভম্ব হয়ে বেশীক্ষণ থাকবার উপায়ই বা কই?

আরিমানের সেই কথা মনে পড়ে গেল সকলের। আকাশ থেকে আগুন ঝরবে, সেই আগুনে পুড়ে ছাই হবে তাদের ওক গাছ, পাতালপুরীতে নামবার সিঁড়ি সমেত। তখন অতল গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে পাতালে পৌঁছুতে হবে।

এ বিপদে একমাত্র ভরসা তাদের আয়বাঙ্গি। কিন্তু আয়বাঙ্গি রইল পাতালপুরীতে, সেখানে ত পৌঁছোতেই পারছে না এরা। পথ আগলে রয়েছে সেই অজানা আততায়ী, যে খামোখাই তাদের উপর হানা দিয়ে এযাবৎ তিন-তিনটে জোয়ানের মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

নেতা নেই, সে মারা পড়েছে আর এক রহস্যময় শত্রুর আক্রমণে, বাস্তবিক হলদেদের বড় দুঃসময় পড়েছে।

নেতা নেই, তবু তারা তাড়াতাড়ি শলাপরামর্শ করে একটা মতলব ঠিক করে নিল। যেমন করে হোক পাতালপুরীতে নামতেই হবে, সিঁড়ি পুড়ে যাওয়ার আগেই। নেমে আয়বাঙ্গির পায়ে লুটিয়ে পড়তে হবে।

আকাশ তখন নিকষকালো। মাঝে মাঝে চোখধাঁধানো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর সোঁ সোঁ রবে একটা ঝড় গর্জাচ্ছে বায়ুকোণে। সেটা এক্ষুণি এসে আছড়ে পড়বে ওক গাছের মাথায়।

সবাই ওরা ছুটল। গাছে উঠে কোটরে ঢুকল। নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। সবচেয়ে সাহসী চারজন জোয়ান এগিয়ে গেল বর্শা হাতে নিয়ে। বর্শা ছুঁড়বে তারা দূর থেকে। আততায়ী যদি দোরগোড়ায় থাকে, চারখানা বর্শার একখানাতে অন্ততঃ সে ঘায়েল হবেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য! দোরগোড়ায় ত সে-লোক নেই! চার-চারখানা বর্শা সাঁ করে গিয়ে মাটিতে বিঁধল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তারা দোরগোড়ায় পেল শুধু মৃত হলদেটার দেহ।

টারজান ওখানে নেই কেন, সেই কথাই এখন বলা যাক।

হলদেরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল যখন তাদের কর্তার আহ্বানে, টারজান কপালের ঘাম মুছে ফেলল বাঁ হাত দিয়ে।

হ্যাঁ, উত্তর-হিমালয়ের চার মাইল উঁচু অধিত্যকার দুর্জয় শীতেও টারজান ঘেমে উঠেছে উত্তেজনায় আর উদ্বেগে।

এইবার ক্ষণিকের বিশ্রাম। শত্রুরা পিছু হটেছে। নিজের করণীয়টা ভেবে নেওয়ার সময় পাওয়া গিয়েছে।

একবার ভাবল হলদেদেরই পিঠ-পিঠ সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা যাক। তেতলায় পৌঁছে, যেভাবে হোক, পালানো যাবে ওদের এলাকা থেকে। গাছের ডালে টারজানকে তাড়া করে ধরবে, এমন সাধ্য মনুষ্যজাতির ভিতর কেউ রাখে না।

ভেবেছিল একবার এইভাবে পালাবার কথা। কিন্তু সে ভাবনা সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল টারজান। এই পাতালপুরী সে কেমন করে ছেড়ে যাবে?

এখানে না সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর সে একটু আগেই শুনেছে, যা বহু বৎসর আগে শেষবারের মত শুনেছিল ন্যুন্দুর পাহাড়ের জঠরে অগ্নিতরঙ্গিণীর কূলে দাঁড়িয়ে?

গজমতী রানীর আহ্বান সে শুনেছে এখানে। কোথায় আছে গজমতী? কীভাবে? আছে যদি, তবে দর্শন দিচ্ছে না কেন? এসব সমস্যার সমাধান না করে, গজমতীকে না নিয়ে সে কোথায় যাবে? জীবনের মায়া কবে থেকে এত প্রবল হল টারজানের কাছে?

না, সে বেরুবে না এখান থেকে, তার পরিণাম যা-ই হোক।

এই সংকল্প তার মনের ভিতর যে মুহূর্তে দানা বেঁধে উঠল, একটা শীতল স্পর্শ বুকের উপর অনুভব করে সে চমকে উঠল হঠাৎ।

কিন্তু পরক্ষণেই সে আনন্দে হেসে ফেলল। বুকের উপর ফিরে এসেছে গজমতীর জাদুদণ্ড, যা এতক্ষণ ইয়েটিদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করছিল।

"কেনই বা গেলে? কেনই বা এলে?"—জাদুদণ্ডের গায়ে হাত বুলিয়ে সাদরে প্রশ্ন করে টারজান।

কেন গিয়েছিল, সে প্রশ্নের জবাব দিল না দণ্ড। কিন্তু কেন এল আবার, তার জবাবটা পাওয়া গেল। সে ফিরে এসেছে টারজানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কোথায় নিয়ে যাবে? সেটা ক্রমে বোঝা যাবে।

কীভাবে নিয়ে যাবে? সে ত কথা বলে না।

কথার দরকার কী? টারজান অনুভব করল কে যেন তাকে মৃদু মৃদু ঠেলছে মন্দিরের দিকে যাওয়ার জন্য।

এমনধারা আকর্ষণ সে আগেও অনুভব করেছিল একবার। কিন্তু সেবারে সেটা এসেছিল আরিমানের জাদুদণ্ড থেকে, সে আকর্ষণ তাকে অগ্নিতটিনীতে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। বাঁচিয়েছিল তাকে গজমতীর জাদুদণ্ড।

কিন্তু এবারে ত সেই গজমতীরই জাদুদণ্ডখানা তার বুকের ভিতর রয়েছে! আশঙ্কা তাহলে কী আছে?

নিঃসংকোচে মন্দিরের দিকে পা বাড়াল টারজান।

হলদে জাতের নারী আর বৃদ্ধেরা এখন আর জটলা করছে না সেখানে। ইয়েটিরা পিছু হঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজের নিজের আশ্রয়ে লুকিয়েছে।

ফাঁকা মন্দিরের ভিতর দাঁড়িয়ে টারজান কিছুই বুঝতে পারে না এবারে জাদুদণ্ড তাকে দিয়ে কী করাতে চায়।

কড়-কড়-কড়াৎ—আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

একটা প্রলয়ংকর বজ্রধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলোকে আলোকিত হয়ে উঠল পাতালপুরীর তলা পর্যন্ত।

তার পরই শতকণ্ঠের হাহাকার। মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তনাদ।

টারজান ছুটে এগিয়ে যেতে চাইল মন্দির থেকে বেরিয়ে। সে দেখতে চায় ঘটনাটা কী ঘটল, হাহাকার করে কারা মৃত্যুযন্ত্রণায়। যদি শত্রুও হয় তারা, টারজান এ-সময়ে তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

সে ছুটে বেরুবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। যে শক্তি তাকে বৃক্ষমূল থেকে মন্দিরে এনে তুলেছে, সেই শক্তিই তাকে বাধা দিল। এক পা চলবার শক্তিও যেন আর নেই টারজানের।

ওক গাছ জ্বলে গিয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে নামছিল দুশো হলদে জোয়ান, তারা পুড়ে মরেছে বজ্রাগ্নিতে।

কার পাপে? ওরা ত এমন কোন দোষ করেনি, যাতে এতগুলো মানুষের প্রাণই চলে যাবে মর্মান্তিক অপঘাতে!

ওদের কোন দোষে নয়, মৃত্যু হয়েছে ওদের দেহমুক্ত আরিমানের রোষে। আরিমানের আত্মা চেয়েছিল টারজানের মরণ। পাতালপুরী ধ্বংস করে টারজানের মৃত্যু আনয়ন করা, পুনর্জাত গজমতী যাতে তার সঙ্গে মিলিত হতে না পারে।

কিন্তু সময় থাকতে টারজানকে আসন্ন বিপদ্ থেকে উদ্ধার করেছে গজমতীর জাদুদণ্ড।

ঠেলতে ঠেলতে টারজানকে সেই দণ্ড নিয়ে এসেছে মন্দিরের ঈশানকোণে। সেইখানে এসে দাঁড়াতেই পায়ের তলায় গৃহতল কেঁপে উঠল থরথর করে।

টারজান এক লাফে সরে দাঁড়াল। আর তার চোখের সমুখে গৃহতল ফাঁক হয়ে নীচে বেরিয়ে পড়ল এক থাক সিঁড়ি।

জাদুদণ্ড ঠেলে নামিয়ে দিল টারজানকে সেই সিঁড়িতে। ঘুরতে ঘুরতে নামতে লাগল টারজান। তারপর সিঁড়ি উপরমুখে উঠতে লাগল আবার।

শেষ হল যেখানে, সে একটা প্রশস্ত বেদি, মুক্ত আকাশের নীচে। সেই বেদির উপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে—

আর কেউ নয়, নবদেহধারিণী গজমতী রানী।

(৮)

গজমতী তাকিয়ে ছিল মেঘাচ্ছন্ন কালো আকাশের দিকে। আকাশে তখনও ঘনঘন চমক, বাজ পড়ছে চড়চড়

কড়কড় শব্দে।

টারজান যে পিছন থেকে এত কাছে এসে পড়েছে, তা কি জানতে পেরেছে গজমতী? যে অতীত ভবিষ্যৎ সব জানে, একান্ত বর্তমানের এই জাজ্বল্যমান উপস্থিতি সম্বন্ধে সে কি সচেতন নয়?

সচেতন থাকলেও সে তার কোন চিহ্ন প্রকাশ পেতে দিল না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল আকাশপানে তাকিয়ে, রইল তেমনি।

টারজান ধরাগলায় ডাকল—"রানি! গজমতী রানি! আমি এসেছি।"

গজমতী ফিরল। হাঁ, এ সেই গজমতী, তাতে সন্দেহ নেই এতটুকু। সেই ফুটন্ত পদ্মের মত লাবণ্য, সেই সম্রাজ্ঞীর মত মহিমা। কিন্তু টারজানের দিকে তাকিয়ে প্রথম কথা যা সে বলল, তা হল এই—"কে গজমতী? আমি ত বেদবতী!"

'গজমতী' আর 'বেদবতী'—এই শব্দ দুটিই বুঝল টারজান। গজমতীর বাচনের অর্থটা আন্দাজ করে নিতে হল তার মাথা নাড়া দেখে।

টারজান সে-যুগে গজমতীর সঙ্গে আলাপ করত ওয়াজিরি ভাষায়, যেটা ওদের কারোই নিজের ভাষা নয়, অথচ দুজনেই জানত।

সেই সংস্কারের বশে টারজান এবারও ব্যবহার করেছে সেই ওয়াজিরি ভাষা।

কিন্তু গজমতী বা বেদবতী জবাব দিয়েছে যে ভাষায়, তা ওয়াজিরির ধারেকাছে দিয়েও যায় না। তা হল ভারতের আদি ভাষা সংস্কৃত।

এ-জন্মে ভারতীয় হয়ে আবির্ভাব ঘটেছে গজমতীর, সেটা টারজান জানবে কেমন করে? বিশেষ করে প্রথম যে-আহ্বানটি সে শুনেছিল গজমতীর, দুই যুগ পূর্বের সেই রাত্রিশেষে আফ্রিকার মহারণ্যে মহাজম্বুর তেতলায় শুয়ে, সে-আহ্বানের ভাষাও ত ছিল ওয়াজিরি!

এ কি তবে গজমতীর ছলনা?

ছলনা কি না, সে বিচারের সময় এখন নয়। এখন ঘোরতর এক সমস্যা উপস্থিত, পরস্পরের বক্তব্য তারা পরস্পরকে বোঝায় কেমন করে? টারজান আকুল হয়ে বলে উঠল—"রানি! তোমার কথা যে আমি বুঝতে পারছি না!"

তখন এক অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

টারজানের চোখের সামনে অনিন্দ্যযৌবনা গজমতীর চেহারায় তিলে তিলে পরিবর্তন আসতে লাগল। বিস্ময়ে
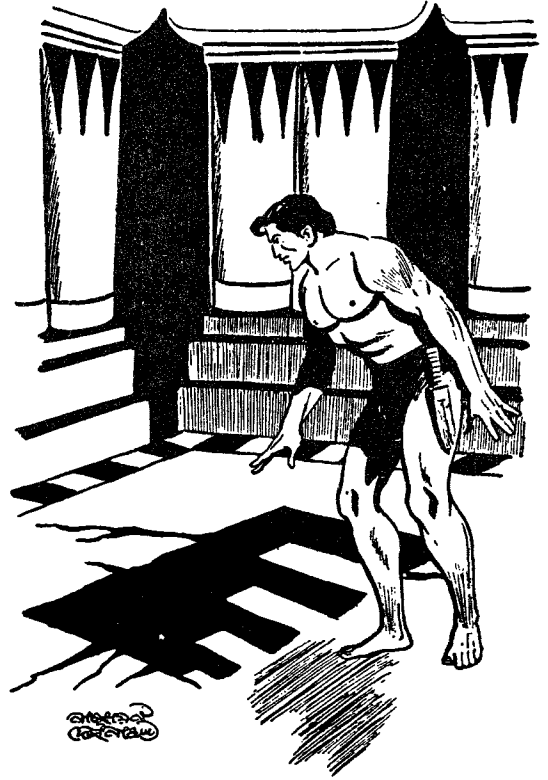
বেরিয়ে পড়ল এক থাক সিঁড়ি।

অবাক্ হয়ে, হতাশায় ব্যথিত হয়ে টারজান দেখছে গজমতীর ঘনকৃষ্ণ এলায়িত চিকুরদাম বিরল লালচে-সাদা শণের নুড়িতে পরিণত হল।

তার মর্মরমসৃণ দেহত্বক্ কুঁচকে কুঁকড়ে গেল বৃদ্ধা বানরীর চামড়ার মত।

দেখতে দেখতে গজমতী পরিবর্তিত হল আয়বাঙ্গিতে।

টারজানের আত্মসংযমের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ তার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে এল—"গজমতী! গজমতী রানী!"

আয়বাঙ্গির ফোকলা মুখ থেকে খলখল হাসি বেরুল একটা—ওয়াজিরি ভাষাতেই সে বলল—"তুমি কথা কইতে চাইলে কিনা! আমি সব ভাষা জানি। আমি জানি না এমন কিছু নেই। তুমি সাধ মিটিয়ে আলাপ কর আমার সঙ্গে, অবশ্য সময় বেশী পাবে না তার জন্য।"

সব জরুরী কথা পাশে ঠেলে রেখে টারজান তুচ্ছ প্রশ্ন করল একটা—"সময় পাব না কেন?"

"আরিমানের আত্মা প্রতিহিংসার জন্য ঘুরছে বলে। প্রতিহিংসাটা নিতে চায় তোমার উপর। তোমাকে সে

প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে কিনা!"

"তা সে-প্রতিহিংসার খপ্পরে কি এক্ষুণি পড়ব আমি?"

"এতক্ষণ পড়তে। বজ্রাঘাতে ওক গাছ জ্বালিয়ে দেওয়া ত শুধু তোমায় বধ করবার জন্যই। আমি তোমায় সে-বিপদ্ থেকে রক্ষা করেছি বটে— থুড়ি, গজমতী তোমায় সে-বিপদ্ থেকে রক্ষা করেছে বটে, কিন্তু পরের ব্যাপারগুলির সমাধান অত সহজ হবে না, গজমতীর পক্ষেও।"

"কেন? হবে না কেন?"—এর চেয়ে জোরালো প্রশ্ন আর টারজানের মাথায় এল না।

"আরিমানের জাদুবিদ্যার জোর গজমতীর জোরের চাইতে বেশী বলে। তার উপর আর একটা মুশকিল হয়েছে কি, জানো? দেহধারণ করে গজমতী নিজের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে, আর দেহ মুক্ত বলে আরিমান হয়েছে অসীম ক্ষমতার অধিকারী।"

"তাতে হল কী?"—কিছু বুঝতে না পেরে শিশুসুলভ প্রশ্ন করে টারজান।

"তাতে হল এই যে দেহমুক্ত আরিমান খেয়ালখুশিমত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে খুশি যেতে পারছে, গজমতী স্থূলদেহে তা পারছে না। তার জাদুদণ্ডকে কেউ বহন করে নিয়ে গেলেই তা কাজ দিতে পারে। আর আরিমানের জাদুদণ্ড নিজেই চলে, নিজের কাজ নিজেই গুছিয়ে নেয়।"

টারজান কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। আয়বাঙ্গি তার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষাও করল না, বলে চলল—"এই মুহূর্তেই সে জাদুদণ্ড কী অনর্থ ঘটিয়েছে, জানো? হিমালয়পৃষ্ঠের সব ইয়েটিকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে তোমার বিরুদ্ধে।"

"ইয়েটি?—তারা ত তোমারই ভক্ত, দেখেছি—!" বলে টারজান।

"ভক্তি চটিয়ে দিচ্ছেন আরিমানের জাদুদণ্ড নিজে ধারণ করেছে ইয়েটির রূপ, যেমন একবার ধারণ করেছিল ন্যন্দুরের রূপ। মনে পড়ে কি?"

"পড়ে, সেই ন্যন্দুর উপত্যকায়। সমস্ত ন্যন্দুরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল আমায় হত্যা করবার জন্য।"

"ঠিক সেইরকম"—বলে আয়বাঙ্গি—"কিন্তু আজে-বাজে কথায় সময় নষ্ট করছি আমরা। গজমতী যে তোমায় ডেকেছিল, কেন ডেকেছিল তুমি জানো?"

"জানি। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

"কীভাবে উদ্ধার করবে, কিছু ঠিক করেছ?"

"তা কেমন করে ঠিক করব? দেহের শক্তিতে যা সম্ভব, তা আমি চিরদিন করেছি, চিরদিন করব গজমতীর জন্য। কিন্তু যেখানে দেহাতীত শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে, সেখানে ত তুমিই ভরসা। আরিমানের জাদু তোমার চেয়ে প্রবল কি না, তুমিই জানো। কিন্তু আমি ত দেখছি তুমিও কিছু দুর্বলা নও সে-বিদ্যায়।"

আয়বাঙ্গি আবার হাসল, সেই খলখল হাসি। তারপর করল কী, টারজানকে অবাক্ এবং হতবুদ্ধি করে দিয়ে হঠাৎ সে উবে গেল তার সমুখ থেকে।

আর সেইক্ষণে দূরে শোনা গেল একটা প্রচণ্ড কলরব। ইয়েটিরা আসছে।

আকাশের মেঘ তখন কেটে গিয়েছে। বৃহৎ একটা চাঁদ উঠেছে ঠিক টারজানের মাথার উপরে। একটা দুর্দান্ত হিমেল হাওয়া উত্তর দিক্ থেকে ছুটে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল টারজানের গায়ে।

হায়, ন্যন্দুরের দুর্গন্ধ চামড়াখানাও হাতের কাছে নেই! সেটা ইয়েটি গুহার নিকটেই উপত্যকায় পড়ে আছে।

আর, সবচেয়ে মারাত্মক কথা—বুকের ভিতর থেকে জাদুদণ্ডখানি অন্তর্ধান করেছে আবার।

তা যাক—তার জন্য ভয় পাবার কিছু নেই। যখন ওকে দরকার, তখন ও ঠিক আসে। এখন হয়ত দরকার নেই। অর্থাৎ ভক্ত ইয়েটিদের নিধনে আয়বাঙ্গি জাদুশক্তির প্রয়োগ করতে চায় না।

বেশ, না চায় যদি, করে না যেন। টারজান নিজের শক্তিতে গরিলাদের এক একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়েছে এক এক সময়, জঙ্গলভরা ন্যামাদের গোটা পল্টনকে চালিত করেছে অঙ্গুলিহেলনে, সে কি মুখোমুখি লড়াইয়ে ভয় পাবে, ইয়েটিদের সংখ্যা যতই হোক?

হোক দেহে তাদের মত্তমাতঙ্গের শক্তি, বুদ্ধির ভাণ্ডার ত তাদের শূন্য!

টারজানের মনে পড়ে কচুর শিকড় যখন সে খেতে গিয়েছিল ইয়েটি উপত্যকায় প্রথম এসে, গজমতীর জাদুদণ্ড তখন তার হাতে আঘাত করে সে-শিকড় হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

নিশ্চয় এই কারণে যে ইয়েটির খাদ্য খেলে ইয়েটির অর্থাৎ জানোয়ারের মতই বুদ্ধিসুদ্ধি হয়ে যাবে টারজানের।

একটা উন্নতশ্রেণীর মানুষের পক্ষে তারচেয়ে মর্মান্তিক বিপর্যয় আর কী হতে পারে?

কিন্তু সে-চিন্তা এখনকার নয়।

ইয়েটিদের কোলাহল নিকটতম হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। আকাশে চন্দ্রমণ্ডলে একটা আগুনের আভা। আরিমানের অশিব শক্তি যেন ছেয়ে আছে আকাশ পৃথিবী।

কোন্ দিকে যাবে এখন টারজান? এ জায়গাটা লড়াই দেবার পক্ষে অনুকূল নয়, চারিদিকে এর খোলা জায়গা। তবে কি ফিরে যাবে পাতালপুরীতে?

বজ্রাঘাতে বিধ্বস্ত হলেও খুব সম্ভবতঃ লুকিয়ে লড়াই করবার মত জায়গা এখনও সেখানে কোথাও-না-কোথাও মিলতে পারে।

কিন্তু ওদিকে যাওয়ার উপায় আছে কি?

পাতালপুরীর ইয়েটির দল—হলদে অধিবাসীদের পোষা যমদূতেরা—তারা ঐ তেড়ে আসছে না পাতালপুরীর দিক্ থেকে?

ওদিকে এখন যাওয়া মানেই হচ্ছে দুটো আগুনের মধ্যে ধরা পড়া।

এমন মূর্খতা টারজান করবে না।

সে দ্রুত পা চালিয়ে দিল বিপরীতমুখে।

দুই দিক্ থেকে কোলাহল শোনা যায়—পিছন দিক্ এবং বাম দিক্। টারজান সমুখ এবং ডান দিকের মাঝামাঝি একটা কোণ ধরে অগ্রসর হতে লাগল। সম্পূর্ণ অজানা অঞ্চল।

ছোট ছোট ঝোপঝাড়। চাঁদের আলোর নীচে কতকগুলো বুড়ী যেন সাদা কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে আছে।

সাদা কেন? এতক্ষণে টারজানের হুঁশ হল গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু জলের আকারে পড়ছে না বৃষ্টি, পড়ছে অতি সূক্ষ্ম বরফকুচির আকারে।

আরিমানের ঝড় এই কাণ্ডটি করে গিয়েছে। তুষারবৃষ্টির সময় এখনো আসেনি এ-অঞ্চলে। জমা হচ্ছিল নিম্ন আকাশে, মাসখানেক পরে মাটিতে নামবার মতলবে।

সেই তুষারমেঘকে আজকার প্রাকৃতিক আলোড়ন অসময়ে ভেঙে দিয়েছে, অতর্কিতে শুরু হয়ে গিয়েছে তুষারবৃষ্টি।

টারজানের খালি গা। তার উপরেও যে এক লেপ বরফকুচি জমে গিয়েছে, তা এতক্ষণে লক্ষ্য করল সে।

শীত? সে ত আগে থাকতেই করছিল। আশ্চর্য এই যে, গায়ে তুষারকম্বল জড়িয়ে তার বরং আগের চাইতে এখন ঠাণ্ডা কম লাগছে।

বিষে বিষক্ষয় নাকি? টারজান হেসে ফেলল ছুটতে ছুটতেই।

কিন্তু এ ঠাণ্ডা আর বেশীক্ষণ বরদাস্ত হবে না, এটা সে জানে। অচিরেই হাত-পা হয়ত আড়ষ্ট হয়ে যাবে। চলচ্ছক্তি হারিয়ে সে হয়ত মাটিতে পড়ে যাবে, আর তার দেহটাই হয়ত ঢাকা পড়ে যাবে দুই হাত পুরু জমাট বরফের তলায়।

সে পরিণতি এড়াবার জন্য যদি কিছু করতে হয়, তবে তা এক্ষুণি।

আপাততঃ একমাত্র কাজ হচ্ছে তীরবেগে দৌড়োনো। তাতে গা-ও গরম থাকছে, ইয়েটিদের থেকে দূরে যাওয়াও হচ্ছে।

কিন্তু ইয়েটিযূথের কোলাহল ত পিছনে লেগেই রয়েছে এখনো! অত বিরাট বিরাট কলেবর নিয়ে ওরা দৌড়োচ্ছে কেমন করে?

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ হোঁচট খেল টারজান। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট হুস্-হুস্ শব্দ এল কানে।

টারজান সে শব্দ চেনে। আফ্রিকার অরণ্যে এর সঙ্গে হামেশাই কারবার হয়েছে তার।

হিস্টা! সাপ! তবে খুবই বড় জাতের সাপ। ছোট সাপ আওয়াজ তোলে হিস্-হিস্। বড়রা করে হুস্-হুস্-হুস্—

টারজান দাঁড়িয়ে পড়ল। পুরোনো বন্ধু হিস্টার কাছ থেকে তার ভয় করবার কিছু নেই।

বিরাট ময়াল একটা।

পড়ে আছে অন্ততঃ ত্রিশ হাত জায়গা জুড়ে, একটা ওপড়ানো শাল গাছের মত।

টারজান এগিয়ে গেল ময়ালের মাথার দিকে। সাপের কোন ভাষা নেই, কিন্তু তার হিস্‌হিসানির ভিতর আছে বিভিন্ন পর্দা এবং রকমারি সুর।

বিভিন্ন রকম মেজাজ প্রকাশ পায় পর্দা ও সুরের প্রকারভেদে।

টারজান জানে এসব।

অতি মোলায়েম একটা সুর ভাঁজছে এই ময়াল। সুর শুনেই একটা মতলব এল টারজানের মাথায়, এই ময়ালের সাথে ভাব করবার একটা উন্মাদ সংকল্প।

সাপ কোন শব্দ শুনতে পায় না, যদি তা হাওয়ার ভিতর দিয়ে আসে। টারজান সাপের সুরের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে তাল ঠোকে সশব্দে। মাটির সে কম্পন অনুভব করবার শক্তি আছে হিস্টাদের। ময়াল শুনছে। তার গানের এই অভিনব সঙ্গত শুনে শুনে তারিফ করছে টারজানের।

শুধু এই একটি ময়ালই নয়, দূরের ও নিকটের প্রত্যেকটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে বিশাল বিশাল ময়াল, আর টারজানকে ঘিরে নাচ দেখছে তার।

নাচ দেখছে এবং নাচের তালে তালে হুস্-হুস্-হুস্ বিকট আওয়াজ তুলছে বত্রিশটা ময়াল। এই মুহূর্তের এই

টারজানকে ঘিরে নাচ দেখছে তার।

আওয়াজ যে বন্ধুত্বসূচক, তা টারজান ভিন্ন অন্য কেউ জানে না।

অন্য কারও কানে সে আওয়াজ গেলে তার মূর্ছা যাওয়ার কথা। টারজান কিন্তু উল্লাসে নেচে চলেছে।

যুদ্ধজয়ের নিশ্চিত কৌশল মাথায় এলে সেনাপতির মনে যে-আনন্দ জাগে, ঠিক সেই আনন্দ এখন টারজানের।

দূরের কোলাহল নিকটে আসছে। ইয়েটিবাহিনীর কোলাহল। দুই দল ইয়েটি মিলেমিশে একটা দল হয়ে গিয়েছে। পৃথিবী কাঁপিয়ে তারা ছুটে আসছে টারজানকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবার জন্য।

মাটির সে দুরুদুরু কাঁপুনি ধরা পড়ছে ময়ালদের অনুভূতিতে। মৃত্তিকালগ্ন বুকের পেশীর সাহায্যে।

চঞ্চল হয়ে ওঠে ময়ালেরা। তারা নাচে-গানে মশগুল হয়ে রয়েছে জ্যোৎস্নাপুলকিত স্তব্ধ নিশীথে, এমন সময়ে বেরসিকের মত কারা আসছে তাদের আনন্দে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবার জন্য ?

হুস্-হুস্ আওয়াজের সুর পালটাচ্ছে। প্রথমে বিরক্তি, তারপরে ক্রোধ ফুটে উঠছে হুস্‌হুসানির ভিতর দিয়ে।

টারজান নাচতে নাচতে আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে সরে পড়ছে। ময়ালেরা মাথা ঘুরিয়েছে আগতপ্রায় ইয়েটিদের অভিমুখে।

বারো হাত উঁচু ইয়েটিদের নজর মাটিতে পড়ে শুধু কচুর শিকড় খুঁজবার সময়। তখন শুধু নজর নয়, দুখানা শালের গুঁড়ির মত মোটা হাতও মাটিতে লগ্ন হয়, খোঁজাখুঁজির সুবিধার জন্য।

বর্তমান ক্ষেত্রে ত খাবারের অন্বেষণে অভিযান করেনি ওরা। বেরিয়েছে দুশমন পাকড়াবার জন্য। পাকড়াবার এবং যমদ্বারে পাঠাবার।

কাজেই তারা তাকিয়ে আছে মাটির অনেক উপর দিয়ে। কোথায় সে শত্রু ? সেই বালক ইয়েটির মত চেহারা যার, অথচ সত্যিকার ইয়েটি যে নয় ?

সত্যিকার ইয়েটি যে টারজান নয়, তা ইয়েটিদের বুঝিয়ে দিয়েছে আরিমান। ইয়েটি যদি হবে, তবে সে কচুর শিকড় খায় না কেন ? ইয়েটি গুহাতে সে কি খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করেনি শিকড় ?

তাই নিয়ে ঝগড়া মারামারি হয়েছিল। আয়বাঙ্গির কোলের উপর গিয়ে যদি হুমড়ি খেয়ে না পড়ত দুশমন, তাহলে সেইদিনই ত সে খতম হয়ে যেত !

বেঁচে যেত আজকার এই ঝামেলা।

কিন্তু তা হয়নি। হয়নি যখন, তখন ঝামেলাটা আজ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

ঐ যে দেখা যায় দুশমনটাকে, নাচতে নাচতে পালাচ্ছে। বিকট উল্লাসে লাফিয়ে অগ্রসর হল ইয়েটির দল।

মাড়িয়ে দিল ধরালগ্ন ময়ালদের, যারা আগে থেকেই ক্রুদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছিল এই অনধিকার-প্রবেশকারীদের জন্য।

হু-উ-উ-স্! একটা প্রচণ্ড জিঘাংসার আওয়াজ।

বত্রিশটা ময়াল অতবড় সব বিশাল কলেবর নিয়ে যেন লাফ দিয়ে উঁচু হয়ে উঠল মাটি থেকে কয়েক হাত ঊর্ধ্বে।

তারপর, চোখের পলকে ইয়েটিদের হাতীর মত কলেবর পাকে পাকে বেষ্টন করে ফেলল তারা।

তারপর, একটা নারকীয় তাণ্ডব সেখানে। ইয়েটিরা অবশ্য সংখ্যায় হয়ত বত্রিশের বেশী ছিল, কিন্তু যে সব ভাগ্যবান্ ইয়েটি ময়ালের কুক্ষিগত হয়নি, তারা পিছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে।

বত্রিশটা ইয়েটি প্রাণপণে যুঝল বত্রিশটা ময়ালের সঙ্গে। ইয়েটিও মরল, ময়ালও মরল। যেসব ইয়েটি দেহের আধখানা ময়ালের জঠরে বিসর্জন দিয়ে বাকী আধখানা নিয়ে বেরুতে পারল, টারজানের পশ্চাদ্ধাবনের চিন্তা তাদের মাথা থেকে

বিলকুল উবে গিয়েছে ততক্ষণ।

(৯)

ইয়েটি-উপত্যকায় আয়বাঙ্গির গুহা।

না, টারজান আর যাবে না সেখানে। দেহধারিণী গজমতীকে সে দেখেছে। তাকে খুঁজে বার করাই এখন তার কাজ।

গজমতী এ-জন্মে নাম নিয়েছে বেদবতী। কথা কইছে এমন এক ভাষায়, যার এক বর্ণ বোঝে না টারজান।

টারজানের ভাষাও গজমতীর বোধগম্য হচ্ছে না, যদিও গজমতী আয়বাঙ্গিতে পরিণত হলেই সঙ্গে সঙ্গে সবজান্তা হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু, আয়বাঙ্গিরূপে ত সে চায় না তার বাঞ্ছিতাকে। মুশকিল হয়েছে ঐখানে! কোন্‌টা বেশী কাম্য, মূর্তি না আত্মা, বুঝতে দেরি হয়নি টারজানের।

বনের জীব সে, দেহাতীত কোন সম্পদের কামনা সে করে না। যে স্তরে উঠলে সে কামনা আসতে পারে, সে স্তরে উত্তীর্ণ হবার সাধনা সে করেনি কোনদিন। সুযোগ আসেনি, প্রয়োজনও বোধ করেনি।

সে গজমতীর সান্নিধ্য কামনা করছে, আয়বাঙ্গির গুহায় গিয়ে তার ফল হবে কী?

গজমতী দেখা দিয়েছিল তাকে। তারপরই অন্তর্ধান করেছে। ভাষাবিভ্রাটের দরুন বিরক্তির বশে নয় ত?

যদি তাই হয়, গজমতী অর্থাৎ বেদবতীর ভাষা যে-করেই হোক, শিখতেই হবে টারজানকে।

কোথায়? কার কাছে? আয়বাঙ্গি পারে শেখাতে। কিন্তু তার জন্য আয়বাঙ্গির গুহায় যাওয়ার দরকার নেই। সেখানে ত সে নিষ্প্রাণ পাথর মাত্র।

যখন ইচ্ছা হবে, আয়বাঙ্গি রক্তমাংসের দেহ নিয়ে নিজেই দেখা দেবে তাকে। দেবেই দেখা। না দিলে সুদূর—বহুদূর আফ্রিকা থেকে তাকে ডেকে আনার তাৎপর্য কী?

আয়বাঙ্গি আর গজমতী ত ভিন্ন নয়!

কিন্তু আয়বাঙ্গির জ্ঞান আর গজমতীর রূপ সে একাধারে পেতে পারছে না কেন?

অস্পষ্ট একটা ধারণা আসে তার জংলী বুদ্ধিতে। গজমতী চায় না যে গজমতীর করুণাই তার একমাত্র সম্বল হোক।

সে চায় টারজান নিজের সাধনাবলে লাভ করুক গজমতীকে।

টারজান তাতে খুব রাজী। পৌরুষগর্ব তার আকাশচুম্বী। তার চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে বলে সে মনে করে না।

তবে—ঐ আরিমান। মরেও যে সাংঘাতিকভাবে বেঁচে রয়েছে। অসীম অশিব শক্তির প্রভাবে টারজানকে সে পদে পদে বিপন্ন করছে, ব্যাহত করছে তার প্রত্যেকটা প্রয়াস।

আয়বাঙ্গির জাদুশক্তিও ম্লান আরিমানের শক্তির কাছে। পূর্বজন্মে আরিমানই ত গুরু ছিল, গজমতী ছিল শিষ্যা। গুরু যে থলি উজাড় করে নিজের জ্ঞান ষোলআনা শিষ্যাকে দিয়ে দেয়নি, তা ত এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আয়বাঙ্গির পীঠস্থান এই পাতালপুরী। আরিমান তা চক্ষুর পলকে ধ্বংস করেছে মায়া-বজ্রের আগুনে।

আয়বাঙ্গির প্রিয় এই টারজান। অথচ আয়বাঙ্গির চিরভক্ত ইয়েটিদের আরিমানই লেলিয়ে দিয়েছে টারজানকে হত্যা করবার জন্য।

টারজান মনে মনে তারিফ করে নিজেকে। নিজের বুদ্ধিবলে সে ইয়েটিযূথকে মথিত করে তাড়িয়েছে। ময়ালগুলিকে দিয়ে নিজের কাজ সে উদ্ধার করেছে অতি দক্ষতার সঙ্গে।

সাফল্যের আনন্দে মনটা তার চাঙ্গা। ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সে খুবই আশান্বিত।

ঘুরতে ঘুরতে রাত ভোর হয়ে এসেছে। পাহাড়ে পাহাড়েই ঘুরছে সে। এই জায়গাটাতে পাহাড় ঘন অরণ্যে আচ্ছন্ন।

আর এ-অরণ্য দেওদার-পাইনের মত শাখাশূন্য গাছের অরণ্য নয়। টারজানের পরিচিত আম-জাম-কাঁঠালের শাখাবহুল মহাবৃক্ষ গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে এখানে।

নীচে থেকে মনে হয় বৃক্ষচূড়ায় ঊষার আলো এসে পড়েছে।

সারা রাত দুর্জয় শীতে কষ্ট পেয়েছে টারজান। উত্তর-হিমালয়ের তুষারবৃষ্টি তার অনাবৃত দেহের উপর দিয়ে গিয়েছে। কী করে এ-ঠাণ্ডা সহ্য করে সে বেঁচে আছে, তাই ভেবেই অবাক্ হচ্ছে টারজান।

অবশ্য প্রকৃত অবস্থা জানা থাকলে টারজান অবাক্ হত না। ইয়েটি গুহায় সে যখন আয়বাঙ্গির পায়ের তলায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তখন আয়বাঙ্গিই শীতের ওষুধ দিয়েছিল তাকে।

একজাতীয় গুঁড়ো। কী সে গুঁড়ো তা আয়বাঙ্গি ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই খানিকটা টারজানকে হাঁ করিয়ে তার জিহ্বায় লেপে দিয়েছিল আয়বাঙ্গি।

স্বাদহীন সে গুঁড়ো। জেগে উঠে টারজান টেরই পায়নি যে তার মুখে কোন কিছু পড়েছে।

কিন্তু সেই গুঁড়োই তার দেহে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে

রক্তজমানো পার্বত্য শীতের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তা নইলে সে জমে বরফ হয়ে যেত কোন্ কালে।

কিন্তু জমে না গেলেও অস্বস্তি সে বোধ করেছে বইকি! সারা রাতই করেছে। এক-একবার ফেলে-আসা ন্যুন্দুর-চামড়াটার জন্য আপসোসও হয়েছে মনে মনে।

এখন তাই মহাবৃক্ষদের মাথায় রোদ্দুরের আভা দেখতে পেয়ে সে একটু উষ্ণতার জন্য লোলুপ হয়ে উঠল। চটপট উঠে পড়ল নিকটতম গাছটাতে। মতলব—মগডালে গিয়ে বসবে।

কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তেতলায়। একটা তেডালার মাঝের খোল জুড়ে এক বিরাট জানোয়ার শুয়ে আছে।

ঠিক এই ধরনের জন্তু টারজান আফ্রিকায় দেখেনি। আকারে এর খানিকটা সাদৃশ্য আছে আফ্রিকার চিতার সঙ্গে। কিন্তু চিতাবাঘ সে এত বড় দেখেনি কোথাও।

অন্ধ-মহাদেশের মহাসিংহদের সমানই বপু এই জানোয়ারের। কিন্তু সিংহের মত কেশর এর নেই, তার বদলে আছে গায়ের ঘন হলদে লোমে লম্বা লম্বা কালো ডোরা।

আর, এর দাঁত, এর থাবা, এর নখর! এসবের সমজদার টারজানের মত কে আছে আর? টারজান দেখে দেখে সিদ্ধান্ত করল—এ জন্তু মাংসাশী এবং যে-কোন বনের পশুরাজ হওয়ার যোগ্য।

ভাগ্যিস আফ্রিকার অরণ্যে এ জীবের অস্তিত্ব নেই। থাকলে সেখানে ন্যুমাদের প্রভুত্ব থাকত কিনা সন্দেহ।

জন্তুটা ঘুমোচ্ছে এখনও। সম্ভবতঃ এই তেডালায় এর নিত্যনৈমিত্তিকের বাসস্থান, তা নইলে এত নিশ্চিন্ত নিদ্রা সম্ভব হত না এত বেলা পর্যন্ত। মাথার উপরে রোদ্দুর ঝকমক করছে যে!

টারজান জন্তু-জানোয়ারের সাহচর্যে মানুষ। কখনো ভাব করেছে, কখনও লড়াই করেছে তাদের সঙ্গে। এ-জন্তুটা তাকে কীভাবে নেয়, জানবার জন্য ভারী আগ্রহ হল তার।

এ-পর্বতে এসে অবধি দু'রকম মাত্র জানোয়ার দেখেছে সে। দু'রকম, তাও যদি ইয়েটিদের জানোয়ার বলে ধরা যায়।

ইয়েটি বাদে আর যে-জীবটি সে দেখেছে, তা হল কৃষ্ণসার হরিণ, যা সে রোজ এক-একটা মেরে খায়।

এখন এই তৃতীয় জানোয়ার যা চোখে পড়ল এ রীতিমত সম্ভ্রম জাগায় দর্শকের মনে। ইয়েটি? তারা জাগায় ঘৃণা, আর হরিণ—সে ত কৃপার পাত্র।

এই মহাব্যাঘ্র—হাঁ, টারজান জানে না বটে, কিন্তু এই অভিনব জন্তু ভারতের বাঘ ছাড়া আর কিছু নয়—

এই বাঘ জেগে উঠলে টারজানের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করে, দেখবার জন্য ভারী ব্যাকুল হল সে।

যদি দোস্তি করতে সে রাজী থাকে, টারজান খুবই খুশী হবে। আর যদি হিংস্রতার দিক দিয়ে যায়, তাতেও টারজান রাজী। অনেকদিন হাতাহাতি লড়াই হয়নি কোন সত্যিকার শক্তিশালী মহাজন্তুর সাথে।

টারজান পা দিয়ে একটা ধাক্কা দিল বাঘের গায়ে। বাঘ চোখ মেলল সঙ্গে সঙ্গেই।

আশ্চর্য! এত বড় জানোয়ার, এমন তীক্ষ্ণ নখর আর এমন সূচ্যগ্র দাঁত যার, তার দু'চোখের দৃষ্টি এমন!

জীবনে লক্ষ মহাজন্তুর মুখোমুখি হয়েছে টারজান, এমন শান্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টি কারও চোখে সে কখনও দেখেনি।

টারজান অবাক্ হয়ে তার সেই চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, শার্দূল মহারাজ আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। সূর্যগোলক তখন চারতলার ডাল-পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখান থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মহাব্যাঘ্র সামনের দুই থাবা একত্র করে সেই দিকে তাকাল এবং ধীরে ধীরে মাথা নুইয়ে, সেই দুই থাবা কপালে ঠেকাল।

এ-কাণ্ডটার মানে কী, তা অবশ্য আফ্রিকা-অরণ্যে লালিত মানুষ টারজানের বুঝবার কথা নয়। সে শুধু ভাবছে জন্তুটা তার মত একজন লম্বা-চওড়া মরদকে এতটুকু মনোযোগের যোগ্য বলেও ভাবছে না কেন!

শত্রুভাবে হোক, মিত্রভাবে হোক, টারজানকে ও সম্ভাষণ করবে একটা, এটাও কি অত্যধিক প্রত্যাশা?

বাঘ ততক্ষণে উঠে এসেছে এবং ধীরে ধীরে গাছের ডাল থেকে ডালে পা ফেলে ফেলে স্বচ্ছন্দে নেমে যাচ্ছে গাছ থেকে। গাছের দিকে তার চোখ নয়, নামছে বুঝি বহুদিনের অভ্যাসের বশেই।

চোখ তার গাছের দিকে নয়, স্থিরদৃষ্টিতে টারজানের উপর নিবদ্ধ। টারজানের মনে হল ও বুঝি কী বলতে চায় তাকে। মুখে ওর ভাষা নেই, কিন্তু চোখে ওর ইশারা আছে।

টারজান স্পষ্ট দেখল ওর চোখের পাতা ঠিক আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে উঠছে আর নামছে।

এ বিস্ময় আরও কতদূর গড়ায়, দেখবার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা হল টারজানের। বাঘের পিছনে পিছনে সেও ধীরে ধীরে নামতে লাগল গাছ থেকে।

মগডালে উঠে একটু রোদ পোয়াবার বাসনা তার ছিল,

এখন আর মনেও পড়ছে না সে কথা।

দানো! বহুদিনের বিস্মৃত সোনাপাহাড়ের দানোর কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল টারজানের। সিংহের ভিতর মহাসিংহ ছিল দানো।

কী ভালোই সে বেসেছিল টারজানকে!

নিজের জীবন দিয়ে সে টারজানকে বাঁচিয়েছিল কালভুজঙ্গের কামড় থেকে।

এই মহাব্যাঘ্রের চালচলন যেন সেই দানোরই মত।

নেমে যাচ্ছে তরতর করে ডালের নীচে ডালে একের পর এক পা ফেলে ফেলে। তার অনুসরণ করে করে টারজানও ঠিক সেই সেই ডালে পা ফেলে নেমে এল মাটিতে।

বাঘ তার দিকে আগের মতই চোখের ইশারা করল বারকতক। চোখের পাতা নাচাল উপরে-নীচে। তারপর হাঁটতে শুরু করল বনপথ দিয়ে।

হাঁ, পায়ে পায়ে সুঁড়িপথ তৈরী হয়ে আছে। দু'ধারে পাথুরে মাটিতে ছোট ছোট অজানা আগাছা, তার প্রত্যেকটাই লাল সাদা হলদে গোলাপী ফুলের সমারোহে উজ্জ্বল।

মহারণ্যের নিবিড় ছায়ায় এত ফুল কী করে ফোটে, টারজান বুঝতে পারে না।

পাখী ডাকছে গাছে গাছে। মৌমাছি গুনগুনিয়ে ঘুরছে ফুলে ফুলে। একটা বড় গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে কৃষ্ণসার মৃগেরা দল বেঁধে উঁকি দিচ্ছে টারজানের দিকে।

হ্যাঁ, টারজানের নিশ্চিত বিশ্বাস হরিণদের দৃষ্টি তার দিকেই নিবদ্ধ। অতবড় জলজ্যান্ত বাঘটা হেলে-দুলে চলে যাচ্ছে তাদের প্রায় গা ঘেঁষে, সেদিকে হরিণদের এতটুকু নজর আছে বলে মনে হয় না।

নাঃ, এ অরণ্যে বিস্ময়ের আর অন্ত নেই।

কুলুকুলু জলের শব্দ শোনা যায়। সমুখেই ছোট এক নদী। ছোট বটে, কিন্তু স্রোত অতি প্রখর। জলও নয় অগভীর। একটা বড় গাছ উপড়ে পড়ে স্রোতের টানে অবলীলায় ভেসে যাচ্ছে, তার ডালপালা কোথাও এতটুকু বাধছে না নদীর গর্ভে।

দুটো দেবদারু গাছ পাশাপাশি পড়ে আছে নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত। এভাবে আপনা থেকে গাছ পড়তে পারে না। এ নিশ্চয় মানুষের হাতের কাজ।

মানুষ আছে এখানে?

টারজান ভাবছে—মানুষ যদি থাকে, হঠাৎ তাদের সমুখে গিয়ে হাজির হওয়া তার উচিত হবে কি না।

আফ্রিকার অরণ্য হলে সে ত প্রাণান্তেও আচমকা হাজির হতে পারত না অপরিচিত লোকালয়ে। জীবনের আশঙ্কা আছে তাতে।

কিন্তু এখানকার ব্যাপার আলাদা।

বাঘ দেবদারু সাঁকোতে উঠে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। টারজানকে ডাকছে চোখের ইশারায়। আবার দানোর কথা মনে পড়ল টারজানের, সে সব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সাঁকো পার হল।

এপারে আর বন নেই। নদীর ধার দিয়ে মাঝে মাঝে এক-একটা বড় গাছ। টারজানের চেনা গাছ একটাও নেই তার ভিতর। সব গাছেই ফুল ফুটেছে অজস্র, উপরন্তু ফলও ফলেছে কোন কোন গাছে।

খোলামেলা প্রশস্ত অঙ্গন একখানি। ছোট মাঠই বলা যায় তাকে। ঘাসে ঘাসে সমাচ্ছন্ন, ভুঁইচাঁপা ফুল মাথা তুলেছে ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে।

পাতার ছাউনি-দেওয়া লম্বা ঘর একখানি, তার তিন দিকে ঘেরা, বাকী একটা দিক্ একেবারে খোলা। সেই ঘরে সারি সারি বসে আছে কতকগুলি বালক। মাটিতেই বসে আছে, কুশঘাসের আসনে।

বাঘকে দেখেই তারা হৈ-হৈ করে উঠল।

তাদের ভাষা টারজানের অজানা। মনে হল গত রাত্রে গজমতীর মুখে যে-ভাষার উচ্চারণ শুনেছিল, বালকেরাও সেই ভাষায় কথা কইছে।

কিন্তু ভাষা না বুঝুক, তাদের হল্লার ভিতরে ভয়ের আভাস ত কিছুমাত্র নেই, বরং রয়েছে উল্লাসের ঝংকার।

এ-বাঘ এদের পোষা বাঘ। তাই বটে, সেইজন্যই মানুষের প্রতি এর এত অনুরাগ।

কিন্তু কী আশ্চর্য! শুধু বালকদের উল্লাসই নয়, জন্তু-জানোয়ারের উল্লাস-কলরবও শোনা গেল। হরেক রকম আওয়াজ। তার ভিতর বাঘের গর্জন আছে, হরিণের ডাক আছে, আছে গাভীরও হাম্বা রব।

একটা ধবধবে সাদা বাছুর ঘরের পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে সামনের দিকে এসে পড়ল এবং টারজানকে স্তম্ভিত করে দিয়ে টারজানের সঙ্গী শার্দূলরাজের গা চাটতে লাগল পরম বান্ধবতার সঙ্গে।

আর, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না টারজান, সেই মহাব্যাঘ্র—

না, বাছুরের গা সে চাটল না, চাটতে গেলে তার কর্কশ জিহ্বার ঘর্ষণে বাছুরের ছালচামড়া উঠে যাওয়ার ভয় ছিল।

গা চাটল না বটে, কিন্তু আদর জানাল সমুখের বাঁ
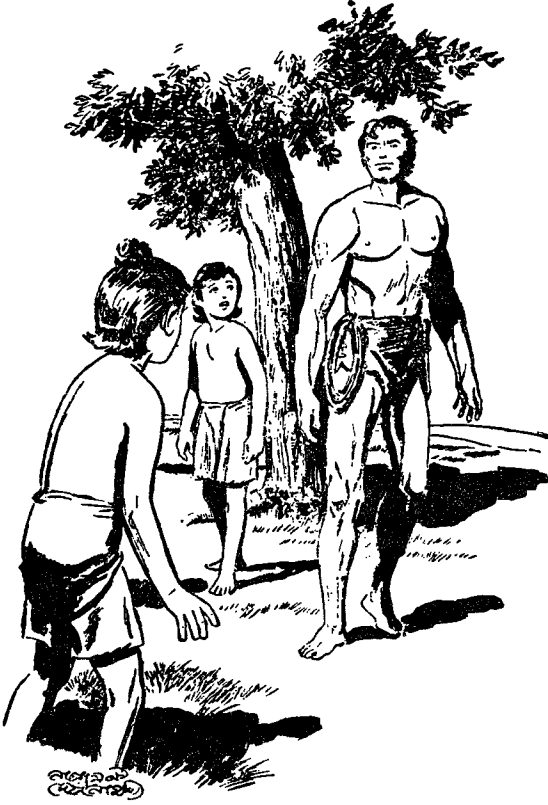
বালকদের দৃষ্টি পড়ল বাঘের সাথী মানুষটার দিকে।

পায়ের থাবাটা তুলে ধীরে ধীরে বাছুরের মাথায় চাপড় দিয়ে দিয়ে।

ঐ অত-অত বিশাল বিশাল-বঁড়শির মত নখ, কোথায় গেল তারা? তার একটার আঁচড় লাগলে যে এই নধর গোবৎসের ভবলীলা সাঙ্গ হত এতক্ষণ!

না, আঁচড় লাগতে পারে না, বাঘ থাবার ভিতর নখ লুকিয়ে ফেলেছে আগেই।

এতক্ষণে বালকদের দৃষ্টি পড়ল বাঘের সাথী মানুষটার দিকে। তার নগ্ন দেহ, কটিতে মাত্র সিংহচর্ম একখানি, কোমরে ছোরা এবং ঘাসের দড়ি—উষ্কখুষ্ক বড় বড় চুল—

সব দেখে বালকেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। কী যে তারা বলাবলি করল তা টারজান বুঝবে কেমন করে? কিন্তু একটা কথা তাদের মুখে মুখে ফিরছে, অর্থ না জেনেও শব্দটা আয়ত্ত করে ফেলল টারজান।

শব্দটা—'কিরাত'।

সব ছেলেই কিরাত-কিরাত করছে। উচ্চারণে বেশ একটু বিতৃষ্ণার ভাব রয়েছে।

টারজান সতর্ক হল। ঠিক সাদর সম্ভাষণের সুর ত ফুটে উঠছে না বালকদের কথায়!

কিন্তু সে-সতর্কতার কোন প্রয়োজন ছিল না। বালকদের কলরবে গৃহের পিছন থেকে একটি বয়স্ক পুরুষ বেরিয়ে এলেন।

শুভ্র কেশ এবং শ্মশ্রু দেখে তাঁকে বৃদ্ধই ভাবতে পারত টারজান। কিন্তু বৃদ্ধ না ভেবে ভাবল শুধু বয়স্ক, কারণ শালতরুর মত সরল সতেজ তাঁর দেহকাণ্ড! চোখের দীপ্তি তাঁর অম্লান।

গাছের ছাল পিটিয়ে তাঁর দেহের আবরণ তৈরী হয়েছে। বলা বাহুল্য বালকদেরও লজ্জানিবারণের ঐ একই ব্যবস্থা।

সেই বয়স্ক পুরুষ আসতেই বালকদের কলরব স্তব্ধ হল। বাঘটা ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের তলায় বসে পড়ল, তিনি তার মাথার উপর রাখলেন বাঁ হাতখানি।

তারপর টারজানকে বললেন মধুর হাস্যে—"স্বাগতম্!"

(১০)

বর্ষীয়ান্ আশ্রমবাসী 'স্বাগতম্' বলে যে-সম্ভাষণ করেছিলেন টারজানকে, তা তাঁর শুধু মুখের কথাই নয়।

উক্তিটি যে আন্তরিক, তা তিনি প্রমাণ করে দিলেন হাতে-কলমে।

বালকদের ডেকে বললেন—"ইনি কিরাত নন, বনবাসী ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রতেজের স্ফুরণ দেখছি এঁর প্রতি অবয়বের সঞ্চালনে, এঁর প্রত্যেক দৃষ্টিক্ষেপণে। কেন ইনি বনবাসী, তা ক্রমে জানব। আগে এঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে বরণ কর।"

তখন দুটি বালক এসে জোড়হাতে টারজানকে গৃহমধ্যে আহ্বান করল। কথা না বুঝুক, ইঙ্গিত এত স্পষ্ট যে ঘরে ঢুকে কুশাসনে আসীন হতে কোন দ্বিধাই এল না টারজানের মনে।

আর দুটি বালক জল এনে পা ধুইয়ে দিল টারজানের, তার নিজের সমূহ আপত্তি সত্ত্বেও। পত্রপুটে কিছু খাবার এবং মৃৎপাত্রে উষ্ণ পানীয় এনে দিল আরও দুই বালক—খাদ্য বলতে কয়েকটি সুপক্ক ফল আর পানীয় বলতে গরম দুধ।

ক্ষুধা টারজানের ছিল, কিন্তু এ-খাদ্যে তার রুচি হবে কেন? একটা আস্ত হরিণ মেরে এনে দিলে তবে সে তৃপ্তি করে তা খেতে পারত। কিন্তু তা বলে ত আর প্রত্যাখ্যান করা যায় না এদের সাদর উপহার! অনিচ্ছাতেই খেতে শুরু করল টারজান।

কিন্তু ফল মুখে দিয়েই সে মশগুল। কী এ ফল?

আফ্রিকার অরণ্যে সে খায়নি এ জিনিস। তৃপ্তি? ভাষা জানলে সে আরও গুটিকতক চাইত এই ফল।

গরম দুধটুকু যেন অমৃত। সত্যই দেহকে গরম করে তুলল দেখতে দেখতে। বর্ষীয়ান্ সন্ন্যাসী ডাকলেন—"দেবীবর!"

সেই মহাব্যাঘ্র উঠে এল ভূমিশয়ন ছেড়ে। সন্ন্যাসীর সমুখে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল সুবোধ বালকের মত।

সন্ন্যাসী বললেন—"অরণ্যের ওধারে যে অধিত্যকা আছে, সেখান থেকে রোজ দুটি করে হরিণ তুমি মেরে আনবে। একটি তুমি খাবে, একটি এনে দেবে এই অতিথিকে। খাবে নদীর ওপারে বসে, তুমিও, অতিথিও।"

বিস্মিত বালকদের দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসী বললেন—"আমরা নিরামিষাশী। জীবহিংসা পছন্দও করি না। কিন্তু সকলের খাদ্য একরকম নয়, হওয়া উচিতও নয়। মাংস খেতে না পেলে ক্ষত্রিয়ের ভিতর ক্ষত্রশক্তির অপমৃত্যু ঘটে দেখতে দেখতে।"

বলা বাহুল্য টারজান এ-আলাপনের এক বর্ণও বুঝল না। তবে সে দেখল দেবীবর বৃহৎ বৃহৎ লম্ফে তীরবেগে চলে গেল নদী পেরিয়ে, ওপারের অরণ্যের ভিতর দিয়ে।

এবং সে ফিরে এল এক প্রহর অতীত হতে না হতেই। টারজানকে ডেকে নিয়ে গেল ইশারায়, নদীর ওপারে।

টারজান বিস্মিত এবং পুলকিত। সদ্যোনিহত দুটি মৃগ সেখানে পড়ে আছে। একটি টারজানের দিকে মাথার ধাক্কায় ঠেলে দিয়ে দেবীবর নিজের অংশের হরিণটির সদ্ব্যবহারে মনঃসংযোগ করল।

টারজানও কালবিলম্ব করল না ভোজে বসে যেতে।

অতঃপর দিনের পর দিন কেটে যায়, টারজান রয়েই গেল। তপোবনের চারিধারে সে ঘুরে ঘুরে দেখে, কোথাও যেতে তার বাধা নেই। ঋষিপত্নী নিঃসংকোচে টারজানের নিকটে আসেন, যত্ন করে লাড্ডু খাওয়ান যখন-তখন। টারজান জানে এগুলি জলযোগ। আসল খাবার তার এনে দেবে দেবীবর।

সন্ন্যাসী দেবভাষা শেখাতে শুরু করেছেন টারজানকে। শিক্ষায় টারজানের প্রচণ্ড আগ্রহ। তার সন্দেহ নেই যে এই ভাষাই সেই ভাষা, যাতে গজমতী কথা বলেছিল তার সঙ্গে।

সন্ন্যাসীর শেখাবার পদ্ধতি চমৎকার। এক-একটা জিনিসের উপর হাত দেন, আর তার নাম উচ্চারণ করেন টারজানের দিকে তাকিয়ে। দ্বিতীয় দিনেই অনেক জিনিসের নাম তার আয়ত্ত হয়ে গেল।

সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে ছোট ছোট বাক্য বিন্যাস রচনা করতে শিখল দেবভাষায়। আশা হল আর এক সপ্তাহ শিক্ষা পেলে সে গজমতীর সঙ্গে যা-হোক করে আলাপ চালাতে পারবে।

কিন্তু গজমতীর দর্শন সে পাচ্ছে কোথায়?

এই পরম হিতৈষী সন্ন্যাসীর কাছে নিজের গুপ্তকথা যদি সে বলে, কেমন হয় তাহলে? টারজান গভীরভাবে চিন্তা করছে এই নিয়ে।

গজমতী বলেছে তার বর্তমান নাম বেদবতী। নামটা এই দেবভাষারই শব্দ, সে জ্ঞান তার ইতিমধ্যে হয়েছে।

সন্ন্যাসীকে অনায়াসে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—বেদবতী কে, এবং কোথায় থাকে! নিজের অতীত কাহিনী তাঁকে বলাও যেতে পারে। প্রসন্ন হয়ে তিনি হয়ত বেদবতী-লাভের কোন উপায় নির্দেশও করে দিতে পারেন।

কিন্তু টারজান তার কাহিনী সন্ন্যাসীকে বলবার আগেই তিনি একদিন টারজানকে চমকে দিলেন এক প্রশ্ন করে—

"তুমি ক্ষত্রিয়, কী অস্ত্রে তুমি দক্ষ?"

টারজান সত্য কথাই বলল—"একমাত্র অস্ত্র যা আমি চালাতে জানি, তা হল তীর-ধনুক। ওটাতে আমি নিজেকে দক্ষ বলতে পারি বোধ হয়।"

সন্ন্যাসীর মুখ উজ্জ্বল হল—"ধনুর্বাণ? তোমার সঙ্গে ত ধনুর্বাণ নেই দেখছি, কিন্তু আমার আশ্রমে আছে। রাজা নরসিংহদেব একদা অতিথি হয়েছিলেন এখানে, তাঁর সৈনিকেরা চলে যাওয়ার সময়ে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ভুলক্রমে ফেলে যায়।"

টারজান ভেবে পায় না ধনুর্বাণ নিয়ে তাকে কোন্ শত্রুর সঙ্গে লড়তে বলবেন সন্ন্যাসী। হরিণ শিকারের জন্য ত তাকে অস্ত্রধারণ করতে হয়নি এযাবৎ, হবেও না কোনদিন, দেবীবর থাকতে।

সন্ন্যাসী তার হতবুদ্ধিভাব দেখে মনের কথা ধরে ফেললেন—"ভগবান্ শংকর ঠিক সময়েই তোমায় এনে দিয়েছেন এই আশ্রমে। আশ্রমে উৎপাত ঘটবে বলে আভাস পেয়েছি।"

তারপর তিনি টারজানকে এক দীর্ঘ কাহিনী শোনালেন।

সত্যযুগ থেকে এই তপোবন রয়েছে এখানে। এক গুরু দেহরক্ষা করেন, তাঁর প্রধানতম শিষ্য গ্রহণ করেন গুরুর ত্যক্ত আসন। এইভাবে কত শত গুরু যে এই তপোবনে জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন, তার হিসাব নেই কিছু।

তপোবন আছে, তপোবনে উৎপাতও আছে। সত্য

ত্রেতায় ছিল রাক্ষসের উৎপাত। তারা চড়াও হত তপোবনে, আশ্রমবাসীদের হত্যা করে নরমাংস ভোজন করত। যোগবলে রাক্ষস তাড়ানো যায় না, তা নয়। তবে তার জন্য প্রয়োজন উঁচুদরের যোগবল, যা সেকালেও সব গুরুর থাকত না, এখন ত কারুরই থাকে না।

সেকালে রাজশক্তির সাহায্য নিয়ে রাক্ষস তাড়াতে হত। ত্রেতাযুগের পর থেকে সে-সাহায্যের আর দরকার হয়নি। কারণ ভগবান্ রামচন্দ্র রাক্ষসদের অধিকাংশকেই বধ করেছিলেন। হতাবশেষ রাক্ষসেরা তাঁর কাছে রেহাই পেয়েছিল এই প্রতিজ্ঞা করে যে বংশানুক্রমে তারা আর কখনও মাংস ভোজন করবে না বা তপোবন আক্রমণ করবে না।

সেই থেকে কচুঘেঁচুর শিকড় খেয়ে তারা জীবনধারণ করছে। দেহের আয়তন আগের মতই বিশাল রয়েছে বর্তমান যুগের রাক্ষস বংশধরদের, দেহের শক্তিও আছে অটুট, কিন্তু বুদ্ধি বলে তাদের আর কিছু নেই। তারা এখন পশুর চাইতেও অধম স্তরে নেমে গিয়েছে।

টারজান এইখানে একবার বাধা না দিয়ে পারল না, উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করল—"প্রভু! বর্তমান রাক্ষস বংশধর বলতে কি আপনি ইয়েটিদের বোঝাতে চাইছেন?"

সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে বললেন—"তুমি ইয়েটিদের জানো নাকি? কী করে জানলে?"

টারজান সবিনয়ে বলল—"জানি। কী করে জানলাম তা পরে বলছি। উপস্থিত আপনি আপনার কাহিনী শেষ করুন।"

সন্ন্যাসীর গল্প আবার চলল।

"কচুভোজী ইয়েটিরা বহু যুগ ধরে কোন উপদ্রব করেনি তপোবনে। হিংসাবৃত্তিই লোপ পেয়েছিল তাদের অন্তর থেকে। কিন্তু অতি সম্প্রতি একটা অনর্থ ঘটেছে।

এক প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে ইয়েটিদের কাঁধে। সে মন্ত্রণা দিয়ে আবার হিংসার পথে চালিত করেছে ওদের। যোগবলে ওদের তাড়াবার মত শক্তি আমার নেই, কিন্তু ওদের আসন্ন কর্মসূচীর আভাস আমি যোগবলেই পেয়েছি।

এখন কথা এই, এ-যুগে রাজা নেই, আছে সরকার। তাকে এ-ব্যাপারে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ইয়েটির উৎপাত প্রতিরোধে প্রবৃত্ত করা শিবের অসাধ্য বলে আমি মনে করি।

তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আমায় সাহায্য করবে?"

এইবার টারজানের বলবার পালা।

তার প্রথম কথাতেই সে চমক দিল সন্ন্যাসীকে—"ঐ প্রেতাত্মাকে আমি জানি। জাদুকর আরিমানের প্রেত ও আফ্রিকার সবসেরা জাদুকর গত যুগের।"

"তুমি তাকে জানো?" অবাক্ বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন সন্ন্যাসী।

"বাধ্য হয়ে জানতে হয়েছে প্রভু! শত্রু আমার বড়-একটা কেউ নেই, কিন্তু বর্তমানে ঐ আরিমানের আত্মা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার মর্মান্তিক শত্রু। বেঁচে থাকতে সে আমার ক্ষতির চেষ্টা করেছে—যত রকমে সম্ভব। তারপর মরে গিয়েও তার অশুভ শক্তি প্রয়োগ করছে আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবার জন্য।"

"বড় আশ্চর্য আশ্চর্য কথা শোনাচ্ছ বৎস! কিসের জন্য চেষ্টা তোমার?"

"তাহলে আমার কাহিনী আপনাকে শোনাতে হয়,"—বলল টারজান—"অবশ্য তা আমি শীঘ্রই একদিন নিজে থেকেই আপনাকে শোনাতাম, আপনি এই রাক্ষস তাড়ানোর প্রসঙ্গ না তুললেও।"

তখন টারজান বলতে শুরু করল গত যুগের গল্প। ন্যান্দুর উপত্যকায় তার রোমাঞ্চকর এবং বিয়োগান্ত অভিজ্ঞতার কথা। তারপর আফ্রিকার মহারণ্যে বসে গজমতীর আহ্বান শ্রবণের কাহিনী।

সন্ন্যাসী মূক বিস্ময়ে তার কথা শুনলেন। তারপর নিজের মনেই যেন বলতে লাগলেন—"আচ্ছা জট পেকে উঠেছে দেখছি! কোথায় আফ্রিকার গজমতী, আর কোথায় উত্তর-হিমালয়ের আয়বাঙ্গি!"

তারপর টারজানকে সম্বোধন করে বললেন—"আয়বাঙ্গি এই অঞ্চলেরই সকল শ্রেণীর মানুষের আরাধ্যা দেবী। 'অবাঙ্মানসগোচরা' এই হল ওঁর শাস্ত্রোক্ত নাম।

রাক্ষসেরা যখন শ্রীরামচন্দ্রের শাসনে আর্যধর্মের গণ্ডির ভিতর আসতে বাধ্য হয়, তখন তারাও পূজা করতে আরম্ভ করে ঐ দেবীকে। রাক্ষসের জড়িত উচ্চারণে অবাঙ্মানসগোচরা হয়ে দাঁড়িয়েছেন আয়বাঙ্গি।

কিন্তু আয়বাঙ্গির সঙ্গে গজমতীর সম্পর্কটা কীরকম, আমায় জানতে হবে। তুমি বলছ—গজমতী এ-জন্মে নাম গ্রহণ করেছে বেদবতী?"

"সে নিজে বলেছে আমায়"—বলে টারজান—"আমি তার কথা বুঝিনি তখন, তবে 'বেদবতী' নামটি আমি শুনেছি।"

"তারপর বেদবতীকে দেখেছ আয়বাঙ্গিতে পরিণত হতে?"

"তা দেখেছি। তবে ওরকম দেখা আমার জীবনে এই প্রথম নয়। আগুননদীতে দ্বিতীয়বার স্নান করে ওঠার পর গজমতী ঠিক ঐভাবেই পরিবর্তিত হয়েছিল আয়বাঙ্গিতে। তারপর সে মারা যায়।"

সন্ন্যাসী গম্ভীর হয়ে বললেন—"আমি এ-প্রহেলিকার সমাধান এক্ষুণি করতে পারছি না। ভাবতে হবে, শাস্ত্রগ্রন্থ খুলে দেখতে হবে। হয়ত, ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ যাঁরা হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলসমূহে গুহাবাসী হয়ে আছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে জানতে হবে।"

তারপরই তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন—"ও-চিন্তার ভার আমার উপর দিয়ে তুমি আমার তপোবন রক্ষায় উদ্যোগী হও। হবে ত?"

"নিশ্চয় প্রভু!"—টারজান কোন দ্বিধা না করে কথা দেয়—"আমি জীবনপাত করেও আপনার তপোবন রক্ষা করব ইয়েটিদের আক্রমণ থেকে। তীর-ধনুক পেলে আমি ওদের গোটা দলকে একা হাতে নির্মূল করতে পারব—এ আশা আমার আছে।"

"আমি জীবনপাত করেও আপনার তপোবন রক্ষা করব...

নরসিংহদেবের সৈন্যরা অনেক অস্ত্রশস্ত্রই ফেলে গিয়েছিল। টারজান বেছে বেছে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলিই বার করে নিল তা থেকে। তীরগুলির ফলায় মরচে পড়েছিল, ঘষে ঘষে সাফ করল নদীর জলে। তারপর চলল তার মহড়া। আশ্রমের বাইরে।

নদী পেরিয়ে অরণ্যে চলে আসে টারজান। সে বনের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কতকগুলি লম্বা গাছ বেছে নিয়েছে। সেইসব গাছের মগডালে যেখানে প্রকৃতির হাতে-গড়া বসবার জায়গা নেই, সে নিজে চেষ্টা করে গড়ে নিয়েছে বসবার জায়গা।

নির্বাচিত প্রত্যেকটা গাছের মাথায় সে আগে থাকতে অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ে তুলেছে। কয়েকখানা ধনুক এবং প্রচুর তীর। কিছু কিছু বর্শাও।

সে ঐ অরণ্যের ভিতরই যুদ্ধ দিতে চায় ইয়েটিদের। সন্ন্যাসী বলেছেন—ঐ অরণ্যের ভিতর দিয়ে ছাড়া আশ্রমের দিকে আসার কোন পথ নেই ইয়েটিদের পক্ষে। কারণ অন্য তিন দিকে, খুব কাছে না হলেও, দুরারোহ পর্বত। ইয়েটিরা বাস করে না সে-পর্বতে। পাহাড়ের গা এত খাড়া যে বিশাল কলেবর নিয়ে ইয়েটিরা চলাফেরা করতে পারে না। টারজান নিজের কাজ করছে, সন্ন্যাসীর কাজও সন্ন্যাসী অবহেলা করছেন না। টারজানকে যে কথা দিয়েছেন, তা তিনি যেভাবে হোক, রাখবেনই। আয়বাঙ্গি-বেদবতীর প্রহেলিকা উদ্‌ঘাটন করে দেবেন টারজানের সমুখে।

তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ছেন তন্নতন্ন করে। ধ্যানস্থ হচ্ছেন যখন-তখন, অন্ধকার অতীতে এবং অস্পষ্ট ভবিষ্যতে দৃষ্টি সঞ্চালন করবার জন্য। দিব্যদৃষ্টি ত ধ্যানযোগে ছাড়া লাভ করা যায় না।

তাঁর এই তন্ময় ভাব একজনের নজর এড়ায়নি। তিনি হচ্ছেন আশ্রমজননী, সন্ন্যাসীর সহধর্মিণী। তাঁর নাম ধরে কেউ ডাকে না, এমন কি, তাঁর স্বামীও না। স্বামী তাঁকে সম্বোধন করেন 'আর্যে' বলে।

তা, আর্যার নাম কী, তাতে কারও কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না, এ-কাহিনীতে আর্যা নামেই তিনি অভিহিতা হবেন।

এখন আর্যা একদিন নাছোড়বান্দা হয়ে চেপে ধরলেন স্বামীকে—"ঋষি, তুমি আজকাল এত কী পড়াশোনা করছ? মুহুর্মুহুঃ ধ্যানস্থই বা হচ্ছ কেন, আর ধ্যানে বসে অর্ধ প্রহর, এক প্রহর পর্যন্ত কাটিয়েই বা দিচ্ছ কেন?"

ধর্মপত্নীকে অকারণে উত্তেজিত করে তোলা ঋষির স্বভাব নয়, সেইজন্যই জটিল কোন ব্যাপার তিনি পারতপক্ষে

তাঁকে বলতে চান না। কিন্তু আর্যা যদি নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করেন, না বলে উপায় কী?

তিনি আয়বাঙ্গি-বেদবতীর সমস্যা যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করে খুলে বললেন আর্যাকে।

"বেদবতী?"—আর্যা একটুও চিন্তা না করে বলে উঠলেন—"জ্যোতির্গুহার বেদবতী নয় ত?"

"জ্যোতির্গুহা?"—ঋষি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন।

"জ্যোতির্গুহাতে একটি কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে লালন করছেন মহর্ষিরা, তা শোনোনি?"

"না ত!"

"তার নামও বেদবতী। অবশ্য তোমার বীরবরের বেদবতী সে কিনা, তা আমি কেমন করে বলব?"

সন্ন্যাসী টারজানকে ডাকেন বীরবর বলে। তার আসল নাম কী, তা তিনি জিজ্ঞাসা করেননি কোনদিন।

সন্ন্যাসীর টনক নড়ল। জ্যোতির্গুহা! ত্রিকালজীবী ত্রিকালদর্শী মহর্ষিরা বাস করেন সেখানে। গুহার ভিতর সে যেন এক অভিনব নৈমিষারণ্য।

সে এক চিরতুষারের রাজ্য। ঐ যে উত্তরের তুঙ্গ গিরি, তার মাথায়। উড়ে যেতে পারলে দূরত্ব সামান্য। হেঁটে সেখানে উঠতে হলে পক্ষকালও সময়ও যথেষ্ট নয়, কারণ পথ বলে সে-পর্বতে কিছু নেই।

সন্ন্যাসী পরদিন বিশেষ কিছু ক্রিয়াকাণ্ড করলেন। অনেক মন্ত্রপাঠ, অনেক হোমযজ্ঞ। তারপর তিনি ধ্যানস্থ হলেন আবার। হোমগৃহে অবশ্য দরজা নেই যে বন্ধ করবেন, কিন্তু আর্যাকে এবং প্রধান শিষ্যকে বিশেষ করে বলে রাখলেন তাঁর ধ্যান যেন কোনমতে ভঙ্গ করা না হয়।

কিন্তু দুই দণ্ড পার হতে না হতে এমন একটা কাণ্ড ঘটল যাতে আর্যার আশঙ্কা হল—ধ্যান না ভাঙিয়ে বুঝি উপায় নেই।

দেবীবর ছুটতে ছুটতে এল বৃহৎ বৃহৎ লম্ফে। সে আজকাল টারজানের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। টারজান থাকে অরণ্যের কোন গাছের মাথায়, দেবীবর থাকে সেই গাছের গোড়ায়। গাছ থেকে ওরা পাহারা দেয়, ইয়েটিরা আসছে কি না।

আজ দেবীবর এসেছে ব্যস্ত ও উত্তেজিত হয়ে। নিশ্চয় বীরবরই পাঠিয়ে থাকবে তাকে।

ইয়েটিদের আক্রমণের সম্ভাব্যতা আশ্রমের সবাই জানে। দেবীবরকে ওভাবে আসতে দেখে সকলেই ভাবল সেই আক্রমণই শুরু হয়েছে।

দেবীবর কেবলই লাফিয়ে হোমগৃহে ঢুকতে চায়, যেতে চায় ঋষির কাছে। আর্যা তাকে নিরস্ত করতেই পারেন না।

কিন্তু আর্যা মনস্থির করে ফেলেছেন। ঋষি দ্ব্যর্থহীন আদেশ দিয়েছেন ধ্যান যেন কোনমতেই ভঙ্গ করা না হয়। কোনমতেই না। সুতরাং সে-ধ্যান ভাঙার প্রশ্নই ওঠে না।

যা কিছু ঘটুক, ঘটতে দাও। ইয়েটিরা আসছে? তা যে আসবে কোন-না-কোন দিন, তা ত ভালই জানতেন তিনি। আসবে জেনে তার ব্যবস্থাও করে রেখেছেন।

আর্যা দেবীবরকে বললেন—"যুদ্ধ করগে যাও। তুমি আর বীরবর।"

(১১)

গাছের মাথায় বেশ একটি বসবার দাঁড়াবার জায়গা করে নিয়েছে টারজান। দুই দিকে দুই পেল্লায় ডাল; পিছনদিকে ডাল নেই, সেখানে কাঠের টুকরো বেঁধে বেঁধে একটা শক্ত বেড়া তৈরী করে নিয়েছে, যার গায়ে অনায়াসে ভর দিয়ে দাঁড়ানো চলে।

সমুখটা একদম খোলা, যাতে শত্রুর গতিবিধি পরিষ্কার দেখা যায়।

সে-শত্রু ঐ আসছে। অন্ততঃ একশো মহাকায় ইয়েটির একটা দল। কত ইয়েটি আছে হিমালয়ের অধিত্যকায়?

একটা ইয়েটির সঙ্গে আর একটার চেহারার এমন মিল, অন্ততঃ মানুষের চোখে, যে মুখ দেখে চেনা-অচেনার পার্থক্য করবার উপায় নেই।

তবু টারজানের কেমন যেন মনে হয় ঐ বাঁদিকের নাদাপেটা জীবটাকে সে আগে দেখেছে ইয়েটি গুহায়। আর ঐ যে লাইনের মাঝবরাবর জন্তুটা—যাকে ইয়েটিসমাজেও মহা-ইয়েটি আখ্যা দেওয়া যায়, দেহের আয়তন বিচার করলে, ও ত নির্ঘাত পাতালপুরী-ফেরতা!

ঋষির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ইদানীং শুনেছে টারজান যে ইয়েটিরা বড় বড় দলে বাস করা পছন্দ করে না। তিন-চারটি নিয়ে ছোট এক পরিবার। কর্তা, গিন্নী, দুই-একটা বাচ্চা। বাচ্চারাও একটু বড় হলে বাপ-মায়ের থেকে আলাদা হয়ে যায়।

তবে এই বিশাল দঙ্গল কোথা থেকে এল? ময়াল উপত্যকাতেও টারজান দেখেছিল পঞ্চাশ-ষাট জন ইয়েটিকে। তখন ওদের রীতি-চরিত্র জানা ছিল না বিশেষ, তাই এক জায়গায় অত ইয়েটির ভিড় দেখে তেমন আশ্চর্য লাগেনি।

কিন্তু আজ ? আজ সে সত্যিই অবাক্ হচ্ছে। কে ওদের ডেকে এনেছে নানাস্থান থেকে ? এক জায়গায় সমবেত হয়ে একই উদ্দেশ্যে শিক্ষিত সৈন্যদলের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে কে শিখিয়েছে ওদের ?

টারজানের সন্দেহ হয়—আরিমান উপস্থিত আছে ওদের মধ্যে। গজমতীর জাদুদণ্ড যদি কাছে থাকত, তাহলে সুনিশ্চিত আরিমানের ছায়া সে দেখতে পেত ইয়েটিদের পুরোভাগে।

নেই সে জাদুদণ্ড। তবু ঋষি বলেছেন—প্রেতাত্মার পরামর্শে ইয়েটিরা আবার রাক্ষসবৃত্তিতে ফিরে যেতে চাইছে, যে-বৃত্তি তারা ভগবান্ রামচন্দ্রের শাসনে একদা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

সে প্রেত কি সঙ্গীন সময়ে ইয়েটিদের নেতৃহীন অবস্থায় যুদ্ধে অগ্রসর হতে দেবে ?

টারজানের মনে মনে ধারণা—ইয়েটিদের লক্ষ্য যা-ই হোক, আরিমানের লক্ষ্য সে নিজে।

টারজান পাতালপুরীতে ঢুকেছিল, আরিমান ধ্বংস করল পাতালপুরী। নিশ্চয়ই টারজানকে বধ করবার মতলবেই।

এবার আবার এই তপোবন আক্রমণ করতে এসেছে ইয়েটি পল্টন সাথে নিয়ে। এও নিশ্চয়ই সেই টারজানবধের প্রয়োজনে।

টারজান যদি একবার জ্যান্ত আরিমানকে নাগালে পেত ! তা হওয়ার উপায় নেই। মৃত জাদুকরের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে যে-বস্তুটা কাছে থাকা একান্ত দরকার, গজমতীর সেই জাদুদণ্ড গজমতী ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

ইয়েটিরা তীরের পাল্লার মধ্যে এসে গিয়েছে।

টারজানের পায়ের তলায় ঘন বনের বেষ্টনী। তবে তার বিস্তার বেশী নয়। তার ওপারেই খোলা এক টুকরো মাঠ। হু-হু-হু-হু হুংকার করতে করতে ইয়েটিরা সেখানে এসে পড়ল।

টং করে শব্দ হল টারজানের ধনুকে। দেড়-গজী মৃত্যুবাণ ছুটল ইয়েটিবাহিনী লক্ষ্য করে। বিঁধল গিয়ে পুরোবর্তী ইয়েটিদেরই অন্যতমের লোমশ বক্ষে। একটা হু-হু আওয়াজ, তবে এটা রণোল্লাসের ধ্বনি নয় এবার, একান্তই মৃত্যুযাতনার কাতরানি।

টং-টং-টং-টং। ক্রমাগত তীর ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে শত্রুব্যূহ লক্ষ্য করে। ইস্পাতের ফলা আমূল বিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সাধারণতঃ বুক লক্ষ্য করেই শরবৃষ্টি করছে টারজান। কাজেই ইয়েটিরা পড়ছে আর মরছে।

হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কানে এল—"সবাই ছুটে গিয়ে ঐ গাছটা মাটিতে ফেলে দাও, ধাক্কা দিয়ে দিয়ে।"

এ-স্বর আরিমানের না হয়ে যায় না। কিন্তু না, চর্মচক্ষের দৃষ্টিতে সে ধরা পড়বে না। টারজান তাকে খুঁজতে গিয়ে ইয়েটিনিধনে শৈথিল্য দেখাতে পারে না।

ঋষি তাকে রাক্ষসনিধনের জন্যই নিয়োগ করেছেন। সে-কাজে সে কোনমতেই পারে না অবহেলা করতে।

গাছের গোড়া থেকে শোনা যায় বিকট হল্লা। ইয়েটিদের ক্রুদ্ধ গর্জন মৃত্যুযন্ত্রণার হাহাকারে পর্যবসিত হচ্ছে কেন ?

দেবীবর ছিল বৃক্ষমূলে পাহারায়। ইয়েটিদের একটা দল যেই ছুটে গিয়ে একসাথে ধাক্কা দিতে উদ্যত হয়েছে গাছের গায়ে, অমনি দেবীবর ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা অগ্রবর্তী ইয়েটির ঘাড়ে।

অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে জন্তুটা মাটিতে পড়ে গেল, আর তার সঙ্গীরা দ্রুতবেগে পিছু হটল এই নতুন দুশমনকে দূর থেকে ভাল করে যাচাই করে দেখবার জন্য।

যারা ময়াল উপত্যকায় ইয়েটিদের বিধ্বস্ত হতে দেখেছিল, তারা আর যুদ্ধ করবার জন্য দাঁড়িয়ে রইল না। সেবারে ময়ালে খেয়েছে, এবারে খেতে শুরু করেছে বাঘে।

আপাততঃ বাঘ একটামাত্রই দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু আরও বাঘ যে এক্ষুণি এসে চড়াও হবে না তাদের উপরে, এ-আশ্বাস কে দিচ্ছে ?

অশরীরী আরিমানের শাসন তারা আর মানতে চায় না। উপর থেকে তীরের বিরাম নেই। যার দেহে বিঁধবে, সে মরবে। ইয়েটিরা এভাবে মরতে রাজী নয়। হাতাহাতি লড়াইয়ে মরা—সেটা তারা বোঝে।

কিন্তু দূর থেকে সাঁ করে একটা তীর এল, কোনরকম আত্মরক্ষার চেষ্টা তারা করতে পারল না, নিতান্ত অসহায় জীবের মত পড়ল আর মরল, এতে তারা খুশী নয়।

তারা পালাতে চায়। ইয়েটির লাইনটা আবারও দুলে উঠল। তারপর পিছন ফিরে ছুট লাগাল তারা, বন থেকে বেরুবার জন্যই।

স্তূপাকারে শব পড়ে আছে ইয়েটিদের। দেবীবর পেট ভরে ইয়েটিমাংস খেতে শুরু করল।

টারজান শেষ তীর নিক্ষেপ করেছে। আর ইয়েটি নেই তীরের পাল্লায়। ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে কপালের ঘাম মুছবে, হ্যাঁ, হিমালয়ের শীতেও তাকে ঘামতে হচ্ছে—

হ্যাঁ, সবে সে দাঁড়িয়ে ঘাম মুছবার চেষ্টা করছে কপাল থেকে, এমন সময় সাঁ করে একটা কালো বিদ্যুৎ চমকাল তার ঠিক নাকের ডগায়।

তারপরই গজমতীর জাদুদণ্ড এসে আশ্রয় নিল ওর

বুকের ভিতর।

আর সেই মুহূর্তে টারজান দেখল—

তার ঠিক সমুখে, হয়ত দুই হাত দূরেও নয়, একটা অতি কুৎসিত মুখের আদল ভেসে উঠল ফাঁকা হাওয়ায়।

ওই জিঘাংসায় উন্মত্ত চোখ—ও ত আরিমানের না হয়ে যায় না। গত যুগে ন্যুন্দুর উপত্যকায় টারজান একদিন আরিমানকে মাথায় উপরে তুলে আছড়ে মারতে গিয়েছিল।

সেদিন মারা হয়নি। তারই ফলে আজ টারজানকে মারবার ফিকিরেই আকাশ-পৃথিবী আলোড়ন করছে দেহমুক্ত আরিমান।

নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রগর্জন শোনা গেল।

টারজান আকাশের এদিক-ওদিক চারদিক তাকিয়ে দেখল—কোথাও এক কণিকা মেঘ দেখা যায় না।

এ বজ্রের গর্জন এখানকার আকাশের নয়। তবে কোথাকার?

হোমঘরে ধ্যানস্থ ঋষি নদীপারের দারুণ সংঘর্ষের কোন খবরই রাখেন না। জিভ দিয়ে ঠোঁটের রক্ত চাটতে চাটতে দেবীবর যখন অক্ষতদেহে আশ্রমে ফিরল, তখন আর্যা টের পেলেন যে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে বীরবর।

কিন্তু বীরবর কোথায়? আর্যা সাগ্রহে তার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে ধ্যানস্থ ঋষি সমাধিযোগে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করেছেন জ্যোতির্মঠের মহর্ষি হারীতের সঙ্গে। হারীতই ঋষিমণ্ডলীর সর্বজনমান্য নায়ক।

হারীত বলছেন—"বেদবতীকে পাই প্রায় বিশ বৎসর আগে। কে তার পিতা, কে তার মাতা, জানি না। গিরিচূড়ায় জটায়ুবংশীয় মহাবিহঙ্গের যে বাসা আছে, তারই ভিতর শিশুর রোদন শুনে ঋষিবালকেরা উঠে পড়ে সেই বাসায়। মেয়েটিকে নিয়ে আসে জ্যোতির্মঠে।"

ধ্যানযোগেই এদিক থেকে বলছেন ঋষি—"কে উনি, আপনার নিজের কী বিশ্বাস?"

"দৈবীশক্তিসম্পন্না, জাতিস্মরা কোন মহীয়সী। দেবী অবাঙ্‌মানসগোচরার ভর হয় মাঝে মাঝে ওঁর উপর, তখন দেবীর যা সনাতনী মূর্তি, সেই অতিজরতী বৃদ্ধার মত চেহারা হয়ে যায় ওঁর। আমরা ওঁকে কন্যার মত লালন করেছি বটে, কিন্তু শ্রদ্ধা করি দেবীর মত।"

তখন এদিক থেকে ঋষি সংক্ষেপে সেই কাহিনী জানালেন হারীতকে, যা টারজান তাঁকে শুনিয়েছে ইদানীং—সেই ন্যুন্দুর উপত্যকায় ট্রয় রাজবধূ অ্যানড্রোমেকের গজমতী রানীরূপে আবির্ভাব, দীর্ঘ পাঁচ হাজার বৎসর অম্লান যৌবন উপভোগ করে অগ্নিতরঙ্গিণীতে অবগাহন—

হারীত বলে উঠলেন ওদিক থেকে—"মিলে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে। বেদবতী নিজে জাতিস্মরা, বলেছি না? তিনিও মাঝে মাঝে এই রকম ইঙ্গিতই দিয়েছেন আমাদের। তা সেই ট্রয় রাজপুত্র হেক্টর—ন্যুন্দুর উপত্যকার সেই শ্বেতদেবতা—"

"এখানে উপস্থিত। বেদবতীর সন্ধানে এবং বেদবতীরই আহ্বানে সে এসেছে। বর্তমান মুহূর্তে সে আশ্রমপীড়া নিবারণের জন্য রাক্ষসনিধনে নিযুক্ত—"

"হয়েছে। তাকে আমারও প্রয়োজন। হলদে জাতির একটা বিশাল বাহিনী উত্তর থেকে হিমালয়ে উঠে আসছে। আচরণে ক্রিয়াকলাপে এরা রাক্ষস না হলেও দানব। অর্থাৎ, মানুষ এরা খায় না, কিন্তু পীড়ন যা করে, তা ভক্ষণের চাইতেও মারাত্মক।"

"পাতালপুরীতে হলদেদের একটা গুপ্ত আশ্রয় ছিল, বীরবরের মুখেই শুনেছি। অথচ আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না—"

"আরও অমন কত গুপ্ত আশ্রয় ওদের এ-তল্লাটে আছে, কে বলবে? যা হোক, ওরা আসছে। হিমালয়ে উঠলেই দুই দিনের দূরত্বে জ্যোতির্গুহা। আমাদের একজন পরাক্রান্ত রক্ষক দরকার।"

ধ্যানযোগেই হাসি ফুটল ঋষির মুখে—"মহর্ষি হারীত! একজন রক্ষক বিশাল একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে জ্যোতির্গুহাকে রক্ষা করতে পারবে?"

"ইয়েটিরাও ত বাহিনী সাজিয়েই এসেছিল!" ওদিক থেকেও হাসি শোনা যায় হারীতের—

"ইয়েটিরা নিরস্ত্র। পক্ষান্তরে বীরবরকে ধনুর্বাণ দিয়েছিলাম আমি। রাজা নরসিংহদেবের সৈন্যেরা ফেলে গিয়েছিল এখানে—"

"আমাদের এখানেও অস্ত্র আছে। মহাপ্রস্থানের কালে পাণ্ডবেরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র এখানে রেখে গিয়েছিলেন। ভীমের গদা স্কন্ধে আপনার শ্বেতদেবতা যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন—"

এদিক থেকে ঋষি বাধা দিয়ে বললেন—"কিংবা অর্জুনের গাণ্ডীব হস্তে যদি রথে চড়ে বসেন, এবং সে-রথের সারথ্য যদি করেন বেদবতী—"

আরিমানের পৈশাচিক শক্তি টারজানকে বধ করতে কৃতসংকল্প।

বৃক্ষচূড়ায় একা টারজান। হাতে তার ধনুর্বাণ আছে

বটে কিন্তু পিশাচের দেহ ভেদ করবার মত অস্ত্র ধনুর্বাণ নয়। কারণ বিদ্ধ হওয়ার মত স্থূল দেহ পিশাচেরা ধারণ করে না।

দেহ তাদের আছে, কিন্তু তা অতি সূক্ষ্ম। আর সে দেহ রক্তমাংসে গঠিত নয়। অতি হালকা বায়ব্য উপাদানের একটা জমাট পিণ্ড বলা যেতে পারে সে দেহকে।

সেই অভেদ্য পিণ্ড-বস্তুর ভিতরে নিহিত আছে আরিমানের সমগ্র দুর্নিবার শক্তি, ইন্দ্রজালসাধনায় লব্ধ অশিব ঐশ্বর্য।

টারজান তা প্রতিরোধ করবে কী করে?

নিশ্চিত বিজয়ের আশায় উৎফুল্ল আরিমানের তাই আকস্মিক হানা বৃক্ষচূড়ায়। বায়ব্য পিণ্ড তখন রূপ গ্রহণ করেছে টারজানের পূর্বপরিচিত কুঁজো বামনের আকারে।

শুধু প্রতিহিংসা নিলেই হল না, টারজানকে জানানো চাই যে কে লোকটা নিচ্ছে সে প্রতিহিংসা। তাই এই রূপগ্রহণ।

আরিমান আবির্ভূত হয়েই তার জাদুদণ্ড নিক্ষেপ করেছে টারজানকে লক্ষ্য করে। পুচ্ছধর কালসর্পের মত সাঁ সাঁ করে সে-দণ্ড এগিয়ে আসছে ফণা উদ্যত করে।

ঠিক এই সময়ে গজমতীর জাদুদণ্ড কোথা থেকে এসে বক্ষলগ্ন হল টারজানের। এতক্ষণ আরিমানের হাস্যকুটিল মুখ বা কুশ্রী কুঁজো দেহ দৃষ্টিপথেই পতিত হয়নি তার।

তেমনিই দংশনোদ্যত কালফণীকেও দেখতে পায়নি সে। এখন আচম্বিতে সবকিছুই চোখে পড়ল, বিদ্যুৎচমকে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অন্ধকার আকাশ।

তীর ছুঁড়বার সময় নেই, এত নিকটে এসে পড়েছে সাপটা যে তীর ছোঁড়াও চলে না তার দিকে। বর্শা ছিল হাতের মাথায়, পর পর তিনখানা বর্শা সবেগে নিক্ষেপ করল টারজান সাপের ফণা লক্ষ্য করে।

ফণা ভেদ করে বর্শা ওপিঠে চলে গেল, কিন্তু ফণা তেমনি অক্ষত, উদ্যত। অদূরে দাঁড়িয়ে কুঁজো বামনটা খলখল করে হাসছে।

ছোবল পড়ল বলে। টারজান যে পিছনে সরে আসবে, তার উপায় নেই, কারণ কাঠের বেড়া দিয়ে নিজের হাতেই সে পিছনদিকটা অবরুদ্ধ করেছিল।

ছোবল পড়ল বলে। আর এক পলক মাত্র।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। টারজানের বুক ছেড়ে লাফিয়ে উঠল গজমতীর জাদুদণ্ড, এবং ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল কালসাপের উপর, বাজপাখীর আকার গ্রহণ করে।

খলখল করে আবার হেসে উঠল আরিমান। কে না

নিক্ষেপ করল টারজান সাপের ফণা লক্ষ্য করে।

জানে যে আরিমানই ছিল গজমতীর জাদুবিদ্যার গুরু! গজমতীর জাদুদণ্ড আরিমানের জাদুদণ্ডের সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ে পাল্লা দিতে পারবে কেন?

পারত না, টারজানের জীবন কখনই রক্ষা হত না এভাবে।

কিন্তু টারজান ত মরতে পারে না! অগ্নিতরঙ্গিণীতে অবগাহন করে সে যে অমরত্ব লাভ করেছে!

তাছাড়া, তার যে এখনও অনেক করণীয় আছে পৃথিবীতে! বরং আরিমান—ঐ দেব-নরের অভিশপ্ত পিশাচ—ওরই পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপের অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়েছে বিশ্ববাসীর শান্তির জন্য।

হঠাৎ টারজান সমুখে দেখল এক বিকট বিভীষিকা। তেডালার আশ্রয়টি সুরক্ষিত না থাকলে সে নিশ্চয়ই গাছ থেকে পড়ে যেত, সেই চমকের ধাক্কায়।

তার সমুখে খড়্গধারিণী এক বিকটা বৃদ্ধা।

দেবী আয়বাঙ্গি। অবাঙ্মানসগোচরা মহাশক্তি।

সেই মহাকাল সর্পকে তিনি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন, তারপর এক হাতে তার ফণা, আর এক হাতে লেজ ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন ধড়টাকে। আর সেই ছেঁড়া

টুকরো দুটোকে ছুঁড়ে মারলেন আরিমানের বায়ব্য মূর্তির উপরে।

সে মূর্তি দেখতে দেখতে হাওয়ায় মিশে গেল চিরতরে। আরিমানের পৈশাচিক লীলার হল অবসান।

(১২)

টারজান কৈশোরে যৌবনে সাহেবদের তাঁবুতে কাটিয়েছে কিছুদিন। উপাসনার সময় হাঁটু গেড়ে বসতে দেখেছে তাদের।

নিজে কখনও উপাসনার প্রয়োজন সে বোঝেনি। হাঁটু গেড়ে সারা জীবনে বসেওনি কোনদিন। ওটাকে সে দীনতা প্রকাশ বলেই মনে করে, এবং নিজে সে কারও কাছে এক মুহূর্তের জন্যও দীনতা দেখাবে এমন কল্পনাই সে মাথায় আনতে পারে না।

কিন্তু আজ, চিরদিনের অনভ্যস্ত ব্যাপারটাই কখন নিজেরই অজান্তে সে করে বসেছে। দেবী আয়বাঙ্গির সমুখে হাঁটু গেড়ে বসেছে কখন, নিজেই টের পায়নি।

কতক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসে ছিল একভাবে, তা মনেও পড়ে না তার। হুঁশ হল মাথায় কার কোমল করস্পর্শ অনুভব করে। চোখ মেলে দেখে—

যা দেখল, তা বিশ্বাস করতে পারা যায় না হঠাৎ।

জ্যোতির্ময়ী এই দেবী ত আয়বাঙ্গি নন।

কিন্তু এ আবার কেমন ভুল? সে কি আগেও দুই দুই বার দেখেনি গজমতী রানীকে আয়বাঙ্গিতে পরিবর্তিত হতে?

এবারে উলটোটা যদি ঘটে থাকে ত অবাক্ হওয়ার কী আছে?

উলটোই ঘটেছে কিন্তু। হাঁটু গেড়ে সে বসেছিল আয়বাঙ্গির সমুখে। এখন মুখ তুলে দেখে আয়বাঙ্গি নয়, তার মাথার চুলের ভিতর ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করছে—

আর কেউ নয়, গজমতী রানী!

"গজমতী রানী?" সে ভয়ে পুলকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে।

"না, গজমতী কেন? আমি বেদবতী"—এবার আর ভাষার অসুবিধা নেই। টারজান দেবভাষা বোঝে, কিছু কিছু বলতেও পারে।

"বেদবতী হও বা না হও, আমি জানি তুমি আমার সেই রানী গজমতী"—টারজান উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরল।

"কিন্তু যে-প্রয়োজনে আমি তোমাকে নিতে এসেছি, সেটা গজমতীর ঘটত না কোনদিন, আমি বেদবতী বলেই আমার সে-প্রয়োজন ঘটেছে।"—মধুর হেসে উত্তর দেয় বেদবতী।

"চল, কী প্রয়োজনে কোথায় যেতে হবে, নিয়ে চল"—ঝটিতি উত্তর দেয় টারজান।

তখন গজমতীর সেই জাদুদণ্ড যা ইতিপূর্বেই বাজপাখীর আকার গ্রহণ করেছিল, এগিয়ে এল বাজপাখীরই আকারে। আর, কী প্রকাণ্ড দেহ এই বাজপাখীর!

দুই পাখা ছড়িয়ে দিয়ে পাখীটা হাওয়ায় ভাসছে, সেই দুই পাখার মাঝখানে প্রকাণ্ড পিঠের উপরে দুটো মানুষ স্বচ্ছন্দে নিরাপদে বসে আকাশপথ অতিক্রম করতে পারে।

"যাও যদি আমার সঙ্গে, তাহলে উঠে বসো এই পাখীর পিঠে"—বলতে বলতে গজমতী পাখীতে চড়ে বসল।

আর দ্বিরুক্তি না করে তার পাশেই বসে পড়ল টারজান, উড়ন্ত বাজপাখীর পিঠে।

একবার মনে হল আশ্রমে একটা খবর দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন তার কানে কানে বলে উঠল—"না দিলে ক্ষতি হবে না। সন্ন্যাসী সব জানেন।"

বাজপাখী উঠছে ত উঠছে, খাড়া উঠে যাচ্ছে নীল আকাশের গাঢ় গাঢ়তর গাঢ়তম নীলিমা ভেদ করে করে।

উঠতেই থাকল যতক্ষণ না অভ্রভেদী উত্তর হিমাচলের উচ্চতম শিখরের সমান উঁচুতে সে উঠল।

তারপর তার অগ্রগতি—

"তোমার শীত করে না এখানে?"—প্রথম প্রশ্ন বেদবতীর।

"সময় সময় খুবই করে, কিন্তু অসহ্য লাগে না কোন সময়—" সত্য উত্তরই দেয় টারজান। তার পরে বলে—"অবাক হয়ে ভাবি গরম আফ্রিকার মানুষ হয়ে এই বরফের দেশে আমি কী করে টিকে আছি। ন্যন্দুরের চামড়া গায়ে চড়াতে হয়েছিল এদেশে পৌঁছোবার পরই। কিন্তু ইয়েটি গুহায় অজ্ঞান হয়ে পড়বার পর থেকে শীতের দরুন কষ্ট ততটা আর টের পাই না।"

তারপর বেদবতীর দিকে তাকিয়ে বলল—"কেন টের পাই না, তুমি হয়ত জানো?"

বেদবতী হেসে বলল—"দেবী আয়বাঙ্গি হয়ত জানেন!"

"তুমি আর আয়বাঙ্গি কি এক নও?"—আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে টারজান।

"এক হিসাবে এক। অর্থাৎ আমি আয়বাঙ্গির ক্ষুদ্র একটা অংশ। সম্পূর্ণ আয়বাঙ্গির মহিমা আমার মাঝে খুঁজো না।

আয়বাঙ্গি থেকেই আমার উদ্ভব, আয়বাঙ্গিতেই আমি বার বার ফিরে যাই। আয়বাঙ্গি হলেন অবাঙ্‌মানসগোচরা, বাক্য বা মন দিয়ে যাঁর নাগাল পাওয়া যায় না।"

"বুঝলাম না"—অকপটে স্বীকার করে টারজান।

"কথা দিয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করা যায় না, মন তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম। বুঝতে পারছ না বলে দুঃখ করবার কিছু নেই। হারীতের মত মহর্ষিরা যুগ যুগ উপাসনা করেও তাঁকে বুঝতে পারেননি এখনও।"

"আশ্চর্য হচ্ছি এই দেখে যে আর্য ঋষিরাও আয়বাঙ্গির পূজা করেন, আবার একদিকে রাক্ষস ইয়েটিরা, অন্যদিকে বর্বর হলদেরাও তাঁর নামে ভক্তিতে গদগদ, ভয়ে কম্পমান।"

"আশ্চর্য হবার কী আছে তাতে? সম্পূর্ণ আলাদা জাতের হলেও একদিকে ইয়েটিরা, অন্যদিকে হলদেরা আর্যদেরই প্রতিবেশী ত! শিখেছে ওঁদেরই কাছে। দেবীর মহিমাটি উপলব্ধি করতে পারেনি, শুধু তাঁর ধ্বংসশক্তির পরিচয় পেয়ে ভয়ে কাঁপে তারা। ভক্তি যেটা বলছ, সেটা শুধু ভয়কে ঢাকবার জন্য একটা ছদ্মবেশ—"

বাজপাখী তখন হিমালয়শৃঙ্গের চূড়ায় পৌঁছেছে—

"তাকিয়ে দেখ এখান থেকে"—বলে বেদবতী—"এখান থেকে পাহাড় থাকে থাকে নেমে হলদে জাতের দেশের সীমানায় মিশেছে। এই ঢালু পাহাড়ের বিস্তার খুব জোর কদমে চলে এলে দুই দিনে পেরিয়ে আসতে পারে একটা জঙ্গী পল্টন—"

"জঙ্গী পল্টন?"—জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকায় টারজান।

"পাতালপুরীতে দুশো হলদে তোমার কল্যাণে নিহত হয়েছে, হলদে জাত কি সে-অপমান মুখ বুজে সইবে?"

"আমার কল্যাণে নিহত হয়েছে?"—আপত্তি জানাল টারজান।

"তোমায় হত্যা করতেই চেয়েছিল আরিমান। বরাতজোরে তুমি বেঁচে গেলে, বরাতের দোষে মারা গেল হলদেরা। হতাবশেষ হলদেরা তোমাকেই দোষী ঠাউরেছে। এবং যেহেতু তোমায় গায়ের রং সাদা, আর্য ঋষিদের স্বজাতি বলেই মনে করেছে তোমাকে।"

"তাহলে আমাকে ধরে নিয়ে সাজা দেওয়ার জন্যই তাদের অভিযান?"

"অন্ততঃ সেটাই উপলক্ষ। তোমায় উপলক্ষ হিসাবে না পেলে অন্য উপলক্ষ খাড়া করতে অবশ্যই পারত ওরা। যেন তেন প্রকারেণ কিছু জমি দখল করার দরকার ওদের। পাতালপুরীর ঘাঁটি ত ওরা তৈরী করেছিল, তুমি এ-অঞ্চলে আসার আগেই।"

জ্যোতির্গুহা নামে গুহা, কিন্তু বিস্তারে একটা গ্রাম। গুহার ভিতরেই অবশ্য গ্রামখানি।

সারা গ্রামের মাথার উপরে আচ্ছাদন, সারা গ্রামের চারিপাশে পাহাড়ের প্রাচীর।

আলো? পাহাড়ের ছাদে, পাহাড়ের প্রাচীরে মাঝে মাঝেই এক-একখানি চন্দ্রকান্তমণি। অগুনতি মণি! বৃহদাকার সব মণি! সারা দিনরাত পূর্ণিমার অনাবিল জ্যোৎস্না যেন স্নিগ্ধ আলোকে জ্যোতিষ্মান্‌ করে রেখেছে গুহাখানিকে।

তাই এর নাম জ্যোতির্গুহা।

এর ভিতরে স্থানে স্থানে ফোয়ারা আছে জলের। এর ভিতরে কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালেন ঋষিপত্নীরা, হোমানলে আহুতির গন্ধ আমোদিত করে রাখে গুহাগ্রাম।

পালিত চমরী ধেনু আছে ঋষিদের। ঋষিবালকেরা ধেনুচারণ করে গুহার বাইরের উপত্যকায়। দুগ্ধ দধি ঘৃতের অনটন সত্যযুগ থেকে কখনো হয়নি জ্যোতির্গুহায়।

মহর্ষি হারীত সাদরে গ্রহণ করলেন টারজানকে।

বেদবতী ইশারা করছিল, হেঁট হয়ে টারজান ঋষির পদস্পর্শ করুক। নিষেধ করলেন হারীতই—"তার প্রয়োজন নেই বৎসে! শ্রদ্ধা যেখানে অন্তর থেকে স্বতঃউৎসারিত হয়, সেখানেই তার মূল্য। বাহ্যিক আচার হিসাবে ওটা মূল্যহীন ত বটেই, অনেক সময়ে মর্যাদাবান মানুষের পক্ষে পীড়াদায়কও।"

আশ্রমে কিছু ভোজন করানো হল টারজানকে। দুগ্ধজাত খাদ্য সব, টারজান আর্যার হাত থেকে ওসব জিনিস ইতিপূর্বে খেয়েছে বলেই খেতে পারল। বেদবতী কানে কানে বলল—"যেখানে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে তোমার মনোমত খাদ্য পাবে। হরিণ আছে পাহাড়ের সানুদেশে।"

হারীত বললেন—"শুনেছ ত সব ব্যাপার? হলদে পল্টন এসে পড়ল বলে। আমাদের এক আশ্রম তুমি রক্ষা করেছ, রাক্ষসের আক্রমণ থেকে, এখন দানবের অত্যাচার থেকে এ-আশ্রম রক্ষা কর—"

"আমার যথাসাধ্য আমি করব"—বলে টারজান।

"তোমার কথায় তৃপ্ত হলাম। প্রকৃত বীর বৃথা দম্ভ করে না। কার্যকালেই তার বীরত্ব প্রকাশ পায়। দ্বাপরযুগে এদেশে যে সব অস্ত্রের প্রচলন ছিল, তা কি তোমার কাজে লাগবে? চাও ত দিতে পারি।"

টারজান বলল—"না। একমাত্র অস্ত্র যা আমি চালাতে জানি, তা হল ধনুর্বাণ। সে আমার সঙ্গেই আছে। এখন তাহলে সময় নষ্ট না করে আমি রওনা হতে চাই। কোন্‌ পথে শত্রু আসছে, কীভাবে কোথায় তাকে বাধা দেবার

সুবিধা হবে, আগে থেকে দেখা দরকার।"

মহর্ষি উত্তর দিলেন—"পথ দেখাবার জন্য বেদবতীই যাবে। ঋষিরা বা ঋষিবালকেরা হোম যাগ প্রভৃতি কাজেই দক্ষ। সামরিক ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত করে তাঁরা নিশ্চিন্ত আছেন। আমি তোমায় শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলে বরণ করছি এই বিপৎকালে।"

কালবিলম্ব না করে ওরা দুজনে বিদায় হয়ে গেল—টারজান আর বেদবতী। এবার আর বাজপাখীতে চড়ে নয়, কারণ পার্বত্যপথের, পর্বতগাত্রের প্রতি বিতস্তি পরিমাণ জমি পরীক্ষা করতে করতে যাওয়া প্রয়োজন। আকাশপথে যেতে যেতে সে কাজ করা সম্ভব নয়।

টারজানের প্রথম দিনটা কেটে গেল। পর্বতের ঢাল বেয়ে আধাআধি পথ তারা অতিক্রম করে এসেছে।

টারজানের চোখ আছে পথের উপরে, কিন্তু কান রয়েছে বেদবতীর দিকে। বেদবতী আজ যোল-আনাই গজমতী হয়ে গিয়েছে। ন্যুন্দুর উপত্যকার রাজপাট, গেরস্থালির প্রতিটি খুঁটিনাটি তার মনে আছে। তারই কথা জিজ্ঞাসা করছে টারজানকে।

কারণ, সে এবার টারজানকে নিয়ে ন্যুন্দুর উপত্যকাতেই ফিরে যাবে। ফেলে-আসা রাজ্যপাট আবার দখল করবে। এবার আর আরিমান নেই শত্রুতা সাধনের জন্য। তার বদলে আছে টারজান—তার জন্মজন্মান্তরের সাথী। আনন্দের সীমা থাকবে না।

বেদবতীর আনন্দকাকলির বিরাম নেই। শুনে শুনে টারজানও পায় স্বর্গসুখ। কিন্তু কর্তব্যের প্রতি সে চির-সজাগ।

এক জায়গায় এসে সহসা দাঁড়িয়ে পড়ল—"এইখানে হবে আমাদের রক্ষাব্যূহ।"

বেদবতী আগে লক্ষ্য করেনি স্থানটির বৈশিষ্ট্য। সে তার স্মৃতিচারণেই মশগুল ছিল। এখন চোখ তুলে তাকাল।

একটা শুকনো নদীর খাত।

খাতটা বাঁদিক থেকে এসে এইখানে উত্তরমুখে বাঁক নিয়েছে। বর্ষায় হয়ত জলধারা সবেগেই প্রবাহিত হয় এখান দিয়ে, এখন একেবারেই শুষ্ক।

খাতটা ঢালু হয়ে নেমেছে। হেঁটে উঠে আসবার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। যতদূর দৃষ্টি চলে, খাতের শেষ নেই।

হুন্দে বাহিনী প্রকৃতির নিজহাতে-গড়া এ-রাজপথের সুযোগ নেবে না, তা হতে পারে না।

বেদবতী টারজানের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারে না। "ওরা এ-পথে আসবে, এটা ধরেই নিচ্ছি। কিন্তু ঠিক এইখানে ওদের বাধা দেবার কথা তুমি ভাবছ কেন? কী-এমন বিশেষ সুবিধা পাবে এখানে?"

টারজান দেখিয়ে দিল—কী সুবিধা। বাঁয়ের দিক থেকে এসে খাত মোড় নিয়েছে উত্তরমুখে। বর্ষার দিনে নদীপথে যখন জলধারা সবেগে বয়ে যায়, তখন ঐ মোড়ের মুখের পাহাড়টার তলা দিয়ে যায় ক্ষইয়ে। কত যুগ ধরে ক্ষয় পেতে পেতে অবস্থা এখন এমনি দাঁড়িয়েছে ঐ বিরাট শিলাস্তূপের যে আগামী বর্ষায় ও স্রোতের বেগ কখনো সহ্য করতে পারবে না।

সহ্য করতে পারবে না, অর্থাৎ টাল খেয়ে গড়িয়ে পড়বে ঐ খাতের মধ্যে। এবং যেহেতু খাতের নিম্নমুখী গড়ান খুব মৃদু নয়, সেই কারণেই ঐ পাহাড়ের টুকরোটা তীরবেগে নামতে থাকবে উলটিপালটি খেতে খেতে।

সেই সময় মত্তমাতঙ্গযূথও যদি সমুখে পড়ে, ঐ পাহাড়ের তলায় পিষে ছাতু হয়ে যাবে তারা।

টারজান এই কথা বলতেই বেদবতীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে শঙ্কার সুরে বলল—"কিন্তু তুমি অসীম শক্তিশালী, তা জানি। তবু জিজ্ঞাসা করি, পাহাড়ের তলা ক্ষয়ে গেলেও এখনও দাঁড়িয়ে ত আছে! তুমি কি ধাক্কা দিয়ে ওকে উলটে ফেলতে পারবে?"

একথার উত্তরে টারজান শুধু তার শালের গুঁড়ির মত দুই বাহু চক্রাকারে ঘুরিয়ে নিয়ে এল একবার। "এইখানেই আমাদের স্থিতি। তারপর দেখা যাক ভাগ্যে কী আছে। নীচের দিকে এর চেয়ে সুবিধার জায়গা আর না পেতে পারি।"

অতঃপর টারজান কাঁধ থেকে দড়ি খুলে নিয়ে হরিণ-শিকারে বেরুল এবং অচিরেই একটা কালো হরিণকে মেরে নিয়ে এল হাতে ঝুলিয়ে। "তোমার সামনে খেলে তোমার গা গুলোবে না ত?" হেসে জিজ্ঞাসা করল বেদবতীকে।

"না, তা গুলোবে না। তবে ন্যুন্দুরে গিয়ে তোমায় রান্না-করা মাংসও খাওয়াব মাঝে মাঝে।"

বেদবতীর সঙ্গে কিছু খাবার ছিল। সে তাই খেলো, আর তার সমুখে বসে টারজান হরিণের কাঁচা মাংস খেতে থাকল পরম পরিতোষের সঙ্গে। এমন তৃপ্তির খাওয়া টারজান জীবনে কোনদিন খায়নি।

বেলা যখন পড়ে আসছে, তখন টারজানের শিক্ষিত-শ্রবণে ধরা পড়ল বহু মানবের দূরাগত মিলিত-পদধ্বনি। মাটিতে কান পেতে সে ভাল করে শুনল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে গা ঝাড়া দিয়ে ভারী গলায়

বলল—“আসছে বন্ধুরা।”

বেদবতীর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে শক্ত করে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল টারজানের একখানি হাত।

“আমার জাদুদণ্ড কি কোন সাহায্যেই আসবে না?”—সে জিজ্ঞাসা করল কাতর হয়ে।

“না। এ হল বাহুবলের ব্যাপার। তুমি একটু দূরে ঐ পাহাড়ের টুকরোটাতে বসে দেখো—এক্ষুণি তোমার চোখের সামনেই শত্রু নিপাত হবে।”

বেদবতী বেশী দূরে গেল না। নিকটেই একটা বৃহৎ শিলাস্তূপের উপর উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গে ক্ষয়ে-যাওয়া পাহাড়টার কোন যোগই নেই কোন দিক দিয়ে।

থপ্ থপ্ থপ্! বহু পায়ের শব্দ। ওরা আসছে। ক্রমশঃ সে-শব্দ নিকটতর। ক্রমশঃ একটা তুমুল শব্দসংঘাত আকাশে-বাতাসে! সারা পর্বত থমথম করছে।

এল বলে! টারজান কাঁধ লাগাল পাহাড়ের গায়ে। প্রথম ধাক্কায় নড়লও না পাহাড়। বেদবতী খাড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। তার দুই চোখ ফেটে বেরুতে চাইছে উত্তেজনায়।

টারজান ঠেলছে! সারা অঙ্গে হিমারণ্যের রাক্ষুসে লতার মত মোটা মোটা শিরা দড়া পাকিয়ে উঠেছে। ধাক্কা! অবিরাম ধাক্কা! এল যে শত্রু! পাহাড় যদি না পড়ে!

পাহাড়ের তলা ত ঝাঁঝরা! পড়ে না কেন? পড়ে না কেন?

অবশেষে পড়ল—পড়ল পাহাড়। শিকড় ছিঁড়ে অতবড় পাহাড় উলটে পড়ল খাতের ভিতর—

আর সেই মুহূর্তে বেদবতীর কণ্ঠ থেকে সহসা বেরুল একটা আর্ত চীৎকার— “টারজান! হেক্টর!”

টারজান একলাফে পিছিয়ে এসে পিছনপানে ফিরল। কই? ঐখানে যে পাথরের চাঙের উপর দাঁড়িয়ে ছিল বেদবতী!

সে-চাঙ নেই সেখানে। পাহাড়টা পড়বার সময় সারা অঞ্চলটা জুড়ে একটা ভূমিকম্প জাগিয়েছিল। ঐ চাঙটাও উপড়ে পড়েছে। ওর মূলও ক্ষয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই, সেটা বেদবতী বা টারজান লক্ষ্য করেনি।

টারজান হাহাকার করে উঠল—“গজমতী! গজমতী রানী!”

ঐ বুঝি যায়! পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে গড়াতে গড়াতে নীচুপানে চলে যায় ঐ একটি দেহ—দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশ এক গুচ্ছ দেখা যায় এখান থেকে।

টারজান ঠেলছে।

হারীত এসে দেখলেন পাথরের উপরে পাথরের মূর্তির মত বসে আছে টারজান বেদবতীর দলিত-পিষ্ট দেহ সমুখে নিয়ে।

“পুত্র! তোমায় কী বলে সান্ত্বনা দেব? শত্রুবাহিনীকে তুমি নিঃশেষে ধ্বংস করেছ—এই হোক তোমার সান্ত্বনা। তুমি বীরশ্রেষ্ঠ বীর। তোমার জন্য আমরা কী করতে পারি, বল।”

টারজান বলল—“আপনারা যোগবলে যদি আমায় আফ্রিকায় ফেরত পাঠাতে পারেন, তাহলে তাই পাঠান। এক্ষুণি।”

“পাঠাব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন?”

“এক মুহূর্তও বাঁচতে সাধ নেই আমার। অথচ আমার এ জীবন ত সহজে যাবার নয়। আফ্রিকায় এক্ষুণি যাওয়া দরকার, ন্যুন্দুর পাহাড়ের আগুননদীতে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য। দয়া করে তাই পাঠান আমাকে।”

সত্য ঘটনার গল্প

সুখলতা রাও

এক

কুড়ি-বাইশ বছরের একটি ছেলে উড়িষ্যার জঙ্গলে গিয়েছিল পাখী শিকার করতে। তার সঙ্গে লোক ছিল। হেঁটে হেঁটে আসছে তারা, হঠাৎ সঙ্গের লোকটি চেঁচিয়ে উঠল। ছেলেটি চেয়ে দেখে, একটা ভালুক তার দিকে তেড়ে আসছে। সে ত ভালুক মারতে যায়নি, গিয়েছিল পাখী মারতে, তার কাছে ছিল কেবল ছর্‌রা গুলি। তাড়াতাড়ি আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে সে ছর্‌রা গুলিই চালিয়ে দিল ভালুকের গায়ে। ভালুকটা তাতে তার দিকে দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে উঠে তার দুই কাঁধে থাবা রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে, ভালুক পড়ল উপরে, ছেলেটি পড়ল নীচে। তখন সে প্রাণপণে প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে দিল ভালুকের পেটে। লাথি খেয়েই, ভালুকের কি হল কে জানে, ছেলেটিকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে সে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পালিয়ে গেল। ছেলেটি লম্বাতে প্রায় ছয় ফুট, এ থেকেই বুঝতে পারা যায় ভালুকটা কত বড় ছিল।

পরে আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ভালুক যখন তোমার উপরে পড়ল, তোমার কেমন লাগল?" সে বলেছিল, "ভয়ানক গরম, আর বিশ্রী গন্ধ!"

দুই

এবার যাঁর কথা বলব সেই মিত্র মহাশয় তেজস্বী সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন বলে, তাঁকে কারাগারে বন্ধ করা হয়েছিল। বাংলাদেশে এখনও তাঁর নাম সুপরিচিত। তিনি জীবিত থাকতে, তাঁকে অনেকবার দেখেছি, তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি। তাঁর আত্মচরিত থেকে একটা গল্প এখানে তুলে দিচ্ছি।

১২৭০ সালে, ২০শে আশ্বিন সকাল বেলায় যমুনা নদী দিয়ে একখানি নৌকা যাচ্ছিল, তাতে ১৬/১৭ জন আরোহী। সেই আরোহীদের সঙ্গে মিত্র মহাশয়ও ছিলেন। তখন তাঁর বয়স এগার বৎসর।

বর্ষাকালে যমুনা নদীর এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। তার উপর সেদিন নদীতে প্রবল স্রোত থাকাতে, মাঝি-মাল্লারা আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল। যতই বেলা বাড়তে লাগল, বাতাসও বাড়তে লাগল। সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল মেঘে। দিনটাকে মনে হচ্ছিল রাতের মত। নৌকা কোন্ দিকে যে চলল বোঝা গেল না। অনেক পরে, একটা চড়ায় লেগে নৌকাখানা ফেটে গেল। আরোহীরা কোনও মতে বেরিয়ে চড়ায় লাফিয়ে পড়ল। চড়ার উপর দিয়ে চলেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ। ঢেউ-এর সঙ্গে উঠে পড়ে তারা একটা ঝাউবনে ঢুকল। ঝাউগাছের উপর দিয়েও বয়ে যাচ্ছিল ঢেউ। সমস্ত রাত তারা ঝাউগাছ ধ'রে বসে রইল, একটা গাছ ভেঙ্গে পড়ে ত আর একটা গাছ আঁকড়ে প্রাণ বাঁচায়। সকাল বেলায় দেখা গেল, যমুনার তীর থেকে চার শ' হাত দূরে একটা দ্বীপে তারা উঠেছে। সেখানে মানুষের চিহ্ন নেই। নৌকার আরোহীদের পরনে যে ভিজা কাপড় ছিল, সেই কাপড় ছাড়া অন্য সমস্ত জিনিস নৌকার সঙ্গে ডুবে গেছে নদীগর্ভে। সকলে ভিজে কাপড়ে শীতে কাঁপছে। এদিকে পেট জ্বলছে খিদেতে। ঠিক এই সময়ে, একখানা বোঝাই নৌকাকে বাতাস ঠেলে এনে এত জোরে দ্বীপের তীরের উপরে ফেল্‌ল যে নৌকার তলা গেল ফেটে। দ্বীপের উপরের আরোহীরা তাড়াতাড়ি সেই নৌকার কাছে গেল। নৌকাখানার ছই উড়ে গেছে, মাঝি-মাল্লা কেউ নাই তাতে। নৌকার পাটাতনের নীচে এক জালা-ভরা চাল ও একটি কলসীতে গুড় ছিল। তারা ভিজা চালের জালা আর গুড়ের কলসী নামিয়ে নিতে, নৌকাটা ডুবে গেল।

সেই ভিজা চাল ও গুড় আনন্দ ক'রে খেল ক্ষুধার্ত্ত মানুষগুলি। দুবেলাই পেট ভরাল চাল আর গুড় দিয়ে। সারাদিন বৃষ্টি চলছিল, তাই কাপড় আর শুকাল না। ভিজা কাপড়েই তারা ঝাউবনে রাত্রি কাটাল।

এই ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে মিত্র মহাশয় তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন "তখন বুঝিতে পারি নাই কিরূপে অকস্মাৎ একখানি নৌকা আসিল। তাহার মধ্যে ভিজা চাল ও গুড় কেন ছিল, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। এখন সে কথা স্মরণ করিয়া জগতের যে একজন প্রতিপালক কর্ত্তা আছেন তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি।"

বকের যদি শিং গজায়?

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

তখন... তখনই হয়তো বলা যায়। তার আগে নয়।

বক দেখেছো তো? জলার ধারে এক পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় যে-বক, তার কথা আমি বলচিনে, আবার যে-বক এক হাত তুলে দেখাতে হয়—সে বকও নয়...

সে-বক অবশ্যই দর্শনীয়। আর, প্রদর্শনীয় তো বটেই! কিন্তু সেই দর্শনীয়ের যখন শিং বেরয়, আর যখন তা যুৎসই গুঁতো বসায় তখনই তাকে বলে থাকে বক্‌শিং!

এই বক্‌শিং হচ্ছে একান্তই গুঁতব্য ব্যাপার। আর, গুঁতো খাবার পরেই টের পাওয়া যায় যে কী! কিন্তু সেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের কিছুই আমার জানা ছিল না। তখন আমি ইস্কুলে পড়ি, ফার্স্ট কি সেকেণ্ড ক্লাসে। একদিন ইস্কুলের ড্রিলের পর ড্রিলমাষ্টার মশাই সবাইকে ডাকলেন—'তোমাদের মধ্যে খুব বাহাদুর কে আছো? এগিয়ে এসো তো!'

বাহাদুর আমি নই, তাই এগুবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পিছনের ধাক্কায় তিন পা এগিয়ে যেতে হলো। আচমকাই।

'ও, তুমি?' বলেই ড্রিলমাষ্টার কী যেন একটু ভেবে নিলেন—'বেশ, তাহলে তুমিই যাবে আমাদের ইস্কুলের হয়ে।'

'কোথায় যাবে সার?' ছেলেদের পেছন সার থেকে আওয়াজ উঠলো।

'কলকাতা আন্তঃস্কুল বক্‌শিং-প্রতিযোগিতায়, আমাদের ইস্কুলের পক্ষ থেকে তুমিই যোগ দেবে। খেলাটা হবে আসচে শনিবার।'

শুনেই আমি তিন পা পিছিয়ে গিয়েছি।—'বক্‌শিংয়ের আমি কিছুই জানি না যে সার।'

'তাতে কি? তাতেই হবে। আনাড়ির মার দুনিয়ার বার, বলে থাকে না কথায়, শোনোনি?' বললেন ড্রিলমাষ্টারঃ তাছাড়া, এটা হচ্ছে নভিস্‌দের টুর্ণামেন্ট। সব ইস্কুলের নভিস্‌রাই শুধু যাবে। ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। তাছাড়া,—' আমাকে উৎসাহ দিতে আরো তিনি যোগ করেনঃ 'বক্‌শিং কি একটা শক্ত কিছু নাকি! এমন কিছুই নয়। কেন, তুমি কি কখনো কাউকে ঘুষোওনি? ঘুষি খাওনি কারো? সেই ঘুষি মারার ইংরেজি নামই হচ্ছে বক্‌শিং।'

বক্‌শিংয়ের ইতিহাসে আমার অবদান কী, নিজের মনে আমি খতাই। কাউকে কখনো ঘুষিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। হ্যাঁ, ছোটবেলায় আমার ছ'বছরের ছোট বোনকে ঘুষিয়েছিলাম। আহা, তার চোটেই বেচারা সেই থেকে কেমন যে তোতলা মেরে গেল, সেই তোতলামি এতদিনেও তার গেল না।

'ঘাবড়াও মৎ, মাষ্টার চকরব্বর্‌তি!' এই বলে মাষ্টারমশাই আমার পিঠে এক বক্‌শিং ঝাড়েন। প্রায় চোদ্দ পোয়া ওজনের। তাঁর সেই পিঠ চাপড়ানিতে আমায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়।—'এই যা একখান্ দিলাম না, এই জিনিসই সেখানে তোমায় ঝাড়তে হবে। তবে কারো পিঠে নয়, সামনের দিকেই। কোমরের তলাতেও না। এ আর তুমি পারবে না?'

'পারবো সার।' মাটির থেকে নিজেকে কুড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ভগ্নস্বরে আমি বললাম।

আর দিন সাতেক বাদেই সেই ম্যাচ্। আসচে শনিবারই। এই কদিনেই যতটা সম্ভব, বক্‌শিংয়ের কায়দাকানুন শেখাতে

আমায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়

এক বক্শিং মাষ্টার এসে গেছেন। স্কুলের ছুটির পর ঘন্টাখানেক ধরে শেখানো হয়।

'বাঁ পা সামনে রেখে দাঁড়াতে হবে বুঝেচ? না না, ও পা নয়। ওকি তোমার বাঁ পা? তোমার বাঁ পা কোন্‌টা? তোমার বাঁ পা কটা হে?'

'একটাই তো। একটাই মোটে। কিন্তু ডান পায়ে আমার জোর বেশি কিনা, তাই—'

'ঘুষির লড়াই এটা, লাথালাথির তো নয়। ডান পা দিয়ে কী হবে? যা বলছি তাই করো।' বক্শিং টীচার বলেন—'বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে, বাঁ হাত উঁচিয়ে খাড়া হও। এম্‌নি করে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতে নিজেকে সামলে, ডান হাত দিয়ে ঝাড়তে হবে ঘুষি। ঘুষোও তো দেখি।' নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি আমায় অনুকরণ করতে বললেন।

'কাকে?'

'কাউকে না। এম্‌নি ফাঁকা মারতে বলছি। ঘুষির কায়দাটা দেখতে চাই তোমার।'

কয়েকটা ঘুষি আমি ছাড়লাম—ফাঁকা আকাশেই। আমার খুশিমতন।

'বাঃ, বেশ! এতেই হবে। হয়ে যাবে। এম্‌নি করে লাফাতে লাফাতে মারতে হয়। লাফাও তো দেখি!'

লাফাই। ইংরেজিতে আর বাংলায়—যুগপৎ। আমার লাফের নমুনা দেখে ছেলেরাও এম্‌নি laugh-তে থাকে যে বলবার নয়!

'ও-রকম না, ও-রকম না। অমন হনুমানের মত নয়। না না না, ও কী হচ্ছে? ও ধরণেও নয়। আমি লাফাতে বলেছি, নাচতে বলেছি কি?'

ধুপ্ ধাপ্, ধাপুস্ ধুপুস্, তিড়িং বিড়িং—যতো রকমের লাফানি-ঝাঁপানি আছে, সব দেখিয়েও মাষ্টার মশাইকে খুশি করতে পারলাম না। বক্শিংয়ের নাচন—যা নাকি একেবারে আলাদা ধারার—তা আমার ধারণাতীতই থেকে গেল।

যাক্, দেখতে দেখতে আর শিখতে শিখতে শনিবার এসে গেল। আমাকে নিয়ে গেল টুর্ণামেন্টের জায়গায়। একটা চৌকোণো জায়গা—মোটা কাছি দিয়ে ঘেরাও করা। আমার কোমরে একটা লাল রঙের ফিতে বেঁধে দেয়া হোলো।

মনে মনে ভারী দমে গেলেও কিছুই যেন পরোয়া করিনে এম্‌নি একটা ভাব দেখিয়ে গট্‌মট্ করে সেই ঘেরাওটার মধ্যে ঢুকে এককোণে গিয়ে চুপটি করে বসলাম।

বক্শিংয়ে যাকে সেকেণ্ড বলে—আমার সেই দুনম্বর এগিয়ে এসে বলল—'ওঠো। ওঠো তো একটু।'

'বক্শিংয়ের এখনো দেরি আছে তো, এখন কি? জিরিয়ে নিচ্ছিলাম একটু।' জবাব দিলাম আমি।

'আহা, এই টুলটা রাখবো যে।'

'রাখো না! জায়গা কি নেই?'

'তোমার তলায় রাখতে হবে।'

তখন বাধ্য হয়ে আমায় উঠতে হোলো। সে টুলটা রাখলো, তারপরে তার টুলের ওপরে আমি নিজেকে রাখলাম।

আমার দুনম্বর একেবারে আমার মত আনাড়ি নয়। বক্শিংয়ের জ্ঞানগম্যি তার আছে। বরং সেদিকে একটু টন্‌টনেই বলতে হয়। সে আমার কানে কানে ফিস্‌ফিসোয়—'বুঝেচো? প্রথম চোটেই তোমার ঘুষি ঝাড়বে। পেল্লায় রকমের একখানা! বক্শিংয়ে মারাটাই হচ্ছে নিজেকে বাঁচাবার কায়দা।'

'ও, তাই নাকি? বেশ, আমার মনে থাকবে।' আমি বললাম।

ঘেরাওয়ের ও-কোণে, ঠিক আমার মুখোমুখি বিদ্‌ঘুটে চেহারার একটা ছেলে বসে ছিল। দেখতে ছেলে, কিন্তু আসলে একটি ছেলের বাবা! ওজনে মণ দুয়েকের কম হবে না। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পেশীবহুল দেহের দিকে চেয়েছিলাম—চাইতে চাইতে আমার মনে হোলো, এই ছেলেটাই না তো? যার সঙ্গে আমায় ঘুষি লড়তে হবে, সেইতো নয় এ?

বিদ্যুৎগতিতে কথাটা আমার মনের মধ্যে খেলে গেল। আর সেই বিদ্যুৎগতিটা কখন যে মন থেকে আমার পায়ে এসে ভর করেছে টের পাইনি...

মনে হচ্ছে, নিজের অজান্তেই আমি বুঝি পালাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ঘেরাওয়ের বেড়া টপ্‌কাবার মুখেই আমাকে পাক্‌ড়ে এনে আবার সেই টুলের ওপরে বসিয়ে দিলো সবাই।

ড্রিলমাষ্টার মশাই তখন রিংয়ের মধ্যে ঢুকে ঘোষণা করলেন—'আমার ডাইনে হচ্ছে মাষ্টার চকর্‌বর্‌তি, আর বাঁয়ে মাষ্টার ভরদ্বাজ।' বলে আমাদের কে কোন্ ইস্কুলের থেকে এসেছি সেকথাও তিনি জানিয়ে দিলেন।

তারপর রেফারি উঠে বেড়ার মধ্যে এলো। ভরদ্বাজের থেকে সে বেশ ব্যবধান রেখেই দাঁড়িয়েছে দেখলাম। লোকটা বুদ্ধিমান বটে!

'তিনটে এক মিনিটের করে রাউণ্ড। এইরকম তিনটে পালা হবে। সেকেণ্ডরা সব এবার রিংয়ের বাইরে যাও।'

আমার বাঁ পাটা এগিয়ে দিয়ে বেশ একখানা পোজ্

নিয়ে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখি, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু ঐভাবে দাঁড়ায়নি। একমুখ হাসি নিয়ে সে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

ভাব করবার মতলব তার বুঝতে পারি। আমিও হাসিমুখে এগিয়ে যাই তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে।

কিন্তু করতে না করতেই—কী হোলো জানিনে—কেন যে তার এই হৃদ্যতা হঠাৎ লোপ পেল তা আমি বলতে পারব না—চক্ষে যেন আমি অন্ধকার দেখলাম। তার এক ঘুষিতে কখন্ আমি তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছি!

ভূঁয়ের থেকে উঠে আমি অবাক হয়ে তাকে দেখছি—অভদ্রের মত তার এই দুর্ব্যবহারের কথাই ভাবছি, রেফারি বললো—'ঘুষোও। দাঁড়িয়ে কী দেখচো? ঘুষি লড়ো।'

তারপর বাকী বাহান্ন সেকেণ্ড ধরে কী যে হোলো, সেকথা আমি বলতে চাইনে। নাটকীয় ভাষায়, তার ওপরে আমি যবনিকা টেনে দিতে চাই।

কারণ, তার সমস্তটাই আমার কাছে অস্পষ্ট এক আবছায়া।

ফার্স্ট রাউণ্ড শেষ হলে আমি টলে টলে কোনোরকমে দাঁড়ালাম। বসলাম বেড়ার কোণটিতে গিয়ে।

সেটা আবার আমার কোণ নয়। আমার সেকেণ্ডকে সেখানে দেখা গেল না। সে ছিলো ঠিক অপর কোণটিতে দাঁড়িয়ে।

আবার আমায় টলতে টলতে নিজের কোণে যেতে হোলো। এবার কোণাকুণি না গিয়ে সোজাসুজি গেলাম। ত্রিকোণের দুধারের চেয়ে একধার যে অনেক বেশি খাটো, জ্যামিতির সেই রহস্য—যা কোনদিনই আমার মগজে ঢোকেনি—তখন আমার কাছে পরিষ্কার হোলো। আর, জ্যামিতিও যে আমাদের জীবনে কাজে লাগে, তখনই তা আমি মালুম করতে পারলাম।

আমার দুনম্বর আমার চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে উৎসাহ দিতে লাগলো—'ফার্স্ট রাউণ্ডে পারোনি না হয়, তাতে কী হয়েছে? আরো দু রাউণ্ড তো আছে। জিতবে তুমি নিশ্চয়।'

আরো—আ—রো—দু—রাউণ্ড! ভাবতেই আমার বুক কেঁপে ওঠে।

কিন্তু শুনতে শুনতে আমার ঘোর কাটে। আমি সজাগ হই। আমার রাগ হয়। ঘোরতর রাগ। মনে মনে বলি—'দাঁড়াও না! দেখাচ্ছি এবার হতভাগাকে। তৃতীয় রাউণ্ড আর লড়তে হবে না। এইবার—এই দ্বিতীয়
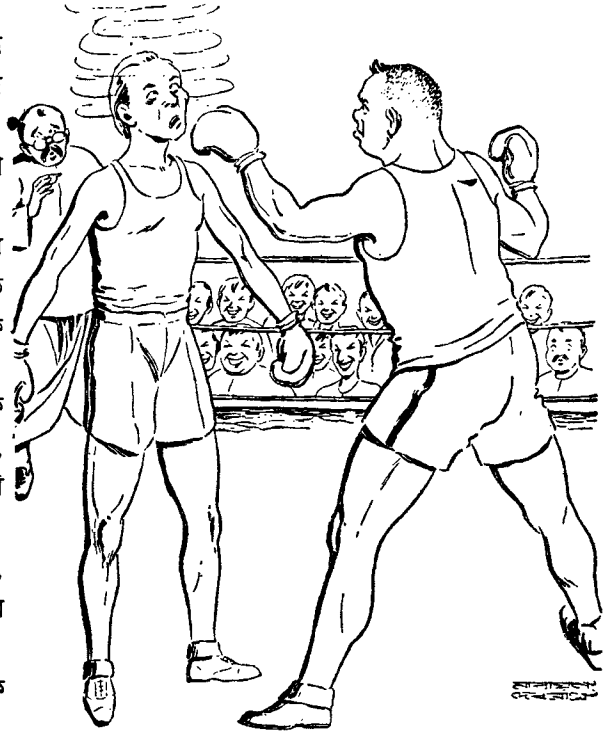
"দাঁড়িয়ে কী দেখচো? ঘুষি লড়ো।"

ধাক্কাতেই—ওকে অক্কা পাইয়ে দেব। গুঁড়িয়ে যদি ছাতু না করেছি তো আমার নামই নেই!'

'সেকেণ্ডরা বেরিয়ে যাও সব। সেকেণ্ড রাউণ্ড। টাইম।' হাঁকলো রেফারি।

দ্বিতীয়রা বেরিয়ে যাবার পরে বেড়ার মধ্যে আমরা দুজন অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করতে লাগলাম। রেফারি বাদে অবশ্যি।

মুখখানা হাঁড়িপানা করে ভরদ্বাজ এগিয়ে এলো।

'দাঁড়াও না! মজাটা দেখাচ্ছি এবার তোমায়। শেকহ্যাণ্ড করেই না, একটুও না ভাবতে দিয়েই এমন এক হাত নেব! এইসা একখানা জবর ঘুষি তোমাকে লাগাবো যে বাছাধন টের পাবে তখন। নাক-মুখের তোমার চিহ্ন থাকবে না...' মনে মনে আওড়াই।

হাত বাড়িয়ে আমি এগিয়েছি, কিন্তু আবার...আবার সেই যবনিকাপাত! আবার সেই ছায়া-ছায়া আবছায়া! ফের আমার যবনিকাপতন! যবনিকার মত আমার নিজেরই পতন আবার।

পলকের ভেতর আমার চোখের ওপর থেকে আবার মুছে গেছে—ঘেরা বেড়া, রেফারি, ভরদ্বাজ—সারা পৃথিবী!

সেকেণ্ড রাউণ্ডে যে শেকহ্যাণ্ড করতে হয় না, তা কে জানতো?

বাঘের বিচার

পরিমল গোস্বামী

বারো বছর বয়স হলে কি হয়, রনু বেশ সাহসী, এবং বয়সের তুলনায় সাহসটা সামান্য একটু বেশিই বলতে হবে।

শোনই না ব্যাপারটা কি!

একদিন খবর শোনা গেল দমদম জংশনের কাছে এক জঙ্গলে প্রকাণ্ড এক বাঘ এসেছে। বাঘ মানে সত্যি বাঘ, গায়ে ডোরা কেটে এসেছে। খবরটা কিন্তু রটেছে আর এক ভাষায়। সবাই বলছে তিলককাটা বাঘ, ফোঁটাকাটা নয়। মানে রয়্যাল বেঙ্গল, চিতা নয়।

লোকের আর কৌতূহলের অন্ত নেই, কারণ ইতিমধ্যে তারা সে বাঘের নাম-ধাম জ্ঞাতিগুষ্টির খবর জেনে ফেলেছে। কিন্তু তার কতখানি সত্যি তা কেউ বলতে পারে না। যে রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাকেও চেপে ধরলে বলে, তা আমি কি জানি, একটা কিছু বলতে হবে তো?

বাঘের বাড়ী জলপাইগুড়ি জেলায়। আগে ছিল খুলনা, কিন্তু দেশ ভাগ হওয়ার পরে ওরা কয়েকটি পরিবার মিলে নিরাপদে থাকবে বলে জলপাইগুড়ি চলে গেছে। বাঘ শুনেছে, কলকাতা এসে উদ্বাস্তুর খাতায় নাম লেখালে অনেক সুবিধে পাওয়া যাবে, তাই এসেছে। তা ভিন্ন বাঘের এক আত্মীয় থাকে কলকাতার এক জজের বাড়ীতে—বাঘ তার মেসো হয়। সেও যদি কোনো সাহায্য করে এই উদ্দেশ্যে।

কিন্তু হাজার হলেও বাঘ তো, বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস সত্যিই নেই, কারণ বাঘ আসার পর দমদমে অনেক বাড়ী থেকেই ভেড়া গোরু ছাগল কমে যাচ্ছে।

রনু কলকাতা থাকে। খবরটা তার কানে এসেছে। ভাবছে কি করবে। তার মনে হল, আর চুপ করে থাকা চলে না। একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে তার ঘাড়ে। সে সাহসী, তার সাহস দিয়ে সমাজের কিছু উপকার করা দরকার।

বন্ধুদের সঙ্গে কিছু আলোচনার পর রনু বলল, এ বাঘটি আমি মারতে চাই।...বাবার বন্দুকটা লুকিয়ে নিয়ে যাব, কেউ টের পাবে না।

হলও তাই। রনু আর তার পাঁচ বন্ধু সেই দিনই রওনা হয়ে গেল দমদম জংশনে।

কয়েকজন বালকের হাতে বন্দুক দেখেই স্থানীয় লোকেরা তাদের খুব খাতির করতে লাগল। ওদের বেশ করে আদর-যত্ন করে বলল, ঐ যে দেখা যায়—ঐ জঙ্গলে বাঘ আছে।

রনুরা তখনই ঢুকে গেল সেই জঙ্গলে এবং গিয়েই দেখতে পেল কথাটা ঠিক। প্রায় আট ফুট লম্বা হলুদ রঙের বাঘ গায়ে কালো ডোরা কেটে শুয়ে-শুয়ে ঘুমুচ্ছে ওদের মনে হল বাঘটা যেন একটি চোখ খুলে ওদের দিকে চেয়ে দেখেই আবার চোখ বুজে ফেলল। আরও মনে হল বাঘের মুখে যেন একটু হাসিও ফুটে উঠেছিল সে সময়। কিন্তু তাতে ওদের কোনো ক্ষতি হল না।

রনু বন্ধুদের ইশারায় বলল—গাছে ওঠ।—সে নিজেও গাছের একটা ডালে উঠে বসে বন্দুক তুলে চালিয়ে দিল গুলি। লক্ষ্য করেছিল বাঘের মাথাটির প্রতি।

বন্দুকে খট্ করে একটি আওয়াজ হল।

আবার ঘোড়া টিপল, আবার খট্।

খটকা লাগল মনে। ব্যাপার কি?

রনুর খেয়াল হল, বন্দুক এনেছে বটে, কিন্তু গুলি তো আনেনি! সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বাঘ এখুনি জেগে উঠবে আর সবাইকে ধরে ধরে খাবে।

বাঘ একটু নড়ে উঠল যেন।

রনু ভয়ে ভয়ে তাকাল তার দিকে।

বাঘ উঠে বসল। তারপর ওদের সবাইকে অবাক করে বলল, কোনো চিন্তা কোরো না, তোমাদের দুঃখ দেখে আমারও দুঃখ হচ্ছে কম নয়। দাঁড়াও আমিই একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বাঘ উঠে এলো ওদের কাছে, এসে বললো তোমরা ঐখানেই থাক, আমি নিজে গিয়ে তোমাদের জন্য গুলি এনে দিচ্ছি। তোমাদের দেখছি টুয়েলভ্-বোর শট-গান্। রাইফেল নয়। আচ্ছা, ওতেই হবে। তোমরা অপেক্ষা কর, আমি গুলি আনতে যাচ্ছি। কলকাতা যেতে আসতে আর আমার কতক্ষণ সময় লাগবে!

রনু বলল, বেশ, আমরা অপেক্ষা করছি এইখানেই।

বাঘ বেরিয়ে গেল জঙ্গল থেকে। কিন্তু তার ফলে যে কাণ্ড ঘটল তা খুলে বলতে গেলে এক বছর লাগবে। ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে যে একটা গোটা লঙ্কাকাণ্ডের মতো এত ঘটনা ঘটতে পারে, তা সেকালের রাম বা রাবণ কেউ কল্পনা করতে পারেননি, এমন কি বাল্মীকিও পারেননি।

দিনের আলোয় শহুরে পথে একটা প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘ ছুটে চলেছে। পথের দুধারের সমস্ত লোক একে একে

এক বাক্স টোটা মুখে তুলে নিয়ে……

অজ্ঞান হয়ে পড়ছে, যারা মোটর চালাচ্ছে তারা ভয়ে চোখ বুজে মোটর চালিয়ে দিচ্ছে মানুষের ঘাড়ের উপর। সে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড, দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার—পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। শুধু কল্পনা করে বুঝে নাও। শুধু একটি খবর এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সে হচ্ছে বাঘ দমদম থেকে একটানা ছুটতে ছুটতে চিড়িয়াখানার পাশের রাস্তা ধরে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী পর্য্যন্ত গিয়েছিল এবং ভুল বুঝতে পেরে সেখান থেকে আবার ঘুরে ছুটে এসেছিল এসপ্ল্যানেডের দিকে। দমদম থেকে বেরিয়েই সে চেঁচাতে আরম্ভ করেছিল, কারণ সে জানত রাজপথে ছুটতে হলে হর্ণ বাজাতে হয়। বাঘ আর হর্ণ পাবে কোথায়—তাই সে আপন কণ্ঠের ভাষাতেই ডাকতে ডাকতে ছুটছিল; এবং তার প্রত্যেকটি ডাক ছিল বাঘের ডাক। সে যে কি ডাক তা তোমরা অনেকেই জান। না জানলে হাঁড়ির

মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে দেখ।

যে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য বলেছি সে হচ্ছে এই যে, বাঘ যখন চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটছিল তখন চিড়িয়াখানার ভিতরের বাঘেরা উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং বাইরে বাঘেদের বিপ্লব শুরু হয়েছে মনে করে কয়েকবার ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

যাই হোক, বাঘ চৌরঙ্গী রোড ধরে ছুটে এসে প্রথমেই যে বন্দুকের দোকান পেল তাইতে ঢুকে চকিতে নম্বর মিলিয়ে, এক বাক্স টোটা মুখে তুলে নিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি ছুটে চলল দমদম জংশনের দিকে।

বাঘের মুখের প্যাকেটে সবগুলোই ছিল দমদম বুলেট। দোকানের বন্দুকধারী প্রহরী থেকে শুরু করে সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বাঘকে দেখে।

কিন্তু বাঘ জানল না যে মোটর সাইকেলে এক পুলিস সার্জ্জেণ্টও ছুটছিল তার পিছু পিছু। এইটিই বাঘের প্রধান ভুল। তাই সে যখন জঙ্গলে ঢুকে গুলির বাক্সটি রনুর হাতে তুলে দিল, ঠিক তখনই পুলিস সার্জ্জেণ্ট তার চার পায়ে হাতকড়া (পা-কড়া সঙ্গে ছিল না) পরিয়ে বলল, ডাকাতি ও বেআইনী পথ চলার অপরাধে এবং সবচেয়ে বড় কথা—বাঘ হওয়ার অপরাধে, তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম। আর রনু, তুমি বিনা লাইসেন্সে বন্দুক ব্যবহার করেছ, তোমাকেও গ্রেপ্তার করলাম।

বন্ধুরা ছাড়া পেয়ে গেল।

পুলিস বাঘের একখানা পায়ের সঙ্গে রনুর একখানা পা বেঁধে নিয়ে পুলিসের ঢাকা গাড়ীতে ওদের কলকাতা চালান দিল।

পরদিনই বিচার। বাঘকে বেশিদিন হাজতে রাখা নিরাপদ নয়। বিচারসাপেক্ষভাবে চিড়িয়াখানায় রাখা যায় কিনা সন্ধান নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাজি হননি। তিনি বললেন, দীর্ঘমেয়াদী জেল হলে চিড়িয়াখানায় নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে।

হাজত থেকে বাঘকে বিচারকের কাছে নিয়ে যাবার সময় বাঘ পুলিসকে বলল, জজসাহেবের সঙ্গে আমার একটি গোপন কথা আছে, সেটি বলতে দেওয়া হোক। পুলিস জানাল, এখন নয়, বিচারের পরে।

বিচারে বাঘের পাঁচ বছর জেল হল। রনুর বয়স বিবেচনা করে তাকে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হল। বাঘের প্রার্থনা এবারে মঞ্জুর হল। সে তখন নিরাপত্তা পুলিসের প্রহরাধীনে জজসাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে কি যেন বলল।

জজসাহেব কিছুক্ষণ চোখ বুজে চিন্তা করে বললেন, বাঘকে মুক্তি দিলাম। এবার ওকে ক্ষমা করা গেল। কিন্তু এ রকম বিচার বিভ্রাটে জজের খুব নিন্দা হল। আদালতে হাজার হাজার লোক এসেছিল, তারা অবাক হল। সবাই বলল, কি অন্যায়!

কিন্তু তাদের কোনো কথাই শোনা হল না, জজের নির্দ্দেশে কয়েকজন কনষ্টেবল বাঘকে নিয়ে গেল দমদম এয়ারোড্রোমে এবং সেখান থেকে বাগডোগরার টিকিট কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হল দেশে।

বাঘ রওনা হতেই জজ উঠে জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা কিছু মনে করবেন না। শুনুন, আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় বিড়াল আছে; তাই আমি যখন শুনলাম ঐ বাঘ আমার সেই বিড়ালের দূরসম্পর্কে মেসো হয়, তখন আর তাকে জেলে পাঠাতে পারলাম না। পাঠালে আমার বিড়ালটি দুঃখে মরে যেত। এই পৃথিবীতে তার ঐ মেসোমশাই ভিন্ন আর কোনো আত্মীয় নেই।

জজসাহেবের এই রকম মনখোলা কথায় সবার মন ভিজল, এবং তারাও মন খুলেই বলল, ও, এই কথা? তা আমরা তো জানতাম না, তাই এতক্ষণ হল্লা করেছি। আমাদের ক্ষমা করবেন আপনি।

জজসাহেব বললেন, না না, ক্ষমা চাইবার আর কি আছে, ওরকম ভুল সবারই হয়ে থাকে, আপনারা নিশ্চিন্তমনে ঘরে ফিরে যান, বাঘকে আমি নিজের খরচে জলপাইগুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি, সেইখানেই ওর বাড়ী।

সবাই এ কথায় জজের গুণগান করতে করতে ঘরে ফিরে গেল।

ময়ালের বন

সুকুমার দে সরকার

দূর পাহাড়ের মাথায় হলদে রোদ। এ দিকটায় বড় বড় মোটা শাল, আসন, কাঞ্চন গাছের ভিড়। বুনো কলাগাছ দেখা যায় মাঝে মাঝে। জায়গাটা ঠাণ্ডা ছায়াস্নিগ্ধ হিল্লোলিত বনময়। চমকানো চোখে নিঃশব্দে একটা বন-মোরগ ছুটে পালাল। দূর থেকে ভেসে যায় লঙ্গুর-বানরদের খেয়াল-খোলা আনন্দ-ধ্বনি—"কু-উ! উকু-উ! উকু উকু উক্কু!"

এ দিকটা ঠাণ্ডা স্তব্ধ গম্ভীর। কান পেতে শোন, দূরে শুনতে পাবে কত রকমের রহস্যময় ভূতুড়ে বন্য শব্দ! কিন্তু এখানটা স্থির। লঙ্গুরেরা সাড়া না নিয়ে বনের এ কোণে ঢোকে না। গাছে গাছে বুনো কলার কাঁদি ঝুলে থাকে। মধুর লোভে ভালুক আসে না এধারে অন্ততঃ হুকুম না নিয়ে। খেঁকশিয়াল আর বন-বেরাল এড়িয়ে চলে এধার; এমন কি, ঈগলও এখানে ছোঁ-মারার আগে ডেকে জানিয়ে দেয় যে সে এই বনে শিকার করতে চায়! অথচ বনের এ কোণটায় মৌমাছিরা গড়ে চাক, বন-মোরগেরা খেলা করে, মাটির ঢিপিতে অসংখ্য ফুটো করে করে বেড়ে চলে খরগোসের পাল।

সে দিন কিন্তু একটা অসম্ভব ঘটনাই ঘটে গেল! কোথা থেকে একটা লঙ্গুর-বানরের বাচ্ছা এসে যেন লঙ্কা-দাহন সুরু করে দিল জায়গাটায়! হুপ হুপ করে এ-গাছে ও-গাছে লাফায়, কলার কাঁদিগুলো ভাঙে, কিছু খায়, কিছু মাটিতে ছোঁড়ে। একবার লাফিয়ে নামে মাটিতে, আবার "উকু-উকু-উক্কু" ডেকে উঠে, ছুটে লাফিয়ে গাছে চড়ে, আবাব নামে। এদিকের শান্ত ঘুমন্ত বনে সে এক মহা হৈ-চৈ!

তারপরে একবার মাটিতে নেমে হঠাৎ জমে গেল লঙ্গুর-বাচ্ছা। তার কিছু দূরেই যেন একজোড়া মরকত মণির সবুজ আগুন জ্বলছে আর সেই আগুনটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকে। সে নড়তেও পারছে না, পালাতেও পারছে না! স্থাণুর মত অনড় বসে সে দেখল, একটা অতিকায় সরীসৃপ হড়কে এগিয়ে আসছে তার দিকে। আসলে সে দুটো মরকত মণি নয়—প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপের একজোড়া ঠাণ্ডা জ্বলন্ত চোখ!

ময়ালের মাথাটা লঙ্গুরের অল্প দূরে এসে ঘাসের মাঝে থেমে গেল। একটা ঠাণ্ডা শিহরন অনুভব করল লঙ্গুর-বাচ্ছাটা। তারপরে হিস্ হিস্ করে ময়ালটা বলল, "যে পায়ে শব্দ ওঠে না, যে চোখ আঁধারে জ্বলে, যে কানে দূরের বাতাস খবর বয়ে আনে, সেই শুধু বনের কর্তা হওয়ার উপযুক্ত। জানিস লঙ্গুর-বাচ্ছা, রাজা আমি,

অনড় বসে সে দেখল, একটা অতিকায় সরীসৃপ....

তোকে আজ আস্ত গিলে ফেলব?"

লঙ্গুর-বাচ্ছাটা তখন সত্যি সত্যিই ঠক-ঠক করে কাঁপছে!

—"লঙ্গুর-সর্দার শেখায়নি তোকে যে বনের শিকারীকে চমকে দিতে নেই? শিকারী চমকে গেলে তখন তার জ্ঞান থাকে না, যাকে সামনে পায় আক্রমণ করে বসে। না হলে বাচ্ছা জানোয়ারকে সহজে শিকার করে না কোন শিকারী, শুধু সেই হতভাগা কেঁদো-বেরালগুলো ছাড়া।"

তার চোখের মোহময় আকর্ষণ কমিয়ে আনল ময়াল; বলল সে, "যা লঙ্গুর-বাচ্ছা, তোকে আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এই বুড়ো ময়ালের কাছে থেকে শিখে নে যে, সব জানোয়ারের একটা একটা ডেরা আছে বনে। কারও এলাকায় কেউ ঢুকতে হলে জানিয়ে দিয়ে ঢুকতে হয়। নেকড়েরা শিকার করার আগে ডেকে জানিয়ে দেয়—'শোন বনবাসী, আমাদের খাদ্য চাই; এই বনে শিকার করব আমরা।'

যদি জবাব আসে 'পেট ভরাবার জন্যেই শিকার কর,

মারার আনন্দে নয়!' তবেই নেকড়েরা শিকারে নামে। সব শিকারী জানোয়ারেরই ওই ধুয়ো। এমন কি ভাল্লুক যখন মৌচাক ভাঙে, সেও মৌমাছিদের মিষ্টি কথা বলে নেয়, 'কিছু মনে কোরো না ভাই! তোমাদের চাকটা ভাঙতে হবে, ক্ষিধে পেয়েছে! তার বদলে অবশ্য তোমরা যত খুশী হুল ফুটোতে পার।'

ময়াল হিস্ হিস্ করে হেসে ওঠেঃ "ভাল্লুকের লোমওলা গায়ে হুল ফুটিয়ে মৌমাছিরা করবে কি? শুধু বনের এই ভদ্রতা মানে না কেঁদো-বেরাল—বাঘ। সে মনে করে, সে এই বনের রাজা, সব নিয়মের ওপরে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে শিকার করলেই হলো! কিন্তু একদিন দাম দিতে হবে ওই কেঁদো-বেরালটাকে!"

ময়াল মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তিন লাফে অতি সাহসী লঙ্গুর-বাচ্ছা ময়ালের বন ছেড়ে গাছের ডালে-ডালে মিলিয়ে যেতে থাকে।

কালো বাঘটার মখমল-জোড়া পায়ে কোন শব্দ ওঠে না অথচ পেশীতে তার সে কি দ্রুত গতি! বনের পর বন অতি অল্পক্ষণেই পার হয়ে যায় সে। আর যেখানে শিকার—সে যে জানোয়ারের এলাকার মধ্যেই হোক না কেন,—নিঃশব্দে আক্রমণ করে সে। সে জানে যে, সে বাঘ—বনের রাজা।

কিন্তু সেদিন হলো কি, বন থেকে যেন শিকার উবে গেল! যে বনেই যায় বাঘ, কোথাও শিকার নেই! এর একটা কারণ ছিল। বনের নিয়ম ভাঙায় বনের সব জানোয়ার বিরক্ত হয়ে উঠেছিল বাঘের ওপর। তাই আকাশের চিল সেদিন প্রহরীর কাজ করছিল। বাঘ তার নিজের ডেরা থেকে সেদিন বার হওয়া মাত্র আকাশ থেকে একটা চিল ডেকে উঠলঃ

"কি-ই কিরকি-কি!"

নীল আকাশের আর এক প্রান্ত থেকে আর একটা চিল লুফে নিল তার ডাকঃ "কি-ই কিরকি-কিরকি-কি! কেঁদো-বেরাল যায়, সাবধান! সাবধান!"

বেলা বেড়ে চলে। পলাশের দল বনের মাথা রাঙিয়ে তুলেছে, সূর্য্যের আলো সেই লালে পড়ে সোনা হয়ে ঠিকরে যাচ্ছে। বুনো কুচো ফুলের গন্ধে বাতাস ভরপুর।

শিকার! শিকার কোথায়? ক্ষিধেয় মাতাল হয়ে উঠেছে কালো বাঘ। আর কতদূর? এত মাটি মাড়িয়ে এল সে, একটাও শিকার নেই?

দীর্ঘ আসন গাছটার একটা ডালে পা আটকে মাথা নীচু করে চোখ বুজিয়ে ছিল বাদুড়দের সর্দ্দার সিং। সূর্য্যের রশ্মি তখন প্রখরতর। তীক্ষ্ণ আলো চোখে সয় না বাদুড়দের। চোখ বুজিয়েই সিং বলে, "কেঁদো-বেরালটা আসছে।"

ময়াল ধীরে ধীরে কুণ্ডলীর পাক খুলতে লাগল। আর কালো বাঘ চলার পথে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। "ওই ত সামনে রসাল খাদ্য—নরম সাপের মাংস অজস্র! ক্ষিধেটা আজ মিটবে ভাল।"

বন কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে লাফাল বাঘ ময়ালকে লক্ষ্য করে। একটু নড়লও না ময়াল। আর কালো বাঘ যখন লাফিয়ে পড়েছে তার মাথায় তখন তার দীর্ঘ শরীরের অবশিষ্ট অংশ ফাঁসের মত গোল হয়ে নিঃশব্দে পাকিয়ে ফেলল কালো বাঘটার শরীর।

এক পাক, দু পাক, তিন পাক, চার পাক! ময়ালের মাথার দিকটা মড়ার মত নিশ্চল। ওদিকে বাঘ তখন প্রথম কামড়টা বসিয়েছে এমন সময় সব নিঃশব্দে নিংড়ে বেরিয়ে এল তার শরীর থেকে!

ময়ালের পাক তখন সজোরে চেপে বসতে শুরু করছে। ভয়ে আর্ত্তনাদে চীৎকার করে উঠল কালো বাঘ।

ময়াল হিস্ হিস্ করে বলল, "রাজা ভাবলেই রাজা হওয়া যায় না। যে পায়ে শব্দ ওঠে না, যে চোখ আঁধারে জ্বলে, যে কানে দূরের বাতাস খবর বয়ে আনে, যে শিকারী অন্য শিকারীকে সম্ভ্রম করে চলে, সেই শুধু বনের রাজা হওয়ার উপযুক্ত।"

ময়ালের পাক দৃঢ়তর হলো। আর একটা শেষ আর্ত্তনাদ করে উঠল কালো বাঘ।

"কি-ই-ই কিরকি কিরকি কি!"

চিলের ডাক নীলে-ঝলসানো আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চমকে চমকে যেতে লাগল।

—"ই-ই, কিরকি-ই!"
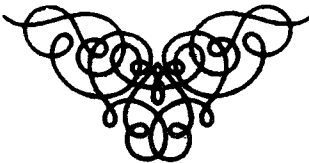
রূপোর ডালে সোনার পাতা

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

বাপ-মা তার নাম রেখেছিল টুনটুনি। মা তাকে আদর করে ডাকত খুদে টুনটুনি বলে।

খুদে টুনটুনি খুদেই আছে এখনও। কতই বা তার বয়স—নয় ডিঙিয়ে দশে পড়েছে বোধ হয়।

মার মিষ্টি মুখখানা তার এখনও একটু একটু মনে পড়ে যেন স্বপ্নের মত। বাবাকে কিন্তু তার মনেই পড়ে না।

কোন কুলে কেউ আর নাকি এখন নেই তার। এত বড় পৃথিবীতে খুদে টুনটুনি একবারেই একা।

কবে কেমন করে যে বেচারা তাঁতী আর তাঁতিনীর খপ্পরে পড়েছিল, তা সে জানে না। দয়ামায়ার লেশও নেই তাদের মনে।

দু'বেলা দু'বাটি সাতবাসী পান্তা আর এক ছিটে নুন তাকে খেতে দেয় আর উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটায়।

চরকায় সুতো কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা, সেই কাপড় ধোলাই করে বেলনে পরিপাটি করে গুটিয়ে রাখা, তারপর আবার হেঁসেল তোলা, বাসন মাজা, কাঠ কাটা, গোয়াল কাড়া—গেরস্থালীর সব কাজই সে করে মুখ বুজে। তবু একটা মিষ্টি কথা নেই তাদের মুখে।

পান থেকে চুন খসলেই দেখে কে তাদের তম্বি! তাঁতী চোখ লাল করে বলে,—মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয় অমন হাবাতে মেয়ের। তাঁতিনী ঝাঁটাহাতে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে। মুখ ভেংচিয়ে বলে,—খেংরিয়ে ভেঙে দিতে হয় ও পোড়ার মুখ।

এইভাবে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দিন যায় বেচারা টুনটুনির।

তাঁতী আর তাঁতিনীর ছিল তিন মেয়ে। বড় মেয়ে এক-চোখো, মেজ মেয়ে দু-চোখো আর সবার ছোটটি তে-চোখো।

তিনটি মেয়ে তিন কুঁড়ের ধাড়ী। সংসারের কুটোটুকু ছিঁড়ে দুখান করে না। কেবল বসে বসে খায় আর পায়ের ওপর পা দিয়ে রাজা-উজীর মারে।

একদিন হয়েছে কি—তাঁতীর ধবলী গাইটাকে টুনটুনি, রোজ যেমন নিয়ে যায়, সেদিনও তেমনি মাঠে নিয়ে গেছে চরাতে। গাইটাকে সে প্রাণ ঢেলে ভালবাসত আর গাইটাও যেন বুঝত তা। টুনটুনির যত কিছু দুঃখের কথা হত ধবলীর সঙ্গে।

সেদিন টুনটুনি ধবলীর গলা জড়িয়ে খুব আদর করে বললে,—ধবলী ভাই, আর যে পারি না নিত্যি ওদের জুলুম সহ্য করতে। হাড় কালি হয়ে গেল দিনভোর খেটে খেটে, তবু মন পাই না ওদের।...সারাদিন কেবল মুখঝামটানি আর বেদম মার। খিদে পেলে যদি কাঁদি, তাহলে আর রক্ষে নেই।...একরাশ তুলো দিয়েছে। কালকের মধ্যেই কাটনা কেটে, তাঁত বুনে, বোনা কাপড় ধোলাই করে বেলনে গুটিয়ে ফেলতে হবে।...কেমন করে করি বল তো ধবলী ভাই? বলতে বলতে ছলছল করে উঠল তার দুটি চোখ।

ধবলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে,—কিছু ভেবো না টুনটুনি ভাই।...তুমি একটা কাজ কর—আমার একটা কানের মধ্যে সুড়সুড় করে সেঁধিয়ে যাও আর বেরিয়ে পড় আর এক কান দিয়ে। ব্যস, তাহলেই তোমার সব কাজ ফতে। আর কিছুই করতে হবে না তোমাকে।

টুনটুনি তো শুনে অবাক্‌। বললে,—সত্যি?

ধবলী বললে,—হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ, যা বলছি তা করেই দেখ না একবার।

ধবলী যেমন যেমন বলেছিল, টুনটুনি তখন ঠিক তাই করলে। তার এক কানের মধ্যে ঢুকে পড়ল আর বেরিয়ে এল আর এক কান দিয়ে।

বেরিয়েই দেখে, তাই তো, সত্যিই তো; আগে যেখানটায় সে তুলো রেখে দিয়েছিল, সেখানে তুলোর বদলে রয়েছে তাঁতে বোনা একখানা চমৎকার ধোলাই-করা ধবধবে কাপড় বেলনে দিব্যি করে জড়ান।

দেখেই তো সে আহ্লাদে আটখানা! খুশিতে নাচতে নাচতে সে বেলনে জড়ান কাপড় নিয়ে সটান তাঁতিনীর সামনে গিয়ে হাজির।

তাঁতিনীর হাড় তো জ্বলে গেল তাকে দেখে। সে আর কিছু না বলে, মুখখানা তোলো হাঁড়ির মত করে কাপড়টা একটা পেঁটরার মধ্যে তুলে রাখলে আর টুনটুনিকে আরও বেশী তুলোর কাঁড়ি দিয়ে ধমক দিয়ে বললে,—যা, এগুলো নিয়ে যা।...আর একখানা বেশ মিহি কাপড় বুনে ফেলবি

আরও তাড়াতাড়ি। দেরি হলে তোর হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করব, মনে থাকে যেন।

টুনটুনি সেই তুলোর কাঁড়ি নিয়ে ছুটল ধবলীর কাছে। ধবলীর কথামত সে আবার সেই আগের মত তার এক কান দিয়ে ঢুকল আর অন্য কান দিয়ে এলো বেরিয়ে। তারপর তুলোর বদলে বেলনে জড়ান ধবধবে তাঁতের কাপড় নিয়ে ফিরে এলো তাঁতিনীর কাছে।

তাঁতিনী মুখ হাঁড়ি করে কাপড়টা পেঁটরার মধ্যে তুলে রেখে আবার একগাদা তুলো দিয়ে টুনটুনিকে বললে,—বেশ ভাল একখানা কাপড় বুনবি এবার। দেরি করবি না কিংবা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কাজ খারাপও করবি না। কাপড় মনের মত না হলে, তোর একদিন কি আমারই একদিন।

টুনটুনি সেই তুলোর গাদা নিয়ে হাজির হল ধবলীর কাছে।

এইভাবে দিন যায়। তাঁতিনী টুনটুনিকে কাঁড়ি কাঁড়ি তুলো দিয়ে যত জব্দ করতে যায়, ততই জব্দ হয়ে যায় সে নিজে।

শেষে একদিন সে তার বড় মেয়ে এক-চোখোকে ডেকে বললে,—

কুঁড়ের ধাড়ী সে হাবাতে মেয়েটা কি যে করে মাঠে গিয়ে,
কাটনা কাটে কে, তাঁত কে চালায়, কাপড় কে দ্যায় গুটিয়ে,
এক-চোখো সোনা, দেখে আয় তো মা, তার সাথে সাথে গিয়ে।

মার কথা শুনে এক-চোখো টুনটুনির সাথে একদিন সকালে গেল মাঠে।

একেই তো সে ঘুম-কাতুরে, তার ওপর শীতের সকাল। উঠতেও হয়েছে ভোর ভোর। তখনও ঘুম লেগে রয়েছে তার চোখে।

সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর বসে বেশ আরাম করে রোদ পোয়াতে পোয়াতে তার ঢুলুনি এলো। সে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঝিমুতে লাগল।

তাই দেখে টুনটুনি তার চোখের ওপর হাত নেড়ে নেড়ে সুর করে বললে,—

এক-চোখো দিদিমণির এক চোখ ভরি
ঘুম দাও, ঘুম দাও, ওগো ঘুম-পরী।

যেমনি এই কথা বলা, অমনি রাজ্যির ঘুম নেমে এলো তার চোখে। সে চোখ বুঁজিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই ফাঁকে টুনটুনি রোজকার মত ধবলীর এক কানে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে এলো আর দেখলে তার তুলো থেকে তৈরী সুতোয় বোনা ধবধবে পরিষ্কার একখানা তাঁতের কাপড় পরিপাটি করে জড়ান রয়েছে বেলনে।

সে তখন সেই কাপড় এনে তুলে দিল তাঁতিনীর হাতে।

তাঁতিনী দেখলে তার বড় মেয়েকে দিয়ে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হল না। তাই এবার সে মেজ মেয়ে দু-চোখোকে ডেকে চুপিচুপি বললে,—

কুঁড়ের ধাড়ী সে হাবাতে মেয়েটা কি যে করে মাঠে গিয়ে,
কাটনা কাটে কে, তাঁত কে চালায়, কাপড় কে দ্যায় গুটিয়ে,
দু-চোখো সোনা, দেখে আয় তো মা, তার সাথে সাথে গিয়ে।

এবার টুনটুনির সাথে মাঠে চলল দু-চোখো মেজ মেয়ে।

কিন্তু সেও ঘুম-কাতুরে কম না। এক-চোখো বড়দিদির মত সেও একটু পরে ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে শুয়ে পড়ল। তাই দেখে টুনটুনি তার চোখের ওপর হাত নেড়ে নেড়ে বললে,—

দু-চোখো দিদিমণির দুটি চোখ ভরি
ঘুম দাও, ঘুম দাও, ওগো ঘুম-পরী।

তার মুখের কথা শেষ না হতেই দু-চোখোর চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল। দু চোখ বুঁজে অঘোরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই সুযোগে টুনটুনি তার কাজ হাসিল করে নিলে। তারপর রোজকার মত বেলনে জড়ান ধোয়া ধবধবে তাঁতের কাপড় এনে দিলে তাঁতিনীকে।

মেজ মেয়েকে দিয়েও কোন কাজ হল না দেখে রাগে রিরি করতে করতে তাঁতিনী এবার পাহাড়প্রমাণ এক তুলোর বস্তা ধপাস করে চাপিয়ে দিলে বেচারা টুনটুনির মাথায়। দিয়ে বললে,—কাপড়ের বুনন যদি আরও মিহি আর ধোলাই যদি আরও ভাল না হয় তো তোমার আদিখ্যেতা জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব, এই বলে দিলাম।

তারপর সে তার ছোট মেয়ে তে-চোখোকে আড়ালে ডেকে বললে—

কুঁড়ের ধাড়ী ও হাবাতে মেয়েটা কি যে করে মাঠে গিয়ে,
কাটনা কাটে কে, তাঁত কে চালায়, কাপড় কে দ্যায় গুটিয়ে,

তার চোখের উপর হাত নেড়ে...বললে,—

তিন-চোখো সোনা, দেখে আয় তো মা, তার সাথে সাথে গিয়ে।

এবার তে-চোখো চলল টুনটুনির সাথে।

মাঠে গিয়ে খানিকক্ষণ মনের আনন্দে সে রোদে খুব ছুটোছুটি লাফালাফি করল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলে ঘাসের ওপর।

টুনটুনির সেদিন কি জানি কি হল, তার চোখের ওপর হাত নাড়তে নাড়তে ভুল করে সে বললে,—

তিন-চোখো দিদিমণির দুই চোখ ভরি
ঘুম দাও, ঘুম দাও, ওগো ঘুম-পরী।

একথা যেমনি বলা অমনি তার দু চোখ ঘুমে বুঁজে গেল বটে কিন্তু আর একটা চোখ দিয়ে পিটপিট করে দেখতে লাগল কেমন করে টুনটুনি ধবলীর এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে আসে আর কেমন করে ভোজবাজির মত তুলোর বদলে বেলনে জড়ান তাঁতে বোনা কাচা ধবধবে কাপড় হাতে নিয়ে সে বাড়ি ফেরে।

তে-চোখোর মুখে সব কথা শুনে আর এতদিনে সব কথা জানতে পেরে তাঁতিনীর তো মহাফুর্তি!

সে তখনই তাঁতীকে বললে,—কালই নিকেশ কর বজ্জাতের ধাড়ী ওই গাইটাকে।

তাঁতী আমতা আমতা করে কি বলতে যাচ্ছিল, তাঁতিনী ঝংকার দিয়ে উঠল,—না না, তুমি বাপু আর কাঁদুনি গাইতে এস না ওর হয়ে।...আর একদিনও দেরি না করে কালই খতম করে দাও ও পাপটাকে।

তাঁতী আর কি করে—মস্ত একটা ছোরা নিয়ে বসল সে শানাতে।

আড়াল থেকে তাই দেখে টুনটুনির চোখ তো চড়কগাছ! কাঁদকাঁদ হয়ে সে তক্ষুণি ছুটল মাঠে।

সেখানে গিয়ে ছলছল চোখে ধবলীর গলা জড়িয়ে ধরে সে বললে,—কি হবে ধবলী ভাই, তাঁতী যে কাল তোমাকে কেটে ফেলবে ঠিক করেছে। তাহলে কি হবে বল না। বলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তাকে অমন করে কাঁদতে দেখে ধবলী বললে,—ছি টুনটুনি ভাই, আমার জন্যে কেঁদ না।...যা বলি তাই শোন এখন। আমাকে যখন ওরা কেটে ফেলবে, তুমি তখন করবে কি—আমার হাড়গুলো সব একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে নিয়ে গিয়ে বাগানের এক কোণে পুঁতে দেবে। তারপর রোজ সেখানে জল দেবে তুমি।...কেমন—মনে থাকবে তো আমার কথা?

সে কথার জবাব দিতে গিয়ে টুনটুনির গলা ভারী হয়ে এলো। ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল সে।

তাঁতিনীর কথার নড়চড় হল না। তার কথা ঠেলতে না পেরে তাঁতী পরের দিন সকালেই কেটে ফেললো ধবলীকে।

টুনটুনি কাঁদতে কাঁদতে তার হাড়গুলোকে একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে বাগানে নিয়ে গিয়ে এক কোণে পুঁতে দিলে। আর রোজ সেখানটায় জল দিতে লাগল।

জল দিতে গিয়ে একদিন সে দেখলে সেখানে একটা চারাগাছ হয়েছে। দিনে দিনে সেই গাছ যখন বড় হল, গাছ ছেয়ে গেল কনকচাঁপা ফুলে। টুনটুনি অবাক হয়ে দেখলে গাছের ডালগুলো সব রূপোর আর পাতাগুলো সব সোনার।

ঝিরঝিরে বাতাসে সেই ডালগুলো যখন দুলতে থাকে, রোদ্দুরে ঝকঝকে করে সোনার পাতাগুলো আর কনকচাঁপার গন্ধে ম-ম করে সারা বাগান, তখন সে কি শোভা! বাগানের আশপাশ দিয়ে যে যায়, সেই থ হয়ে চেয়ে থাকে সেই গাছের দিকে।

একদিন কি হয়েছে—এক-চোখো, দু-চোখো আর তিন-চোখো তিন বোনে সেজেগুজে বেড়াচ্ছে সেই গাছতলায়। বাগানের ধার দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন এক পরম সুন্দর রাজপুত্র। তিন বোনকে সেখানে বেড়াতে দেখে রাজপুত্র খুনসুড়ি করে বললেন,—

রূপোর ডালে সোনার পাতা, তিন কন্যা তার তলায়,
গাছের ফুল যে আনবে পেড়ে, মালা দেব তার গলায়।
ভিন রাজ্যের রাজার ছেলে, সূর্যসাক্ষী করছি পণ,
রাজার ঘরে রানীর আদর পাবে কন্যা আমরণ।

যে আগে ফুল তুলে আনতে পারবে সেই হবে রাজপুত্রের ঘরণী, রাজপুত্রের মুখে যেমনি এই কথা শোনা অমনি তিন বোনে ভোঁ দৌড়।

গাছের নীচের দিকের ডালে যে ফুলগুলো ফুটেছিল, মরিবাঁচি করে ছুটে গেল তারা সেইগুলো তুলতে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! যেই তারা হাত বাড়িয়েছে ফুল তুলতে অমনি সরসর করে ফুলভরতি ডালগুলো উঠে গেল তাদের নাগালের বাইরে। ডালপালা ধরে তারা যত টানাটানি করে, ডালগুলো ততই কখনও যায় তাদের খোঁপায় আটকে, কখনও বা জামায়। দেখতে দেখতে জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই, খোঁপা লণ্ডভণ্ড, হাত কেটে ছিঁড়ে রক্তে লালে লাল।

নাজেহালের একশেষ হয়েছে যখন তারা, তখন সেখানে এলো টুনটুনি। সে ধবলীকে মনে মনে একবার স্মরণ করে গাছের কাছে গিয়ে হাত বাড়াতেই সরসর করে নেমে এলো ফুলন্ত ডালগুলো। সে অঞ্জলি ভরে ফুল নিয়ে রাজপুত্রকে দিলে।

তারপর একদিন খুব ধুমধাম করে টুনটুনির বিয়ে হয়ে গেল সেই রাজপুত্রের সঙ্গে। আজন্ম দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর এতদিনে সে রাজপুত্রের ঘরণী হয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।

দুর্যোগের বন্ধু

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বজ্র হাঁকে কঠিন রবে আকাশ ঢাকে মেঘে,
পাগল হয়ে বাতাস হঠাৎ বইছে ঝড়ের বেগে,
অন্ধকারে ঢাক্‌ল দিশি
পথ-অপথে গেল মিশি
এ দুর্যোগে বন্ধু, শুধু তুমিই আছ জেগে।
বজ্র হাঁকে কঠিন রবে আকাশ ঢাকে মেঘে॥

জানি না পথ, তুমি এসে ধর আমার হাত,
সঙ্গে থেকে পার করে দাও ঘন-গহন রাত।
পথ-দেখানোর মিথ্যা ছলে
সবাই নানান কথা বলে
জাগায় ভীতি মনে নানান মতের প্রতিঘাত।
ওগো বন্ধু, তুমি এসে ধরো আমার হাত॥
আঁধারে সব ভরসা হারায় অবুঝ অন্তর
তাই তো ভয়ে কেঁপে মরি, তাই তো লাগে ডর।
তুমি আছ কাছাকাছি
এ-বিশ্বাসেই আছি বাঁচি
ভরসা তোমার ভয়ঙ্করে করবে যে সুন্দর।
জানি বন্ধু, তুমি একা মনের নির্ভর॥

বজ্র হাঁকে কঠিন রবে, আকাশ ঢাকে মেঘে,
পাগল হয়ে বাতাস হঠাৎ এলো ঝড়ের বেগে।
জানি সবাই ভয় দেখাবে
তারা কি আর জানতে পাবে
আঁধার পথই হয় যে আলো তোমার ছোঁওয়া লেগে।
বজ্র হাঁকুক, আসুক না ঝড়, আকাশ ঢাকুক মেঘে॥

একজোড়া মোজা

কুমারেশ ঘোষ

সেদিন হঠাৎ হাবুলদাকে অনেকদিন পর দেখতে পেয়ে আমরা ক'জন তাকে চেপে ধরলামঃ হাবুলদা, তোমার বনজঙ্গলের গল্প বলো।

হাবুলদা আমাদের পাড়ার বাসিন্দা, তবে এখন আর থাকে না। কী কাজে যেন নেপালের দিকে বনজঙ্গলে কাটাতে হয় তাকে। তবে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে ছুটি নিয়ে। বলে, শহরের লোকেরা যেমন রেগেমেগে বলে, ধুত্তোর বনে চলে যাবো, ঠিক আমারও তেমনি রোজ রোজ বনজঙ্গল আর বাঘ-ভালুক দেখে দেখে চোখটা যখন পচে যায়, মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় তখন পালিয়ে আসি কলকাতায় এই মানুষের ভিড়ে! বেশ ক'দিন সিনেমা, থিয়েটার, জলসা, ক্রিকেট, ফুটবল ম্যাচ দেখবার পর মেজাজটা ভাল হয়, চোখদুটো বাঘ-ভালুকের চোখের মতই জ্বলজ্বল করে ওঠে—আর তাদের জন্যে মনটাও যেন কেমন-কেমন করে তখন আর ভাল লাগে না কলকাতা—তাই চলে যাই আবার বনে।

সেই হাবুলদা হঠাৎ দেখা গেল বছরখানেক পরে আবার কলকাতায় এসেছে, বোধহয় মেজাজ ভাল করতে, পচা চোখদুটোকে তাজা করতে।

পটলা বললো, হাবুলদা, বনজঙ্গলের গল্প বলো, শুনি আমরা।

আমি বললাম, বেশ নতুন গল্প, হাবুলদা।

নন্তে বললো, হাবুলদা, এমন গল্প বলবে যে আমাদের তাক লেগে যাবে।

শুনে হাবুলদা একটি সিগ্রেট ধরিয়ে বললো, দ্যাখ্ গল্প-গল্প করিসনে। গল্প মানেই বানানো গল্প—এই যাকে বলে মনগড়া কিছু। আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমার কাছে সব সত্যি ঘটনা। তবে হ্যাঁ, বলতে পারিস গল্প হলেও সত্যি।

পটলা দেখলো হাবুলদা যেন একটু গরম হয়ে গেছে, তাই তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললো, আমরা সত্যি ঘটনাই তো শুনতে চাই।

আমিও বললাম, আর সত্যি ঘটনাই অনেক সময় গল্পের মতই মনে হয়।

হাবুলদা যেন খুশীই হলোঃ হ্যাঁ, যাকে বলে সত্যি হলেও গল্প।

নন্তে একটু অধৈর্যগোছের ছেলে। বললো, হাবুলদা, শুরু করো।

দাঁড়া, আগে সিগ্রেটটা শেষ করি।—বলেই হাবুলদা বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই সিগ্রেটটা টানতে লাগলো চোখ বুজে।

আর আমরা তিনজন চোখ ড্যাবড্যাব করে তার সিগ্রেট-পোড়া দেখতে লাগলাম। কতক্ষণে সিগ্রেটটা পুড়ে যায়!

খানিক পরে হাতের পোড়া সিগ্রেটটা ফেলে দিয়ে হাবুলদা চোখ মেলে বললো, আছে তো অনেক ঘটনা, কোন্‌টা বলি ভাবচি—

তোমার যেটা ইচ্ছে।—নন্তেটার ঐ তাড়াহুড়ো।

আমি বললাম, যেটা সব চাইতে ভাল।

তবে শোন—

আমরা তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বসলাম।

হাবুলদা বললো, এই গত শীতের সময়কার ঘটনা। বেশ শীত পড়েচে। আর বনজঙ্গলের শীত তো—একেবারে হাড়কাঁপানো শীত! সে শীত যে কী শীত এই কলকাতায় বসে তোরা তা বুঝতেই পারবিনে।

কী রকম?—পটলা জিগ্যেস করলো।

এই যেমন সব সময় অগ্নিময় হয়ে থাকতে হয়। চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, এমন কি শুতেও আগুন দরকার।—হাবুলদা বুঝিয়ে দিলোঃ মাটির ভাঁড়ে কয়লার আগুন করে ভাই দড়ি বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয়।

পুড়ে যাবার ভয় থাকে না?—নন্তে জিগ্যেস করলো।

থাকে বৈকি! অসাবধান হলে পুড়েও যায়।—হাবুলদা বললো।

আমি জিগ্যেস করলাম, তুমিও ঐ রকম আগুন নিয়ে ঘুরতে নাকি?

নাঃ!—হাবুলদা বললো, আমার রক্তটা গরম বোধহয়।

পটলা বললো, চামড়াটাও বোধহয় মোটা—

গণ্ডারের মত।—নন্তে যোগ দিল।

আমি ধমক দিলামঃ যাঃ! কী বলচিস! কাকে কি বলতে হয় জানিসনে! ওতে গালাগালি দেওয়া হয়।

কিন্তু হাবুলদা দেখলাম রাগ করলো না, বরং হেসেই বললো, নন্তে ঠিকই বলেচে। গণ্ডারের বিষয়ে ওর জ্ঞান আছে দেখচি। গুড্!

শুয়ে থাকলাম চুপ করে অন্ধকারে

পটলা বললো, যাকগে, গল্পটা বলো—

ফের গল্প?—হাবুলদা ধমক দিলো।

না, না—সত্যি ঘটনাটা।—শুধরে নিলো পটলা।

হাবুলদা বললো, আমি তো আগুন সঙ্গে রাখতামই না, এমন কি, হাতে গ্লাভস্ বা পায়ে মোজাও পরতাম না। কিন্তু গত শীতে আমাকেও কাত করেছিল বটে!

তাই নাকি?—উৎসুক হলাম আমি।

হাবুলদা বললো, একরাতে তো শীতের চোটে ঘুম ভেঙে গেল। অথচ গায়ে তিন-তিনটে তিব্বতী কম্বল। ভাবলাম, নাঃ এবার পায়ে মোজা চড়াতেই হলো। খেয়াল হলো পায়ের কাছেই তো আমার একজোড়া উলের হাফ-মোজা রাখা আছে। পরা যাক। ঘুমের ঘোরেই উঠে বসে মোজা একপাটি নিয়ে পায়ে দিতে গিয়ে দেখি মোজাটাও ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে গেছে। যাক, সেটি পায়ে পরিয়ে দু'হাতে ওপর দিকে টানতে গিয়ে দেখি হাফ-মোজা ফুল-মোজা হয়ে যাচ্চে। এ কী রকম হলো! অথচ কাছাকাছি মাইল তিনেকের মধ্যে মেয়েমানুষের নামগন্ধ নেই! কী ব্যাপার! মোজাটা ঠাণ্ডায় বেড়ে গেল নাকি?

আমি তাড়াতাড়ি বিজ্ঞানের জ্ঞানটা ফলাতে গেলামঃ কিন্তু হাবুলদা, বিজ্ঞানে বলে গরমে জিনিস বেড়ে যায়, ঠাণ্ডায় কমে যায়।

হাবুলদা বললো, ঠিকই বলেচিস। এ দেখলাম তার উলটো। ঠাণ্ডা মোজাটা বেড়েই চলেচে। আরো টানতেই ফুল-মোজা একেবারে লেডিজ মোজা হয়ে গেল—একেবারে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত চলে এলো!...এবার সন্দেহ হলো, এ কী রকম ব্যাপার! মাথার কাছেই একহাত লম্বা আট-ব্যাটারীর টর্চ ছিল, জ্বেলে দেখি—সব্বনাশ, একটা পায়থন সাপের মুখের মধ্যে ডান পা ভরে দিয়ে তার দুই ঠোঁট ধরে টানচি!

বলো কি!—আঁতকে উঠলাম আমি। আর সকলেও।

তারপর?—গলা শুকিয়ে গেছে নন্তেরও।

ইস্! কী ভয়ানক!—বললো পটলা।

তখন কি করলে তুমি?—শুকনো গলায় জিগ্যেস করলাম।

কী আবার করবো?—হাবুলদা বললো, অমন শীতে এমন একটা মোজা পেয়ে ছাড়ি কখনো। শুনেচি অনেক সময় এরা জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। নিশ্চয়ই আর একটাও কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। এর খোঁজে আসবে হয়তো!

উঃ! খুব সাহস তো তোমার!—পটলা বললো।

হাবুলদা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললো, আমি তাড়াতাড়ি টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে পায়থনের মোজাটা খুলে সেটা আমার বালিশের তলায় লুকিয়ে চেপে রেখে শুয়ে থাকলাম চুপ করে অন্ধকারে।

তারপর?—আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়।

তারপর হাবুলদা আর একটা সিগ্রেট ধরালো গম্ভীর হয়ে।

নন্তে তাড়াতাড়ি বললো, হাবুলদা, এখন তোমার সিগ্রেট ফোঁকা রাখো। আমি তোমাকে আমার টিফিনের পয়সা দিয়ে একবাক্স গোল্ডফ্লেক কিনে দেবো। এখন বলো, তারপর কী হলো—

হাবুলদা গম্ভীর হয়ে বললো, দাঁড়া, একটু অপেক্ষা কর।

অগত্যা মুখ বুজে অপেক্ষা করতেই হলো।

হাবুলদা সিগ্রেটে আরো দু'চারটে টান দিয়ে বললো, অন্ধকারে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতেই মনে হলো পায়ের কাছে কী যেন একটা নড়চে। বুঝলাম, এসে গেচে। আর দেরি না করে দু'হাতে এই পায়থনটারও ঠোঁটদুটো ফাঁক করে তাতে ভরে দিলাম আমার বাঁ পাটা। আর আশ্চর্য, দেখা গেল এটাও আগের সাইজের। পরে বালিশের তলা থেকে আগের পায়থনটাকে বার করে ডান পায়ে আবার পরে দিব্যি ঘুম লাগানো গেল আরাম করে।

হাবুলদার গল্প, থুড়ি, সত্য ঘটনাটা শুনে আমরা সবাই হাঁ হয়ে গেলাম। বেশ খানিকটা পরেই আমাদের মুখ দিয়ে রা বেরুলো।

বললাম, হাবুলদা, ঐ মজার মোজা জোড়া সঙ্গে করে আনলে না কেন?

শুনে হাবুলদা হাসলোঃ ঐ পায়থনের মোজা জোড়া আমার কাছেই ছিল এতদিন। কিন্তু মাঝে টাকার খুব টানাটানি হলো। কাজেই, কাছেই পাহাড়ী রাজ্য গারোমাণ্ডার রানীর কাছে মোজা জোড়া চারশো বিশ টাকায় বিক্রি করে দিলাম। আমার ঐ লেডিজ মোজা দিয়ে কি হবে বল?

সম্পূর্ণ উপন্যাস

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস, এম্-এ

এক

—"বাবা! বাবা!"

বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে ডাক্তার স্যামুয়েল পেরেইরার তাঁবু!

তাঁবুর বাহিরে আসিয়া জনী প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বাবা! বাবা!"

কিন্তু কোন উত্তরই পাওয়া গেল না।

চেঁচামেচিতে ভৃত্য পেড্রোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায় পেড্রো?"

পেড্রো অবাক্ হইয়া জনীর মুখের দিকে চাহিল—"কেন, বিছানায় নাই?"

—"না।"

পেড্রো ছুটিয়া তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইহাদের পরিচয় বলিবার মত বিশেষ কিছু নাই। ডাক্তার স্যামুয়েল পেরেইরা একজন ভারতীয়, মাদ্রাজের অধিবাসী। বড় একজন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু অবসর গ্রহণ করিলেই কি তাঁহাকে এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে? যাযাবরের মত আজ এখানে, কাল ওখানে, এমনিভাবে আফ্রিকার বুকে?

পুত্র জনী, এখনও নাবালক, বয়স পনেরো-ষোল মাত্র। প্রৌঢ় পিতার এই দেশভ্রমণের অভিযানকে সে উদ্দেশ্যহীন বলিয়াই মনে করে। কিন্তু তাই বলিয়া পিতার প্রতি তাহার ভক্তি বা ভালোবাসার অভাব নাই। পিতা যে একজন দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত, ইহা সে জানে, আর জানে বলিয়াই পিতাকে সে তাহার হৃদয়ে দেবতার আসনে বসাইয়া রাখিয়াছে।

বালক সে, প্রত্নতাত্ত্বিক পিতার অনেক কিছুই সে বুঝিতে অক্ষম। তবু পিতা যে তাহার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, ইহা তাহার কাছে এক পরম গৌরবের বিষয়।

কয়েক বছর হল, সে তাহার মাকে হারাইয়াছে। মাকে হারানো অবধি পিতার জন্য তাহার ভক্তি ও মমতা যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে! পিতাকে সে মুহূর্তের জন্যও একা কোথায়ও ছাড়িয়া দিতে নারাজ। কাজেই পিতার এই উদ্দেশ্যহীন দুঃসাহসিক অভিযানেও সে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে। কিন্তু সেজন্য তাহাকে কম চেষ্টা করিতে হয় নাই। কারণ, পিতা কি কখনও কোন পুত্রকে তাঁহার দুঃসাহসিক অভিযানে সাথী করিতে সম্মত হন? ডাঃ পেরেইরাও কাজেই প্রথমে কিছুতেই রাজী হন নাই। কিন্তু অবশেষে পুত্রের একান্ত আগ্রহ ও অনশন অবলম্বনই জয়ী হইল, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই সম্মতি দিতে হইয়াছিল।

পুত্র জনী ব্যতীত ডাঃ পেরেইরার আরও কয়েকটি সঙ্গী ছিল। একজন তাঁহার বহু পুরাতন ও বিশ্বস্ত নিগ্রো ভৃত্য পেড্রো, আর ছিল তিনটি কষ্ট-সহিষ্ণু উট।

তাঁবুর বাহিরে প্রভাতের আলো তখন ধীরে ধীরে ফুটিয়া

উঠিতেছে। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে কিশোর জনীর আজ একি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! কয়েক বছর আগে সে তাহার মাকে হারাইয়াছে, এবার কি সে তাহার পিতাকেও হারাইল?

একে একে তাহার অনেক কথাই মনে হইল। ডাঃ পেরেইরা কেন যে কায়রো গিয়াছিলেন, কেনই বা কায়রো হইতে নীল নদের বুকের উপর দিয়া বহুদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন, আবার কেনই বা তিনি যে অবশেষে এই অজ্ঞাত মরুভূমির মধ্যে আসিয়াছিলেন, জনী তাহার কিছুই জানে না। তবু যাহোক্, তাহারা প্রথমে এক মরূদ্যানে আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানে জল ও খাদ্যের অভাব ছিল না। কিন্তু একদিন সহসা তাহাও কেন যে পিতা পরিত্যাগ করিয়া সদলবলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, জনী তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। মরুদস্যু বেদুইনরাও বুঝি এমন দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয় না।

পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও জনী কখনও তাহার সুস্পষ্ট উত্তর পায় নাই। পিতা দিনরাত পুঁথি-পত্তর ও মানচিত্র লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। জনী বা পেড্রো বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। বলিতেন, "যদি ভালো না লাগে বা ভয় হয়, দেশে ফিরে যাও।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রশস্ত ললাটে ও বলিষ্ঠ মুখমণ্ডলে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত। তথাপি ইহা বুঝিতে কাহারও বাকি ছিল না যে, ডাঃ পেরেইরা নিশ্চয়ই কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য উন্মাদ নহেন এবং তাঁহার এই দেশ-দেশান্তর অভিযানের পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু অকস্মাৎ রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে তিনি তাঁহার উটটি লইয়া কোথায় যে অন্তর্হিত হইলেন, জনী বা পেড্রো কিছুই তাহার বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কিন্তু এখন কী তাহার কর্ত্তব্য? সে কি পিতার অন্বেষণে বাহির হইবে? না, পিতার জন্য সেই তাঁবুতেই অপেক্ষা করিবে?

পেড্রোর সঙ্গে কিছুক্ষণ পরামর্শ হইল। অবশেষে স্থির হইল, না, অলসভাবে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে—ডাক্তারের সন্ধানেই তাহারা বাহির হইবে।

পরামর্শ কাজে পরিণত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। জনী তাহার তাঁবু তুলিয়া, উটগুলি ও পেড্রোকে সঙ্গে লইয়া অনতিবিলম্বে সীমাহীন মরুপথে পিতার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

কয়েক দিন চলিয়া গিয়াছে। তখন নগ্ন, তৃষিত মধ্যাহ্ন!

আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। দূরে বা নিকটে কোন গাছপালা নাই, কোন পাহাড়-পর্ব্বত নাই; এমন কি এতটুকু ছায়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই! কেবল বৃত্তাকার বালুকাস্তূপ হইতে বাষ্প উঠিতেছে। দূরে দিক্‌চক্রবালে নীলিমার বুকে যেন ছোট্ট একটি কাল বিন্দু—একবার উপরে উঠিতেছে, আবার নীচে নামিতেছে! বস্তুটি যে কি তাহা অনুমান করা কঠিন, তবে মনে হয় শকুনের দল যেন ঘোরাফেরা করিতেছে! কারণ, ঐ বিচ্ছেদহীন উঠানামার মাঝে মাঝে শিকারী পাখীর চীৎকার কানে ভাসিয়া আসিতেছে।

সেই দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দৃষ্টিগোচর হইল, এক ঝাঁক শকুন কোন্ এক শবের মাংস খাইতেছে। কিন্তু হঠাৎ মানুষের পদশব্দে তাহারা ভীত সচকিত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে একসঙ্গে উড়িয়া গেল। তাহাদের পরিত্যক্ত মৃত প্রাণীর বিক্ষিপ্ত কঙ্কাল ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিল।

লোলুপ গৃধ্রের দল পক্ষশব্দে মরুভূমির নির্জ্জনতার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া উড়িয়া গেল বটে, কিন্তু সমস্ত মরুভূমি যেন এক অজানা আশঙ্কায় থম্‌থম্ করিতে লাগিল! সেই ভয়াবহ নির্জ্জনপথে মাত্র দুইটি পথিক—একটি এক ভারতীয় কিশোর ও অপরটি এক নিগ্রো। ইহাদের দেখিয়া শকুনগুলি হঠাৎ উড়িয়া গেল।

বালি তাতিয়া আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছে! উট দুইটি কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইতেছে। চারিধারে বালি ছিটকাইয়া পড়িতেছে। ঘামে উট দুইটির সমস্ত অঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে।

জনী ও পেড্রো ধীরে ধীরে কঙ্কালের নিকটবর্ত্তী হইল। কি জানি এক অজানা আশঙ্কায় জনীর সর্ব্বদেহ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল!

কঙ্কাল যে নরকঙ্কাল নহে, কোন চতুষ্পদ প্রাণীর কঙ্কাল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তবু জনীর অন্তরাত্মা এমনভাবে কাঁপিয়া উঠিল কেন?

ইহার সমাধান করিল পেড্রো। সে এক মুহূর্ত্ত কঙ্কালটি দেখিয়াই সহসা ঘোষণা করিল, "খোকাবাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে! এ কঙ্কাল আমাদের ডাক্তার সাহেবের উটের কঙ্কাল। কর্ত্তা আমাদের এই উটে চেপেই বেরিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর উটের অবস্থা যদি এই হয়, তা হলে কর্ত্তা এখন বেঁচে আছেন কিনা কে জানে?"

জনী অতিকষ্টে আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কিন্তু এ যে আমাদেরই উট, তা কেমন করে চিনলে পেড্রো?"

প্রত্যুত্তরে সে একটি চামড়ার জলপাত্র তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—"এই দেখ।"

জনী পাগলের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া

দেখিল—সত্যই সেই পাত্রে পেরেইরার নাম খোদাই করা রহিয়াছে।

জনী আর ভাবিতে পারিল না। পিতার শোচনীয় পরিণাম কল্পনা করিতেই তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া যেন বন্ধ হইয়া গেল! সে অসহায়ভাবে সেই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নের অতি-উত্তপ্ত বালিরাশির উপর ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল!

পেড্রো অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী হইলেও জনীকে যে কি ভাবে সাহায্য করিবে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

কিন্তু অকস্মাৎ এ কী ভীষণ দুর্য্যোগ! মুহূর্ত্তের মধ্যে বিস্তীর্ণ মরুভূমির দৃশ্য যেন আচম্বিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! তাহাদের চারিদিকে যেন চোখের নিমেষে হরিদ্বর্ণের এক প্রাচীর আবির্ভূত হইল! একটানা শোঁ-শোঁ শব্দে ও ধূলিজালে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল—শবভুক্‌ শকুনি-গৃধিনীর দল কিসের বিপদাশঙ্কা করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে আরব-সমুদ্রের দিকে উড়িয়া গেল!

জনী ও পেড্রো বুঝিল, আর আজ তাহাদের নিস্তার নাই। হতভাগ্য উটগুলিসহ আজ তাহাদিগকে বালুর তলায়ই প্রোথিত হইতে হইবে—আফ্রিকার মরু-ঝড়ই হইল তাহাদের মৃত্যুর কারণ, আজ আফ্রিকার মরুবুকেই তাহাদের শেষশয্যা রচনা করিতে হইবে!

তাহারা উপুড় হইয়া, উভয় হাঁটুর মধ্যস্থলে মুখ লুকাইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দুই

ঝড় উঠিয়াছিল যেমন অকস্মাৎ, সেইরূপ অকস্মাৎই তাহা থামিয়া গেল। উট দুইটি পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল; জনী আর পেড্রোও আবার উঠিয়া বসিল।

মরুভূমির বালু-সমুদ্রে ঝড় থামিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই ধূ-ধূ বালুরাশির উপর সে তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল!

জনী চারিদিকে তাকাইয়া বিস্মিতভাবে পেড্রোকে কহিল, "দেখলে পেড্রো! অনন্ত মরুভূমি এখন সত্যই যেন শুকনো সমুদ্রের চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে! বালুময় সমতল ভূমি এখন দেখো কেমন এবড়ো-খেবড়ো অসমান—বুকের ওপর কত ঢেউ!"

পেড্রো বলিল, "খোকাবাবু, অদেষ্টকে ধন্যবাদ দাও, এমন একটা তুমুল ঝড়ের মধ্যেও যে আমরা বেঁচে আছি!"

জনী বলিল, "সেজন্য ধন্যবাদ নিশ্চয়ই দেবো; কিন্তু তখন বেঁচে গেলেও এখন যে একটু জল না পেলে আর

"এই দেখ।"

বাঁচতে পারবো না পেড্রো, তার কি করা যায়? আমার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি কেউ শুষে নিয়েছে!"

পেড্রোও তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল,—"উটের থলির মধ্যে জল আছে খোকাবাবু! কিন্তু সে জল তো খাওয়ার উপায় নেই।"

প্রত্যুত্তরে জনী বলিল,—"এখন সেই হারানো মরূদ্যান খুঁজে বের করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। সেটা হয়তো খুব কাছে কোথাও আছে।"

পেড্রো পাগলের মত হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বলিল,—"আশার কথা আর শুনিও না খোকাবাবু, ঢের হয়েছে।"

তথাপি জনী আশান্বিত হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"ঐ দেখো উটগুলো যাবার জন্যে কেমন ব্যস্ত হয়েছে! বোধ হয় নিকটেই জলের গন্ধ পেয়েছে!"

পেড্রো আর কোন কথা বলিল না—যাত্রার আয়োজন করিয়া উট দুইটি খুলিয়া দিল। আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা শুরু হইল।

এদিকে বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যের উত্তাপ মৃদুতর বলিয়া মনে হইতেছে। বালি হইতে যে তাপ বিকীর্ণ হইতেছিল, তাহার মাত্রাও হ্রাস পাইয়াছে। তাহারা আবার

পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিল।

মরুভূমির চতুর্দ্দিক স্থির ছবির মত নিস্পন্দ—যেন মরুভূমির শবের উপর দিয়া চারিটি জীবন্ত প্রাণী অজানা পথে মৃত্যুর অভিসারে চলিয়াছে!

ক্রমান্বয়ে প্রায় ঘণ্টাধিক চলার পর তাহারা দেখিল, বালির রং বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অবশেষে আশে-পাশে এখানে-ওখানে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি দেখা গেল। সেই তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের পার্শ্ব হইতে মাটি ক্রমশঃ উঁচু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উট লইয়া সে পথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। তথাপি উট দুইটি থামিল না, প্রাণের দায়ে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি গর্ত্তের সম্মুখে আসিয়া উট দুইটি থামিল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই এক অপূর্ব্ব তৃপ্তির আনন্দে জনীর অন্তরে শিহরন খেলিয়া গেল। কারণ, তাহার পুরোভাগেই ছায়াশীতল মরূদ্যান—আর তাহাদের কাছে—অতি কাছে এক সুউচ্চ পিরামিড!

জনীর বুকের মধ্যে এতক্ষণে যেন আশার হিল্লোল খেলিয়া গেল! আশা হইল, এত বড় পিরামিডের কোন না কোন অংশে তাহারা যতদিন খুশী নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে পারিবে, আর এই শ্যামল মরূদ্যানে পানীয় বা আহার্য্যেরও কোন অভাব হইবে না।

বল্গা-মুক্ত তৃষিত পশু দুইটি স্বেচ্ছায় জলপান করিতে আরম্ভ করিল—তৃপ্তির অপার আনন্দে তাহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! ঝর্ণার স্বচ্ছ জল অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে সোনার বর্ণ ধারণ করিয়াছে। পাহাড় হইতে বাতাস বহিতেছে। গাছে গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। কিন্তু দূরে প্রবাল-রঙিন পিরামিড-শ্রেণী—ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছে। এই মরূদ্যানে আসিয়া তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল!

পিরামিডের অন্তরালে অস্তগামী সূর্য্য। আকাশে মেঘে মেঘে বিচিত্র রঙের খেলা। বাতাস ক্রমশঃ ভিজা ও ঠাণ্ডা হইয়া উঠিতেছে। এখনই রাত্রের অন্ধকারে দিনের সূর্য্যালোক ঢাকা পড়িয়া যাইবে, রাত্রি-সমাগমে বৃদ্ধি পাইবে শীতের তীব্রতা! হু-হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনই উট দুইটি কাঁপিতে শুরু করিয়াছে। সুতরাং রাত্রের আশ্রয় চাই—নহিলে কোন প্রাণীই বাঁচিবে না।

আর কালক্ষেপ করা যুক্তি-সঙ্গত নয়। কাজেই জনী আশ্রয়ের সন্ধানে পিরামিডের দিকে অগ্রসর হইল। পিরামিড-শ্রেণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া জনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সুউচ্চ পিরামিড-শ্রেণী যেন আকাশ ফুঁড়িয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে! তাহাদের উচ্চতা প্রায় শতফুট হইবে। কঠিন গ্র্যানাইট-নির্ম্মিত এই পিরামিডগুলির সুনিপুণ কারুকার্য্য—অতীতের স্থাপত্য-শিল্পের চরম বিকাশ বলিয়া মনে হয়। যে শিল্পীরা এই পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা আর কেহই জীবিত নাই, কিন্তু তাহাদের কীর্ত্তি আজও জীবিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে—কত উত্থান-পতনের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনের লীলা-নিকেতনেও পিরামিড-শ্রেণী সেই অপরিবর্ত্তিত সনাতন মূর্ত্তিতেই সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! কালের প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া দাম্ভিকের মত আজও তাহারা মাথা উঁচু করিয়া আছে! কোথাও এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই, এমন কি এক টুকরা পাথরও স্থানচ্যুত হয় নাই!

জনী কিছুক্ষণ অভিভূতভাবে পিরামিড-শ্রেণীর সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিল। তারপর সহসা তাহার বাস্তব জগতের কথা মনে পড়িল! সে পেড্রোকে কহিল, "পেড্রো! তুমি এইখানে একটু বসো! আমি এর চারদিকটা একবার দেখে আসি।"

এই বলিয়া সে পেড্রোকে সেইখানে বসাইয়া রাখিয়া নিজে পিরামিড-শ্রেণীর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইল ও পেড্রোর দৃষ্টিপথ হইতে শীঘ্রই অন্তর্হিত হইয়া গেল।

জনী পিরামিডের চারিদিক ঘুরিয়া দেখিল কোথাও রাত্রিবাসের স্থান মেলে কিনা! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব—এই তিন দিকে কোন গর্ত্ত বা প্রবেশ-পথ নাই; কিন্তু পশ্চিম দিকে একটি মাত্র প্রবেশ-পথ আছে—সবুজ শষ্পদলে তাহাও প্রায় সমাচ্ছন্ন। সূর্য্যের শেষ রশ্মি তখন সেই গর্ত্তের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

সাহসে ভর করিয়া জনী সেই সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিল। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই সে দেখিতে পাইল, পথটি একটি দেওয়ালের ধার দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। আর ঠিক সেই বাঁকের মুখ হইতে একটি প্রশস্ত দীর্ঘ পথ শুরু হইয়াছে। জমাট অন্ধকারে সেই পথ ঢাকা। মনে হইল, পিরামিডের সেই অংশটি বেশ গরম—রাত্রে আরামে থাকা চলে। রাত্রিবাসের স্থান ঠিক করিয়া জনী ভাবিতে লাগিল, উট দুইটির কি ব্যবস্থা করা যায়! তাহাদের স্থান কোথায়?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জনী সেই পথ দিয়া অন্যমনস্কভাবে ফিরিতেছিল, ভাল করিয়া কোন দিকে লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ অন্ধকারে কিসের খস্‌খস্ শব্দে সে সচকিত হইয়া উঠিল! একটু লক্ষ্য করিয়াই সে বুঝিতে পারিল কে যেন অন্ধকারে সেখানে চলাফেরা করিতেছে!

ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া আসিল! বুক ধড়্ফড়্ করিতে লাগিল! পিরামিডের অন্ধকার জনহীন কক্ষে মনুষ্য-সমাগম কখনই সম্ভব নহে—এ নিশ্চয়ই ভৌতিক প্রক্রিয়া! কারণ, প্রাচীন পিরামিডের গোপন কক্ষের নানা রহস্যের কথা তাহার জানা ছিল। সেই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়াই পিরামিডের নির্জ্জনতায় তাহার গা ছম্-ছম্ করিতে লাগিল। কাজেই সে রীতিমত ভয় পাইল! ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে আরম্ভ করিল, হাত-পা অবশ হইয়া গেল! একসঙ্গে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অনুভূতি যেন নিষ্ক্রিয় হইবার উপক্রম হইল!

জনী চুপ করিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু আর কোনরূপ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না। এবার জনী নিজ দুর্ব্বলতার কথা ভাবিয়া মনে একটু বল পাইল। সে আবার সাহসে ভর করিয়া পিরামিডের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে কোথাও জন-মানবের চিহ্ন নাই, কেবল পেড্রো তখনও বৃক্ষতলে মনের আনন্দে গান গাহিতেছে!

জনী তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—"পেড্রো, পিরামিডের ভেতর থাকবার জায়গা পাওয়া গেছে। জিনিসপত্তর তোল। রাত্রে সেখানেই থাকা যাবে।"

পুকুরের ধারে যদিও ছোট-বড় অনেকগুলি খেজুর গাছ এবং ছোট ছোট গুল্মলতার ঝোপ আছে, তথাপি উটগুলিকে সেখানে রাখা যায় না। কেন না, রাত্রের ভীষণ শীতে উটগুলি মরিয়া যাইতে পারে। অথচ এই উটের সাহায্য ছাড়া লোকালয়ে ফিরিয়া যাওয়া কোনদিনই সম্ভব হইবে না। সুতরাং উট দুইটির রাত্রিযাপনের স্থান খুঁজিয়া বাহির করা একান্ত প্রয়োজন। জনী আর একবার অনুসন্ধানে বাহির হইল।

পিরামিডের অন্তরালে সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। দিনের শেষ রশ্মিকণাও তখন নীলিমার বুক হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। গোধূলির ধূসর অন্ধকারে আকাশের এক প্রান্তে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। জ্যোৎস্নার মৃদু আলোকে শুভ্রায়িত মরূদ্যানের গাছপালা ও পিরামিড-শ্রেণী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! সুউচ্চ পিরামিড-শৃঙ্গ জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত,—কিন্তু তাহার পাদদেশে ছায়া-নিবিড় অন্ধকারের রাজত্ব! হিমশীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে কোথা হইতে গরম বাতাস আসিতেছে! জনীর মনে হইল, বোধ হয় পিরামিডের পেছন হইতেই গরম বাতাস আসিতেছে! সে তৎক্ষণাৎ উট দুইটিকে লইয়া পিরামিডের পশ্চাৎ-ভাগে গমন করিল। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার ধারণা ঠিক নহে; কারণ, সেখানকার বাতাসের বেগ মন্দ হইলেও বেশ ঠাণ্ডা এবং ভিজা। জনীর শীত করিতে লাগিল।

জনী চিন্তা করিয়া দেখিল, এখানে কোন মতেই উট দুইটিকে রাখা চলে না। অদূরে যে পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজ করিতেছে, হয় তো সেখানে কোন গুহায় উট দুইটিকে রাখা যাইতে পারে! এই ভাবিয়া জনী আবার অনুসন্ধান করিতে পর্ব্বতাভিমুখে চলিল।

পর্ব্বতের সন্নিকটে সে একটি উপত্যকার সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেখানে পাহাড় খুঁড়িয়া বিরাট এক গর্ত্ত করা হইয়াছে। সে বোধ হয় আজ অনেক দিনের কথা। কে বা কাহারা কবে যে সেই গর্ত্ত খুঁড়িয়াছিল, আজ তাহা অনুমান করা যায় না! মরুপথের দু'ধারে গ্র্যানাইট প্রস্তরের ছোট-বড় চাঙ্গর পড়িয়া আছে। তাহাতে শ্যাওলা ধরিয়াছে।

একটু লক্ষ্য করিতেই জনী দেখিতে পাইল, সেই গর্ত্তের ভিতরে বরাবর একটি পথ চলিয়া গিয়াছে। সে পথে সাবধানে নামা চলে। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে জনী সেখানে নামিয়া গেল। সেই পথ মাটির নীচে প্রায় কুড়ি ফুট নামিয়া গিয়াছে এবং তাহার সন্নিকটে একটি বড় ঘর। চাঁদের আলো আসিয়া সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া জনী দেখিল, উট দুইটিকে সেখানে দিব্যি রাখা চলে; কারণ, সে ঘরের বাতাস বেশ গরম। ভয়েরও বিশেষ কোন কারণ নাই। কাজেই সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উট দুইটিকে সেই বঙ্কিম পথে গর্ত্তের ভিতরে লইয়া গেল, তাহার পর একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডে উট দুইটিকে বাঁধিয়া রাখিল।

উট দুইটিকে যথাস্থানে রাখিয়া সে পিরামিডের দিকে অগ্রসর হইল। চিন্তা ও পরিশ্রমে তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন, অবাধ্য পা দুটি আর চলে না! তবুও অফুরন্ত আশা ও সাহস তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সে কোন রকমে মনের জোরে পিরামিডের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেখানে আসিতেই হঠাৎ সে দেখিতে পাইল একটি শ্বেত রমণী-মূর্ত্তি নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছে!

সে ভাবিতেই পারিল না কেমন করিয়া এই রাত্রে নির্জ্জন মরূদ্যানে মনুষ্য-সমাগম হইল। কোন অপদেবতা ভিন্ন সে মূর্ত্তি যে জীবন্ত প্রাণী নয়—তাহা বুঝিতে তাহার আর বাকি রহিল না!

ভয়ে ও অজানা আশঙ্কায় তাহার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল! সে একবার চোখ বুজিল, আবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া

চাহিয়া দেখিল—সত্যই সম্মুখে এক শ্বেতাঙ্গিনী রমণী-মূর্ত্তি!

কল্পনা নয়, মায়া নয়—জাগ্রত স্বপন! সম্মুখে প্রেতাত্মা চলিয়া বেড়াইতেছে! শ্যাম শষ্পদলের উপর দিয়া যদিও মূর্ত্তিটি চলিয়াছে, তথাপি তাহার পদশব্দ শোনা যাইতেছে না! আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভয় পাওয়ার কথাই বটে! দ্রুতপদে চলিতে চলিতে চকিতে সেই মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইয়া গেল—যেন বাতাসে শূন্যে মিলাইয়া গেল! অজ্ঞাত আশঙ্কায় জনীর প্রাণ শুকাইয়া গেল!

পিরামিডের স্তব্ধ কক্ষে সেই চঞ্চল শব্দ শুনিয়া এবং জ্যোৎস্নালোকে সেই শ্বেত মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার মনে হইল, সে যেন কোন এক ভূতুড়ে দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! বহু শতাব্দীর নির্জ্জন পিরামিডের গোপন কক্ষে হয়তো কোন প্রেতাত্মা আজও বাস করিতেছে! হয়তো কোন মমির অতৃপ্ত আত্মা পিরামিডে ঘুরিয়া মরিতেছে! নতুবা আফ্রিকার দুস্তর মরুভূমির বুকে হাজার হাজার বছরের পুরাতন পরিত্যক্ত পিরামিডের মধ্যে সুন্দরী শ্বেত রমণীর আবির্ভাব হইল কিরূপে?

জনী ভাবিল একি প্রেত, না পরী?

যেইই হোক্, মানুষ যে নহে, জনীর তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ভয়ে ও আতঙ্কে তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল!

তিন

জনীর মুখ-চোখ দেখিয়াই পেড্রোর সন্দেহ হইয়াছিল, নিশ্চয়ই অপ্রীতিকর কোন একটা ব্যাপার ঘটিয়া থাকিবে। কাজেই সে কিছু ব্যগ্রভাবেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে খোকাবাবু? তোমাকে এমন বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন?"

জনী সব-কিছু বলিবার জন্য পূর্ব্বেই ব্যগ্র হইয়া ছিল। পেড্রো জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল, "পেড্রো, আমাদের এখুনি এখান থেকে চলে যাওয়া সঙ্গত। নইলে কে জানে কখন কোন্ ভূতের পাল্লায় প্রাণ হারিয়ে বসবো!"

এই বলিয়া সে যাহা দেখিয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিল। পেড্রো বলিল,—"খোকাবাবু, সাদা ভূত আমিও দেখেছি। এই পিরামিডের ভেতরে আরো অনেক ভূত আছে। আমি স্বচক্ষে এই পিরামিড থেকে একটা ভূতকে বেরুতে দেখেছি।"—বলিতে বলিতে ভয়ে সে জনীর কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

জনী বলিল,—"সে যাই হোক্ পেড্রো, আমাদের একটু সাবধান থাকতে হবে। মনে রেখো, আমরা এখন একেবারেই অসহায়। ভূতের ভয়ে যে কোথাও চলে যাব, তাও খুব সহজ নয়। আমাদের না আছে খাবার, না চিনি কোন পথ! বরং বাইরে বেরুলে দুর্দ্দান্ত বেদুইন ডাকাতদের হাতে পড়বার আশঙ্কা। কাজেই এইখানে এই পিরামিডের ভেতরেই আমাদের আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু এগুলো এত রহস্যময় মনে হচ্ছে যে, একটু ভাল করে দেখেশুনে রাখা দরকার। আমি তাই একটু ভেতরে চললাম। ইচ্ছে করলে তুমি আসতে পারো, নইলে বাইরেই থাকো।"

পেড্রো কোন কথাই বলিল না। মনিবের কথাও সে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। কি আর করে, ভয়ে ভয়ে সে জনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিল।

জনী দরদালানের করিডোরে আসিয়া মোমবাতি জ্বালাইল। সেই আলোকে দেখা গেল পথটি সাত ফুট উচ্চ এবং চার ফুট চওড়া। ঘরের মেজে ধূলায় ঢাকা। দু'ধারে পাথরের মজবুত দেওয়াল। সম্মুখের দেওয়ালের কাছে খানিকটা দূরে এক বোঝা জ্বালানি কাষ্ঠ পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে জড়করা শুক্‌না পাতা ও দূর্ব্বাঘাসও রহিয়াছে। এক কোণে কিছু ছাই জড় করা, দেওয়ালে ঝুলের বিচিত্র দাগ। এই সমস্ত দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, নিশ্চয় একদিন কেহ এখানে রান্না করিয়া খাইয়া-দাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কে সেই লোক আর কবে ও কেন এখানে আসিয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

জনী আর কালক্ষেপ না করিয়া প্রদীপটি নিবাইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। চারিদিক অন্ধকারের প্লাবনে ডুবিয়া গেল! অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত পথিক দুইটি ঘুমাইয়া পড়িল।

সে রাত্রে জনীর ভাল ঘুম হইল না। নানা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। সে স্বপ্ন দেখিল, তাহার পিতা একদল অসভ্য নিগ্রোর হাতে বন্দী হইয়াছেন। তাঁহার হাত-পা বাঁধা। নিষ্ঠুর নিগ্রোর দল তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। তাহাদের সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। সে তাহার সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া ক্ষুধার্ত্ত দানবের ন্যায় লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে!

পিতার পরিণামের কথা স্মরণ করিয়া সে রাইফেল বাগাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার হাত উঠিল না! সে নিরুপায় হইয়া মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। অসহায়ভাবে পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। এমন সময় অতর্কিতে একটি শকুন যেন আসিয়া তাহাকে ছোঁ মারিয়া আকাশে লইয়া গেল!

হঠাৎ কিসের শব্দে জনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং স্বপ্নের জালও সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হইয়া গেল! জনী শুনিতে পাইল

কে যেন বিকট স্বরে চীৎকার করিতেছে!

চীৎকার শুনিয়া জনীর খুবই ভয় হইল। সে আতঙ্কে প্রাণের দায়ে পিরামিডের বাহিরে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কোথাও কিছু নাই। তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে, মৃদু-মৃদু বাতাস বহিতেছে; খেজুর গাছের পাতাগুলি মৃদু-মন্দ আন্দোলিত হইতেছে। প্রভাতের আলোক-স্পর্শে তাহার সমস্ত ভয় কাটিয়া গেল। সে আবার পিরামিডে প্রবেশ করিল।

যাতায়াতের পথের এক কোণে আসিয়া সে ক্ষণিকের জন্য থামিল এবং উঁকি মারিয়া অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিন্তু কিছুই তাহার চোখে পড়িল না। কেবল তাহার মনে হইল দূর হইতে অতি অস্পষ্ট কিসের শব্দ আসিতেছে—ঠিক যেন পেড্রোর কণ্ঠস্বর!

এতক্ষণ পেড্রোর কথা তাহার মনে হয় নাই। কিন্তু এখন পেড্রোর কণ্ঠস্বরের মত শব্দ শুনিয়া সে চমকিত হইয়া পেড্রোর বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, এ কি, সত্যই যে পেড্রোর বিছানা খালি! কোথায় সে?

জনী চীৎকার করিয়া ডাকিল, "পেড্রো, পেড্রো, তুমি কোথায়?"

কিন্তু কোনই উত্তর আসিল না; শব্দ থামিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে আবার সেই শব্দ! এবারে পেড্রোর কণ্ঠস্বর একটু স্পষ্ট বলিয়াই মনে হইল। সে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"শীগ্‌গির পালাও খোকাবাবু, নইলে আর রক্ষা নেই।"

কিন্তু জনী তাহাতে ভয় পাইল না বা তাহাকে কোন প্রশ্ন করিল না। যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে সে অগ্রসর হইল। যদিও পেড্রোর কণ্ঠস্বর খুব নিকট হইতে আসিতেছিল, তথাপি এত চাপা আওয়াজ শোনা যাইতেছিল যে, মনে হইতেছিল যেন ভূগর্ভের কোন এক অজ্ঞাত কন্দর হইতে শব্দ উঠিতেছে!

সেই শব্দ শুনিয়া জনী বিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কোথায় পেড্রো?"

কিন্তু কোন উত্তর আসিবার আগেই কে যেন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। জনীর কণ্ঠ হইতে ভয়ে একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ বাহির হইল! কেন না সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রাচীরের কোন এক অজানা গুহা হইতে কাহার বলিষ্ঠ বাহু তাহাকে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিল! পরক্ষণেই পেড্রো চীৎকার করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিল। তাহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া টানাটানি করিয়া জনী বহুকষ্টে পেড্রোকে এক রহস্যময় কন্দর হইতে উদ্ধার করিল।

জনী দেখিল, ভয়ে পেড্রোর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে!

জনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছিল পেড্রো?"

প্রত্যুত্তরে উত্তেজিত পেড্রো কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় যাহা ব্যক্ত করিল তাহার মর্ম্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, রাত্রে এক সময় অন্ধকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে অবসাদগ্রস্ত আড়ষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া সামনের দিকে পা বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু সম্মুখের দেওয়ালে পা লাগিতেই দেওয়ালটি যেন একটু সরিয়া যায় এবং সে এক প্রকাণ্ড ধাক্কা খাইয়া ভিতরের অন্ধকার ঘরে পড়িয়া যায়। কক্ষান্তরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দেওয়ালটি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ভীষণভাবে চীৎকার করিয়া ওঠে।

সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জনী তামাসার ছলে মন্তব্য করিল, "পেড্রো, তোমাকে ধন্যবাদ! তুমি যা চীৎকার করেছ তা একটা কালা মানুষও শুনতে পেতো!"

এই কথা বলিয়া জনী একটা মোমবাতি হস্তে সেই রহস্যের কারণ অনুসন্ধানে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবা মাত্র পেড্রো ঘোর আপত্তির সুরে চীৎকার করিয়া বলিল—"দোহাই খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, ওদিকে গিয়ে কাজ নেই, আমি নিশ্চয় জানি এ ভূতের কাজ। এই পিরামিডগুলো ভূতের আড্ডা। আমাকে বিশ্বাস কর খোকাবাবু, আমি শুধু ভূত দেখিনি, তাদের হাতে মার পর্য্যন্ত খেয়েছি।"

জনী কিন্তু সে চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া সেই যাতায়াতের পথের দু'ধারের দেয়াল পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিল, পেড্রোর ঘাস-পাতার বিছানার প্রায় এক ফুট উঁচে একটি পাথরের কিয়দংশ বাহির হইয়া আছে। তাহার পর সে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, সেই পাথরটি দুইটি অদৃশ্য ফ্লিন্টদণ্ডের উপর এমনভাবে স্থাপিত যে, একটু ধাক্কা লাগিলেই পাথরটি ঘুরিয়া যায়। যখন ইহার একধার ঘোরে, তখন অন্যধার বাহির হইয়া আসে। কিন্তু পিছনে সজোরে ধাক্কা দিলেই পাথরটি সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরিয়া যায় এবং একটি গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই গর্ত্তটি প্রায় চার ফুট গভীর।

এতক্ষণে জনী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, কেমন করিয়া পেড্রো সেই গর্ত্তের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল!

সেই গর্ত্তটি আবিষ্কার করিবামাত্রই জনীর কৌতূহল জাগ্রত হইল। সেই গর্ত্তের মধ্যে কি আছে দেখিবার নিমিত্ত সে মোমবাতি লইয়া সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিল।

গর্ত্তটি একটি ছোট ঘরে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ঘরটি

অন্ধকার কিন্তু সেই ঘরের বাতাস বেশ আরামপ্রদ। জনী চিন্তা করিল, এখানে বেশ নিশ্চিন্তে সুখে ঘুমানো যাইবে, কারণ সে ঘরে কোন শবাধার ছিল না।

পেড্রো যেভাবে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া জনী এবার হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে পিরামিডের অভ্যন্তরের কোন অজ্ঞাত কক্ষে ঐরূপ অতর্কিতভাবে নিক্ষিপ্ত হইলে অতিবড় সাহসী ব্যক্তিও নিতান্ত ভীরুর মত চীৎকার না করিয়া পারিত না!

জনী বহুকষ্টে পেড্রোকে বাহির করিল।

পেড্রোর সাহসের একান্ত অভাব ছিল না। সে জনীর জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিল। তথাপি জনীর পশ্চাদানুসরণ করিবার মত সাহস তাহার হইল না।

সে জনীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভূত-প্রেতের কথা উল্লেখ করিয়াছিল, চীৎকার করিয়া বার বার মানা করিয়াছিল। তাহার সেই চীৎকারে আন্তরিকতার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের জাতিগত ভূত-প্রেত প্রভৃতি অপদেবতা সম্বন্ধে যে ভয়মিশ্রিত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সে তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। কাজেই সে নিরুপায় হইয়া অশ্রু-সজল নয়নে জনীর যাত্রা-পথের দিকে—সেই নিবিড় অন্ধকারে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ সে ঐভাবে ছিল, তাহা বলা কঠিন। কারণ, তাহার মাথার মধ্যে তখন কেবলই সেই পিরামিডের নানা রহস্যের কথাই উদয় হইতেছিল।

সে ভাবিতেছিল, গ্রহ-বৈগুণ্যে তাহারা আজ এমন এক জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে চলাফেরা বা শান্তিতে বাস করাও কঠিন। যে কোন দেয়াল বা পায়ের তলার মেঝে কখন যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে, কখন যে তাহাদিগকে বেমালুম গ্রাস করিয়া অন্ধকার উদর-মধ্যে টানিয়া লয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই!

তা ছাড়া, তাহাদের আশে-পাশে না-জানি কত ভূত-প্রেত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ইহারই মধ্যে এক শ্বেত রমণীর সঙ্গে তাহাদের কয়েকবার পরিচয় হইয়া গিয়াছে! নারীমূর্ত্তির আকারে ঐ প্রেতের কুহক তাহাদের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কেন ?—

হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া একটা হাসির শব্দে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাকাইতেই সে দেখিল, অনতিদূরে আবার সেই নারীমূর্ত্তি এক ঝলক বিদ্যুতের মত কোথায় ছুটিয়া পলাইল!

মহা আতঙ্কে পেড্রো দুর্ব্বোধ্য আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

চার

প্রদীপ হস্তে জনী ফিরিয়া আসিল। তখনো তাহার কৌতূহল দুর্নিবার! সে পিরামিডের গুপ্ত কক্ষ তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে। কিন্তু তখন সে ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত। প্রথমে খাদ্যের প্রয়োজন। বোঁচকার মধ্যে রন্ধনোপযোগী খাদ্য-সামগ্রী আছে এবং ইন্ধনও মিলিয়াছে। কাজেই সুন্দর আহার্য্য প্রস্তুত হইবে। প্রাতে তাহারা শুধু খেজুর খাইয়াছে। এখন মধ্যাহ্নের আহার্য্য প্রয়োজন।

কাজেই জনী এবার পেড্রোর অন্বেষণে পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু বাহিরে আসিয়াই দেখিল, পেড্রোর আবার সেই অবস্থা! ভয়ে তাহার মুখ-চোখ নীল হইয়া গিয়াছে। বেচারা তখনও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে!

—"কি হলো পেড্রো? দিন-দুপুরে আবার কি হলো তোমার?"

পেড্রো বিবর্ণমুখে বার-কয়েক চারধারে তাকাইয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, "খোকাবাবু, ভূত কি কখনো রাত-দিন মানে? বিশেষতঃ, এ সব হচ্ছে পিরামিডের ভূত। কত হাজার হাজার বছর আগে যাদের এইখানে কবর দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রেতাত্মা প্রতিহিংসার আশায় পাগলের মত চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এমনি একটা ভূত আমাদের কাঁধে চেপেছে সুন্দরী মেয়েমানুষের চেহারা নিয়ে। সেটা বারবারই দেখা দেয়। এইতো খানিক আগে খিল্-খিল্ করে হেসে ঐ দিকে পালিয়ে গেলো! এমনিভাবে খানিকক্ষণ আমাদের নিয়ে খেলা করবে, তার পরেই করবে আমাদের দফা নিকাশ!

খোকাবাবু, তাই বলছি, যে দিকেই হোক্, চল, এখুনি পালাই।"

জনীও এ সব রহস্যের কোন মীমাংসাই করিতে পারে নাই। তবু তাহার মনে হইল, পেড্রোর সঙ্গে সুর মিলাইয়া সেও যদি এখন ভূতের ভয়ের কথাই বলে, তাহা হইলে পেড্রোকে আর বাঁচানোই যাইবে না! তাই সে ব্যাপারটা হালকা করিবার জন্য বলিল, "সে যাই হোক্, এখন আগুন জ্বালো পেড্রো! একটা কিছু খেতে হবে তো! তুমি বরং আগে জল নিয়ে এসো, আমি আগুন ধরাই।"

কাষ্ঠখণ্ডগুলি বেশ শুষ্ক, সুতরাং আগুন জ্বালাইতে বিশেষ কষ্ট হইল না। ইতিমধ্যে পেড্রো জল আনিয়া উপস্থিত হইল। সহসা জনীর দৃষ্টি ধোঁয়ার গতিপথের দিকে আকৃষ্ট হইল। সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করিল যে, ধোঁয়া বাহিরের দিকে না গিয়া পথের যে অংশে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন, সেই দিকে যাইতেছে, কিন্তু সে দিক হইতে আর ফিরিয়া আসিতেছে না!

জনীর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। সে পেড্রোর উপরে রন্ধনের ভার দিয়া এক টুক্‌রা জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইতেই ধোঁয়ায় তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। তবুও সে অতিকষ্টে অগ্রসর হইল।

নীচু হইতে পথ ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। এক স্থানে আসিয়া যে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, কোথা হইতে এক রাশ দিনের আলো ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে! আরো কিছুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া সে দেখিল যে, একটি ছোট জানালা দিয়া বাহিরের আলো ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। সেই জানালার কপাটে ঝুল জমিয়াছে এবং বহুদিনের ধোঁয়া যে এই পথ দিয়া বাহির হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জনী সেই মুক্ত বাতায়ন-পথে উত্তর দিকের অনুচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী দেখিতে পাইল। এদিকে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড পুড়িয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে মোমবাতি বাহির করিয়া সেই আগুনে ধরাইয়া লইল। পথ জানালার নিকট আসিয়া আবার বাঁকিয়া পিরামিডের পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে এবং তথায় অনুরূপ আর একটি জানালা রহিয়াছে। আর ঠিক সেই জানালার পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত। সেই গহ্বর-পথে মরুভূমি দেখা যায়।

পূর্ব্বদিকে আসিয়া আবার সোপান-শ্রেণী দক্ষিণ দিকে নামিয়া গিয়াছে। তাহার পার্শ্বে আর একটি জানালা রহিয়াছে। সেই উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে মরূদ্যানের একাংশ, পুষ্করিণী ও দূরের সুবিস্তৃত ধূসর রুক্ষ মরু-প্রান্তর দেখা যায়।

সেই জানালার কাছে আসিয়া পথ যেন সহসা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! কারণ, পথের মাঝখানেই সুউচ্চ পাষাণ-প্রাচীর।

প্রাচীরের প্রতি প্রস্তরখণ্ড পরীক্ষা করিয়াও সে কোথাও কোন গুপ্ত পথের সন্ধান পাইল না! কিন্তু তথাপি তাহার কৌতূহল চরিতার্থ হইল না! কারণ, পিরামিডের এই পথের এমন কতগুলি বিশেষত্ব ছিল, যাহার কোনই অর্থ সে করিতে পারিল না। সে প্রত্যেক জানালার বিপরীত দিকে একটি করিয়া সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান পাইয়াছে। সে সকল সুড়ঙ্গ-পথে কেবল গুঁড়ি মারিয়া প্রবেশ করা যায়। সেই সুড়ঙ্গ-পথ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়।

জনী তখন ফিরিয়া আসিল। সে মনে মনে ঠিক করিল, অন্য এক সময়ে সেই সকল সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবে।

সুড়ঙ্গ-পথের নানা রহস্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে জনী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রান্না করিতে করিতে পেড্রো মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে। প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখায় তাহার মসীকৃষ্ণ বলিষ্ঠ দেহ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সে নীচু হইয়া আগুনে ফুঁ দিতে ব্যস্ত ছিল। বাতাসে কম্পমান অগ্নি-শিখা অন্ধকারাচ্ছন্ন দেওয়ালের পটভূমিকায় আলোছায়ার অপূর্ব্ব মায়াপুরী রচনা করিতেছিল। জনী তাহার নিকটে আসিয়া দেখিল, সে এক বোঝা কাঠ আগুনে

দিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ সে কাষ্ঠখণ্ড ফেলিয়া দিয়া ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

জনী দ্রুতপদে তাহার নিকটে আসিতেই সে বলিয়া উঠিল—"দেখ খোকাবাবু, এসব কোত্থেকে এলো!"

জনী দেখিতে পাইল, গোটা-কয়েক রাইফেল সেই কাঠগুলির সঙ্গে রহিয়াছে! সেই রাইফেলগুলি হাত দিয়া সরাইতেই সে দেখিতে পাইল কতগুলি গাদা বন্দুক এবং তাহারই নীচে একটি কাঠের পিপার উপর আরবী ভাষায় কি একটা ঠিকানা লেখা রহিয়াছে। কয়েক মিনিট ইতস্ততঃ করিবার পর সে খামটি ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল।

পড়িতে পড়িতে তাহার মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সে উদ্বিগ্ন হইয়া একবার আগুনের দিকে আর একবার চিঠির দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর সে সহসা সস্‌-প্যান্‌টি উল্টাইয়া দিয়া, পা দিয়া টিপয়টি দূরে সরাইয়া দিল এবং নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি-শিখাগুলিকে নির্ব্বাপিত করিল।

তথাপি তাহার ভয় দূর হইল না। পেড্রোকে উদ্দেশ্য করিয়া বিহ্বল কণ্ঠে বলিল—"পালিয়ে চল পেড্রো, নইলে প্রাণে বাঁচবে না।"

এই কথা বলিতে বলিতে জনী মুহূর্ত্তের মধ্যে পিরামিড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুষ্করিণীর দিকে দৌড়াইয়া গেল।

পেড্রো এতক্ষণ বিমূঢ়ের মত জনীর এই অদ্ভুত কার্য্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। অকস্মাৎ জনীর চিৎকারে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সেও দ্রুতপদে জনীর অনুগমন করিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে জলাশয়ের ধারে আসিয়া তাহারা বালু-সৈকতে শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে পেড্রো প্রকৃতিস্থ হইয়া বিজ্ঞের মত রসিকতা করিয়া বলিল—"এবার কিন্তু আমি ভয় পাইনি, মাষ্টার জনীই ভয়ে চীৎকার করেছিলেন!"

জনী গম্ভীর হইয়া বলিল—"হ্যাঁ, একথা সত্যি। কিন্তু তার জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আচ্ছা পেড্রো, ঐ পিপের মধ্যে কি ছিল বলে তোমার মনে হয়?"

পেড্রো তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"কি আবার? বিয়ার।"

—"দূর বোকা! বারুদ,—শুকনো বারুদ—আবার আগুনের কাছেই! কাজেই রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে যে কোন মুহূর্ত্তেই তুমি গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যেতে! বুঝলে?"

—"কিন্তু তুমি কি করে টের পেলে ওতে বারুদ আছে?"

—"এই চিঠিতে লেখা ছিল, এই দেখ না।"—এই বলিয়া জনী পকেট হইতে ভাঁজ করা সেই চিঠিখানা বাহির করিয়া দিল।

পেড্রো চিঠিখানা হাতে করিয়া লইয়া দেখিল—সেই রহস্যময় চিঠিখানা বিশ্রীভাবে চল্‌তি ফরাসী ভাষায় লেখা। অতি কষ্টে পাঠোদ্ধার করিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ

"শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাত্রে, মরূদ্যানের শিবিরস্থিত ইস্‌লামের রক্ষাকর্তা (তাঁহার নাম জয়যুক্ত হোক) নুরুলের পুত্র আবুল কাসেমের প্রতি—আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন—

আপনার ভৃত্য কাইরোর বণিক (মোশীর বংশজাত কিন্তু সত্য ধর্ম্মাবলম্বী) ইউসুফ্‌-বিন্‌-ইব্রাহিম কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী। সুতরাং সে পূর্ণিমার দিন শেখেদের সহিত পিরামিডে কোন উপায়ে মিলিত হইতে পারিবে না।

সুতরাং, হে পবিত্র শক্তিমান্‌ মহাপুরুষ (আপনার শত্রুর ধ্বংস হউক)? আমাকে মিথ্যাবাদী বা আপনার কাজে গাফিলি করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না। আমি এতই অসুস্থ যে, আপনার চরণ চুম্বন করিতে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। সেজন্য আমাকে নিশ্চয় ক্ষমা করিবেন।

পরিশেষে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, যেহেতু আমি নিশ্চিতরূপে এবং নিরাপদে আপনার পবিত্র শিবিরে আপনার লিখিত মত রৌপ্য-মুদ্রা ও মারণাস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়াছি, সেইজন্য এ দাসের কোন অপরাধ লইবেন না।

প্রেরিত দ্রব্যের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) ১২ সহস্র রৌপ্য-মুদ্রা (২) ১০টি রাইফেল (৩) ৫০টি গাদা বন্দুক (৪) এক বাক্স রাইফেলের বুলেট্‌ (৫) দুই তাল সীসা (৬) বুলেট্‌ তৈয়ারী করিবার ছাঁচ দুইটি (৭) এক পিপা বারুদ (৮) একটি ক্রীতদাসী।

ইস্‌লামের সুলতান আবুল কাসেম যেন তাঁহার অযোগ্য দাস ইউসুফের অনুপস্থিতির অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বাধিত করেন।

আল্লার নামে লিখিতেছি (বিধর্ম্মীরা যেন তাঁহাকে ভজনা করে)। ইতি—

আপনার দাসানুদাস

ইউসুফ্‌-বিন্‌-ইব্রাহিম, কাইরো।"

জনী তিনবার সেই পত্রটি পাঠ করিল এবং প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক ছত্রের কি অর্থ হইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিল। সে আরো পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, কালি তাজা, কাগজও নূতন। সুতরাং পত্রখানি নিশ্চয় অধিক দিন পূর্ব্বে লিখিত নহে। জনী একটি ঘন ঝোপের পার্শ্বে বসিয়া আবুল কাসেমের কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

এই সেই আবুল কাসেম! ইঁহার সম্বন্ধে সে ইতিপূর্ব্বে অনেক গুজব শুনিয়াছে। নীলনদের নৌকার মাঝিদের মুখে

সে আরো জানিয়াছিল যে, এই কাসেমই অসাধারণ শক্তিশালী—এই কাসেম সাধারণ ব্যক্তি নহে—লোকে মনে করে ঈশ্বর-প্রেরিত দেবদূত এবং দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ বক্তা। তাঁহারই নেতৃত্বে আরবেরা আবার নাকি খৃষ্টান ও অমুসলমানদের উপর প্রভুত্ব করিবে এবং নিখিল বিশ্বকে পবিত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে। কাসেম পুনরুত্থান ও বিচার-দিনের অগ্রদূত।

ডোঙ্গলার কোন এক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শোনা যায়, তাঁহার ভ্রাতারা নীলনদের অশিক্ষিত মাঝি ছিল। কাসেম কিন্তু ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশব হইতেই তিনি অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। শোনা যায়, বার বৎসর বয়সেই সমগ্র কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যৌবনের প্রথম অবস্থায় তাঁহার মনে বৈরাগ্য-ভাবের উদয় হয়। পঁচিশ বৎসর বয়সেই তিনি ফকির হইয়া গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগের পর তিনি এক গহ্বরে থাকিয়া উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করেন। শোনা যায়, এই কঠোর সাধনায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ফলে লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধপরিকর হয় যে, তিনি একজন উচ্চ-শ্রেণীর ফকির। ইহার পর চল্লিশ বৎসর বয়সেই তিনি আপনাকে ঈশ্বর-মনোনীত মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা বলিয়া ঘোষণা করেন।

তাঁহাকে একচ্ছত্র নেতা বলিয়া মানিবার আর একটি অন্তর্নিহিত কারণ ছিল। সে কারণ আর কিছু নয়, আরবেরা তুরস্ক বা মিশরের শাসন-প্রণালী মোটেই পছন্দ করিত না। কাজেই তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, কাসেমই তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই কাসেম ছিলেন অত্যন্ত চতুর ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার এই গুণের জন্যই হিক্স্‌-পাশার সৈন্য-সামন্ত অতি সহজেই পরাজিত হইয়াছিল।

চিঠির মানুষটি যাহাই হোক—তাঁহার চরিত্রে যে একাধারে দৃঢ়তা ও কৌশলী যোদ্ধার কূট-নৈপুণ্য ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জনীর মনে হইল, হয় তো এই লোকটির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবে! এই লোকটি সামান্য ব্যক্তি নহেন; কারণ, তাঁহার অনুচরেরা এখন পর্য্যন্ত কাইরো শহরে অবস্থান করিতেছে। জনী এবার স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের সম্মুখে আবার এক নূতন বিপদের আসন্ন ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে! কারণ, কাসেমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার মানেই যমের সঙ্গে পরিচয়!

কিন্তু একটি কথা জনী কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, চিঠিখানি কেন কাসেমের হস্তে না দিয়া এই পিরামিডের ভিতরে রাখা হইয়াছে! অথচ চিঠিতে লেখা রহিয়াছে, "আমি নিরাপদে রৌপ্য-মুদ্রা, সুন্দরী দাসী এবং অস্ত্রাদি আপনার পবিত্র শিবিরে প্রেরণ করিয়াছি।"

সমস্ত কিছুই সে পাইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সুন্দরী দাসীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কেন ইউসুফের দূত কাসেমকে জিনিসগুলি পৌঁছাইয়া দেয় নাই? কেন লুকাইয়া রাখিয়াছে? হয় তো বা তাহারা পৌঁছাইয়া দিয়াছে, না হয় মরূদ্যানের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। চিঠিটাও খোলা হয় নাই কেন?

জনীর একবার মনে হইল, অপরের চিঠি পড়ার জন্য তাহার ক্ষমা চাওয়া উচিত। আবার সে চিন্তা করিল, সহস্র বৎসর ধরিয়া মরুভূমির যে পিরামিডের কথা কেহই জানে না, সেই অজ্ঞাত পিরামিডের ভিতর বন্দুক, রাইফেল এবং চিঠির আবির্ভাব সম্ভবপর হইল কিরূপে?

কিন্তু চিঠির অর্থ কি? হয় মরূদ্যানে আরবদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে, না হয় একটি সভা হইবে। কিন্তু কোন্ পূর্ণিমায়? গত মাসের পূর্ণিমায়, না আগামী মাসের? অথবা আজকের এই পূর্ণিমা-রাত্রে?

এই কথা স্মরণ করিয়াই জনীর মনে একটু ভয় হইল। সে পেড্রোকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—"আজ আমাদের খুব সাবধানে থাক্‌তে হবে।"

সমস্ত কথা পেড্রোর কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে এতক্ষণ ঢুলিতেছিল, হঠাৎ সে চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিল—"কেন, ডাক্তার আসবেন?"

জনী কোন উত্তর করিল না। তাহার মুখে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিল! সে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল—"ডাক্তার নয় পেড্রো, কাসেম আসবেন।"

কাসেমের নাম শুনিতেই পেড্রো ভয়ে শিহরিয়া উঠিল এবং তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—"সেই শয়তান কাসেম!"

তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া জনী সহাস্যে বলিল, "থামো, থামো, তুমি কি সব সময় কেবল নতুন-নতুন ভয়ের আমদানি করবে? কাসেম আর যা করুক, আমাদের জ্যান্ত খেয়ে নেবে না। তার কাছে বাবার খবর মেলাও অসম্ভব নয়!"

পেড্রো বলিল, "কিন্তু কাসেম শয়তান। মুসলমান ছাড়া আর কাউকে সে বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু কাসেম যে আসবে তা জানলে কেমন করে?"

—"চিঠিতে সে কথা লেখা আছে।"

—"আচ্ছা খোকাবাবু, এই বারুদ-বন্দুক সবই কি

"এসব কোত্থেকে এলো?"

কাসেমের জন্য?"

জনী বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু কেমন করে এসব এখানে এলো—যাকে দিয়ে পাঠানো হলো সে কোথায়—সুন্দরী ক্রীতদাসীই বা কোথায়, তার কিছুই বুঝতে পারছি না!"

—"যাই হোক্, খোকাবাবু, চল আমরা পালাই।"

হাসিয়া জনী বলিল, "কিন্তু পালাবো কোথায় পেড্রো? তার চেয়ে এসো কাসেমের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব করি।"

প্রত্যুত্তরে গম্ভীর কণ্ঠে পেড্রো বলিল, "সে চেষ্টা বৃথা খোকাবাবু! কাসেম বন্ধুত্ব করে না; বন্ধুত্বের ভান করলেও তাতে মেশানো থাকে বিষের ছুরি।

আমি তাকে ভালো রকমেই জানি। ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিশ্বস্ত ভক্ত বলে নিজেকে জাহির করলেও ধর্ম্ম-টর্ম্ম তার কাছে কিছু নেই। টাকা আর বিশ্বাসঘাতকতা—এই হচ্ছে ওর মূলমন্ত্র।"

জনী কথাগুলি খুবই মন দিয়া শুনিয়া গেল। কথা শুনিতে শুনিতেও তাহার মাথায় কেবলই একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল, জিনিসগুলি কাসেমের হাতে সাক্ষাৎ মত না দিয়া, এমনভাবে এখানে ফেলিয়া যাইবার উদ্দেশ্য কি? আর কই সেই পত্র ও জিনিস-বাহক দূত? ও কই সেই সুন্দরী ক্রীতদাসী?

পেড্রোও ততক্ষণে অনেক-কিছুই চিন্তা করিতেছিল। ভূত-প্রেতের ভয় বুঝি তাহার দূর হইয়া গিয়াছিল! দুর্দ্দান্ত কাসেমের ভয় তখন তাহাকে নানা দুশ্চিন্তায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

পাঁচ

জনী জানিত যে, আরব-সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। নরহত্যা করিতে তাহারা বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। সুতরাং তাহাকে সাবধানে কাজ করিতে হইবে। নতুবা তাহাদের জীবনলীলা খার্তুমের জলে শেষ হইতে পারে! এ কথা চিন্তা করিয়া সে ভয় পাইল। সে আবার পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিল। যদিও বার বার পড়ার দরুণ পত্রখানি প্রায় তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সে পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিল।

সে চিন্তা করিল, নিশ্চয় এ সেই বিশ্বাসঘাতক ইহুদী। সে একবার মিশরীয় সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। সে এখন কাসেমের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে; নতুবা সে নিজেই আসিত এবং অস্ত্র ও টাকা পাঠাইয়া কাসেমকে সাহায্য করিত। তাহার অসুখ ভান মাত্র। সে ধূর্ত্ত কাসেমের নিকটে আসিতে সাহস পায় না। তাহার দূতেরাও কাসেমকে ভয় করে, তাহা না হইলে তাহারা স্বয়ং কাসেমকে জিনিসগুলি পৌঁছাইয়া দিত—এই পিরামিডের ভিতর এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিত না। তাহারা নিশ্চয় একটি ক্রীতদাসীও জোগাড় করিয়াছে। আহা! বেচারা! তাহার ভাগ্য আমাদের চেয়েও মন্দ! আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমরা অজানা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া বহু কষ্টে এই মরূদ্যানে উপনীত হইয়াছি। এখন জানি না ভাগ্যে আরো কি আছে! কারণ, ফিরিয়া যাইবার কোন পথই জানা নাই। হয়তো এমনও হইতে পারে যে, শীঘ্রই আমরা এক দল বিদ্রোহী বেদুইন দস্যুর কবলে পড়িব!

জনী উঠিয়া আর একবার পিরামিডের ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন আগুন নিভিয়া গিয়াছে। উনানের পার্শ্বে রাশীকৃত ছাইয়ের স্তূপ জড়ো করা। ছাইয়ের ভিতর হইতে জনী বারুদের পাত্র, বন্দুক এবং চামড়ার টাকার থলে বাহির করিল। কোন বস্তুই নষ্ট হয় নাই।

সেগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে জনী পেড্রোকে

বলিল—"এই নাও, পেড্রো, একটা বন্দুক তোমার কাছে রাখ। আর বারুদের পাত্রটি পুকুরের পাড়ে নিয়ে চলো। সাবধানে নিয়ে চলো, যেন বারুদের গুঁড়ো মাটিতে না পড়ে!"

জনীর কথামত পেড্রো সেই বারুদ-পাত্র কাঁধে করিয়া পিরামিডের বাহিরে চলিয়া গেল। জনী আবার আগুন জ্বালাইয়া রাঁধিতে বসিল।

পেড্রোর ফিরিতে বিলম্ব হইল। সে যখন পিরামিডের ভিতরে ফিরিয়া আসিল, তখন রান্না প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

রাত্রিতে জনীর সে দিন ভাল ঘুম হয় নাই। কারণ, সে দিন ছিল অসহ্য গরম। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, এক অজানা আশঙ্কায়ও সে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই; তাহার প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হইতেছিল, কখন না-জানি আরব-দস্যুরা মরূদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হয়!

শয্যাত্যাগ করার পর জনী ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, এখন সে কি করিবে? আপাততঃ সে একটু বিশ্রাম চায়। কেননা গত তিন দিনের চিন্তা ও শ্রমে তাহার সমস্ত দেহ ও মন অবসন্ন ও ক্লান্ত। এই কয় দিনের উদ্বেগ, অমানুষিক পরিশ্রম, অনিশ্চয়তা ও রহস্যময় ঘটনাবলী—একযোগে তাহার মনকে পীড়িত করিয়াছে। এখন আর কিছু নয়, সে পূর্ণ বিশ্রাম চায়।

কিন্তু কেবল বিশ্রাম করিলে তো চলিবে না! সম্মুখে আবার নূতন বিপদের ছায়া। কিন্তু ভরসা এই যে, তাহারা যদি সেই গোপন কক্ষে লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তো আরবেরা তাহাদের নাগাল পাইবে না! কিন্তু তাহাদেরও যদি সেই গুপ্ত-প্রবেশ-পথ জানা থাকে, তবে তো বিপদের একশেষ হইবে!

এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে সে স্থির করিল যে, পিরামিডের একধারে লুকাইয়া থাকিয়া তাহারা শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবে এবং কাসেমের নিকট যদি আত্মসমর্পণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তবে তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে।

কিন্তু উট! ইহাদের সে কোথায় লুকাইবে? নিশ্চয় ইহারা শত্রুর নজরে পড়িবে। কিন্তু উপায় কি? সে কি ইহাদের হত্যা করিবে? কিন্তু উট ছাড়া তাহারা কেমন করিয়া আবার লোকালয়ে ফিরিয়া যাইবে? যেমন করিয়াই হোক, উটগুলি লুকাইয়া রাখিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে সে পিরামিডের পশ্চাদ্দিকে যেখানে পিরামিড প্রস্তুত করিবার জন্য পাহাড় কাটা হইয়াছিল, সেই দিকে চলিল।

সে দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত দেখিতে পাইল। তাহার চারিধারে ছোট-বড় টুকরা-টুকরা পাথর ছড়ানো। সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার মানসলোকে পিরামিড-নির্ম্মাণের দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তাহার মনে পড়িয়া গেল—বহু শতাব্দী আগে হয় তো কোন এক অত্যাচারী রাজা নিরীহ শ্রমিকদের উপর অযথা অত্যাচার করিয়া পাথরের উপর পাথর সাজাইয়া এই পিরামিড প্রস্তুত করাইয়াছেন! তাহার পর কত যুগ-যুগান্তর কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মানুষের সৃষ্টি এই পিরামিড-শ্রেণী আজিও অম্লান থাকিয়া সর্ব্বধ্বংসী কালের শক্তিকে উপহাস করিতেছে!

এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে ভাবাবেশে জনী তন্ময় হইয়া পড়িল। ক্রমে সেই শ্রমিকদের চীৎকারও যেন তাহার শ্রুতিগোচর হইল! বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই সব শ্রমিকের দল বুকের রক্ত জল করিয়া পিরামিডের পাথর সংগ্রহ করিয়াছিল; মাটি কাটিয়া সমতল ভূমি প্রস্তুত করিয়া পাথরের পর পাথর সাজাইয়া পিরামিডের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু একদিন মৃত্যু আসিয়া ঐশ্বর্য্যের ব্যবধান, ক্ষমতার পার্থক্য, সমস্তই ঘুচাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদের মৃতদেহ হয়তো এই সব পিরামিডেই সমাহিত হইয়াছে!

এ সব কত কাল আগের কথা—কে জানে? কিন্তু এই সব পিরামিড-শ্রেণী আজও অবিনশ্বর; তাহাদের দেহে ধ্বংসের প্রলেপ আজও পড়ে নাই! হয়তো বহু শতাব্দী আগে একদিন এই পিরামিড-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল এবং নৃত্য-গীত-মুখরিত এক উৎসবের মধ্যে মহাসমারোহে পিরামিডের শুভ উদ্বোধনও হইয়াছিল! তাহার পর হয়তো আসিয়াছিল শোভাযাত্রীর দল—মরুভূমির কোন এক দূরপ্রান্ত হইতে! তাহাদের গতি মন্দীভূত, কণ্ঠে বিষাদ-গাথা! কারণ, তাহাদের রাজার শবযাত্রা। হয়তো মিশরের দেবতা তাঁহার প্রতি কুটিল নেত্রে চাহিয়াছিলেন! তাই তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছিল!

সহসা পেড্রোর বিকট চীৎকারে তাহার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সে জনীকে উদ্দেশ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—"খোকাবাবু! অমন করে কি ভাবছ? এদিকে এস; দেখো এখানে এক হাজার উট রাখা যেতে পারে।"

জনী সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। তখন এক ঝলক দিনের আলো সেই গহ্বরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোকে সে দেখিতে পাইল যে বহুপূর্ব্বেই স্থানটি আস্তাবলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে!

সুতরাং উটগুলিকে এখানে রাখা নিরাপদ নয়। সে

মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"এতে চলবে না পেড্রো! আমার মনে হয় কাসেমের উটগুলোকে এখানে রাখা হবে, তাই আগে হতেই এ জায়গাটা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। আমাদের উটগুলো এখানে থাকলে তারা দেখে ফেলবে। কাজেই এস, আমরা অন্য কোন জায়গা খুঁজে বার করি।"

জনীর ওকথা শুনিয়া পেড্রো বলিল—"খোকাবাবু, এই দিকে এস।"

এই বলিয়া সে পিরামিডের যেখানে কতকগুলি পাথরের টুকরা পড়িয়া ছিল, সেই দিকে চলিল।

জনী সেই প্রস্তরস্তূপের অন্তরালে দশ-বার ফুট উচ্চ একটি ছোট পথ দেখিতে পাইল। পথের দুই পার্শ্ব বেশ সমতল। দেখিলেই মনে হয় যে, এই সর্পিল দীর্ঘ-পথটি প্রকৃতির স্বহস্ত-রচিত।

জনী সেই পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সে দেখিতে পাইল যে, সেই পথের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত এবং সেই গর্ত্ত হইতে গোলক-ধাঁধার ন্যায় একটি পথ পিরামিডের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

বাহিরের দেওয়ালের ছোট ছোট ফাঁক দিয়া সূর্য্যালোক ভিতরে আসিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু তাহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই যেন সূর্য্যালোক ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া আসিতে লাগিল। কাজেই সেই স্বল্পালোকে ভাল করিয়া পথ দেখা যাইতেছিল না। সেইজন্য চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে তাহারা আছাড় খাইতে লাগিল। শ্যাওলা জমিয়া পথ এতই পিচ্ছিল হইয়াছিল যে, সে পথে চলাফেরা করা অত্যন্ত কষ্টকর।

সেই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে, পথটি ঘুরপাক খাইয়া এক বাঁকের মুখে সূচীভেদ্য অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। সেখানে এত অন্ধকার যে নিজের হাত পর্য্যন্ত দেখা যায় না! কাজেই তাহারা হাত এবং পা দিয়া পথ অনুভব করিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু পথ যেন ক্রমশঃই অধিকতর দুর্গম, স্যাঁৎসেতে ও অন্ধকারময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তথাপি তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিল। কারণ, তাহারা পথের এমন স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল যে, ফিরিয়া যাওয়া একরূপ অসম্ভব; কাজেই তাহারা বহু কষ্টে পথ অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এইরূপ কিয়দ্দূর চলার পর অকস্মাৎ তাহাদের মনে হইল যে চিররাত্রির অন্ধকার আলোর বন্যায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু এ আলো কোথা হইতে কেমন করিয়া গুহার অভ্যন্তরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার কিছুই ভাবিয়া পাইল না! বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহারা চাহিয়া দেখিল সম্মুখে মাটির মধ্যে একটি গুহা রহিয়াছে। সেই ভৌতিক গুহার অর্দ্ধগোলাকৃতি খিলান হইতে রামধনু-বর্ণের আলোকরশ্মি পথের উপরে গড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই পীতাভ সূর্য্যরশ্মি গুহার ছাদের খাঁজকাটা ছিদ্রপথ দিয়া প্রবেশ করিয়া একখণ্ড উজ্জ্বল স্ফটিকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। দেখিলেই মনে হয় যেন অন্ধকার সহসা এখানে আসিয়া পরাজিত হইয়াছে!

সেখানে আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব লীলা—স্বপ্নময় রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে! বাহিরের আলোক-সম্পাতে সেই স্ফটিকের উপরিভাগ চক্‌চক্‌ করিতেছে এবং তাহার ইন্দ্রধনু-বর্ণের বিচিত্র ছটা প্রদীপ-শিখার মত ঘরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জনী মন্ত্রমুগ্ধের মত সেদিকে চাহিয়া রহিল। লোকালয়ের অন্তরালে অজ্ঞাত পিরামিডের কোন্ এক গোপন কক্ষে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে কারুকার্য্যের এমন চূড়ান্ত বিকাশ কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল, সে তাহা ভাবিয়াই পাইল না!

সত্যই সেখানে ভাস্কর্য্যের যে কি অপূর্ব্ব সমাবেশ—তাহা চোখে না দেখিলে বোঝানো যায় না! চিত্র-বিচিত্র ছাদ হইতে শুক্তিশুভ্র কঠিন তুষারকণা প্রাচীন গির্জ্জাগুলির গম্বুজে গম্বুজে কারুকার্য্য-খচিত ঝলকের ন্যায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে!

মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া জনী বলিল—"এটা পরীর দেশ পেড্রো, পরীর দেশ! কিন্তু পরী কোথায়? চিঠিতে এক সুন্দরী ক্রীতদাসীর কথা লেখা আছে বটে। সম্ভবতঃ সেই এ দেশের পরী হবার যোগ্য। কিন্তু কোথায় সে?"

পেড্রো একটু হাসিয়া জনীর রসিকতায় যোগদান করিয়া বলিল, "কিন্তু খোকাবাবু, পরী যে সেই ক্রীতদাসীই হবে তার তো কোন মানে নেই! মাঝে মাঝে এক শ্বেতমূর্ত্তি নারী যে আমাদের দেখা দিয়ে পিলে চমকিয়ে দিচ্ছে, হয়তো সে-ই হচ্ছে এ দেশের পরী! আর—"

পেড্রোর কথা শেষ হইল না। সহসা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল! কোথা হইতে সত্যই শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা এক রমণী আসিয়া জনীর পদতলে পতিত হইল! তারপর অনুনয়ের স্বরে ইংরেজীতে কহিল, "আমায় এমন বিপদে ফেলে যাবেন না। আপনার কথাবার্ত্তা শুনে বুঝতে পেরেছি আপনি একজন ভারতীয়। ভারতীয়দের অন্তঃকরণের কথা আমি অনেক সময় অনেক পুঁথি-পত্তরে পড়েছি। সেই বিশ্বাসে নির্ভর করেই আমি আপনার দয়া ভিক্ষা করছি।

আপনি আমায় আশ্রয় দিন—আমায় রক্ষা করুন।”

জনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই শ্বেতমূর্ত্তির দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। কি যে সে বলিবে বা করিবে, তাহার কিছুই সে স্থির করিতে পারিল না।

ছয়

প্রথম দর্শনে জনী ও পেড্রো ভাবিয়াছিল, শ্বেত-বসনা রমণী নিশ্চয়ই কোন ভূত বা প্রেত!

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ইহারা তাহারই কথা আলোচনা করিতেছিল—এক শ্বেতমূর্ত্তি তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ দেখা দিয়া তাহাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছিল, ইহাই ছিল তাহাদের আলোচ্য বিষয়।

তাহাদের আলোচনা শেষ না হইতেই শ্বেতমূর্ত্তি যে সত্যই আবার তাহাদিগকে দর্শন দিবে ও মানুষের ভাষায়, মানুষেরই মত তাহাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে, কে তাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল?

কিন্তু এতক্ষণে বুঝিল, শ্বেতমূর্ত্তি প্রেত নহে—যথার্থই কোন মানুষ—এবং সে বিপন্না রমণী—নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়িয়াই সে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে!

জনীর মনে হইল, এই তরুণীই নিশ্চয় সেই পিরামিডের ভূত! মরূদ্যানে আমি এরই শ্বেতমূর্ত্তি দেখেছিলাম। বোধ হয় কেন, এই সেই সুন্দরী দাসী।

শেষ কথা চিন্তা করিয়াই জনীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল—দাসী! সুন্দরী শ্বেতাঙ্গ-রমণী আজ দাসী? না, এর প্রতিকার করতেই হবে, তাতে যদি কাসেমকে হত্যা করতে হয়, তাতেও প্রস্তুত! জনী আর চিন্তা করিতে পারিল না।

বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে সেই তরুণীটি চক্ষু উন্মীলিত করিল। পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে কপোল হইতে ঘনকৃষ্ণ অলকরাশি অপসারিত করিয়া সচকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর জনীর পশ্চাৎ দিকে পেড্রোকে দেখিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল!

পেড্রো তাহার বিহ্বলতার কারণ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল—“আপনি ভয় পাবেন না, আমরা বন্ধুলোক; আপনার কোন উদ্বেগের কারণ নেই।”

পেড্রোর কাছে আশ্বাস পাইয়া সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল! মুক্তিলাভের আশায় তাহার প্রাণ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল! সেই আনন্দে, বাঁচার নূতন স্বপ্নে তাহার কৃষ্ণায়ত আঁখি-পল্লব নিমীলিত হইয়া আসিল।

কিন্তু এত সুখ তাহার সহ্য হইবে কেন? আনন্দের আতিশয্যে তাহার প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। তাহার পায়ের নীচে পৃথিবীও যেন টলিয়া উঠিল। জনী মেয়েটির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ধরিতেই সে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাহার কোলের উপর পড়িয়া গেল।

জনী তখন পেড্রোকে ডাকিয়া বলিল—“শীগ্‌গির এস পেড্রো, একে খোলা জায়গায় এখুনি নিয়ে যেতে হবে।”

জনীর কথামত পেড্রো সেখানে ছুটিয়া আসিল। তখন তাহারা দুইজনে ধরাধরি করিয়া সেই তরুণীকে বহন করিয়া বিসর্পিল পথে বাহিরে আনিল। তাহার পর পুষ্করিণী-তীরে খেজুর-কুঞ্জের ছায়াতলের উন্মুক্ত বাতাসে অল্পক্ষণেই তাহার জ্ঞানোদয় হইল। জ্ঞান সঞ্চার হইলেই, সে বীণানিন্দিত-কণ্ঠে তাহার মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করিল।

সে যাহা প্রকাশ করিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে,—তাহার নাম জুলিয়া। তাহার মাতা ইংরাজ এবং পিতা ফরাসী। অনেক দিন হইল তাঁহারা দুইজনেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। সংসারে এখন তাহার আপনার বলিতে ভাই-বোন বা কোন আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই! এমন কি, তাহার বন্ধু-বান্ধবও

“আমায় আশ্রয় দিন—”

নাই! সে একেবারেই নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায়!

তাহার বয়স যখন মাত্র বারো, তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়; এবং মাতৃবিয়োগের অল্পদিন পরেই তাহার পিতার মৃত্যু ঘটে। কাইরোতে তাহার পিতার মস্ত বড় স্যাকরার দোকান ছিল। তাঁহাদের কারখানায় অনেক নামজাদা কারিগর ছিল। তিনি নিজেও একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন।

প্রাচীন মিশরীয় অলঙ্কারের অনুকরণে তিনি যে কৃত্রিম গহনা প্রস্তুত করিতেন, তাহার চাহিদা বড় কম ছিল না। কারণ, ভ্রমণকারী ধনী ইংরাজ ও আমেরিকার লোকেরা সেগুলিকে খাঁটি মিশরীয় জিনিস মনে করিয়া ক্রয় করিত। ফলে, তাঁহার ভাগ্যে প্রচুর অর্থলাভ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির লোক। সেই সুযোগে লোকে নানা মিথ্যা অভাব-অভিযোগের কথা উত্থাপন করিয়া, সময়ে-অসময়ে তাঁহার কাছে অর্থ ভিক্ষা করিত ও কর্জ্জ লইত। কিন্তু যথাসময়ে কেহই সেই দেনা পরিশোধ করিত না। অথচ টাকার জন্য কোন দিন তিনি তাগাদা করিতে পারিতেন না। ফলে, দেনার দায়ে অবশেষে তাঁহার মাথার চুল পর্য্যন্ত বাঁধা পড়ে!

এই সময়ে কাইরোর ইউসুফ্-বিন্-ইব্রাহিম নামে এক-জন ইহুদী বন্ধুত্বের ভান করিয়া তাঁহাকে অনেক টাকা ধার দিয়াছিল; কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। টাকার জন্য ইউসুফ্ তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। কিন্তু তখন তাঁহার পরিশোধ করিবার মত অবস্থা ছিল না। কাজেই অভাবের তাড়নায় ও দুর্ভাবনায় অল্পদিনেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সেই রোগেই তাঁহার দেহান্তর ঘটে। ইউসুফ্ সেই দিনই তাঁহার সমস্তই হস্তগত করিয়া লয়।

জুলিয়া তখন আশ্রয়হীন নিঃস্ব কাঙাল! ইউসুফ্ কিন্তু দয়া করিয়া তাহাকে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়াছিল। জুলিয়া অবশ্য সে দয়ার জন্য লালায়িত ছিল না; কারণ, সেই অযাচিত করুণার ফলে তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল ইউসুফের গৃহে দাসীর কাজ; কিন্তু জুলিয়ার তাহাতে মোটেই দুঃখ ছিল না। কারণ, গৃহস্থালী কাজকর্ম্মে সে আনন্দ পাইত। কিন্তু হতভাগ্য জুলিয়ার কপালে সে সুখও বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। অর্থের লোভে নিষ্ঠুর ইউসুফ্ তাহাকে কাসেমের কাছে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করে।

নূতন পোষাকে তাহাকে সজ্জিত করিয়া দুইজন বিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে ইউসুফ্ তাহাকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রেরণ করে। জুলিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল; কারণ, সে বুঝাইয়াছিল যে, তাহার লোকের তাহাকে তাহার পিতার কোন এক বিশিষ্ট বন্ধুর গৃহে রাখিয়া আসিবে। কাজেই জুলিয়া কোন অমত করে নাই।

ইউসুফের লোকের সঙ্গে সে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া নীলনদের বুকের উপর দিয়া নৌকা-যোগে চলিতে লাগিল। তাহার পর উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহুদিন পরে কোন এক মরুভূমির এই অজ্ঞাত মরূদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে দিন সে সত্যই ভয় পাইয়াছিল। সে আরও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এখন হইতেই তাহার ভাগ্যে শুরু হইল—চূড়ান্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা! কারণ, ইউসুফের ভৃত্যদের কাছে অনুসন্ধান করিয়া সে জানিতে পারিয়াছিল যে, ইউসুফের উক্তি মিথ্যা—সে তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে! আজ হইতে সে ক্রীতদাসী!

সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছিল। তাহার পর হইতে সে এই পিরামিডেই আশ্রয় লাভ করিয়াছে। সে শুনিয়াছিল, কোন্ এক প্রবল-পরাক্রান্ত সম্রাটের হাতে নাকি তাহাকে দেওয়া হইবে এবং সে-ই হইবে তাহার প্রভু! সেই সম্রাট নাকি শীঘ্রই সদলবলে সেই মরূদ্যানে আসিবে, এ কথাও সে শুনিয়াছিল।

জুলিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলে ও কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, ইউসুফের ভৃত্যদের সর্দ্দার আবদুল্লা তাহাকে ভীষণ প্রহার করে। দু' একদিন পরেই দেখা গেল, আবদুল্লা ছাড়া অন্য সকলেই দেশে ফিরিয়া গেল, একমাত্র আবদুল্লাই রহিল তাহার রক্ষক। সম্রাটের হাতে তাহাকে উপহার দিয়া পরে সে দেশে চলিয়া যাইবে ইহাও সে শুনিতে পাইল।

জুলিয়া বলিল, "অন্য সবাই চলে গেলে আবদুল্লার অত্যাচার ক্রমশঃ খুবই তীব্র হয়ে ওঠে, আমার ভাগ্যে তখন কেবল কথায় কথায় প্রহারই জুটতো! কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখি, এই বিশাল দেশে আমি সম্পূর্ণ একা—আবদুল্লাও যেন কেমন করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে!

সেই থেকে আমার ভয় যেন আরো শতগুণ বেড়ে গেছে! চলতে-ফিরতে সব সময়ই মনে হয়, এই পিরামিডগুলোর ভেতরে কারা যেন চুপি চুপি কথা কয়—কারা যেন নিঃশ্বাস ফেলে! আমার এখন বেঁচে থাকাই কষ্টকর!"

এই বলিয়া সে পুনরায় জনীকে মিনতি করিয়া কহিল,—"আপনি যদি ভারতীয় হন, আমাকে সাহায্য করুন। আপনি ছাড়া আমার আর গতি নেই।"

প্রত্যুত্তরে জনী তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিল,—"নিশ্চয়

আমরা তোমায় সাহায্য করবো। কারণ, বিপন্নকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম্ম। কাজেই যত দিন আমরা জীবিত আছি, ততদিন তুমি নিশ্চয়ই স্বাধীন থাকবে। কাসেমের কোন অনুচর তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

শয়তান ইহুদী এক ইঙ্গ-ফরাসী মেয়েকে এমনিভাবে ক্রীতদাসী করে পাঠিয়েছে? কাইরো গিয়ে আমি তার উপযুক্ত শাস্তি দেবো। সেই বিশ্বাসঘাতকের চিঠিও আমার কাছে আছে। ঈশ্বর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। তবে বর্ত্তমানে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। আমাদের আর কাসেমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা শোভনীয় নয়। এসো জুলিয়া, আমরা আশ্রয় খুঁজি।"

এই বলিয়া জনী ও তাহারা দুইজনে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

তাহার প্রায় ঘণ্টা-কয়েক পরে দেখা গেল যে, পিরামিডের অন্ধকারময় কক্ষে জনী পাহারা দিতেছে! তাহার আয়োজন ও সাবধানতার অন্ত নাই! সে সম্পূর্ণ সতর্ক ও সজাগ। তাহার উদ্দেশ্য, শুধু শত্রুর আগমন-পথ লক্ষ্য করা।

ঠিক তাহার পূর্ব্বেই তাহার স্থানে পেড্রো পাহারায় নিযুক্ত ছিল। প্রায় চার ঘণ্টা ব্যাপী তাহাকে এত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে যে, সে জীবনে কখনো এত পরিশ্রম করিয়াছে কিনা সন্দেহ!

যথাস্থানে সাবধানে উষ্ট্রগুলিকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। পানীয় জলের পাত্র জলে ভরা আছে। বারুদের পিপাটি জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে। যতদূর সম্ভব, তাহারা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। দশটি রাইফেল এবং তদুপযোগী বারুদ, তল্পিতল্পা ও সীসার কয়েকটি ছাঁচ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছাড়া পিরামিডের ভিতরে আর কিছুই রাখা হয় নাই। তাহারা অবশিষ্ট বন্দুকগুলি পাহাড়ের গোপন কন্দরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া, সমস্ত পিরামিডই পূর্ব্ববৎ সাজানো আছে। পাছে কাহারও কোন সন্দেহ হয়, সেই জন্য কাঠের বোঝা যেমন ভাবে ছিল, ঠিক তেমন ভাবে রাখিয়া উনানের ছাই পরিষ্কার করা হইয়াছে, এবং পাতা দিয়া অধুনা বাসের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে।

এই সমস্ত খুঁটিনাটি কাজের মধ্যে কখন যে বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে, তাহা তাহারা টের পায় নাই। এখন বাহিরের আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই জনী টের পাইল, বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর বিলম্ব নাই, শীঘ্রই সন্ধ্যা নামিবে। নিস্তব্ধ দিক্-চক্রবালে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাতারা এয়োতির সীমন্ত-সিন্দূরের মত শোভা পাইতেছে! মৃদু-মন্দ গোধূলির বাতাস বহিতেছে।

পিরামিডের দক্ষিণ দিকে জনী পাহারায় নিযুক্ত। জনীর বিশ্বাস, কাসেমের সৈন্যরা দক্ষিণ দিক হইতে আসিবে। কাজেই দক্ষিণ দিকে জনী নিজে এবং পূর্ব্বধারে পেড্রো পাহারায় নিযুক্ত। কিন্তু কে জানে কাসেমের লোকজন কোন্ দিক হইতে আসিবে?

জুলিয়া পরিশ্রান্ত। সে গুপ্ত কক্ষে নিদ্রা যাইতেছে। সে যেন জনীর হস্তে জীবনের সমস্ত দায়িত্ব সমর্পণ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত,—ভাবনা-চিন্তার কোন কারণই তাহার আর ছিল না। কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব যাহার হাতে, সে কখনও স্থির থাকিতে পারে? কাজেই জনী বিনিদ্র অবস্থায় কঠোর পাহারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। পিরামিডের দক্ষিণ-জানালা হইতে পূর্ব্ব-জানালা পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঘুরিয়া সে পাহারা দিতেছে।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক হইতে বিপদ আসিবার আশঙ্কা। কারণ, পশ্চিম দিকে সীমাহীন মরুভূমি, আর উত্তরে দুর্গম পার্ব্বত্যপথ—কাজেই এই দুই দিকে বিপদের কোন ভয় নাই।

মাঝে মাঝে জনী পেড্রোকে সতর্ক করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"কিছু দেখতে পাচ্ছ পেড্রো?"

—"কিছু না।"

তাহার পর আর কোন সাড়া-শব্দ নাই। চারিদিকে কেবল জমাট নিস্তব্ধতা, মরুভূমির একঘেয়ে কঠিন নীরবতা—কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নাই। পৃথিবীও এখানে মৃত্যুর মত স্থির—যেন পিরামিডের নর-কঙ্কালের যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীভূত নীরবতা এখানে স্বপ্নপুরীর রহস্য-নিবিড় কুহেলিকায় রাজত্ব করিতেছে! সেখানে বসিয়া জনী আজ নিজের হৃৎ-স্পন্দনও যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে!

বাহিরে এখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। জনীর ভয়-ভয় করিতেছিল! তাই সে ব্যগ্রভাবে চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কে জানে আজ কি তিথি? আজ পূর্ণচন্দ্র উঠিবে, না আগামী কাল পূর্ণকলায় চন্দ্রালোক প্রকাশিত হইবে কে বলিতে পারে? চন্দ্রোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই বোঝা যাইতেছে না; কারণ, আকাশে মেঘ করিয়াছে।

ধীরে ধীরে সময় কাটিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। আকাশে মেঘের ফাঁকে চন্দ্রোদয় হইল। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে শুভ্রশুভ্র বালুকারাশি নদীর জলের মত

চক্‌চক্‌ করিতে লাগিল! পুষ্করিণীর জলে চন্দ্রের স্বর্ণাভা প্রতিবিম্বিত হইল। কিন্তু আজ বোধ হয় পৌর্ণমাসী নহে; কারণ, চন্দ্রের নিম্নভাগে সূক্ষ্ম কৃষ্ণ রেখা। কাজেই অনুমান করা যায় যে, আগামী কল্য পূর্ণিমা।

পরদিন প্রভাত—পরিপূর্ণ প্রভাত। সোনার আলোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। পুকুরের জলে সোনার রং। গাছে গাছে সোনার খেজুর। ঘুম ভাঙ্গিতেই জনী পিরামিডের বাহিরে আসিল। জুলিয়া তাহার জন্য পুকুরের ধারে অপেক্ষা করিতেছিল। জনী জুলিয়ার কাছে উপস্থিত হইল। এখনও তাহাদের বিপদ কাটে নাই। বরং বিপদের সম্ভাবনা আছে।

জনী ভাবিতে লাগিল, আজই পূর্ণিমা। যদি সে শয়তান আসে, তবে আজই আসিবে। কারণ, নিশ্চয়ই কাল সমস্ত রাত্রি তাহারা চলিয়াছে। সুতরাং দিনের বেলায় বিশ্রাম করিয়া আবার তাহারা যাত্রা করিবে।

আরবেরা সাধারণতঃ দ্বিপ্রহরে কখনও মরুভূমি অতিক্রম করে না। দিনের বেলায় তাহারা নিদ্রাসুখ উপভোগ করে এবং সন্ধ্যারাত্রেই মরুভূমির বুকে পাড়ি দেয়। কাজেই আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা কিছুতেই আসিতে পারিবে না।

এই কথা চিন্তা করিয়া জনী একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া জুলিয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মিস্ জুলিয়া, প্রথম যখন পিরামিডে ঢুকি, তখন হয় তো তোমাকেই দেখে থাকবো?"

জুলিয়া সহাস্যে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আমাকেই দেখেছিলে। উঃ, তোমাকে দেখে আমি কি ভয়ই না পেয়েছিলাম! আমি ঘুমুচ্ছিলাম, ঘুম ভেঙ্গে গেল তোমার পায়ের শব্দে। তুমিও কিন্তু খুব ভয় পেয়েছিলে,—কেমন না?"

উত্তরে জনী বলিল,—"সে তো স্বাভাবিক জুলিয়া, ভয় পাবারই তো কথা; কিন্তু তুমি কি পেড্রোর উপর লাফিয়ে পড়েছিলে, না আর কেউ?"

—"হ্যাঁ আমিই।" জুলিয়া জবাব দেয়। কৈফিয়তের সুরে সে আরো বলে,—"আমি তোমার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর অন্ধকারে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাইরে গেলাম। বাইরে আসতেই পড়লাম গিয়ে একেবারে পেড্রোর ঘাড়ে। অন্ধকারে তাকে মানুষ বলে চেনাই কঠিন। পেড্রো যে ওখানে শুয়ে ছিল, তা মোটেই দেখতে পাইনি।"

জনী আবার প্রশ্ন করে,—"আচ্ছা জুলিয়া, কুঞ্জবনে কি তোমায়ই দেখেছিলাম?"

—"হ্যাঁ, আমাকেই দেখেছিলে; আমি কিন্তু প্রথমটা তোমাকে দেখিনি।"—জুলিয়া জবাব দেয়।

—"কিন্তু ভয় পেয়েছিলে কেন?"—জনী প্রশ্ন করে।

—"তোমাদের পায়ের শব্দে।"—জুলিয়া উত্তর দেয়।

—"তারপর কি করলে?"—আবার জিজ্ঞাসা করে জনী।

—"আমি ভয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম।"—জুলিয়া হাসিমুখে জবাব দেয় এবং পূর্ব্বাপর আরো অনেক ঘটনার অবতারণা করিয়া বলে, "কিন্তু সেই ঝোপের আড়ালে একদণ্ড থাকা গেল না, কারণ সেখানে ভীষণ ঠাণ্ডা; আমার হাত-পা শীতে জমে যাবার উপক্রম হলো। তবু প্রাণের দায়ে মিনিট কয়েক চুপ করে সেখানে লুকিয়ে রইলাম। তারপর যখন আর কোন শব্দ পেলাম না, তখন সাহসে ভর করে পাহাড়ের দিকে গেলাম আশ্রয়ের খোঁজে।

সেখানে অবশ্য মাথা গুঁজবার মত একটা আশ্রয় পেলাম। একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তের মধ্যে রাতের মত শোয়ার আয়োজন করলাম। কিন্তু সেখানে শুয়ে দেখি আর এক বিপদ! ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল! কারণ, আমার গায়ে ঠেকলো এক প্রকাণ্ড লোমশ দৈত্যের দেহ।

আমি ভয়ে আঁৎকে উঠলাম! আমার বুকের মধ্যে সুরু হলো হাতুড়ি-পেটার শব্দ!

বহু কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা দূরে সরে গেলাম। কোন রকমে অর্দ্ধ-জাগরণে সে রাতটা কেটে গেল। সকাল হলে দেখলাম, সেই গুহার মধ্যে বাঁধা আছে গোটা-দুই উট!

রাতের ভয়ের কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার কাছে। কিন্তু তখন আর কিছু বিচার করে দেখবার সময় ছিল না। কারণ, তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ আমার কণ্ঠাগত! কিন্তু তবুও ভয়ে অনেকক্ষণ বাইরে বেরুতে পারলাম না। তারপর অবশ্য পেটের দায়ে আহারের ব্যবস্থা করতে বেরুতেই হলো।"

জুলিয়ার সঙ্গে জনীর যখন এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, হঠাৎ জনীর কানে আসিল পেড্রোর কণ্ঠসঙ্গীত!

জনী সেদিকে ফিরিয়া চাহিল। দূরে পাহাড়ের নিকটে বসিয়া পেড্রো গ্রাম্য সুরে গান ধরিয়াছে। তাহার গানের সুরে যেন পিরামিডের নির্জ্জনতা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! কিন্তু জনী সেখানে অধিকক্ষণ নির্জ্জীবের মত বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার মনে আবার সেই বিপদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

সে তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে পেড্রোর নিকটে গিয়া বলিল—"পেড্রো, অমন করে বসে বসে গান গাইলে

চলবে না; পাহারা দিতে হবে, ওঠো। আমি ততক্ষণ কবর-ঘরটা একবার ঘুরে দেখে আসি। কি বল?"

পেড্রো কোন আপত্তি করিল না—সে রাইফেল কাঁধে পাহারায় নিযুক্ত হইল।

জনী জুলিয়াকে লইয়া উঠিয়া বসিল। সে প্রথমে উট দুইটিকে জলপান করাইল, তারপর নূতন কোন রহস্য আবিষ্কারের আশায় সে পিরামিডের গোপন কক্ষে প্রবেশ করিল।

সেই ঘুরানো দরজা ঠেলিয়া জনী সমাধি-স্থলে প্রবেশ করিল। এবারে জুলিয়া তাহার সঙ্গী।

জনীর হাতে একটি মোমবাতি। সেই মোমবাতির আলোকে সমস্ত ঘর ভরিয়া গেল। তাহারা সেই আলোকে দেখিতে পাইল যে, একটি সোপান-শ্রেণী নীচে পাতালপুরীর মধ্যে কোথায় নামিয়া গিয়াছে!

তাহারা সেই সোপান বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই সে জুলিয়াকে বলিল—"জুলিয়া, এখানে দাঁড়াও। আগে আমি পরীক্ষা করে দেখি ঘরের বাতাস কেমন! তা না হলে দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে। কারণ, এসব কক্ষ বিষাক্ত বাতাসে ভরপুর থাকে। তাই পরীক্ষা করে দেখা ভাল, কারণ সাবধানের মার নেই।"

—"কিন্তু কেমন করে বুঝবে যে, ঘরের বাতাস ভাল কি মন্দ?" জুলিয়া জিজ্ঞাসা করে।

জনী উত্তর দেয়—"যদি দেখি মোমবাতি ঠিকমত জ্বলছে, তবে বুঝবো বাতাস ঠিক আছে।"

এই বলিয়া জনী খুব সাবধানে একটি দড়িতে বাঁধিয়া জ্বলন্ত মোমবাতিটি নীচে ঝুলাইয়া দিল। দেখা গেল, দীপশিখা একটুও কাঁপিল না। তখন তাহারা উভয়ে নীচে নামিতে লাগিল।

জনী আগে, পিছনে জুলিয়া, চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া নামিয়া চলিল। জুলিয়া তাহার রুমাল ছিঁড়িয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। কিন্তু যাইবার সময় সে মেঝের উপর সূতার টুকরা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিহ্ন রাখিয়া যাইতে লাগিল।

পথ দীর্ঘ নয়; কাজেই কিছুক্ষণ চলিয়াই তাহারা তোরণ-দ্বারের যেখানে পথ শেষ হইয়াছে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই তাহারা অবাক্ হইয়া গেল! কারণ, তাহাদের সম্মুখে সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রকাণ্ড এক হলঘর! কিন্তু কোথা হইতে কেমন করিয়া যে সেই পাতালপুরীর মধ্যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। সেই দালানে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মনে হইল যেন অনন্ত রাত্রির পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা আজ দিনের উপকূলে উপনীত হইয়াছে!

সেই দালানের ভিতর প্রবেশ করিলে বোঝা যায় যে, সমস্ত পিরামিডটা একেবারে ফাঁপা। ইহার বিশাল পাষাণ-প্রাচীর কাটিয়া হলঘরের চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ ঘোরানো আরাম-কেদারা প্রস্তুত করা হইয়াছে; সূর্য্যালোক বিচূর্ণ হইয়া ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সার্চ্চ-লাইটের মত নানা দিক হইতে দিনের আলো আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রদীপের আর কোন প্রয়োজন নাই। জনী এবার প্রদীপটি নিভাইয়া দিল। জনী দেখিল, সেই পাতালপুরীতে সুবিস্তৃত এক হলঘর!

হলঘরটি সযত্নে পরিপাটিরূপে সাজানো। দালানের মেঝে হইতে সুদৃঢ় ও উচ্চ স্তম্ভশ্রেণী আঁকিয়া-বাঁকিয়া পল্লবিনী লতার ন্যায় ছাদে গিয়া ঠেকিয়াছে। সেই স্তম্ভশ্রেণীর দেহ বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত, এবং প্রতি দুইটি স্তম্ভ অন্তর একটি করিয়া কৃত্রিম নিকুঞ্জ। আর প্রতি নিকুঞ্জ-দ্বারে দৈত্যের ন্যায় সুবৃহৎ পুত্তলিকা! তাহাদের মুখাকৃতি অদ্ভুত—দেখিলেই ভয় হয়।

এই সমস্ত লক্ষ্য করিতে করিতে জনী ও জুলিয়া সেই দর-দালানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সেখানে তাহাদের সম্মুখে একটি স্রোতহীন জলাশয় আঁকিয়া-বাঁকিয়া মেঝের উপর প্রবাহিত। জলাশয়ের মধ্যে পাথরের তৈরী একটি প্রকাণ্ড কুম্ভীর। তাহার ব্যাদিত মুখ-গহ্বরের সুতীক্ষ্ণ দন্তগুলি সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। দেখিলেই তাহাকে জীবন্ত বলিয়া মনে হয়, ও অতিবড় সাহসীরও বুক কাঁপিয়া উঠে!

জনী কৌতুকের বশে জলাশয়ে নামিয়া কুমীরের উপর উঠিয়া বসিল। জুলিয়া হাসিয়া ফেলিল। জন্তুটার উপর চাপ পড়িতেই তাহার ভিতরে ভিতরে স্প্রিং-এর এক অদ্ভুত কাজ আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহার পরিণতি যে কিরূপ, জনী তাহা বুঝিতে পারিল না। জুলিয়ার চীৎকারে সে ফিরিয়া দেখিল যে, স্প্রিং-এর চাপে সশব্দে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই জলধারা একটি নালা দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

জনী তাহা লক্ষ্য করিয়া জুলিয়াকে বলিল—"আমাদের সৌভাগ্য জুলিয়া! এসো, এই বেলা আমরা এই পরিখা পার হয়ে যাই। নইলে আবার হয় তো এখুনি জল এসে

জনী কৌতুকের বশে জলাশয়ে নামিয়া
কুমীরের উপর উঠিয়া বসিল।

পড়বে!”—

এই কথা বলিয়াই জনী জুলিয়াকে সঙ্গে করিয়া দ্রুতপদে সেই পরিখা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তাহারা যাইতে না যাইতেই আবার জলোচ্ছ্বাসে সেই জলাশয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাহারা সেই জলাশয় পার হইয়া শ্বেত পাথরের আট-কোণা মেঝের উপর গিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বের ভয়ার্ত্ত ভাব তখন দূর হইয়াছিল বটে, কিন্তু আবার এক নূতন ভয়ের ছায়া দেখা দিল!

তাহাদের সম্মুখে পিরামিডের চূড়ার ঠিক নীচে অবগুণ্ঠনে ঢাকা দৈত্যাকৃতি এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি! তারকার মত উজ্জ্বল একখণ্ড হরিৎ প্রস্তর সেই দৈত্যমূর্ত্তির অবগুণ্ঠনে ঢাকা মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে কণ্টকাকীর্ণ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেখানে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া রাজমুকুটের প্রচ্ছন্ন হরিদ্রাভা বিকীর্ণ করিতেছে!

জনী বলিল, “এ নিশ্চয়ই মিশরের রাণী বা ঈশ্বরী ‘আইসিসে’র মূর্ত্তি! তা না হলে এ অবগুণ্ঠনের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ, প্রধান ধর্ম্মযাজক ছাড়া আর কেউ এ মূর্ত্তির মুখ-দর্শন করতে পারে না, এমনি একটা কথাই আমি শুনেছি।”

তাহারা ক্রমশঃ মূর্ত্তিটার নিকটবর্ত্তী হইল। সেই মূর্ত্তির পাদদেশে কালো পাথরের বেদী। বেদীর উপর তখনও ধূপধূনার ছাই পড়িয়া রহিয়াছে! প্রশস্ত সোপান-শ্রেণী সেই বেদী পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। কালের প্রভাবে সোপানাবলী জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায়।

তাহারা বেদীর নীচে কালো পাথরের আর একটি পথের সন্ধানও পাইল। সেই পথটি সরু হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া জলাশয়ের কাছ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেখানে আছে একটি সেতু। সেই সেতুর উপর দিয়া প্রায় দালানের শেষ সীমা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই পথে আবার তাহারা অগ্রসর হইল।

সেতুর কাছে আসিয়াও পিছনে বেদীর মুখ দেখা যায়। জুলিয়া একবার সেদিকে ফিরিয়া চাহিল। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন মিশরের পুরোহিতের দল শোভাযাত্রা করিয়া বেদীর নিকট পূজা দিতে আসিত, তখন হয়তো তাহারা এই সেতুর উপর হইতেই দেবীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিত!

তাহারা যে পথ দিয়া দালানে প্রবেশ করিয়াছিল, এই পথ ঠিক তাহার বিপরীত দিকে চলিয়া গিয়াছে। পথটি কিছুদূর গিয়া একটি ঘরের ভিতরে শেষ হইয়াছে। সেই ঘরে নানা প্রকার বিচিত্র চিত্রাবলী। প্রাচীরে প্রাচীরে অপূর্ব্ব নক্সা। দেওয়ালে দেওয়ালে দেব-দেবীর খোদিত প্রস্তর-মূর্ত্তি। দেওয়ালের এক স্থানে একটি প্রস্তর ঘরের দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

জনী কৌতূহলবশতঃ সে পাথরের গায়ে খুব জোরে ধাক্কা দিল। ধাক্কা খাইবার সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি এক পাক ঘুরিয়া গেল। আর একটি গর্ত্ত দেখা গেল। জনী ও জুলিয়া আবার সেই পথে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াই জনী অবাক্ হইয়া গেল। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে অজ্ঞাতসারে তাহারা কেমন করিয়া আবার সেই পূর্ব্ব-পরিচিত গুহায়ই ফিরিয়া আসিয়াছে! জনী দেখিল, গুহামধ্যে উটগুলি তখনও আহারে ব্যস্ত। জনী জুলিয়াকে লইয়া আবার পিরামিডের ভিতর প্রবেশ করিল।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই পিরামিডের বাহিরে আসিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল! দেখিল, সমস্ত মরূদ্যান আরব-সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে!

আচম্বিতে অগণিত বিপুল-বপু সশস্ত্র আরব-সৈন্য দেখিয়া জনী ও জুলিয়ার অন্তরাত্মা মুহূর্ত্তমধ্যে কাঁপিয়া উঠিল!

সাত

পেড্রো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মরূদ্যান কবরের মত

নিস্তব্ধ,—যেন শান্ত মধ্যাহ্ন সেই মরূদ্যানে মরণের অভিসারে বাহির হইয়াছে।

প্রায় ঘণ্টাধিক কাল পেড্রো নিদ্রা গিয়াছে; অকস্মাৎ বহুলোকের কলকণ্ঠে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন বিচ্ছেদহীন শব্দের কম্পনে পিরামিডের সমস্ত কক্ষ গম্ গম্ করিতেছে। হলঘরে বহু লোকের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। সে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। আশ্চর্য্য সেই শব্দ! কখনও অস্পষ্টধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, আবার কখনও মেঘমন্দ্র বজ্রধ্বনি শোনা যায়। আবার কখনও সেই অস্পষ্ট স্বর-ধ্বনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়। পেড্রো কাঁপিতে লাগিল—উত্তেজনায় নহে, ভয়ে! তাহার মনে হইল ভৌতিক নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে পিরামিডের সমস্ত অশরীরী প্রেতাত্মা যেন কোন এক জটিল সমস্যার সমস্ত মীমাংসায় মগ্ন হইয়াছে,—আর সেই আলোচনার প্রতিধ্বনি পিরামিডের ভেপসা বাতাসে তরঙ্গিত হইয়া তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সেই কথোপকথনের মধ্যে আরবী শব্দ শোনা যাইতেছে। তবে কি ইহারা কাসেমের অনুচর?

কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য পেড্রো নিঃশব্দে পূর্ব্বদিকের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দূরে মহানন্দে বেদুইনের দল আসিতেছে। ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া পিরামিডের দক্ষিণ গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। সেখান হইতেও দেখা গেল, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিক হইতে আরও দুই দল বেদুইন আসিতেছে। পেড্রো স্পষ্ট বুঝিতে পারিল এবার আর তাহাদের রক্ষা নাই!

মরূদ্যানে অনেকগুলি উট চরিয়া বেড়াইতেছে। জনকয়েক আরব-দস্যু শিবির নির্ম্মাণে ব্যস্ত। সমস্ত মরূদ্যান প্রায় আরব সৈন্যে পূর্ণ। কিন্তু জনী ও জুলিয়া কোথায়?

তাহাদের খোঁজে পেড্রো সন্তর্পণে দরদালানের এক কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে তাহার সম্মুখে দুই জন আরব রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত। পেড্রো এইবার বুঝিতে পারিল যে, ইহাদের কলকণ্ঠেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নয়। সে এবার নিজের বিপদ বুঝিতে পারিল, কারণ যে পথে সে আত্মগোপন করিতে পারে, তাহার দ্বারদেশেই শত্রুসৈন্য। যে কোন মুহূর্ত্তে সে তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। ফলে তাহাকে বন্দীর শৃঙ্খল পরিতে হইবে বা আজীবন আরবের দাসত্ব করিতে হইবে। কে জানে তাহার ভাগ্যে কি আছে? সে একা, দুইজনকেও পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না!

সে চিন্তা করিয়া দেখিল এখানে অপেক্ষা করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। কাজেই সে বেপরোয়াভাবে ধূম্র-কুণ্ডলীর ভিতর আত্মগোপন করিয়া কবর-ঘরের প্রবেশ-পথের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু প্রচুর ধোঁয়া নাকে-মুখে প্রবেশ করায়, সে কাশিতে আরম্ভ করিল। সেই কাশির শব্দে আরব দুইটি ভয় পাইল।

আর রক্ষা নাই, ধরা পড়িতেই হইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া পেড্রো একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল এবং ছুটিয়া গিয়া সজোরে আরবদের একজনকে আঘাত করিল। এতক্ষণ তাহারা ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে স্থান পরিত্যাগ করে নাই। এবার তাহারা ভীত ও ত্রস্ত পদে পিরামিডের বাহিরে পলায়ন করিল। পেড্রো এইবার তাহাদের অবস্থা দেখিয়া হোঃ হোঃ করিয়া অট্টহাস্য না করিয়া পারিল না।

মরূদ্যানে তপ্ত মধ্যাহ্ন নামিয়াছে। জনহীন মরুভূমি আজ মানুষে পরিপূর্ণ। মানুষের কলকণ্ঠে বাতাস মুখরিত। চারিদিকে কর্ম্মব্যস্ততা। সারি বাঁধিয়া উটের দল বিচরণ করিতেছে। সোনার কাঠির স্পর্শে যেন সমস্ত মরূদ্যান জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই দিকে দিকে সহস্র প্রাণের সাড়া। মরূদ্যানে মহোৎসবের সমারোহ!

পাহাড় ও পুষ্করিণীর মধ্যে একটি সুবৃহৎ শুভ্র শিবির যেন মরালের ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই তাঁবুর সম্মুখে একধারে একটি উচ্চাসন—সভাপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট। তাহার চারিধারে প্রহরী নিযুক্ত। সেই শিবিরের আশে-পাশে আরো অনেক ছোট-বড় তাঁবু। প্রত্যেক শিবিরে একজন করিয়া অধিনায়ক এবং তাহাদের অধীনে এক একটি উপজাতি। ইহারা শেখ নামে অভিহিত। আজ এই মরূদ্যানে সমবেত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মরুভূমির বেদুইন ও সুদানের বিদ্রোহী আরবদিগের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া সাহারাবাসী ও সুদানের আরবদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারি সমাধান করাই এই সভার অন্য উদ্দেশ্য।

শেখের দল উট প্রতিপালন করা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। কিন্তু আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহারা বিষয়ান্তরের উত্থাপন করিল। তাহাদের মধ্যে জনকয়েক ইস্তাম্বুলের সুলতানের অক্ষমতার নিন্দা করিল; এমন কি মিশররাজ খাদিভের দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনও কাসেমের সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কোন কথাই ব্যক্ত করিল না। কারণ কাসেম একজন প্রবল পরাক্রমশালী নেতা। তিনি মুসলমান-গণ-সমাজের একমাত্র অধিনায়ক। শোনা যায় কন্‌ষ্টান্টিনোপেল হইতে কলিকাতা

পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্যই ইনি ইস্‌লাম-রাজ্যে পরিণত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুতরাং এহেন মহাপুরুষ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা চলে কি?

দূরে ঝোপের কাছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাহেবী পোষাক-পরা এক বন্দী পড়িয়া ছিল। লিবিয়ার জৈদ শেখ তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ দেখ, অভিশপ্ত কাফেরের একজন ওখানে বন্দী হয়ে আছে। ওদের প্রতি আমার কোন মমতা নেই। ওরা ঘৃণ্য কুকুরের জাত! আমার অনুচরেরা ওকে খার্তুমের পথ থেকে ধরে এনেছে। ওর নাম ডাক্তার রঙ্গনাথন্। ও একজন ভারতীয়—মাদ্রাজী। লোকটা ভারত-গভর্ণমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ কাষ্টমস্-অফিসার। ওর অত্যাচারে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে লোকটা আমাদেরই গুটি-কয়েক লোককে বোম্বাইয়ে সার্চ্চ করেছিল। সাধারণ সার্চ্চে কিছু না পেয়ে, এক্স-রে করে। তারপর দেহের ভিতরে লুকানো সোনা দেখতে পেয়ে সেগুলো তারা বার করে নেয়।

মোটকথা, এই রঙ্গনাথনই হচ্ছে একজন সরকারী বন্ধু! কিন্তু বাছাধনকে এবার আর বেরুতে হবে না। ওর অত্যাচারে আরবেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আল্লার দোয়া যে, ও ধরা পড়েছে। ব্যাটাকে গুলি করে মারা উচিত। দেখা যাক কাসেম এখন কি করে?"—এই কথা বলিতে বলিতে ঘৃণায় জৈদের মুখ বীভৎস হইয়া উঠিল।

ক্রমে মরুভূমির বুকে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। মরূদ্যান সুপ্তির শান্তিময় আবেশে আচ্ছন্ন হইল। মহামান্য শেখ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য আরব অনুচর পর্য্যন্ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল। সমস্ত মরূদ্যান যেন যাদুকরের মায়াস্পর্শে স্তব্ধতার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল এবং চারিদিকে নামিয়া আসিল মৃত্যুর নির্জীবতা!

অকস্মাৎ মধ্যরাত্রে মরুভূমির স্তব্ধতার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া তূর্য্যনাদ হইল। নিদ্রিত শেখের দল উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার আরব শিবির সহস্র কলকণ্ঠে মুখর হইয়া উঠিল। সাধারণ আরবেরা পুষ্করিণীতীরে সমবেত হইল। কেবল সাতজন মহামান্য শেখ কাসেমের প্রত্যুদ্‌গমনে অগ্রসর হইল।

ক্রমে কাসেমের সৈন্যদলের অগ্রদূত নিশানধারী পদাতিক সৈন্য-সামন্তেরা শিঙাধ্বনি করিতে করিতে মরূদ্যানে উপস্থিত হইল। তাহার পরই আরবদের হর্ষধ্বনির মধ্যে একদল দেহরক্ষী সৈন্য সমভিব্যাহারে শেখের শেখ দ্বিতীয় খলিফা সাদৃশ্য কাসেম শ্বেত উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সগর্ব্বে মরূদ্যানে পদার্পণ করিলেন। নকীব ফুকারিয়া উঠিল।

একে একে শেখের দল নগ্নপদে নতমস্তকে কাসেমের সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রণতি জানাইল। গম্ভীর কণ্ঠে কাসেম তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেই ইহুদী ইউসুফ্ কোথায়?"

বোর্গুর হালিদ্ শেখ উত্তর দিল—"আল্লাকে ধন্যবাদ! সেই ইহুদী কুকুর এই মহতী সভা কলঙ্কিত করিতে আসে নাই।"

ক্রুদ্ধ কাসেম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"চোপরাও, পাশা এবং ইংরাজ ছাড়া আর কেউ কুকুরের দল নয়। ইউসুফ্ আমাদের বন্ধু, আমাদের ধর্ম্মে তার বিশ্বাস আছে। কিন্তু সে কি আমাদের সঙ্গেও ছলনা করতে চায়? তার এত বড় স্পর্দ্ধা! কোথায় সে?"

কিন্তু শেখের দল কোন উত্তর করিল না। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। বিলম্ব দেখিয়া ক্রুদ্ধ কাসেম চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কোথায় সে বিশ্বাসঘাতক কুকুর! সে আমার আজ্ঞার অবমাননা করেছে, তাকে আমি আস্ত রাখবো না। পিরামিডের মত উঁচু জায়গা থেকে তার গলায় ফাঁস ঝুলিয়ে দেবো। সেই হবে শয়তানের শাস্তি!"

এবারে শেখ সুলেমান সভয়ে ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"প্রভো, ইউসুফ্ হয়তো এখনও এসে পৌঁছিতে পারেনি। অল্পক্ষণ পরেই সে হয়তো আসবে। সুদূর কাইরো থেকে এই বিশাল মরুভূমি পার হয়ে আসতে একটু বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক।"

তাহার মন্তব্য শুনিয়া আরব বেশধারী একজন ইংরাজ উত্তর করিল—"আমি জানি ইউসুফ্ চিতাবাঘের চেয়ে চতুর, কিন্তু সে অত্যন্ত ভীতু। হয়তো সে এখানেই আছে, কিন্তু মহামান্য কাসেমের কাছে আসতে তার সাহস হচ্ছে না।"

তাহার কথা শুনিয়া কাসেম সহাস্যে বলিলেন—"ঠিক বলেছ আলি। সে এখানেই আছে। যাও আব্দুল্লা, পিরামিডের মধ্যে একবার খোঁজ করে এস।"

কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই হালিদ উত্তর করিল—"প্রভো! সমস্ত পিরামিডে খোঁজ করা হয়েছে, ইউসুফ্ সেখানে নেই। পিরামিডে ঢোকে কার সাধ্য? ওখানে ভূতের আড্ডা। আমি শপথ করে বলতে পারি—ওখানে একটা কালাভূত আছে; সে নাচে আর গান করে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

প্রত্যুত্তরে কাসেম হালিদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—"বাজে ওজর দেখিও না, আমি যা বলছি তাই কর, আর একবার খোঁজ কর। আর জৈদ, তোমার সেই ভারতীয় বন্দী কোথায়? ঐ যে কাষ্টমস-এ কাজ

করে,—রঙ্গনাথন্ না কি তার নাম! তাকে এখানে নিয়ে এস।"

কাসেমের কথায় সম্মতি জানাইয়া জৈদ বন্দীর খোঁজে চলিয়া গেল।

সভাস্থল নিস্তব্ধ। কাসেম একটি উচ্চাসনে গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে আলি দণ্ডায়মান। সে ইউরোপীয়ান, কিন্তু বিশ্বস্ত। কাসেম তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন, কারণ সে দো-ভাষীর কাজ করে। কাসেমের বাম পার্শ্বে নকীব দায়ূদ।

অল্পক্ষণ পরে বন্দী সেখানে নীত হইল। চারিদিকে তখন গভীর নিস্তব্ধতা। বন্দীর মুখ শান্ত। সে-মুখে কোন উদ্বেগ বা চঞ্চলতা নাই, কেবল চক্ষু দুইটি সন্ধ্যাতারার ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বন্দীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কেবল বিদ্বেষে আলির চোখ হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

হালিদ বন্দীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! ধর্ম্মাবতার কাসেমের কাছে কোন্ সাহসে জুতো পরে এসেছ? শীগ্‌গির জুতো খুলে ফেল।" এই কথা উচ্চারণ করিয়া সে বন্দীর দিকে অগ্রসর হইল।

কিন্তু কাসেম তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—"থাম। বন্দীর গায়ে কেউ হাত দিও না। যে বন্দীর প্রতি কোনরূপ অন্যায় আচরণ করবে, তার শাস্তি মৃত্যু। আমার হুকুম—বন্দীর শৃঙ্খল মোচন কর।"

কাসেমের আজ্ঞায় তাঁহার অনুচরেরা বন্দীর বন্ধন মোচন করিল। সে আসনে বসিবার অনুমতি লাভ করিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বন্দী তথাপি আসন গ্রহণ করিল না, পূর্ব্ববৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কোনরূপ অভিযোগ করিল না, কেবল সানুনয় কণ্ঠে ইংরেজীতে প্রার্থনা করিল—"প্রভো! আমি বিচার চাই। আমি রঙ্গনাথন্ নই; জৈদ ভুল করে আমায় বন্দী করে এনেছে। মরুভূমির পথ হারিয়ে আমি একা একা ঘুরছিলাম, তখন আপনার অনুচরেরা আমায় বন্দী করেছে। আমি জানি যে, জ্ঞানত বা ন্যায়ত আপনার কাছে আমি কোন অপরাধ করিনি। সুতরাং হে মহাপুরুষ! অন্ততঃ আপনার কাছে আমি সুবিচার চাই।"

প্রত্যুত্তরে কাসেম আলির প্রতি কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আলি, বন্দীর বক্তব্য কি?"

এবার আলি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিল। তাহার পর বন্দীর প্রতি ঘৃণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কৃত্রিম ভয়কম্পিত স্বরে উত্তর করিল—"সর্ব্বনাশ! বলতেও জিহ্বা কলুষিত হচ্ছে, প্রভো, ও শয়তান আপনাকে গাল দিচ্ছে। ও

পেড্রো মরিয়া হইয়া একজন আরবকে আঘাত করিল।

বল্‌ছে আপনি কুকুর। ও আপনার মুখে থুথু দেয়।"

আলির এই কথা শুনিয়া কাসেম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। লোষ্ট্রাক্রান্ত মধুচক্রবৎ সভাস্থল চঞ্চল ও কলমুখর হইয়া উঠিল। শেখের দল ক্রোধে গর্জ্জন করিল। কাসেম বহু কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন—"তুমি কি যুদ্ধ চাও? বেশ তাই হোক। ও শয়তানকে আবার বন্দী কর।"

কাসেমের আদেশে তিনজন আরব প্রহরী বন্দীর দিকে অগ্রসর হইল। বন্দী কিন্তু কিছুমাত্র ভয় পাইল না, কেবল দুই পা পিছনে হটিয়া গিয়া প্রথম ব্যক্তিকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির মস্তকে এমন মুষ্ট্যাঘাত করিল যে, সে বেচারা তৃতীয় ব্যক্তির উপর গিয়া পড়িয়া গেল। আহত হইয়া উভয়েই মাটিতে গড়াইতে লাগিল।

এবারে ক্ষুব্ধ আরবের দল চীৎকার করিয়া উঠিল। বন্দী তথাপি কিছুমাত্র ভয় পাইল না; গম্ভীর স্বরে এবার আরবী ভাষায় পুনরায় প্রার্থনা করিল—"প্রভো! আমি বিচার চাই। ভগবানের দিব্যি, আপনি সুবিচার করুন।"

বিস্মিত কাসেম তাঁহার অনুচরগণকে ইঙ্গিতে নিষেধ

করিয়া আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ম্লেচ্ছ, আল্লার নামে কি বলে?" আলি কোন উত্তর করিল না।

আক্রমণকারীরা নিরস্ত হইল। কেবল দায়ূদ অগ্রসর হইয়া কাসেমের চরণ চুম্বন করিয়া বলিল—"প্রভো! আপনার পাগড়ীর দিব্যি, বন্দী আপনাকে কোন অসম্মানের কথা বলেনি। আমি কিছু কিছু ইংরেজী বুঝি। নিজের কানে শুনেছি। আলি আপনার কাছে মিথ্যা ব্যাখ্যা করেছে।"

বন্দী এবার উৎসাহিত হইয়া সানুনয় কণ্ঠে বলিল—"হে শেখের শেখ! আপনি ভুল বুঝে আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন না। আপনার দ্বি-ভাষী মিথ্যা বলেছে। আর মিথ্যা বলাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ ওকে আমি ভাল করেই জানি। গত বৎসর মিউজিয়াম থেকে কতকগুলো দামী জিনিস চুরির অপরাধে ওর চাকুরী যায়। সেইজন্যে আমার উপর ওর রাগ আছে।"

এই কথা শুনিয়া কাসেমের মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল। কারণ তাঁহার ধারণা ছিল যে, তাঁহার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিবার মত সাহস কাহারও নাই।

কাজেই কাসেম গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"আলি! তোমার সাহস স্পর্দ্ধার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে; এক্ষুণি তুমি আমার শিবির ছেড়ে চলে যাও, নইলে রাগের মাথায় আমি তোমায় খুন করে ফেলবো।"

আলি দ্বিরুক্তি না করিয়া শিবিরের বাহিরে চলিয়া গেল।

তাহার পর কাসেম বন্দীর দিকে ফিরিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"রঙ্গনাথন্! বস। আমি দুঃখিত যে, আলি তোমার কথার মিথ্যে মানে আমায় বলেছে।" এই কথা বলিয়া কাসেম একটু চুপ করিলেন।

বন্দী কিন্তু শান্ত হইল না, রঙ্গনাথন্ নাম শুনিয়া সে আবার আপত্তির সুরে বলিল—"ধর্ম্মাত্মা শেখ! আপনি আমাকে রঙ্গনাথন্ বলছেন কেন? আলি কি রঙ্গনাথন্ বলে আমার পরিচয় দিয়েছে?"

প্রত্যুত্তরে কাসেম বিরক্তিস্বরে বলিলেন—"রঙ্গনাথন্! নিজের নাম পর্য্যন্ত অস্বীকার করো না। এর চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। আর আমি কি তোমার বন্ধু নই? তুমি হয় তো জান যে, ভগবান যাকে ক্ষমতা দেন, তার কাছে কোন কথাই গোপন থাকে না। সুতরাং আমার কাছে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করো না। কারণ আমার বিশ্বাস তুমিই রঙ্গনাথন্—ভারত-গভর্ণমেন্টের অধীন বোম্বাইয়ের কাষ্টমস্-অফিসার। তুমি সাহসী ও বুদ্ধিমান। হাঁ, আর একটা কথা, তুমি একাকী এমনিভাবে দেশভ্রমণে বেড়াতে বেরিয়েছিলে কেন?"

বন্দী এবারে উত্তর করিল—"সত্যি কথা, আমি একাকী মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু হে শেখাধিপতি! আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, আমাকে রঙ্গনাথন্ বলে বারবার ভুল করবেন না।"

এবারে কাসেম ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন—"মিথ্যা কথা বলো না!"

প্রত্যুত্তরে বন্দী দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করিল—"আমি সত্যি কথা বলছি।"

—"তবে তুমি কে?"—কাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন।

এবারে ক্রুদ্ধ হালিদ অগ্রসর হইয়া বলিল—"বিধর্ম্মী! তুমি রঙ্গনাথন্ না হলেও মরবে।" এই বলিয়া অকস্মাৎ সে ছোরা লইয়া বন্দীর উপর লাফাইয়া পড়িল।

সূর্য্যালোকে সেই শাণিত ছুরিকা চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। দ্রুত সেই অস্ত্র বন্দীর পিঠের উপর নামিয়া আসিতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই, যে কোন মুহূর্ত্তে বন্দীর মেরুদণ্ড বিদীর্ণ হইবে। কিন্তু সেই ছোরা বন্দীর বক্ষে বিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই একটি বালক ছুটিয়া আসিয়া হালিদের গলা টিপিয়া ধরিল।

পিছন হইতে অকস্মাৎ এইরূপে আক্রান্ত হইয়া হালিদ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল, তাহার হস্ত হইতে ছোরাটি মাটিতে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে হালিদও ভূপতিত হইল।

এতগুলি ঘটনা ঘটিল বটে, কিন্তু সমস্তই ঘটিল অতি অল্প সময়ে—মুহূর্ত্ত-মধ্যে!

ইহাতে কাসেম নিজেও নিতান্ত কম বিস্মিত হন নাই! চকিতে হালিদের আক্রমণ ও অভাবনীয়রূপে তাহার পরাজয়—কাসেমের কাছে এক চমকপ্রদ ঘটনা বলিয়া মনে হইল। যাহোক্, অচিরেই তিনি তাঁহার স্বাভাবিক স্থৈর্য্য ফিরিয়া পাইলেন। একটি বালকের হাতে তাঁহারই একজন সাহসী বীরের এমনভাবে পরাজয় হওয়ায় ক্রোধে তিনি এবার আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন।

ক্রোধকম্পিত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? "কে এই দুঃসাহসী বালক?"

প্রত্যুত্তরে তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বন্দী বলিল—"ধর্ম্মাবতার! এ আমার পুত্র।"

আট

সর্পিল পথের একধারে স্তূপাকৃত পাথরের নুড়ির পার্শ্বে জনী ও জুলিয়া আত্মগোপন করিয়া আরবদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

আরব-দস্যুরা আপন আপন কাজে ব্যস্ত। একদল আরব

তাঁবু খাটাইতেছিল। একদল কফি পান করিতেছিল। এতক্ষণ আরবেরা হাস্য-কৌতুকে মগ্ন ছিল। কিন্তু সহসা তাহারা সজাগ হইয়া উঠিল, বাজনা বাজিল, তাহার পর মহাসমারোহে দলবল সমভিব্যাহারে কাসেম আসিলেন। ঝোপের আড়ালে যে বন্দী শায়িত ছিল, তাহাকে কেহই লক্ষ্য করে নাই। এমন কি, জনীও বন্দীকে দেখে নাই। কিন্তু জৈদ যখন বন্দীকে কাসেমের কাছে লইয়া আসিল, জনী তখন বন্দীকে দেখিতে পাইল। ভয়ে ও আনন্দে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে একবার আত্মবিস্মৃত হইয়া 'বাবা' বলিয়া চীৎকার করিতে যাইতেছিল, কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে জনী মৃদুস্বরে জুলিয়াকে বলিল—"জুলিয়া! এখন আমার কিছুই করবার উপায় নেই। কারণ ওদের হাত থেকে বাবাকে ছিনিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। যদি আমি ওদের আক্রমণ করি এবং প্রত্যেক গুলিতেও যদি একটা করে মানুষ মরে, তবুও বাবাকে উদ্ধার করতে পারবো না। কারণ আমার কাছে মাত্র ছ'টা গুলি আছে, কিন্তু তাদের দলে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। সুতরাং আমাকে রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তার পর যে করেই হোক বাবাকে মুক্ত করবো। দেখ জুলিয়া, যা ঘটুক না কেন, আমি চাই না যে, তুমি ওদের হাতে পড়। যাও, তুমি পিরামিডের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নাও। কারণ পিরামিডই আত্মগোপনের সবচেয়ে ভাল জায়গা। সেই নিকুঞ্জের মধ্যে দিয়ে দালানে যাও। পেড্রোকে বোধহয় ওরা বন্দী করেছে।"

জনীর এই উপদেশ জুলিয়ার মনঃপূত হইল না। সে মাথা নাড়াইয়া জানাইয়া দিল যে, সে তাহাকে ছাড়িয়া পিরামিডে যাইতে রাজী নয়। জনী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিল না; সে মনে করিল হয়তো ভয়ে জুলিয়া পিরামিডে যাইতে চাহিতেছে না; সেই জন্য জনী তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য পুনরায় বলিল—"এখন ভয় পেলে চলবে না জুলিয়া; দেশলাই ও মোমবাতি নিয়ে এই বেলা পিরামিডের মধ্যে চলে যাও, নইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

প্রত্যুত্তরে জুলিয়া সহাস্যে জবাব দিল—"আমি মোটেই ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু একটা কথা, তোমাকে ছেড়ে যাওয়া কি উচিত হবে, তাই ভাবছি।"

তাহার উত্তরে জনী একটা কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু কেন জানি না সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না। তবে অনুমান এই যে তাহার সম্মুখে তাঁবুতে যে আকস্মিক ঘটনা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেদিকে চাহিয়া জনী স্তব্ধ হইয়া গেল! উত্তেজিত ডাক্তার হালিদের মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিল—একটা চাপা কোলাহলে মরুদ্যান পূর্ণ হইয়া উঠিল। আহত হইয়া উন্মত্ত হালিদ পিছন হইতে ছুরি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। এবারে জনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে আচম্বিতে সকলের অলক্ষ্যে ছুটিয়া আসিয়া হালিদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া পিতার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

পিতা এবং পুত্র এতদিন বৃথা পরস্পরের জন্য শোক করিয়াছে। তাহারা স্বপ্নেও চিন্তা করে নাই যে, আবার এইভাবে তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে। কাজেই আকস্মিক এইভাবে মিলিত হইয়া তাহারা নিজেদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

এখন তাহারা দুইজনেই শত্রু-কবলে। মুক্তি অথবা মৃত্যু—এখন তাহাদের ভাগ্যলিখন। তাহাদের উপর কাসেমের কোপদৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন পলায়ন করা অসম্ভব। কেননা দশজন আরব তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত। ডাক্তার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু জনীকে পাইয়া এখন তিনি বাঁচার স্বপ্নে বিভোর!

কাসেম ও অন্যান্য সকলেই যখন স্তম্ভিত ও হতবাক্, এমনই সময়ে জনী চুপিসারে পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"ভয় নেই বাবা! আমার কাছে রিভল্ভার আছে। একবার কোন রকমে পিরামিডে যেতে পারলে আর আমাদের পায় কে?"

প্রত্যুত্তরে হতাশার সুরে পিতা বলিলেন, "জনী! মুক্তি অসম্ভব! ওদের দলে অনেক লোক আছে। তাদের সঙ্গে দু'জনে কি করবো? এতদিন মরতেও দুঃখ ছিল না, কিন্তু এখন তোমাকে পেয়েছি তাই মরতে ইচ্ছে হচ্ছে না।" এই কথা বলিয়া পিতা নীরব হইলেন এবং পুত্রের মুখেও কোন কথা ফুটিল না।

এদিকে কাসেমের শিবিরে অন্যান্য গণ্যমান্য শেখদের সঙ্গে কাসেমের মন্ত্রণা ও আলোচনা শুরু হইয়াছে। তাহাদের কণ্ঠস্বর কখনও সপ্তমে উঠিতেছে আবার কখনও পঞ্চমে নামিতেছে—যেন এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বৈঠক বসিয়াছে। আটজন প্রধান শেখের মধ্যে দুইজন অনুপস্থিত। হালিদ অপমানিত হইয়া ক্রোধে তাঁবু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কূটনৈতিক সুলেমান তাহাকে শান্ত করিতে চলিয়া গিয়াছে।

সুলেমানের প্রবোধবাক্যেও হালিদ কিন্তু কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। সত্যই সে মর্ম্মাহত হইয়াছে! তাই সে কেবলই শপথ করিয়া বলিতেছে যে, সে তাহার জিনিসপত্র লইয়া

এখনই চলিয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে কাসেমের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে যুদ্ধ করিবে। শয়তান কাসেমকে সে হত্যা করিবে। তথাপি সুলেমান তাহাকে বুঝাইতে লাগিল যে, মহাপুরুষ কাসেমের কোন দোষ নাই। কিন্তু হালিদ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন সুলেমান নিরুপায় হইয়া হালিদকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার কানে কানে কি একটা কথা বলিল। হালিদ তখন সত্যই শান্ত হইয়া গেল। তাহাকে শান্ত করিয়া সুলেমান ফিরিয়া গিয়া কাসেমকে বলিল—"ধর্ম্মাবতার! হালিদকে বহু কষ্টে শান্ত করা গেছে। আজ রাত্রে সে আমাদের শিবির ছেড়ে যাবে না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া কাসেম প্রসন্ন মুখে কৌতুক করিয়া বলিলেন—"চাঁদের আলোর মোহিনী শক্তি আছে, কি বল হে সুলেমান! নইলে কি আর রাগ পড়তো?" কাসেমের এই উক্তি শুনিয়া হালিদ অল্প একটু হাসিল।

সুলেমানের সঙ্গে আলোচনা শেষ করিয়া বন্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা বন্দী, রঙ্গনাথন্ যদি তোমার নাম না হয়, তাহলে তোমার নাম কি?"

উত্তর আসিল—"স্যামুয়েল প্যারেইরা। আমি একসময় বোম্বাই মিউজিয়মের কিউরেটর ছিলাম ও সরকারী খরচায় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করতাম।"

কাসেমের প্রশ্ন শুরু হয়—"মরুভূমিতে এলে কেন? এখানে তোমার কি কাজ ছিল?"

—"কাজ আর বিশেষ কিছুই নয়, মরুভূমির এই সব পিরামিড সম্বন্ধে গবেষণা করা।"

কাসেম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরে কহিলেন, "ভারতীয় কাফেরগুলো কি এমনি ধারা পাগল ও বোকা? মরুভূমি ও পিরামিড রয়েছে তোমার দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। তাদের সম্বন্ধে গবেষণা বা অনুসন্ধান করে তোমার লাভ কি বলতে পার? তোমার দেশে কি গবেষণা করবার মত কিছু নেই?"

ডাক্তার প্যারেইরা কোন উত্তর দিলেন না। কাসেম এইবার বালক জনীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বালক! তোমার নাম?"

—"আমার নাম জনী প্যারেইরা।"

—"তুমি কোত্থেকে আসছ?"

এবারে জনী উত্তর করিল—"মরুভূমি থেকে—যেখানে বাবা আমাকে বৃথা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।"

—"সঙ্গে আর কে ছিল?"

—"কেবলমাত্র একজন নিগ্রো চাকর।"

—"কোথায় সে?"

—"বোধ হয় ধরা পড়েছে।"

এবারে সুলেমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাসেম কহিলেন—"আর কেউ বন্দী হয়েছে কি?"

প্রত্যুত্তরে সুলেমান মাথা নত করিয়া বলিল—"না ইমাম!"

আবার কাসেমের প্রশ্ন শুরু হইল—"তোমার উট কই?"

—"পাহাড়ের গুহায় আছে।"

—"তুমি কোথায় লুকিয়েছিলে?"

—"ওই দূরের পাথরের আড়ালে।"

—"লুকিয়েছিলে কেন?"

—"আমি আপনার এই আরবদের ভয় করি।"

—"আমাকে ভয় কর না?"

—"না।"

—"কেন?"

—"কারণ আমি জানি যে, যাঁরা শক্তিমান, তাঁদের মন দয়ায় পূর্ণ।"

এই কথা শুনিয়া কাসেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া তিনি জেরা শুরু করিলেন—"তোমাদের ছাড়াছাড়ি হল কেন?"

উত্তর হইল, "ওরা সকলে ঘুমুলে, আমি একা শিবিরের বাইরে আসি এবং তারপর জ্যোৎস্নালোকে অজানা মরূদ্যানের অনুসন্ধান করি। কিন্তু অল্প দূর যেতেই ভীষণ ঝড় ওঠে এবং আমি পথ হারিয়ে ফেলি। তারপর জৈদের হাতে বন্দী হই।"

কাসেম সমস্তই শুনিলেন। কিন্তু কি তিনি বিশ্বাস করিলেন, আর কি যে করিলেন না, তাঁহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

যাহোক্, তিনি বলিলেন, "বন্দী, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি। বিশ্বাস করছি যে, তুমি রঙ্গনাথন্ নও, তুমি ডাক্তার প্যারেইরা। কিন্তু তুমি রঙ্গনাথন্ হলেই যেন ছিল ভাল। তাহলে আমার একটা দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যেতো—একটা কাজ আমার চিরদিনের জন্য মিটে যেতো। কারণ, রঙ্গনাথন্‌কে আমি চাই। সে আমার বহু ক্ষতি করেছে। আইনের নামে, বেআইনী সোনা আমদানি বন্ধ করার ওজুহাতে, সে আমার ও আমার আরবীয় বন্ধুদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব প্রায় বন্ধ করে ফেলেছে। যাক্—তাকে পেলাম না; বেঁচে গেলো সে। তোমাকে পেয়েছি, কিন্তু তোমাকে দিয়ে কি করবো তা এখনো ভেবে ঠিক করতে

পারিনি।"

একটু থামিয়া কাসেম আবার বলিলেন, "সে যাহোক্, রঙ্গনাথন্‌কে চেয়েছিলাম শত্রুরূপে। কিন্তু তোমাকে চাই আমি বন্ধুরূপে। তবে একটা কথা আছে। কথাটা হচ্ছে, তুমি ইস্‌লাম গ্রহণ কর। তোমাকে আমি উচ্চ পদ ও উচ্চ সম্মানের অধিকারী করবো।"

প্রত্যুত্তরে ডাঃ প্যারেইরা বলিলেন, "সে অসম্ভব, সে হতেই পারে না, জীবন থাকতে আমরা খৃষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারবো না। তাছাড়া আপনার দলভুক্ত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমি দস্যুতার বিরোধী। কোন দস্যুর গোলামী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

এই কথা শুনিয়া কাসেম গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"বিবেচনা কর। এত তাড়াতাড়ি উত্তরের প্রয়োজন নেই—ভাল করে আর একবার চিন্তা করে দেখ। কাল সকালে এর উত্তর চাই। আর স্মরণ রেখো যে, সেই উত্তরের উপর তোমার মৃত্যুদণ্ড বা মুক্তি নির্ভর করছে।"

কাসেম আর কোন কথা বলিলেন না, কেবল দায়ূদকে আদেশ করিলেন, "তুমি ওদের বন্দীশালায় রেখে এসো। হ্যাঁ, আর একটা কথা, ওদের মুসলমান করবার চেষ্টা করো।" এই কথা বলিয়া কাসেম মনে মনে ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া নিকটবর্ত্তী প্রহরীকে একটু ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা আসিয়া দায়ূদকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল।

দায়ূদ চমকিত হইয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "একি! জনাব! আমাকেও বন্দী করছেন? আমার অপরাধ?"

ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া কাসেম কহিলেন, "তোমার অপরাধ?—অপরাধ এই যে, একদিন তুমিও ছিলে বিধর্ম্মী, খৃষ্টান। আজ লোভের মোহে তুমি ইস্‌লাম গ্রহণ করলেও, তুমি ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠতে পারোনি বলে একেবারেই খুশী নও। কাজেই, তুমি যে বন্দীদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে না, তা কি কেউ বলতে পারে?

বিধর্ম্মী যে, কাফের যে, সে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করলেও রাতারাতি বদলে যায় না—এই হচ্ছে আমার বিশ্বাস। তা যাক্, আর কথার দরকার নেই। প্রহরী, এদের নিয়ে যাও।"

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক ঘরে তাহারা তিনজন ছোট একটি তাঁবুর মধ্যে স্থান লাভ করিল। তখন বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, শেখের দল নামাজ পড়িতে শুরু করিয়াছে।

গোলকধাঁধার নির্জ্জন পথে একাকী জুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে জনী ও তাহার পিতাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছে। কাল প্রত্যূষে যে তাহাদের ভাগ্যে

"একি! জনাব! আমাকেও বন্দী করছেন?......"

কি ঘটিবে তাহা অনুমান সাপেক্ষ। যে তাঁবুতে পিতা-পুত্র বন্দী আছে, জুলিয়া সে দিকে বহুক্ষণ সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া রহিল। আরবেরা তখন নামাজ পড়িতেছিল। জুলিয়া কিছুক্ষণ সেইদিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বিষণ্ন মনে সেই গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিল। সে অকম্পিত পদে অগ্রসর হইল। অন্ধকার পথে সে একাকী। পথ ভুল হয় নাই। তথাপি সন্দেহ জাগে, কাজেই সে একবার ফিরিয়া আসে, আবার পথ চিনিয়া অগ্রসর হয়। এইরূপে বহুক্ষণ চলিয়া সে এক গুহার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুহার গায়ে যে ঘোরালো দরজা ছিল, জুলিয়া তাহা খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহার পর বহু কষ্টে এবং বহু যত্নে সেই দরজা খুলিয়া মোমবাতি জ্বালাইয়া আবার অন্ধকারে অগ্রসর হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তাহার চোখে পড়িল দেবী আইসিসের সেই অবগুণ্ঠিতা মূর্ত্তি। সে তাহার পাশ দিয়া জলাশয়ের পাড় ঘেঁষিয়া পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইল। অবশেষে সে জলাশয় পার হইয়া গেল। জলাশয়ের অপর পারে গিয়া সে প্রদীপ ধরিয়া সেই সূতার টুকরা চিহ্নগুলি লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কবর-ঘর হইতে দালানে আসার পথে সে সূতার টুকরা ফেলিয়া চিহ্ন করিয়া রাখিয়া ছিল।

অন্ধকারে নিরাপদ স্থানে পেড্রো ঘুমাইতেছিল। ইতিমধ্যে কত কি ঘটিয়া গিয়াছে, সে তাহার বিন্দু-বিসর্গ জানে না। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! শিবিরে শেখের দল কাসেমের সহিত নানারূপ কথোপকথনের পর এখন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া উৎসবের আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। সেই শব্দে পেড্রোর নিদ্রাভঙ্গ হইলেও, তাহার ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নাই। দ্বিতীয়বারের বন্দুকের শব্দে সে লাফাইয়া উঠিল।

এখন সে সম্পূর্ণ জাগ্রত। তাহার চোখে ঘুমের ঘোর পর্য্যন্ত নাই। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পিরামিডে কেহ নাই। এখন সে কি করিবে? জনী বা জুলিয়া কোথায়?

চিন্তা করিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সহসা আবার বন্দুকের শব্দ হইল। পেড্রো এবার রীতিমত ভয় পাইল। তবে কি শত্রুরা মরূদ্যানে আসিয়া পড়িয়াছে?

নিজের এত বেশী ঘুমের জন্য সে খুবই লজ্জিত হইল—অনুতাপও হইল যথেষ্ট।

মনে হইল, নিজে সে কেমন নিশ্চিন্তভাবে নিরাপদ স্থানে ঘুমে বিভোর, কিন্তু তাহারই প্রভুপুত্র, মাষ্টার জনী, না জানি এখন সে কোথায় ও কিভাবে আছে!

এমনই সময়ে সহসা এক ঝলক আলোর উদয় হইল! সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে জুলিয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে পেড্রো? মাষ্টার জনী কোথায় বলতে পার?"

পেড্রো স্পষ্ট দেখিল, গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কায় জুলিয়ার মুখমণ্ডল যেন ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে! তাহাকে কী যে উত্তর দিবে, তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না।

জুলিয়া তাহাকে নীরব দেখিয়া নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিল না। তাহার হাত দুটি ধরিয়া অশ্রু-সজল চোখে মিনতির স্বরে তাহাকে কহিল, "দোহাই তোমার পেড্রো! হয় আর ঘুমিও না, নয়তো জন্মের মত ঘুমাও—আর যেন জেগে উঠো না কোনদিন! কারণ, মহা সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। মাষ্টার জনী আর তাঁর পিতা শত্রুহস্তে বন্দী হয়েছেন!

ওঃ! এ আমাদের কী সর্ব্বনাশ হলো গো!—"

মুহূর্ত্তমধ্যে জুলিয়ার সংজ্ঞাহীন দেহ পেড্রোর পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

নয়

অন্ধকার শিবিরে পিতা ও পুত্র বন্দী। সাক্ষাতের প্রথম আনন্দে জনীকে ডাক্তার পেরেইরা দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—"এখন তোমাকে পেয়েছি, আর মরতে ভয় নেই। জান জনী, কাল ওরা দেখবে কেমন শান্ত-ভাবে ভারতীয়রা মরতে পারে।"

কিন্তু তাহার উত্তরে জনী বলিয়াছিল—"বাবা! অত সহজে মরলে চলবে না। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কাছে বন্দুক আছে, কাজেই একবার যদি পালাতে পারি, ব্যাস্, আর কেউ ধরতে পারবে না। কারণ, আমি পিরামিডের গুপ্ত কক্ষেরও সন্ধান জানি।"

কিন্তু জনীর প্রবোধবাক্যে ডাক্তারের প্রাণে কোন উৎসাহ জাগে নাই। তিনি হতাশার সুরে উত্তর করিয়াছিলেন—"কিন্তু আসল কথা, আমরা পালাবো কোথায়? আর পালাবোই বা কি করে? আমাদের হাত-পা বাঁধা। বাইরে অস্ত্রধারী প্রহরী!"

প্রত্যুত্তরে জনী চাপা কণ্ঠে বলিয়াছিল—"এখন গভীর রাত। কাজেই পাহারাওয়ালারা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আর দায়ূদও আমাদের সঙ্গী হবে, কারণ, কাসেম তাকে বোকার মত চটিয়ে দিয়েছে, তাকে শত্রু করে নিয়েছে। কাজেই ওকে জাগানো যাক্।" ডাক্তার আর কোন কথা বলিলেন না।

দায়ূদ তাহাদের কথোপকথন শোনে নাই। সে এতক্ষণ অঘোরে ঘুমাইতেছিল। জনী তাহাকে জাগাইয়া সমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল। তাহার কথা শুনিয়া দায়ূদ চিন্তা করিতে লাগিল। সে জাতিতে আইরিশ্‌ম্যান্। তাহার নাম টেরি পেল্টন্। সে পাশার অধীনে চাকরী করিত; কিন্তু এক যুদ্ধে সে বন্দী হয় এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় কাসেম তাহাকে স্বীয় অনুচর করিয়া লন। কিন্তু সে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও কাসেম তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। কাজেই দায়ূদও কাসেমকে ঘৃণা করে—অত্যন্ত ঘৃণা! কিন্তু কাসেমের ভয়ে সে কোনদিন কোন কথা প্রকাশ করে নাই। আজ কাসেম সহসা তাহাকে বন্দী করায় সে তাঁহার পরম শত্রুরূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ডাক্তারের কথা শুনিয়া তাহার প্রাণে আবার স্বাধীনতালাভের প্রলোভন জাগিয়া উঠিল। দাসত্ব-জীবনের অবসান হইবে এইকথা ভাবিয়াই সে আনন্দিত হইল। কিন্তু সে মনে মনে কোন ভরসা পাইল না, কারণ সে জানিত, কাসেমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। কাজেই সে সম্মত হইয়াও গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু পালাবে কি করে?"

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার বলিলেন, "পালাবার একমাত্র উপায় এই যে, প্রথমে হাতের বাঁধন দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে,

পায়ের বাঁধন খুলতে হবে। কাজেই এস, আগে আমরা হাতের বাঁধন কেটে ফেলবার চেষ্টা করি।”—এই বলিয়া তিনি কর্ম্মপদ্ধতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি জনী ও দায়ূদ হাতের বন্ধন-রজ্জু চর্ব্বণ করিতে লাগিল।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে দায়ূদ চর্ব্বণ করিতে করিতে কৌতুক করিয়া হাসিয়া বলিল—“ডাক্তার, আমরা যেন তিনটে বড় ইঁদুর; এই অবস্থায় নিজেদের কেমন দেখাচ্ছে কে জানে!”—এই বলিয়া সে আব এক দফা হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দে একজন প্রহরীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাঁবুর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া ব্যঙ্গের সুরে কহিল—“এত পুলকের কারণ কি দায়ূদ! খ্রীষ্টানদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করতে তোমার লজ্জা করে না?”

প্রত্যুত্তরে দায়ূদ চাপাকণ্ঠে বলিল—“বুঝলে হে, হাসি-ঠাট্টার একটা উদ্দেশ্য আছে; সকাল হোক, দেখবে এরা মুসলমান হ'তে আর আপত্তি করবে না।”

প্রহরী এবার অত্যন্ত খুশি হইয়া মন্তব্য করিল—“তা' হলে কাসেম তোমাকে সোনার মোহর পুরস্কার দেবেন।”—এই বলিয়া প্রহরী চলিয়া গেল; আর কোন সন্দেহ করিল না। আবার চর্ব্বণ সুরু হইল।

গভীর রাত। মরূদ্যান ঘুমন্ত। পাণ্ডুর চাঁদের শুভ্রায়িত কিরণ পিরামিডের উপর পড়িয়াছে। পুকুরের স্বচ্ছ জলে যেন তারার হাট বসিয়াছে! বাতাসে তাঁবুগুলি কাঁপিতেছে। কাসেমের শিবিরে লাল ও সবুজ পতাকা উড়িতেছে। ক্লান্ত প্রহরীরা কাসেমের তাঁবু ও বন্দীশালার মাঝামাঝি একস্থানে ঘাসের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শুভ্র গুল্মলতার পশ্চাতে অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি সারি সারি ঘুমন্ত তাঁবু।

কেবল হালিদ ও আলি অনিদ্রিত অবস্থায় গুল্মবনের অন্তরালে বসিয়া আছে। তাহাদের কথোপকথন চলিতেছে। আলি কি একটা শপথ করিয়া বলিতেছে—“এটা করতেই হবে!”

প্রত্যুত্তরে ভয়ার্ত্তকণ্ঠে চুপিসাড়ে হালিদ মন্তব্য করিতেছে—“ওসবে কাজ নেই আলি, কাসেম জান্‌তে পারলে ফাঁসি দেবেন!”

—“মূর্খ, কাসেম জান্‌বে কি করে?” তাহার কথা শুনিয়া আলি উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল। তাহার পর কেহই কোন কথা বলিল না, ধীরে ধীরে পুকুরের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সে-স্থানটি একেবারে ফাঁকা। সেখান হইতে নিদ্রিত প্রহরীদের দেখা যায়। তাহারা সেখানে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর আলি হালিদের সন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“সত্যি বল, তুমি প্রতিশোধ চাও, না শান্তি চাও?”

প্রত্যুত্তরে হালিদ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—“প্রতিশোধ চাই, আমাকে অপমান করেছে, আমি ওর রক্ত দর্শন না করে ছাড়বো না!” তাহার কথা শুনিয়া আলি উৎসাহিত হইয়া বলিল—“বেশ, তাই হবে; তুমি ছেলেটাকে খুন করবে, আর আমি ঐ ধেড়েটাকে। বন্দী হয়েও ব্যাটাদের স্পর্দ্ধা কমেনি।” “হ্যাঁ, আর একটা কথা”, আলি আরো বলে—“ডাক্তার তোমার কানের নীচে ঘুঁষি মারেনি?”

ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব আসে—“হ্যাঁ, সুতরাং ওরা মরবে, ওদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু একটা কথা, দায়ূদও ঐ তাঁবুতে আছে না? কাজেই অন্ধকারে...”

আলি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—“চুপ, দায়ূদও মরবে। কারণ, কোন সাক্ষী রাখবো না। খুনের সাক্ষী রাখা ঠিক নয়। বিশেষতঃ দায়ূদকে বন্দী করে কাসেম আজ তাকেও যেভাবে চটিয়ে দিয়েছে, এ অবস্থায় দায়ূদও আজ ঐ কাফেরদেরই একজন হয়ে গেছে। ওর বাঁচা-মরায় কাসেম এখন আর কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না।”

প্রত্যুত্তরে চাপা কণ্ঠে হালিদ বলিল—“কিন্তু যা মনে করছ তা নয়, কাজটা অত সোজা নয়; কারণ, প্রহরী রয়েছে। তা ছাড়া কাছেই কাসেমের তাঁবু। সুতরাং রাতদুপুরে ওসব গোলমালে কাজ কি? কাল সকালেই তো ঐ কাফেরগুলো ফাঁসিকাঠে ঝুলবে।”

হালিদ এবার ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—“মূর্খ, তুমি কি মনে কর ওরা মরতে সাহস পাবে? কখনই না। ওরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করবে, তবু মরতে চাইবে না। ফলে দেখবে, ওরা হবে আমাদের সর্দ্দার! কাজেই ওদের খুন করতেই হবে।”

প্রত্যুত্তরে আলি ব্যঙ্গের সুরে বলিল—“বটে, ভারতবর্ষের দুটো কাফের হবে আমাদের সর্দ্দার! না, এ হতে পারে না। কাজেই ওরা মরবে।”

হালিদ এবার উৎসাহিত হইয়া মন্তব্য করে—“এই তো চাই, এস আমার সঙ্গে।”—এই বলিয়া হালিদ বন্দীশালার দিকে অগ্রসর হইল। আলিও তাহাকে অনুসরণ করিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহারা পুকুরের ধার দিয়া খেজুর গাছের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের ঘন বনের কাছে আসিয়াই ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে আলি বলিয়া উঠিল—“হালিদ, ঐ দেখ ভূত! ওদিকে গিয়ে কাজ নেই।” ভয়ে আলির বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না!

নিমেষের মধ্যে তাঁবুর অন্ধকার ছায়ায় এক তন্বী শ্বেত-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল!

হালিদ তখন খুনের নেশায় মশ্গুল। সুতরাং সে আলিকে সাহস দিয়া বলিল—"ও কিছু না আলি, চোখের ভুল! চাঁদের আলোয় কি একটা কাঁপছিল। চলে এসো, শীগ্গির চলে এসো।"—এই বলিয়া সে একটি চওড়া ছোরা দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইল। আলিও তাহার অনুসরণ করিল।

আবার চর্ব্বণ শুরু হইল। প্রায় ঘণ্টাধিককাল অবিরাম চর্ব্বণের ফলেও বন্ধনের অর্দ্ধেকও ছিন্ন হইল না। দায়ূদ হতাশার সুরে মন্তব্য করিল—"ডাক্তার, এ বাঁধন কাটবার নয়!" তাহার কথায় বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন—"বাজে বকে সময় নষ্ট করো না। আবার চেষ্টা কর।"

প্রত্যুত্তরে দায়ূদ বলিল—"বাজে কথা কি বলছ? দাঁত ব্যথা হয়ে গেল—চোয়াল দুটো প্রায় অবশ হয়ে এসেছে। এদিকে রাতও বেশী নেই; তাই মনে হয় সকালের আগে বাঁধন কাটবে কিনা কে জানে!"

জনী তাহাদের সতর্ক করিয়া বলিল—"আস্তে, প্রহরীরা আমাদের কথা শুনতে পাবে।" জনীর কথায় সকলেই চুপ করিল। আর কোন কথা শোনা গেল না।

চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"জনী। মাষ্টার জনী।"

আবার চর্ব্বণ শুরু হইল।

হঠাৎ পিছনে খস্ খস্ করিয়া শব্দ হইল, এবং তাঁবুর নীচে ফাঁক হইয়া গেল। অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল একখানি সাদা হাত দেখা গেল। সে হাতে প্রকাণ্ড একটি ছুরি। ধীর পদে একটি ছায়া-মূর্ত্তি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"জনী! মাষ্টার জনী!"

নারীকণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া জনী জিজ্ঞাসা করিল—"কে? জুলিয়া?"

বালিকাটি এবার জনীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার হাতের বাঁধন কাটিয়া দিল।

অন্যদিকে নিঃশব্দে সাপের মত হালিদ ও আলি অগ্রসর হইতেছে। ঘাসের উপর প্রহরীরা তখনও নিদ্রামগ্ন। কাছে আসিয়া আলি ভাল করিয়া তাহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল—"সব ঠিক আছে হালিদ; এবারে কাজ ফর্সা। আর রক্ষে নেই! তুমি ডাক্তারকে আর আমি ছেলেটা ও দায়ূদকে খুন করবো। বুঝলে!"

হালিদ কোন উত্তর করিল না। তাহারা উভয়ে নিঃশব্দে আবার অগ্রসর হইল।

কিছুক্ষণ পরে বন্দীশালার তাঁবুর পর্দ্দা নড়িয়া উঠিল। তাহার পর এক পাশের পর্দ্দা সরিয়া গেল। এবারে চাঁদের আলোয় দুইজন খুনীকে ভাল করিয়া দেখা গেল। তাহার পর তাঁবুর অন্ধকারে তাহারা অদৃশ্য হইল।

কিন্তু চাঁদের আলো তাহাদের উদ্দেশ্য ও আগমনের কারণ জানাইয়া দিল। ফলে বন্দীরা সতর্কতা অবলম্বন করিয়া শত্রুর প্রতীক্ষায় রহিল। কাজেই শত্রুরা শিবিরে প্রবেশ করিতেই বিদ্যুতের মত ডাক্তার, জনী এবং দায়ূদ তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এইরূপে অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া শত্রুরা বিপন্ন হইল। তাঁবুর মধ্যে একটা চাপা আওয়াজ শোনা গেল। সেই শব্দে মনে হইল কাহাকে যেন শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে ঘর্ঘর ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেল—তাহার পর ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল হালিদ ও আলি ভূতলশায়ী—তাহাদের হাত-পা বাঁধা। আক্রমণকারীরা ভূতলশায়ী হইয়াছে। তাহারা এতই ক্লান্ত যে, নড়াচড়া বা চীৎকার করিবার শক্তি তাহাদের নাই! ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গিয়াছে। বন্দীরা মুক্ত এবং মুক্তরা বন্দী হইয়াছে।

জুলিয়া সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তাঁবু পরিত্যাগ করিয়া তাহারা প্রস্তরস্তূপ পার হইয়া আঁকা-বাঁকা পথে পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবেশ করিল।

তাহারা কি এখন নিরাপদ? কিন্তু না! অন্ধকার হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল—"কে যায়?"

তাহারা সে-কথায় কর্ণপাত করিল না; আবার অগ্রসর হইল।

পর্ব্বত-গুহায় কাসেমের উটগুলি রাখা হইয়াছে। গুহার প্রবেশ-মুখে উটচালকেরা নিদ্রামগ্ন। কাজেই তাহাদের একটু ভয় হইল, পাছে সেই শব্দে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়!

আবার সেই চীৎকার—"কে যায়?"

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কে যেন প্রহরীদের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—"মেসু, হাসান, আলি উঠ, শত্রু এসেছে!"

জনী ও জুলিয়া এবার ভয় পাইল। ডাক্তার দায়ূদের কানে কানে বলিলেন—"দায়ূদ, ওদের যা হয় বুঝিয়ে বল, নইলে রক্ষা নেই।"

দায়ূদ এবার বুদ্ধি করিয়া জবাব দিল—"ইব্রাহিম, আমি দায়ূদ। পাছে কাফের দুটো পালিয়ে যায়, সেই দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুমাতে পারছি না। চারদিক দেখে বেড়াচ্ছি।"

কাসেম যে দিনের বেলায় দায়ূদকেও ভারতীয়দের সঙ্গে বন্দী করে একই স্থানে রেখেছিলেন, এই খবর কাসেমের শত-সহস্র সৈন্যের মধ্যে তখন পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে নাই; ইব্রাহিমও তাহা জানিত না। কাজেই দায়ূদের কথা সে সহজেই বিশ্বাস করিল। সে আর কোন প্রশ্ন করিল না, বিছানায় শুইয়া পড়িল।

তাহার পর প্রহরীদের উদ্দেশ করিয়া বলিল—"হাসান, আলি, সব ঠিক আছে, ঘুমাও। আর দায়ূদ, যদি ঠাণ্ডা লেগে থাকে, এখানে শোও—বেশ গরম আছে—আরামে ঘুমাতে পারবে।"—এই বলিয়া সে আবার শয্যাগ্রহণ করিল।

নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহারা গুহামুখ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল এবং সম্মুখের গুপ্ত তোরণ-পথে অদৃশ্য হইল।

কিন্তু তোরণ-দ্বার পার হইতেই তাহারা দেখিল, এক দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ দৈত্য-মূর্ত্তি যেন একবার মাত্র তাহাদের দিকে তাকাইয়া পরক্ষণেই সাঁৎ করিয়া কোথায় সরিয়া গেল!

দায়ূদ ভীত স্বরে কহিল, "দেখলে ডাক্তার, ঐ যে কি একটা চলে গেল!"

ডাক্তার পেরেইরা স্বভাবতঃই সাহসী। তবু আকস্মিক-ভাবে ভূত-প্রেত দেখিলে কাহার না বুকটা কাঁপিয়া ওঠে? ডাক্তারও তাই একটু শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তবু সাহসে ভর করিয়া তিনি কহিলেন, "ওসব নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিও না দায়ূদ! এসো, নিজেদের কাজ করে যাই।"

দায়ূদ কহিল, "কিন্তু পিরামিডের ঐ ভূত যখন আমাদের পিছু নিয়েছে, তখন একটু সাবধান থাকাই ভালো। কবর-তলার পুরানো আত্মা, কে জানে, কি ওর মতলব?"

জনীও ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু সে জানে, ভয়ের কথা সে যদি কিছুমাত্র প্রকাশ করে, তাহা হইলে জুলিয়া হয়তো অজ্ঞান হইয়াই যাইবে! জুলিয়া এরই মধ্যে সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল। আর তাহার সমস্ত শরীর তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

দশ

পেড্রোর পায়ের তলায় জুলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলে, পেড্রো প্রথমে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল—কি যে করিবে, তাহা সে ঠিক্ করিতে পারিল না; কিন্তু কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইতেই তাহার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল।

ঘর অন্ধকার। যে জ্বলন্ত মোমবাতিটি লইয়া জুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইতেই তাহা হস্তচ্যুত হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, আলোও নিভিয়া গেল! পুনরায় গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত কক্ষ আচ্ছন্ন হইল।

পেড্রো অন্ধকারেই জুলিয়ার মুখে ও নাকের কাছে হাত বুলাইয়া তাহার অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিল। সে বুঝিল, জুলিয়া জীবিত থাকিলেও তখনও তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই—নাসিকায় মৃদু মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে।

একটু হাওয়া ও একটু জল! পেড্রো ভাবিল, একটু জলের ছাঁট চোখে-মুখে দিতে পারিলেই বুঝি তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইত!

কিন্তু জল কোথায়? কোথায় সে জল পাইতে পারে? মনে হইল, পিরামিডের ভিতরেই সে জলাশয় দেখিয়াছে, নকল ফোয়ারা দেখিয়াছে। দেখা যাক্, যদি একটু জল পাওয়া যায়!

সে জুলিয়াকে একাকী সেই অন্ধকার ঘরেই রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মাত্র মিনিট দশেক! কিন্তু ইহারই মধ্যে কিছু জল সংগ্রহ করিয়া সে যখন পুনরায় ফিরিয়া আসিল, দেখিল—জুলিয়া নাই!

—"এ কি! কি হলো? মেয়েটা কি এখনো সেই পরীর মতই চলাফেরা করে? এই মাত্র ছিল সে, আর জল নিয়ে ফিরে আসতেই কোথায় সে পালিয়ে গেল?

আশ্চর্য্য!"

পেড্রো খুবই বিরক্ত ও হতাশ হইয়া পড়িল। সে বুঝিয়াছিল, বহু অপরাধ সে করিয়াছে। একবার সে ঘুমাইয়াছিল মড়ার মত। আর সেই সুযোগে, তাহার অজান্তে আরবীয় ডাকাতের দল পিরামিডের আশে-পাশে ছাইয়া ফেলিল! তাহার দ্বিতীয়বারের ঘুমের ফলেও আবার এক অনর্থের সৃষ্টি হইল! মাষ্টার জনী সেই সময় হইলেন শত্রুহস্তে বন্দী! ভাবিয়াছিল, মেয়েটার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে ভালো করিয়া তুলিতে পারিলে, তাহার পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হইবে, মনকে প্রবোধ দেওয়ার মত তবু যা হোক্, একটা কাজ হইত! কিন্তু এই পরী-মেয়েটা সেই সুযোগও তাহাকে দিলে না!

এখন কী সে করিবে?—

একটু ভাবিয়া সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। সে ভাবিল, "মাঝখানে ঐ যে তাঁবু, ওরই আশে-পাশে ঘোড়সওয়ারদের কয়েকবার চলাফেরা করতে দেখেছি—সিপাইরা পাহারা দিচ্ছে তা-ও দেখেছি। নিশ্চয়ই ঐটাই হচ্ছে বন্দীদের শিবির। মাষ্টার জনী ও ডাক্তার সাহেবকে নিশ্চয়ই ঐখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে। আমি এবার অসীম সাহসে তাদের দু'জনকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো।

কাছে ছোরা আছে, দেহে শক্তি আছে, মনে সাহস আছে। অন্ততঃ মাষ্টার জনীর চেয়ে নিশ্চয়ই কোন কিছু কম নয়। তা হলে নিশ্চেষ্ট থাকবো কেন? দেখাই যাক্ না চেষ্টা করে!"

পেড্রো দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া, বন্দীদের মুক্ত করিতে তাহার নৈশ অভিযানে বাহির হইল।

পেড্রো সাহস সঞ্চয় করিয়া পিরামিডের দক্ষিণ-পশ্চিম ধারে অগ্রসর হইল। দূরে সারি সারি শিবির দেখা যাইতেছে। মরূদ্যানে মৃত্যু-কঠিন নীরবতা! চারিধারের স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে!

"কাসেম কি ঘুমিয়েছে?"—পেড্রো ভাবিতে লাগিল—"এত রাত্রে নিশ্চয় ওরা ঘুমিয়েছে! এখন ওদের উদ্ধার করা সহজ হবে।"—

রাত্রির এই অখণ্ড নীরবতা আজ তাহাকে সাহসী করিয়া তুলিল। সে শত্রুশিবিরের দিকে অগ্রসর হইল।

তাঁবুর প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর হইতে সে চাপা গলায় চুপিসাড়ে ডাকিল,—"খোকাবাবু!" কিন্তু কোন উত্তর আসিল না! সে আর ডাকিল না, কারণ এক্ষেত্রে ডাকাডাকি করিয়া গোলমাল করা সমীচিন নহে। কাজেই সে হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইল।

তাঁবুর কাছে আসিয়া সে পিছন দিকের পর্দ্দার একাংশ একটু উঁচু করিয়া আর একবার মৃদুস্বরে ডাকিল—"খোকাবাবু!" কিন্তু এবারও কোন উত্তর আসিল না; কেবল তাঁবুর ভিতরে একপ্রকার গোঁ-গোঁ শব্দ শোনা গেল।

পেড্রো এবার মনে করিল নিশ্চয় ডাক্তারের মুখ বাঁধা আছে। কাজেই সে ধীরে ধীরে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"জনী! খোকাবাবু! তোমরা কোথায়? কথা বলছ না কেন?"

আবার সেই গোঁ-গোঁ শব্দ হইল। তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিতেই কাহার বুকে তাহার পা ঠেকিল! অন্ধকারে মানুষ চেনা গেল না। তথাপি সে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"ডাক্তার সাহেব! তা হলে খুঁজে পেয়েছি!" এই বলিয়া সে বন্দীর বন্ধন মোচন করিতে আরম্ভ করিল।

আর কোন প্রশ্ন সে করিল না, বা কোন প্রকার অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তাও বুঝিল না! সে কর্ত্তব্য পালনে ব্যাপৃত হইল।

বন্ধন অত্যন্ত কঠিন, খোলা যায় না। যাহোক্, বহু চেষ্টার পর অবশেষে বন্ধন খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত্ত তীব্র কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল। পেড্রো ভয় পাইয়া সরিয়া গেল। সে ভাবিয়া পাইল না জনী কেন বোকার মত চীৎকার করিতেছে!

সেই চীৎকারে প্রহরীদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরে তাহাদের কলকণ্ঠ শোনা গেল। সহসা তাঁবুর দরজা খুলিয়া গেল। সেই মুক্ত পথে আবুকে দেখা গেল। সে একটু বিরক্ত স্বরে বলিল—"চেঁচাচ্ছ কেন দায়ূদ? চুপ কর। কাসেমের ঘুম ভাঙ্গলে যে মুস্কিলে পড়তে হবে!"

প্রত্যুত্তরে আলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"বিশ্বাসঘাতকতা! দায়ূদ বিশ্বাসঘাতক! বন্দীরা পালাচ্ছে!"

তাহার কথা শুনিয়া সকলে তাঁবুর ভিতরে জড় হইল।

তখন আকাশে ত্রয়োদশীর এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছে। সেই স্বল্পালোকে দেখা গেল যে আলি হাত-পা বাঁধা, আর একটি নিগ্রো ভয়ে পলায়ন করিতেছে। তাহারা আর কালক্ষেপ না করিয়া নিগ্রোর পিছনে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

পিরামিড হইতে তাঁবুর দূরত্ব অতি সামান্য। এক মিনিটে পিরামিডে পৌঁছান যায়। কিন্তু সেই এক মিনিট এক ঘণ্টা বলিয়া পেড্রোর মনে হইতে লাগিল। সহসা তাহার কানের পাশ দিয়া গুলি চলিয়া গেল।

আর রক্ষা নাই! সে প্রাণপণে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু হঠাৎ এবার একটি গুলি আসিয়া তাহার বাম কাঁধে লাগিল। সেই আঘাতে সে তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। ধরা পড়িয়াছে এই ভাবিয়া সে মাটিতে পড়িয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল! এমন সময় পিরামিডের মধ্য হইতে বন্দুক-গর্জ্জন শোনা গেল! সঙ্গে সঙ্গে একজন আরব দস্যু ভূপতিত হইল।

এবারে জনী চীৎকার করিয়া বলিল—"দৌড়াও পেড্রো!"

তাহার কথামত পেড্রো উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোনরূপে টলিতে টলিতে পিরামিডের দিকে অগ্রসর হইল। পিরামিডের দ্বারদেশে আসিতেই জনী তাহাকে টানিয়া পিরামিডের ভিতরে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল।

আশঙ্কা ও উদ্বেগের মধ্যে সে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাতের অরুণরাগে আকাশ ভরিয়া উঠিল। গত রাত্রির সমস্ত ঘটনাই কাসেমের কানে উঠিয়াছে। নিজের তাঁবুতে গম্ভীরভাবে বসিয়া কাসেম সেই কথাই চিন্তা করিতেছেন। গণ্যমান্য শেখের দল তাঁবুর বাহিরে বসিয়া কি একটা আলোচনা করিতেছে!

এমন সময় একজন শেখ কাসেমের শিবিরে প্রবেশ করিল। কাসেম তাহার প্রতি ভ্রূকুটি করিতেই সে বলিল—"পিরামিডের সব জায়গাই খোঁজা হয়েছে হুজুর! কোন জায়গাই আর বাকি নেই, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে।"

—"কিন্তু আর একবার ভাল করে খুঁজে দেখ। নিশ্চয় ওরা পিরামিডের মধ্যেই আছে!"

—"আমার বিশ্বাস—ওরা পালিয়েছে—পিরামিডে থাকলে এতক্ষণ ধরা পড়তো।"

—"কি বাজে বক্‌ছ? পালাবে কোথায় শুনি! পিরামিডের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে। গুহার মুখে দায়ূদ ইব্রাহিমের সঙ্গে কথা বলেছে; আর ছেলেটাকেও পিরামিডের গর্ত্তের কাছে দেখা গেছে; সুতরাং মনে হয় ওরা পিরামিডেই আছে। যাও, তাদের খুঁজে আন।"

—"কিন্তু ওখানে আর খুঁজে লাভ নেই, ওরা ওখানে কেউ নেই। তা ছাড়া পিরামিডগুলিতে ভূতের আড্ডা। কার সাধ্যি ওখানে যায়? হালিদ ও আলি দু'জনেই ভূত দেখেছে; ভূতেই ওদের মুক্ত করে দিয়েছে।"

কাসেমের কথায় লোকটা আস্তে আস্তে জবাব দেয়।

ক্রুদ্ধ কাসেম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"ডিনিজু, আমি যা বলছি, তাই কর। তোমার মতামত চাইনে। হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে যেও না যে, খোদাতালার লোকের সঙ্গে শত্রুগণ যুদ্ধ করতে সাহস করবে না। ভয় নেই, খৃষ্টান ও কাফেরদের উপর আল্লার অভিশাপ আছে। তা ছাড়া ওরা মানুষ, ওরা বাতাসে গলে যায়নি। কাজেই আবার খুঁজে দেখ।"

এবার সুলেমান জবাব দেয়—"আপনি বারবার খোঁজার কথাই বলছেন। কিন্তু এখন আর খুঁজে কি হবে হুজুর! সত্যি বলতে কি জনাব, এমন একটা কাজ বলতে গেলে আপনার ভুলের জন্যই সম্ভব হলো! দায়ূদকেও যদি কাফেরদের সঙ্গে বন্দী না করতেন, তার সম্মানে যদি আঘাত না লাগতো, তা হলে কি সে কাফেরদের কখনো এমনভাবে সাহায্য করতো? কাজেই সত্যি বলতে কি—"

—"চোপ্ রও সুলেমান!"

কাসেমের কণ্ঠস্বর বজ্রের মত ফাটিয়া পড়িল।

—"তোমার এত বড় দুঃসাহস! আমি বুঝতে পারছি যে, তোমাদের মত গুটিকয়েক লোকের জন্যই দিকে দিকে এমনভাবে ইস্‌লাম-বিরোধী কাজ সম্ভব হচ্ছে! ইহুদী ইউসুফ্-বিন্-ইব্রাহিম কথা দিয়েছিল যে আমাদের ব্যবসার শত্রু রঙ্গনাথন্‌কে সে ধরে দেবে যেমন করেই হোক্; কথা দিয়েছিল, সে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও অনেক কিছু উপহার পাঠিয়ে দেবে, বিনিময়ে আমরা তারই মারফৎ ভারতে আমাদের সোনা-চালানী ব্যবসা করে যাব। কিন্তু তা সে করলে না, একটা খবরও দিলে না! এত বড় দুঃসাহস তার কখনো হত না, যদি সে তোমাদের কোন গোপন ইঙ্গিত না পেতো—"

বাধা দিয়া সুলেমান কহিল, "হুজুর! আপনাকে আমরা পয়গম্বর ভেবে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। ইস্‌লাম-রাজ্য গড়ে তোলার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, তা সত্যি। কিন্তু তাই বলে কি আপনি যা-খুশী তাই করে যেতে পারেন, না তা সঙ্গত?"

কাসেম বুঝিলেন, সুলেমানের যুক্তি যেন উপস্থিত লোকজনের মুখেও ফুটিয়া উঠিতেছে! সুতরাং কৌশলী কাসেম তাহাতে বিদ্রোহের একটা গন্ধ অনুভব করিলেন। কাজেই, কথা আর বেশীদূর চলিতে না দিয়া, তখনই বিষয়ান্তরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন।

তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে মুসলমান ভাই সব! আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, একত্রে আহার করেছি, এবং বন্ধুত্বের রাখী বেঁধেছি। তার মাঝে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের নামে আমাদের পথ ও উদ্দেশ্য এক আদর্শে গড়ে তুলবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছি। আমরা বিবাদ করতে আসি নাই। কিন্তু তোমাদের যে

খৃষ্টান ও কাফেররা অপমান করেছে তাদের শাস্তি দেবার অবসর আমার নেই, কারণ আজকেই আমাকে অন্যত্র যেতে হবে। আমি থাকতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু খার্তুমে আমার অন্য কাজ আছে। কিছুদিনের মধ্যে আবার তোমাদের আহ্বান করবো।

আনন্দ কর, কারণ মিশরের অধীনতা-পাশ মুক্ত করবার দিন এসেছে। তোমাদের বহুদিনের দাসত্ব-গ্লানি ঘুচে যাবার দিন এসেছে। স্ফূর্তি কর। আমি আমার মতলব ঠিক করেছি। ভয় পেয়ো না।

এর মধ্যে শত্রুদের ধরবার ব্যবস্থা কর। আমি জানি, তারা পিরামিডের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে। তোমরা সবাই যাও। কেবল হালিদ থাকুক। সে পিরামিডের বন্দীদের পাহারা দেবে। আমি চাই যে, তাদের জীবিত কিংবা মৃত মাথা নিয়ে আমার কাছে আসবে। আল্লার নামে শুভ বিদায়!"

কাসেমের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবেরা চীৎকার করিয়া বলিল—"একমাত্র ভগবান ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের অন্য কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় নেই। আর কাসেম সেই ভগবৎ-প্রেরিত মানুষের ত্রাণকর্ত্তা। তার জয় হোক!"

কাসেমের অভিনন্দন শেষ হইল। আরবদের কণ্ঠধ্বনি প্রশমিত হইলে, কাসেম তাঁহার পার্শ্বচরকে হুকুম করিলেন—"আলিকে নিয়ে এস।"

কাসেমের হুকুম তামিল করিতে পার্শ্বচর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বন্দী অবস্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে আলি উপস্থিত হইল।

কাসেম একবার আলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আলি, এক শর্ত্তে তোমায় মুক্তি দিতে পারি; সেটা হচ্ছে এই যে, হালিদের সঙ্গে থেকে বন্দীদের পাহারা দিতে হবে। আর এতে যদি রাজী না হও, তা হলে হয় তোমার মাথা, নয় ঐ কাফেরদের মাথা—এ দুটোর একটা না পেলে আমার তৃপ্তি হবে না।"

বন্দী আর কোন উত্তর করিল না। মাথা নীচু করিয়া সম্মতি জানাইল। সভা ভঙ্গ হইল। দ্বিপ্রহরে কাসেম তাঁহার অনুচরবর্গ লইয়া মরূদ্যান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রভাত। পেড্রো আহত হইবার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। তাহার ক্ষতস্থানে ভাল করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়াছে। দায়ূদ সেই ঘূর্ণিত দরজার পাশে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। যাতায়াতের পথে পিরামিডের মধ্যে পদশব্দ শোনা যাইতেছে। কাসেমের পুরস্কারের লোভে গুপ্তঘাতকের দল তখনও বন্দীদের খুঁজিতেছিল।

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া শব্দ হইল। তাহার পর আবার চারিধার নিশ্চুপ হইয়া গেল। গোপন দরজার গোপনতা তাহারা জানিতে পারিল না। তথাপি সমস্ত দিন পলাতকের দল ভয়ে ভয়ে রহিল। অবশেষে বিলম্বিত দীর্ঘদিনের অবসান হইল। দিনের শেষ আলোক-রশ্মি লাল দালানের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। শ্রান্ত পলাতকের দল ঘুমাইয়া পড়িল।

রবিবারও বিশ্রামের মধ্যে অবসান হইল। বাহিরে মরূদ্যানে মুসলমানদের নামাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল। তাহারা কি এখনও মরূদ্যান পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই? পলাতকদের বন্দী করিবার আশায় এখনও তাহারা ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে! বিনা কাজের মধ্যে ভয়ে ও ঔৎসুক্যে দীর্ঘ প্রহরগুলি নিঃশেষিত হইল। আবার সোমবারের প্রভাত দেখা দিল। পূর্ব্বের জানালা দিয়া সোনার সূর্য্যালোক আসিয়া দায়ূদের চোখে পড়িল। সে চীৎকার করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। সেই শব্দে ডাক্তারের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া পিরামিডের সেই গোপন কক্ষের শ্বেত পাথরের কারুকার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

সেখানে বিচিত্র দেব-দেবীর মূর্ত্তি। অসিরিস, আইসিস এবং হোরাস্—প্রভৃতি মিশরের সমস্ত দেব-দেবীর মূর্ত্তি তাঁহার চোখে পড়িল। পিরামিডের এই প্রকাণ্ড দালানের মধ্যে সময়ের গতিবিধি যেন নিশ্চল হইয়া গিয়াছে! আজ প্রায় চার হাজার বৎসর পরে আইসিসের মন্দিরে আরবদের ভয়ে ভীত হইয়া কয়েকজন বিদেশী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ডাক্তার আর একবার মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার মনে হইল, বিদেশ-বিভূঁই মরূদ্যানে আজ এই দেবী ছাড়া আর কেউ বুঝি তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্রী নাই!

সেই প্রকাণ্ড ঘরের মূর্ত্তিগুলি সত্যই দেখিবার বস্তু। মূর্ত্তিগুলির কোনটির শৃগালের মত মাথা, আবার কোনটির ঠোঁট বকের মত। কোনটির আবার মেয়েদের মত মুখ, কিন্তু ষাঁড়ের মত কান। তাহারই মধ্যে আইসিসের প্রকা[ণ্ড] মূর্ত্তি! অনতিদূরের একটি অবগুণ্ঠনবতী মূর্ত্তির পদপ্রা[ন্তে] পেড্রো গুটিসুটি হইয়া শুইয়া আছে। জ্বরের জ্বালায় [সে] ছট্‌ফট্ করিতেছে! তাহার পার্শ্বে জনী এবং দায়ূদ নি[দ্রা] যাইতেছে। অন্যদিকে জুলিয়া নিদ্রামগ্ন।

চাঁদের শেষ ম্লান আলো নবাগত দিনের আলোর সহি[ত] মিশিয়া সুপ্ত জানালার মুখে আসিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। সেই আলোকে মনে হইতেছে যে কুমীরটি যেন মেবে

উপর চলিতে শুরু করিয়াছে আর শ্বেত পাথরের বিচিত্র মূর্ত্তিগুলি যেন নিদ্রিতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাদের শাসন করিতেছে! মাঝে মাঝে পেড্রোর আর্ত্ত চীৎকার শোনা যাইতেছে!

সমস্ত কক্ষ নিস্তব্ধ। কোথাও প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় না। কাজেই সেই সন্ধ্যালোকে নিদ্রিত মূর্ত্তিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, সেগুলি যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মমি! আর তাহাদের সকলের উপরে দেবী আইসিস্ যেন মৃত্যু-দেবতার মত দাঁড়াইয়া আছেন!

ডাক্তার অবগুণ্ঠনবতী মূর্ত্তিটির দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিলেন্। এবার তাঁহার চোখে পড়িল—মূর্ত্তিটির সরিধারে যেন উর্ণনাভের মত ব্রোঞ্জের সরু জাল! তাহার অন্তরালে যে কি রহস্য, কি বিভীষিকা লুকানো আছে, কে জানে?

ডাক্তার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন। বেদীর উপর পদার্পণ করিয়াই অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মন সম্ভ্রমে ভরিয়া গেল!

তাঁহার পদভারে পাথরের উপর চাপ পড়িতেই একটু মর্ম্মর আওয়াজ শোনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মূর্ত্তিটি কাঁপিয়া উঠিল।

সেই চাপে কি একটা কলকব্জা সক্রিয় হইয়া উঠিল, ফলে সেই মূর্ত্তিটির বাহু দুইটি কাঁপিয়া উঠিল, এবং এক নিমেষে অবগুণ্ঠনটি সরিয়া গেল।

ডাক্তারের মনে হইল, দেবীর বাহু দুইটি যেন প্রসারিত হইয়া তাঁহাকে দৃঢ়-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইতেছে! তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে সভয়ে পিছাইয়া আসিলেন ও চোখের নিমেষে বেদী হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন।

দেবীর আশে-পাশে ধাতু-নির্ম্মিত কয়েকটি বিরাট পদ্মফুল পড়িয়াছিল। ডাক্তার লাফাইয়া পড়িলেন তাহাদেরই একটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ভয়াবহ ব্যাপারে ভীত হইয়া ডাক্তার পেরেইরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

দেবী আইসিসের বিরাট প্রসারিত বাহু দুইটি নিশ্চল হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল; কিন্তু সহসা তাঁহার উদরের একটা অংশ বিরাট গহ্বরের ন্যায় উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং একটা মানুষের প্রাণহীন নিষ্পিষ্ট দেহ তাহা হইতে সশব্দে বেগে বাহির হইয়া ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

এগারো

ডাক্তার পেরেইরার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া জুলিয়া, জনী ও দায়ূদ সেখানে ছুটিয়া আসিল। আসিতে পারিল না শুধু পেড্রো। কারণ, আরব-দস্যুদের বন্দুকের গুলিতে আহত হওয়ায় তাহার তখন আর নড়িবার ক্ষমতা ছিল না।

সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলেই দেখিল, এক বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় ব্যক্তির নিষ্পিষ্ট অসাড় দেহ বেদীর নীচে ভূমিতলে পড়িয়া আছে, ডাক্তার পেরেইরা ভীত ও বিস্মিতভাবে সেদিকে নির্ব্বাক্ হইয়া তাকাইয়া আছেন! প্রচণ্ড নিষ্পেষণের ফলে লোকটির নাকমুখ দিয়া যে রক্তধারা বাহির হইয়াছিল, তাহা শুষ্ক জমাট হইয়া লোকটির সারা দেহে তখনও লাগিয়া রহিয়াছে।

জুলিয়া লোকটিকে এক মুহূর্ত্ত দেখিয়াই চীৎকার করিয়া কহিল, "মাষ্টার জনী, এই সেই লোক!"

জনী সবিস্ময়ে কহিল, "কোন্ লোক জুলিয়া?"

—"ইহুদী ইউসুফ্-বিন্-ইব্রাহিম যার সঙ্গে আমাকে এই মরুভূমিতে নির্ব্বাসিত করেছিল, আমাকে কোন্ এক সম্রাটের হাতে তুলে দেবে বলে!"

ডাঃ পেরেইরার যেন এতক্ষণে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি কহিলেন, "তারপর? সে হঠাৎ অদৃশ্য হলো কেমন করে

আর রক্ষা নাই!

জুলিয়া?"

জুলিয়া কহিল, "সে তো জানি না ডাক্তার! এর সঙ্গে আরো কয়েকজন অনুচর ছিল। কিন্তু এখানে পৌঁছে সে অন্যান্য লোকজন বিদায় দিয়ে আমাকে একাই পাহারা দিতে থাকে, আর সেই সময় ছুতোনাতা একটা কিছু পেলেই সে আমাকে মারধোর করতো ও গালি-গালাজ করতো!

অতি কষ্টেই আমার দিন যাচ্ছিল; তাই যেমন করেই হোক্ পালাতে হবে এই সঙ্কল্প করে, আমি সুযোগ পেলেই পিরামিডের এখানে সেখানে ঘুরে পালাবার রাস্তা খুঁজতাম। এমনিভাবে, কেমন করে আমি পিরামিডের এক গোলকধাঁধার ভিতর এসে পড়ি। তারপর কয়েকদিন নানা চেষ্টার পর অবশেষে একদিন সেই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসি বটে, কিন্তু বেরিয়ে এসেই বুঝতে পারলুম, এই সুবিস্তৃত মরুভূমির ভেতর আমি সম্পূর্ণ একা! যে আমাকে পাহারা দিচ্ছিল, কোথায় সে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

আমার তখন থেকে বড্ডই ভয় করছিল মাষ্টার জনী! কারণ, মারধোর করুক্ বা গালি-গালাজ করুক্, তবু একটা লোক আমার সাথে ছিল তো! কিন্তু জনপ্রাণী একটাও কিছু না দেখলে কি মানুষ বাঁচতে পারে? এমনি অবস্থায় হঠাৎ একদিন তোমাদের দেখা পেলুম, আর তারপর যা ঘটেছে, সে তো ভালরূপেই জানো!"

ডাক্তার ইতোমধ্যে লোকটির পোষাক-পরিচ্ছদ ঘাঁটিয়া তন্ন-তন্ন অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সহসা তাহার কুর্ত্তার এক পকেট হইতে কতকগুলি কাগজপত্র বাহির হইয়া পড়িল। ডাক্তার মনোযোগের সহিত তাহা পড়িতে লাগিলেন—অন্য সকলে নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া তাঁহার কাজ দেখিতেছিল।

প্রায় আধঘন্টা এমনিভাবে কাটিয়া গেল, অবশেষে ডাক্তার বেশ উৎফুল্লভাবে সোজা হইয়া বসিলেন ও কহিলেন, "দায়ূদ! জনী! জুলিয়া! এতক্ষণে আমি এর রহস্যের সমাধান করতে পেরেছি!

এই লোকটাই যে ছিল জুলিয়ার পাহারায়, সে কথা খুবই সত্যি! কিন্তু জুলিয়া গোলকধাঁধার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলে এর তখন খুবই ভয় হয়। কাসেমকে সে কি কৈফিয়ৎ দেবে এই ভেবে সে তখন দিনরাত জুলিয়াকে খুঁজে বেড়িয়েছে। এই শোনো তার ডায়েরীর গুটি-কয়েক পাতা।"

ডাক্তার পেরেইরা বহু ভাষাভাষী—আরবী ভাষাও তিনি ভালই জানিতেন। লোকটার পকেটে যে ডায়েরী ছিল, মাঝে মাঝে তাহা হইতে পড়িতে লাগিলেন।—

"আশ্চর্য্য, মেয়েটা গেলো কোথায়? খুঁজছি সারা দিন-রাত, কিন্তু তার দেখাই নেই! উবে গেলো একদম্ কর্পূরের মতো! মেয়েটা কি পরী না ভূত?

* * *

ভারী মুস্কিল হলো তো! কাসেমকে উপহার দে জন্য যে ক্রীতদাসী পাঠানো হবে, তা যদি তাকে বুঝি দিতে না পারি, তাহলে সে আমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়া হে আল্লা, এ তুমি কী করলে?

* * *

ইহুদী ব্যাটা তো আমার কাঁধে দায়িত্ব চাপিয়েই খা হয়ে যাবে। সত্যিই তো, আমার মারফৎ জিনিসপত্র মেয়েটাকে পাঠিয়েছিল। দায়িত্ব আমারই তো! তা অ এড়াবো কেমন করে?

* * *

এত টাকা ঐ ইহুদীটার, তবু তার লোভ কত! ব একচেটিয়া সোনার ব্যবসা করতে চায়! সেই অধিকার পাওয়ার জন্য কাসেমকে সে অনেক টাকা-কড়ি, অস্ত্র- আর সেই মেয়েটাকে উপহার দেবে এই হয়েছে চু কাসেম তো সেই আনন্দে মশগুল হয়ে আছে—বো পূর্ণিমার রাত কবে, তাই গুনে যাচ্ছে! কিন্তু এদিকে আ যে সর্ব্বনাশ! মেয়েটা গেলো কোথায়?

* * *

হে আল্লা! ইহুদী ব্যাটার কি সাজা হবে না কোনদি কত বড় পাপী সে। বোম্বাইয়ের কাষ্টমস্-অফিসার রঙ্গন আমাদের কাসেমের ব্যবসা প্রায় নষ্টই করে ফেলে তার দাপটে এখন আর কোন আরবই বোম্বাইয়ে গো সোনা নিয়ে যেতে পারে না। ইহুদী বলেছিল, সে ত ধরিয়ে দেবে কিন্তু তাকে ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার দি হবে। কাসেম তাতেই রাজী হয়েছিল। এমনি সময় জৈদের মারফৎ আলি, ডাঃ পেরেইরা নামে এক মাদ্রাজী গ্রেপ্তার করেছে, আর তাকেই রঙ্গনাথন্ বলে অনেক টা বিনিময়ে ইহুদীর কাছে বিক্রী করেছে। ইহুদী আ আত্মহারা হয়ে কাসেমকে জানিয়ে দিয়েছে যে, রঙ্গন ধরা পড়েছে। কাসেমও মহা খুশী হয়ে জানিয়ে দিয়ে 'বেশ, ব্যবসার অধিকার তোমায় দেওয়া হবে, কিন্তু আম এই এই জিনিস দিতে হবে।'

বেচারা জিনিস তো সংগ্রহ করেছিল! কিন্তু এর ম শয়তান আলি, ইহুদী ব্যাটাকে আবার একটু শিক্ষা দিয়ে সে বলেছে, 'আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা না দিলে জানিয়ে দেবো যে, এ লোক আসল রঙ্গনাথন্ নয়, নাম ডাঃ পেরেইরা।'

ইহুদী ব্যাটা তাই বড় বিপদেই পড়েছে! ওর অ

কতকগুলো টাকা নষ্ট হবেই। তবু তার ভয়, কি জানি যদিই বা শেষ মুহূর্ত্তে কথাটা প্রকাশ হয়! ব্যাটা তাই নিজে না এসে আমাকে দিয়ে উপহারগুলো পাঠিয়েছে। কিন্তু মেয়েটা পালিয়ে যাওয়ায় আমি যে কী বিপদেই পড়েছি!

* * *

হ্যাঁ, আলির বুদ্ধি আছে বটে! সে একবার রঙ্গনাথন্ বলে ডাক্তার পেরেইরাকে বেচে কিছু টাকা আদায় করেছে। আবার বন্দী যে আসল রঙ্গনাথন্ নয়, সে-কথা বলে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে আরো কিছু আদায়ের ফন্দী করেছে!

কেবল কি তাই? ডাক্তার পেরেইরার কাছে নাকি আলি কবে কাজ করেছিল! কিন্তু চুরির অপরাধে ডাক্তার তাকে বরখাস্ত করেন। আলি এবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রতিশোধ নিয়েছে। মানে এক ঢিলে দু'পাখী বধ করেছে আলি! কিন্তু আলির শয়তানী বুদ্ধির ফলে একটা নিরীহ লোক আজ মরতে বসেছে! খোদা কি আলিরও কোন সাজা দেবেন না?

* * *

হে আল্লা, এ তুমি কি করলে? মেয়েটার যে কোন খোঁজই পেলাম না! পিরামিডের বাইরে খুঁজেছি, ভেতরেও কত জায়গাই খুঁজলাম!

আচ্ছা, পিরামিডের মধ্যে ঐ বিরাট মূর্ত্তিটা কার? দেবী আইসিস্ বলে নাম লেখা রয়েছে! কিন্তু দেবীর মুখ ঘোমটায় ঢাকা কেন? এমন তো কখনো শুনতে পাইনি! দেখবো একদিন ঘোমটা খুলে? উঃ, কী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি! কিন্তু কাছে যেতেই বুকটা কেমন যেন একটা ভয়ে কেঁপে ওঠে! বেদীর ওপরেও কোথায় যেন কি একটা কৌশল করা আছে! কয়েক সেকেণ্ড পা রেখে দাঁড়াতেই কেমন কচ্-কচ্ শব্দ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল মূর্ত্তির হাত দুটোও যেন নড়েচড়ে উঠলো!—ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছি!

বাপ্‌স্, এ যেন একটা ভীষণ আতঙ্ক! দেখবো একদিন ঘোমটা খুলে আর শেষ পর্য্যন্ত বেদীর ঐখানটায় দাঁড়িয়ে থেকে? কি আর হবে?"

ডাক্তার পেরেইরা আর বেশী পড়িলেন না! এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই তিনি কহিলেন, "জুলিয়া! তাহলে এখন কি তুমি বুঝতে পারছ না যে লোকটা কেমন করে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল?

সে নিশ্চয়ই তার কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে দেবী আইসিসের ঘোমটা খুলতে গিয়েছিল বা অন্য কোন ভাবে তার কৌতূহল মিটাতে গিয়েছিল। কিন্তু দেখছই তো পিরামিডের প্রত্যেকটি জিনিসে ও প্রত্যেকটি স্থানেই কত রহস্য লুকানো আছে!

এর গোলকধাঁধা, পথঘাট, এর নকল কুমীর ও এখানে-সেখানে দৈত্যমূর্ত্তি—সব কিছু মিলে এই পিরামিডকে যেন অনন্ত রহস্যের খনি তৈরী করে রেখেছে! সম্ভবতঃ সবগুলো পিরামিডেই এম্‌নি ধারা অসংখ্য রহস্য বর্ত্তমান। দেবী আইসিসের মূর্ত্তির ভেতরেও যে কী রহস্য গোপন আছে, তা কে জানে? বেদীর ওপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কচ্‌কচ্ শব্দ হয়, তার হাত দুটো প্রসারিত হয়। আর দেখলে তো, তার আশে-পাশে ঐ পদ্মফুলগুলোর বিশেষ কোন একটিতে আমি লাফিয়ে পড়তেই, আমার পায়ের চাপে কি কাণ্ডই না হয়ে গেলো! একটা মানুষের মরা দেহ কেমন সহসা বেরিয়ে এলো—যেন এক ভৌতিক কাণ্ড! লোকটা যে কেমন করে দেবী আইসিসের পেটের ভেতর আটকে গিয়ে প্রবল নিষ্পেষণে মারা গেছে, সে এক গভীর রহস্য!

যাহোক্, এখন তাহলে আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে খুবই সাবধানে থাকা। যেখানে যা কিছু দেখি না কেন, তাতে বেশী কৌতূহল হওয়া সঙ্গত নয়। কারণ, কৌতূহল মেটানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টাই খুব বেশী বিপদের—"

সহসা পেড্রোর আর্ত্তনাদে সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। মহা সন্ত্রস্তভাবে তাহারা তৎক্ষণাৎ আহত পেড্রোর কক্ষে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বারো

—"তুমি হয়তো ভুল দেখেছ পেড্রো!" ডাক্তার পেরেইরা বলিলেন।

পেড্রো প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "না সাহেব, আমি উঠতে না পারলেও মাথা আমার খারাপ হয়নি, চোখও আমার খারাপ নয়। দেখেছি আমি ঠিকই। আর যা দেখেছি, সে কখনো মানুষ নয়, নিশ্চয়ই ভূত।"

ঠিক ভূত না হইলেও পেড্রো যে একটা কিছু দেখিয়াছে, এ বিশ্বাস হইল সকলেরই, কিন্তু কি সে দেখিতে পারে? সকলে মিলিয়া যখন দেবী আইসিসের মূর্ত্তির কাছে বসিয়া নানা আলোচনা করিতেছিল, আর ডাক্তার যখন জুলিয়ার রক্ষক সৈন্যটির গোপন ডায়েরী পড়িতেছিলেন, সেই অবসরে কাসেমের দলবল কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

বাহিরে তখন আর কোন সাড়াশব্দ ছিল না—চারিধার নিস্তব্ধ। কাজেই এই নির্জ্জন পুরীতে এমন বীভৎস ভয়ঙ্কর

বেশে কে আর তখন পেড্রোকে দেখা দিতে আসিবে? তবু একমাত্র জুলিয়াকে পেড্রোর সেবা-শুশ্রূষার জন্য রাখিয়া বিষয়টির অনুসন্ধানের জন্য সকলেই বাহির হইয়া গেল।

নাঃ, কোথাও কিচ্ছু নাই! পিরামিড সম্পূর্ণ নির্জ্জন। সকলেই ফিরিয়া আসিল।

জনী আনন্দিত কণ্ঠে বলিল—"বাবা, আর কোন ভয় নেই। বিপদের আশঙ্কা চলে গেছে। একজন আরবও আর মরূদ্যানে নেই।"

সত্যই মরূদ্যানের কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই। উত্তর-পূর্ব্বে শুধু বালি আর বালি! দক্ষিণের জানালা হইতে মরূদ্যানের একাংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সেখানে কোন জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন নাই—উৎসব-শেষের পরিত্যক্ত গৃহের ন্যায় সে মরূদ্যান নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ। কেবলমাত্র খেজুর গাছের সবুজ পাতার ছায়া পুকুরের জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। মাঝ-রাত্রে আলি ও হালিদ তাঁবু গুটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। কেবল গুল্মবনের সন্নিকটে সদ্য-কর্ত্তিত কবর-স্থান বহু মানবের আগমনের সাক্ষ্য দিতেছে।

সেদিকে লক্ষ্য করিয়া ডাক্তার মন্তব্য করিলেন, "দেখো, আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে! আরবেরা চলে গিয়েছে কিনা বলা কঠিন। দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে তারা মরূদ্যান ত্যাগ করে চলে গিয়েছে, কিন্তু এমন তো হতে পারে যে, তারা হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে শিকারের আশায়,—যেভাবে ইঁদুরের গর্ত্তের কাছে বিড়াল লুকিয়ে থাকে—ঠিক সেইভাবে!"

প্রত্যুত্তরে জনী বলিল—"না বাবা, তারা নিশ্চয়ই চলে গিয়েছে। মরুভূমির কোথাও নেই! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মরূদ্যানে কেউ নেই।"

ডাক্তার সে কথার কোন জবাব না দিয়া যন্ত্রণা-কাতর পেড্রোকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নেই পেড্রো, দু'-এক দিনের মধ্যেই তোমার হাত সেরে যাবে। সামান্য একটু আঘাত কি তোমায় কাবু করতে পারে? বিপদ কেটে গেছে—আরবেরা পালিয়েছে।"

পেড্রো কোন উত্তর করিল না।

কিন্তু উত্তর আসিল দায়ূদের নিকট হইতে—"ডাক্তার সাহেব, আপনার অনুমান ঠিক নয়। কাসেম চলে গিয়েছে একথা ঠিক; কিন্তু প্রতিহিংসার সহোদর আলি চলে গিয়েছে বলে মনে হয় না। সে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে।"

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার বলিলেন—"সত্য বলতে কি, আমারও সন্দেহ হচ্ছে বটে।"

জনী এবারে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"সন্দেহ হচ্ছে কেন? আমার তো বিশ্বাস, নিশ্চয় তারা চ[...] গিয়েছে।"

গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্তার জবাব দিলেন—"অত নিশ্চি[...] হয়ো না। তাড়াতাড়ি করবার কোন দরকার নেই। কার[...] তাড়াতাড়ি করে লাভ কি? আর এই মরূদ্যান থে[...] লোকালয়ে ফিরে যাবেই বা কেমন করে? সংখ্যায় আম[...] পাঁচজন কিন্তু আমাদের উট মাত্র দুটি। কাজেই পরিত্রা[...] অন্য কোন পথ নেই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য—যে [...] দুটো আছে, তাদের খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা। চ[...] একবার গোলকধাঁধার পথে গিয়ে তাদের দেখে আসি[...] বাইরের অবস্থাও তাহলে খানিকটা চোখে পড়বে। আমা[...] উট দুটোকে নিশ্চয় ওরা দেখে থাকবে! কে জানে সেখা[...] ওরা কোন ওৎ পেতে আছে কিনা! কাজেই সাবধা[...] প্রস্তুত হয়ে সঙ্গে বন্দুক নিয়ে যেতে হবে।"

ডাক্তারের কথামত তাহারা সকলেই দালান পার হই[...] দেওয়ালের ঘোরানো গুপ্ত দরজা দিয়া গুহার মধ্যে প্র[...] করিল।

তাহারা সাবধানে একবার চারিদিক দেখিয়া লই[...] অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মনুষ্যাগমনের শব্দ শুনিবার চে[...] করিল; কিন্তু কোথাও কোন শব্দ নাই, কেবল স্ফটিকে[...] উপর জল পড়িয়া টপ্ টপ্ করিয়া শব্দ হইতেছিল—[...] কোন শব্দ শোনা যায় না।

সেই গোলকধাঁধা পথের অন্ধকারে স্ফটিকের দ্যু[...] আসিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার একদৃষ্টে সেই স্ফটিকের পা[...] চাহিয়া রহিলেন।

জনী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দায়ূদকে বলিল—"এই প[...] এস দায়ূদ!"

এই বলিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া নিজে সাবধানে গুহ[...] মধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ডাক্তার জনী[...] বললেন—"এক মিনিট অপেক্ষা কর জনী, স্ফটিক[...] একবার পরীক্ষা করে দেখি।"

জনী বলিল—"স্ফটিক তো? না আর কিছু?"

কাপ্তেন এবারে আর কোন উত্তর করিলে[...] না—দ্রুতপদে তারকাকৃতি পুকুরের কাছে আসিয়া উপ[...] হইলেন। তাহার পর প্রস্তর-স্তম্ভে পা দিয়া উপরে উ[...] স্ফটিকটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরীক্ষা শেষ হইলে ডাক্তার চাপাকণ্ঠে মন্তব্য কর[...] বলিলেন—"জনী, এটা একখণ্ড আসল হীরে, য[...] ভালভাবে কাটা হয়নি, তবুও এটা একটা হীরে ছাড়া [...]

কিছুই নয়।”

—“হীরে? বাবু, আপনি ঠিক বলছেন?”

দায়ূদও ডাক্তারকে অভিনন্দিত করিয়া মন্তব্য করিল—“তোমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ! ওটা তোমার প্রাপ্য; কারণ, তুমিই ওটাকে আবিষ্কার করেছ।”

এবারে জনী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—“না, ওটা জুলিয়ার; কারণ সেই আগে দেখেছে।”

ডাক্তার এবার উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন—“তাহলে তুমি ওর সঙ্গে ভাগ করে নাও। কারণ, জুলিয়া দেখেছে আর তুমি আবিষ্কার করেছ। কিন্তু কথাটা আমি না বল্লে তোমরা জানতে পারতে না যে ওটা একটা আসল হীরে। সে যা'হোক, এর অর্দ্ধেকের দামই হবে ২০ হাজার পাউণ্ড!”

ডাক্তারের কথা শুনিয়া লোভে দায়ূদের দুই চোখ জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল। সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—“পেড়ে আনবো নাকি?”

তাহার কথায় বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন—“না, এখন থাক। যাবার সময় নিয়ে গেলেই হবে।”

তাহার পর জনীকে অনুসরণ করিয়া সকলে মিলিয়া গুহা ছাড়িয়া সাবধানে অন্য পথে অগ্রসর হইল।

কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই, কোন শব্দ পর্য্যন্ত নাই—তাহারা নির্ভয়ে অথচ সাবধানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

সদর পথ যেখানে আসিয়া গ্যালারীর সহিত যুক্ত হইয়াছে, সেখানে উটগুলিকে রাখা হইয়াছে। জনী উটগুলির সন্নিকটে আসিয়া বলিল—“উটগুলি ঠিক আছে। তাদের চলাফেরার শব্দ শোনা যাচ্ছে।”

জনীর কথা শেষ হইতে না হইতে অকস্মাৎ গোলকধাঁধার পথে বন্দুক-গর্জ্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে জনী চীৎকার করিয়া উঠিল—“আরব-দস্যু!”

তাহার চীৎকার শুনিয়া আবার সেই পথে তিনজনে প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে শুনিবার জন্য প্রথমে একবার তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর যেদিকে পাথর স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে, সেই দিকে শব্দ শুনিয়া আবার তাহারা অপর দিকে দৌড়াইতে শুরু করিল। ক্রমে সেই শব্দ কাছে আসিয়া পড়িল। ডাক্তার এবার উত্তেজিতকণ্ঠে আদেশ করিলেন—“আর রক্ষা নেই,

দেবীর বাহু দুটি বিস্তৃত হইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

গুলি চালাও।”

সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ডাক্তারের আদেশ তামিল করিল। তিনটি বন্দুক একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বন্দুকের আলোয় শত্রুর সাদা পোষাক দেখা গেল। হঠাৎ আর্ত্ত চীৎকার করিয়া একজন আরব মাটিতে পড়িয়া গেল।

দায়ূদ দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভয়ার্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—“বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে ডাক্তার, আর রক্ষা নেই! আমার দোষেই সব গেল! আমি সম্মুখের দরজা খুলে রেখে চলে এসেছি।”—এই কথা শেষ হইতে না হইতে তাহারা আবার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

কক্ষের একধারে জুলিয়া বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিল! বাহিরের ঘটনা-বৃত্তান্ত সে কিছুই জানিত না। তথাপি তাহার মন কেন যে অনাগত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেছিল—তাহা কে জানে? দালানের একধারে পেড্রো শুইয়া আছে। সে নির্ভয়ে ঘুমাইতেছে। যখন জনী, ডাক্তার ও দায়ূদ উট দুইটিকে খাওয়াইতে যায়, তখন পেড্রো জাগিয়াই ছিল। কিন্তু এখন সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে সে জাগিয়া উঠিল। ভয়ে

জুলিয়া ও পেড্রো দুইজনেই চীৎকার করিয়া উঠিল ; কারণ, ইতিমধ্যে হালিদ ও আলি দালানের সেতুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জুলিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে পেড্রো! দুটো আরব-দস্যু ঐ দেখ, আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে!

চল, শীগ্‌গির চল, আমাকে ধরে ধরে দেবী আইসিসের ঘরেই চল। সে ঘরটা তবু বড় আছে, শক্তও বটে। সেখানে যাওয়ার গুপ্তপথ আমি জানি। ওঠ, ওঠ শীগ্‌গির বন্দুকটা নিয়ে চল।"

ভয়ে পেড্রোর বুঝি কথা সরিল না! সে কলের পুতুলের মত জুলিয়ার আদেশ পালন করিল!

বুঝিতে কাহারও বাকি ছিল না যে, মরূদ্যান হইতে চলিয়া যাওয়া আরবদের একটি ছল মাত্র। গুহার মধ্যে লুকাইয়া হালিদ ও আলি শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। আলি প্রথমেই উটের আস্তাবল ও গুহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ভাবিয়াছিল যে, এখনই হউক বা পরে হউক, পলাতকের দল উটগুলিকে খাওয়াইতে আসিবেই। সেই সুযোগে তাহাদের আক্রমণ করিয়া বন্দী করা সহজ হইবে। কাজেই তাহারা সঙ্গোপনে অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছিল—শিকারের আশায়।

ইতিমধ্যে সুযোগও মিলিয়া গেল। সুচতুর আলি সেই সুযোগ বুঝিয়া পিরামিডের গোপন কক্ষে সকলের অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সেই গোপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে আপন উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া অবলোকন করিতেছিল—অতীত যুগের ভাস্কর্য্য-সৌন্দর্য্য! ঠিক সেই সময়ে হীরক পরীক্ষা-নিরত ডাক্তারকে দেখিয়াই আলির কল্পনার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। আবার সেই সঙ্কল্পের কথা তাহার মনে পড়িল। সে বার দুই বন্দুক তুলিয়া ধরিল, গুলি করিতে উদ্যত হইল।

বন্দুক তুলিয়া একবার ভাবিল যে সে ডাক্তারকে হত্যা করিবে; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল যে, জীবিত অবস্থায় কাসেমের কাছে লইয়া যাইতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার পাওয়া যাইবে—সে আবার কাসেমের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিবে। এই কথা চিন্তা করিয়া তাহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। জনী, ডাক্তার ও দায়ূদ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে বন্দুকের শব্দে সঙ্কেত-ধ্বনি করিয়া সঙ্গীদের জানাইয়া দিল এবং হালিদের সঙ্গে সেই ঘুরানো দরজা দিয়া পিরামিডে প্রবেশ করিল।

তাহারা ক্রমে সিঁড়ি দিয়া বড় প্রকোষ্ঠের সন্নিহিত ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই তাহাদের কেমন একটা ভয় ভয় করিতে লাগিল! একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিয়া আবার তাহারা থামিল। এই সব আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই হঠাৎ পাশের বড় ঘরে আইসিসের মূর্ত্তির কাছে জুলিয়া ও পেড্রোকে দেখিয়া তাহারা ভয়বিহ্বল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। আলি আগে ও তাহার পিছনে হালিদ—টলিতে টলিতে কোনক্রমে পাথরের সেতু পার হইল। পেড্রো এবারে ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে বেদীর উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আলি এবার পেড্রোকে চিনিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"ওদের খুন কর।"

জুলিয়াও এবার নিজের বিপদ বুঝিতে পারিল। সে গত্যন্তর না দেখিয়া পেড্রোর বন্দুক তুলিয়া লইল এবং হালিদের জঙ্ঘা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক হস্তে প্রস্তুত হইল। ঠিক সেই সময়ে ডাক্তার ও দায়ূদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের আগমনের সঙ্গেই যুগপৎ দুইটি বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

হালিদ জুলিয়ার দিকে আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ডাক্তারের গুলি তাহার পাঁজর ও জুলিয়ার গুলি তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিল। মাটি হইতে হালিদের দেহ জলে গড়াইয়া পড়িল।

ঝুপ্‌ করিয়া একটি শব্দ হইল—তাজা খুনে জলাশয়ের জল আরক্ত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভারে কোথায় কি ঘটিয়া গেল! অকস্মাৎ প্রবল জলোচ্ছ্বাসে তাহার দেহ কোথায় ভাসিয়া গেল কে জানে?

বন্দুকের শব্দ এবং হালিদের আর্ত্তরব কানে আসিয়া পৌঁছিতেই আলি সচকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে পেড্রোকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত ছোরা হস্তে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—পেড্রো ও জুলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

কচ্‌ কচ্‌ কচ্‌! পেড্রো ও আলির পদভারে দেবী আইসিসের বেদীমূলে কিসের শব্দ শুরু হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবীর বাহু দুটি বিস্তৃত হইয়া একবার একটু বাঁকিয়া গেল, তাহার পর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল এবং পরক্ষণেই পেড্রোর উপর হইতে আলিকে শূন্যে তুলিয়া লইল, অবশেষে আলিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিল।

সহসা মূর্ত্তিটির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িল এবং তাহার দেহাভ্যন্তরে হতভাগা আলির শেষ আর্ত্ত ক্রন্দন শোনা

গেল! সেই লৌহ-মূর্ত্তির নিদারুণ নিষ্পেষণে আলির দেহাস্থি চূর্ণ হইয়া গেল—আর শুধু একটিবার মাত্র হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উঠিল, তাহার পর সেই আইসিসের মূর্ত্তি পুনরায় চিরতরে স্থির হইয়া গেল!

অন্যান্য আরব-দস্যুরা যেন এতক্ষণ এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল! কিন্তু তাহারা কিছুমাত্র চিন্তা করিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার পেরেইরা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ কর—বাঁচতে চাও তো আমার কথা শোন। নইলে সকলকেই মরতে হবে। তোমাদের সর্দ্দারও মারা গিয়েছে; তোমরা এখন আমাদের বন্দী। সুতরাং আমার আদেশ অনুযায়ী কাজ কর। দেবতার রোষে তোমাদের সর্দ্দার কিভাবে প্রাণ হারালো দেখ্‌লে তো? এখন পরাজিত বন্দীর মত আত্মসমর্পণ কর, নইলে অমনিভাবে তোমাদেরও মরতে হবে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে বন্দুক, বর্শা, ছুরি প্রভৃতি যাবতীয় অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আরব-দস্যুরা ডাক্তারের পদলেহন করিয়া সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

উপসংহার

দুই দিন পরে।

দলবল লইয়া ডাক্তার পেরেইরা নীলনদের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। নিরস্ত্র আরব-দস্যুরা মুক্তিলাভ করিয়াছে। আলি, হালিদ ও অপর যে আরবটি নিহত হইয়াছিল, তাহাদের উটগুলি ডাক্তার ও দায়ূদের কাজে লাগিয়াছে। ইহুদীদের প্রেরিত অর্থ এবং হীরকখণ্ড ডাক্তার গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন সেই হীরক-খণ্ড বিক্রয়ের জন্য কাইরো হইয়া তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এতদিন পরে ডাক্তার আজ একথাও স্বীকার করিলেন, তাঁহার অভিযানের মূল কারণ এই হীরকের আকর্ষণ।

কিছুকাল আগে একখানি প্রাচীন আরবী পুঁথি পড়িয়া তিনি এইটুকু শুধু জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আফ্রিকার কোন জলাশয়ে পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ হীরকখণ্ড আজও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। তাই তিনি মরূদ্যানগুলি পরীক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিলেন, এবং সেই কারণেই নিকটবর্ত্তী অপর এক মরূদ্যানের সন্ধান-লাভের আশায় তিনি জনী ও পেড্রোকে ফেলিয়া সহসা অপর এক মরূদ্যানের উদ্দেশে বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু একবার বাহির হইয়া আসিবার পর তিনি আর ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই, শত্রুহস্তে বন্দী হন।

তিনি বলিলেন, "প্রাচীন পুঁথির 'জলাশয়' শব্দে আমি মরূদ্যানের জলাশয় অর্থাৎ নদী-নালা বলেই বুঝেছিলাম। কিন্তু তা যে কোন পিরামিডের অন্তর্গত মানুষের তৈরী জলাশয়ও হতে পারে, সে ধারণা আমার একেবারেই হয়নি; আমি তাই মরুভূমির কোথায় কোন্ খাল-বিল আছে, তারই অনুসন্ধান করছিলাম।"

কাইরো যাত্রার তাঁহার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, জুলিয়ার পিতার দোকান ও দোকানটি যে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল সেই ইউসুফ্-বিন্-ইব্রাহিম সম্পর্কে কোন বন্দোবস্ত করা যায় কিনা তাহারও একটু চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। কারণ, জুলিয়ার জন্য ইহারই মধ্যে তাঁহার খুব মমতা হইয়াছিল। তিনি তাহার লুপ্ত ঐশ্বর্য্য ফিরাইয়া আনিবেন ইহাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। তাহা ছাড়া, সেখান হইতে জুলিয়াকে তাহার স্বদেশে পাঠাইবার অভিপ্রায়ও ডাক্তার প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। তাঁহার মনে হইল,—পিরামিডের সেই ঘূর্ণায়মান দরজা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! না জানি কত শতাব্দীর ঘুম-ঘোরে সে রহস্য সমাচ্ছন্ন রহিবে!

তাঁহার মনে হইল, হয়তো পরবর্ত্তী কালে আরও কত ভ্রমণকারীর দল সেই মরূদ্যানে আসিয়া আস্তানা গাড়িবে। এমন কি, গুপ্ত কক্ষের একান্ত পার্শ্বের সেই ছোট ঘরটিতে তাহারা ঘুমাইয়া থাকিবেও কত রাত্রি, তথাপি সেই কক্ষের গোপন রহস্য তাহারা ভেদ করিতে পারিবে না!

সভ্যতার ক্রমোন্নতির যুগে হয় তো লিবিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ জ্ঞানের আলোয় ভাস্বর হইয়া উঠিবে, কিন্তু সেই পিরামিডের অপূর্ব্ব রহস্যের সমাধান করিতে কেহ পারিবে কি? প্রতিহিংসাপরায়ণ আলির শবদেহ বুকে করিয়া দেবী আইসিসের প্রস্তরমূর্ত্তি না জানি কত শতাব্দী ঘুমন্ত রহিবে, তাই বা কে জানে?

ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সেই মরু-যাত্রীদল নিরাপদে মরুভূমি অতিক্রম করিয়া চলিল। ক্রমে তাহারা গাইড্-পোষ্ট পার হইয়া পশ্চিম-মরূদ্যানে উপনীত হইল। তারপর ইজ্‌নি হইতে নৌকা-যোগে তাহারা কাইরো-অভিমুখে যাত্রা করিল।

অবশেষে একদিন যখন তাহারা কাইরো সহরে আসিয়া পৌঁছিল, সহরের প্রবেশ-পথে তখন এক বিরাট শবযাত্রার মিছিল চলিয়াছে! সেই জন-সমুদ্রের এক পাশে আগন্তুকরা থমকিয়া দাঁড়াইল।

—"এ কার শবযাত্রা?" শববাহীদের একজনকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন।

—"ইউসুফ্-বিন্-ইব্রাহিম—এক ইহুদীর।" শববাহী-

দের একজন প্রত্যুত্তর করিল।

ইহুদীর নাম শুনিয়া জনীর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল!

লোকমুখে আরও শোনা গেল যে, ইউসুফ্-বিন-ইব্রাহিমের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহার নিকট হইতে কোন উপহার না পাওয়ায় ও সভাস্থলে বিনা-কারণে সে উপস্থিত না হওয়ায়, কাসেম খুবই উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাহার প্রাণনাশের হুকুম দিয়াছিলেন।

ইব্রাহিম সমস্ত দোষ আলির কাঁধে চাপাইয়া টাকার জন্য তাহার পীড়ন হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু কাসেমের নিয়োজিত গুপ্তঘাতক কাসেমের আদেশ পালন করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করে নাই,—ইউসুফ্-বিন্-ইব্রাহিম একদিন খুন হইয়া গেল।

ওদিকে অন্যান্য আরব-সর্দ্দাররা যখন জানিল যে, কাসেম একজন বিধর্ম্মী ইহুদীকে একমাত্র অর্থলোভে এত বেশী অনুগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহারা প্রকাশ্যেই তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিল; এবং এ কথাও শোনা গেল যে, কাসেম নাকি অপমানিত বোধ করিয়া তৎক্ষণেই পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন!

ডাক্তার পেরেইরা বলিলেন, "দেখলে জনী! সকলেরই শেষ অবস্থাটা দেখলে? হালিদ নেই আমাদের প্রতিহিংসায়, আলি নেই দেবী আইসিসের প্রতিহিংসায়, কাসেমের প্রতিহিংসায় গেল ইহুদী ইউসুফ্-বিন্-ইব্রাহিম, আর কাসেম যে নিজে শেষ হলো, তারও মূলে রয়েছে প্রতিহিংসা—তার সহচরদের প্রতিহিংসা!

সুদূর মরুদেশে এসো আমরা যেন প্রচণ্ড প্রতিহিংসার এক দাবানল দেখে চলে যাচ্ছি! আর অপূর্ব্ব রহস্যময় এক পিরামিডের দুরন্ত ক্ষুধাই যেন এই প্রতিহিংসার দাবানল সৃষ্টি করেছে!"

সকলেই স্তব্ধভাবে তাঁহার কথাগুলি অনুভব করিল, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে কোন কথা সরিল না।

টক্কা-টরে-টক্কা

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা—
টেলিগ্রামে খবর এল
তিড়িং মিড়িং গঙ্গাফড়িং
যাবেন তীর্থে—মক্কা!

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা—
জবর খবর ছড়িয়ে গেল
'পায়রা-প্লেনে' যাবেন ফড়িং,
পায়রার নাম লক্কা!

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা—
জাপান থেকে খবর এল...
সঙ্গে যাবেন বন্ধু ফড়িং
হনসিউ-এর হক্কা!

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা—
আবার খবর যেই না এল,
ফোন বাজল—ক্রীং!
...'হ্যাল্লো, পাঞ্জা-ছক্কা!'

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা—
তার এসেছে এলোমেলোঃ
তিড়িং মিড়িং গঙ্গাফড়িং
হঠাৎ গেছেন অক্কা!!

[পঞ্চতন্ত্রের গল্প]

তাঁতীর বরাত

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

অজ-পাড়াগাঁ। চাষী-মজুরই বেশী সেখানে, দু'চার ঘর ভদ্রলোক যাঁরা আছেন, তাঁরাও খুবই গরীব। সেই গাঁয়ে বাস করে এক তাঁতী।

সার্থক তাঁত বুনতে শিখেছিল সে। হাতের কাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এমন সব বুটি তোলে, কল্কা বুনে তোলে এমন চমৎকার—কাপড় যেন ঝলমল করে ওঠে।

কিন্তু কী বরাত! গরীব গাঁয়ে সৌখীন কাপড়ের দাম দেবে কে? অন্য তাঁতীদের বোনা মোটা মামুলি কাপড়ই হাটে বিকোয়; আমাদের সোমিলকের কাপড় সবাই একবার করে নাড়ে বটে, কেনে না কেউ। এমন কি, দাম পর্য্যন্ত জানতে চায় না, ভাবে—'এ ত রাজার ঘরের জন্য বোনা, আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ নিয়ে করব কী?'

হাট ভাঙ্গবার মুখে সোমিলকই খোশামোদ করে চেনা লোকেদের। 'নিয়ে যা ভাই, চাইনে বেশী দাম; মুড়ি-মুড়কি একদামেই বিকিয়ে যাক! যা হ'ক কিছু পয়সা না এলে যে খেতেই পাব না!'

বাড়ী গিয়ে দিব্যি গালে যে, এবার থেকে অন্য তাঁতীদের মত বাজে জিনিসই বুনবে সে। কিন্তু কী গেরো! তাঁতে বসলে সে-কথা তার মনে থাকে না। কখন যে ভালো ভালো নক্সা ফুটতে সুরু করে তার টানা-পোড়েনে, নিজেও তা সে জানতে পারে না। ভালো কাজ করবার জন্যই জন্ম তার, চেষ্টা করেও সে খেলো কাজ করতে পারে না।

দুঃখ তার ঘোচে না।

বামুনবাড়ীর এক ছেলে বহু দূরদেশে মস্ত কোন পণ্ডিতের কাছে পড়ে। সে একবার বাড়ী এল বাপ-মা'কে দেখতে। সোমিলকের দুর্দ্দশা দেখে সে বললে—'খুড়ো, একটা কথা বলি। আমি সহরে থাকি, সেখানকার হাল-চাল জানি। তোমার হাতের এ-কাপড়—এ-জিনিসের বাজার হল সহরে। সেখানে লোকের সখও আছে, পয়সাও আছে। তুমি যদি কোন বড় জায়গায় গিয়ে কাজ কর, সোনাদানায় ঘর ভরে যাবে তোমার।'

কথাটা মনে লাগল সোমিলকের।

সহরেই সে যাবে।

কিন্তু সব চাইতে নিকটের যে-সহর, সেও ত দিন সাতেকের পথ। গেলে সেইখানেই পাকাপাকিভাবে থাকতে হয়, ঘন ঘন যাওয়া-আসা চলে না।

কিন্তু তাঁতিনীর তাতে ঘোর আপত্তি। বাপ-পিতামহের ভিটেতে সন্ধ্যে জ্বলবে না, এও কখনো হয় নাকি?

তার উপর তাঁতিনীর বুদ্ধিও কী রকম যেন উল্টো। সে বলে—'শোন তাঁতী, বরাত ছাড়া পথ নেই। আমাদের ভাগ্যে যদি পয়সা থাকত, এই গাঁয়ে বসেই পেতাম। সহরে গেলেই যে হাভা'তের ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা আসবে, আমার ত তা মনে হয় না।'

তর্কাতর্কি অনেক হল। শেষ পর্য্যন্ত সোমিলকের যাওয়াও তাঁতিনী বন্ধ করতে পারল না, বাপ-পিতামহের ভিটে থেকে তাঁতিনীকে নড়াবার সাধ্যও সোমিলকের হল না।

যাওয়ার আগে সোমিলক বন্দোবস্ত ক'রে ফেলল—তাঁতিনী সুতো কেটে অন্য তাঁতীদের দেবে, তার একবেলা খাওয়ার মত দু'মুঠো চা'ল যা হ'ক ক'রে তা থেকেই যোগাড় হবে হয়ত।

অবশেষে ভট্চাজ মশাইকে দিয়ে শুভ দিন দেখান হ'ল। গাঁয়ের সওয়া পাঁচ গণ্ডা দেবস্থলীতে প্রণাম ক'রে এল সোমিলক। তারপর 'কেন কাঁদছিস্ তাঁতিনী, এই ত দু'দিন বাদে আমি ফিরে এলাম ব'লে'—এই কথা ব'লতে ব'লতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়ল। 'শ্রীদুর্গা! শ্রীদুর্গা!'—রাস্তায়

—এও কখনো হয় নাকি?

বেরিয়ে তার নিজের চোখের জল আর থামে না!

ক্রমাগত সাত দিন হাঁটছে সোমিলক। যেদিন সন্ধ্যার মুখে কোন গ্রামের কাছে এসে পড়ে, গাঁয়ের লোকে আদর ক'রে ঘরে ডেকে নেয়। অপরিচিত অতিথিকে ভাল ক'রে খাওয়ায়, চণ্ডীমণ্ডপের ভাল জায়গাটিতে বিছানা ক'রে দেয়। আর যেদিন গ্রাম চোখে পড়ে না, আঁধার ঘনিয়ে আসবার আগেই সে পোঁটলা থেকে চিঁড়ে বা'র করে; তাই চিবিয়ে, রাস্তার ধারের দীঘি বা নদীর জল পেট ভ'রে খেয়ে উঁচু দেখে একটা গাছের মগডালে উঠে পড়ে। তারপর চাদর দিয়ে নিজেকে শক্ত ক'রে ডালের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে সেই তিন-শূন্যেই নাক ডাকিয়ে ঘুম!

অবশেষে সহর, বর্দ্ধমানপুর!

প্রকাণ্ড সহর! তাক লেগে যায় সোমিলকের। ভয় পায়—এর ভেতর হারিয়ে যাবে না ত! এক একবার মনে হয় দূর হ'ক গে, কাজ নেই বড়মানুষ হ'য়ে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই, সেখানে যা হ'ক ক'রে এক মুঠো জুটছিল ত! এ বিদেশ-বিভূঁয়ে, একটা চেনা মুখ চোখে পড়ে না—এখানে বাঁচব কি করে!

কিন্তু তারপরই মনকে শক্ত করে সোমিলক। সে গুণীলোক। ভগবান তাকে গুণ দিয়েছিলেন কি তা গোপন করে রাখবার জন্য? সেই গুণ দিয়ে মানুষের কাজ করবে সে। মানুষও পাল্টা তাকে কিছু দেবে। দেবে পয়সা, দেবে মান। সেই আশাতেই সে সাত দিনের পথ ভেঙ্গে বর্দ্ধমানপুরে এসেছে। এখন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে লোকেই বা বলবে কী, নিজের মনের কাছেই বা সে কী বলে জবাবদিহি করবে?

একবার লড়ে দেখা যাক্!

সোমিলক মন খাঁটি করে কাজে লেগে গেল।

তাঁত বেচে সে টাকা এনেছিল সঙ্গে। তাই দিয়ে, সে নতুন তাঁত কিনল। জিনিসপত্র যোগাড় করে নিয়ে ভগবান স্মরণ করে কাজ সুরু করল সোমিলক। প্রথম কাপড় যখন সে জুড়ছে, সহরের তাঁতীরা মজা দেখতে এল। সেই যে কথায় বলে—কামারপাড়ায় সূঁচ বেচতে আসা, এই গেঁয়ো লোকটা সত্যিই তাই করছে। যেখানে ওস্তাদ তাঁতীদের কারবার চলছে শত শত, সেখানে কাপড় চালাতে এল কিনা ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরের এই হাবাগোবা সোমিলক! এ ওর গা টেপাটেপি করে হাসে তারা।

কিন্তু মুখের হাসি মিলিয়ে গেল তাদের। ক্রমে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠল। এ লোকটা গুণ জানে কিছু। এমন কাপড় মানুষে বুনতে পারে কখনো? মিহি যেন রেশমি কাপড়! কল্‌কায় যেন তাজা ফুল ফুটেছে! সোমিলকের পায়ের ধুলো নিয়ে ঘরে গেল তারা।

বাজারে নাম ছড়িয়ে পড়ল। আড়তদারেরা বায়না দিয়ে গেল। কারও বিশখানা কাপড় চাই, কারও পঞ্চাশখানা। টাকা আর টাকা! সোমিলকের কেবল এক আক্ষেপ—তাঁতিনী—তার এ-পসার চোখে দেখল না। বোকা মেয়েমানুষ—সে কিনা সোমিলককে পরামর্শ দিতে এসেছিল—'বরাতে থাকলে গাঁয়েতেই পয়সা হত; মিছে তুমি সহরে যেও না!'

কিন্তু মনকে বোঝায় সোমিলক—তাঁতিনী আজ না দেখুক, একদিন দেখবেই। বছর খানেক এইভাবে কেটে গেলে মোটা টাকা জমবে যখন, তখন সে গাঁয়ে যাবে একবার। ঝন্‌ঝন্ করে মোহর বৃষ্টি করবে তাঁতিনীর সম্মুখে। তাঁতিনী বুঝবে—তার স্বামী তুচ্ছ লোক নয়; গাঁয়ে বসে যে সে পয়সা রোজগার করতে পারেনি—সেটা গাঁয়ের লোকেরই দোষ, সোমিলকের দোষ নয়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গড়িয়ে যায়। বছর শেষ হয়ে এল। সোমিলক একদিন গুণে দেখল—পাঁচশো মোহর জমেছে তার। করকরে ঝক্‌ঝকে সব মোহর। টুং করে আওয়াজ হয় টোকা দিলে, কী মিষ্টি সে আওয়াজ! সোমিলকের কান জুড়িয়ে যায়। এক এক সময় চোখ বুজে সে শুধু হাত বুলিয়ে যায় মোহরের গাদার উপরে, আঃ, কী মোলায়েম লাগে এই শক্ত ধাতুখণ্ডগুলো!

সোমিলক কিন্তু লোভীও নয়, হিসেবীও নয়। টাকা জমাবার জন্য সে টাকা চায়নি, চেয়েছে ব্যবহারের জন্য। নিজে ভাল খাবে ভাল পরবে, তাঁতিনীকে ভাল খাওয়াবে ভাল পরাবে, আত্মীয়কুটুম্ব প্রতিবেশীকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করবে বাড়ীতে—এইগুলিই তার মনের সাধ। এই সাধগুলি পূর্ণ করবার জন্যই সে অর্থ চেয়েছে চিরদিন। এখন, এই মোহরের স্তূপ হাতে পেয়েও সেই কামনাই আবার প্রবল হয়ে উঠেছে তার মনে, আগ্রহে সে দিন গুণছে—কবে ঘরে ফিরবে, কবে তাঁতিনীকে গয়নায় মুড়ে দেবে, কবে ভাল ঘর বেঁধে পালঙ্কের উপর শোবে আরাম করে।

অবশেষে একদিন সত্যিই সে ঘরে ফিরল। তাঁতশালা বন্ধ করে সহরের নতুন আলাপীদের কাছে বিদায় নিল দু'এক মাসের জন্য। আবার সে আসবে, কথা দিয়ে গেল সবাইকে।

সোমিলক দেশে চলেছে—কী আনন্দ তার মনে! সার্থক হয়েছে তার দুঃসাহস। সাত দিনের হাঁটা-পথ পেরিয়ে বর্দ্ধমানপুরে আসতে তার গাঁয়ের কোন তাঁতীই তার আগে

সাহস করেনি। সে এসেছে, এবং সেখান থেকে পয়সা রোজগার করে নিয়ে যাচ্ছে। একটা যুদ্ধ জয় করে বিজয়মালা মাথায় পরে ফিরছে সোমিলক; গাঁয়ের লোক এখন তাকে বাহবা দিক!

ধার্ম্মিক রাজার দেশ, চোর-ডাকাত নেই। মোহর কেউ কেড়ে নেবে, এমন ভয় নেই। ভয় কেবল বাঘ, ভালুকের আর সাপের। দূরে দূরে গ্রাম, রোজ যে রাত্রে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাওয়া যায়, তা নয়। একদিন এক গভীর বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতেই সে দেখল—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

এবারেও তার পোঁটলায় চিঁড়ে আছে; তবে শুক্‌নো চিঁড়ে শুধু নয়, তার সঙ্গে আছে বর্দ্ধমানপুরের সুস্বাদু সীতাভোগ। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে সে এক গাছে উঠে পড়ল, এবং মগডালের সাথে নিজেকে চাদর দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে।

সকালে উঠে পথ চলতে গিয়ে তার মনে হল—কোমরটা কেমন হালকা লাগছে যেন। পাঁচশো মোহর গেঁজেতে ভরে কোমরে বেঁধে রেখেছিল সে, তার ওজনটা ত কম নয়! সে ওজন আজ কমল কিসে?

কোমরের হাত মাথায় উঠল চোখের পলকে! ধপাস্ করে সেই বনের পথে বসে পড়ল সোমিলক! গেঁজে ঠিকই আছে কোমরে, কিন্তু একেবারে খালি!

এ কী এ? রাত্রে মোহর কোমরে বেঁধে গাছের মগডালে সে ঘুমিয়েছে! সেখানে উঠে তার কোমর থেকে মোহর নিলে কে? যেভাবে গেঁজে বাঁধা ছিল, ঠিক সেইভাবেই বাঁধা রয়েছে, শুধু তার ভিতরকার মোহরগুলিই নেই! একি কাণ্ড! কে নিলে? কেমন করে নিলে? কেন নিলে?

হতবুদ্ধি হতচৈতন্যের মত একভাবে এক জায়গায় বহু, বহুক্ষণ বসে রইল হতভাগ্য সোমিলক। তার মাথায় আবছা-ভাবে একটা কথা ঘোরাফেরা করছিল কেবল—তাঁতিনীর সেই কথা—'ভাগ্যে যদি পয়সা থাকত, গাঁয়ে বসেই পেতাম!'

মাথার উপর একটা বটফল টুপ্ করে পড়ল। চমকে উঠে উপর পানে তাকিয়ে সোমিলক দেখল—কোথা দিয়ে গোটা দিনটাই কেটে গিয়েছে, আবার সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে বনের ভিতর।

সোমিলক কী করবে? ঘরের দিকে যাবে? গিয়ে তাঁতিনীকে বলবে—'আমি পয়সা পেয়েছিলাম, কিন্তু ভোগে লাগল না!' কিংবা আবার বর্দ্ধমানপুরে যাবে নতুন করে কাজ সুরু করবার জন্য? কী ফল তাতে? পয়সা আবারও আসবে হয়ত, কিন্তু আসবে ত শুধু কর্পূরের মত উবে যাওয়ার জন্য?

বাঘের ডাক শোনা যায় অরণ্যে। গাছে ওঠা দরকার। তাই উঠল সোমিলক। কিন্তু মগডাল পর্য্যন্ত গেল না। একটা শক্ত লতা জড়িয়েছিল গাছটায়। সেই লতার এক প্রান্ত ছুরি দিয়ে কেটে নিজের গলায় শক্ত করে বাঁধল, তারপর ঝাঁপ দিল গাছ থেকে।

লতার ফাঁস গলায় আটকে যখন তার শ্বাস রোধ হতে যাচ্ছে, তখন কে যেন তার পায়ের তলায় হাত দিয়ে উঁচু করে তুলল। ভয়ে বিস্ময়ে নীচু পানে তাকিয়েই সে দেখল—গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ।

সোমিলক গলার ফাঁস খুলে ফেলে গাছ থেকে নেমে এল। প্রণাম করল জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে।

স্নিগ্ধস্বরে সেই পুরুষ বললেন, 'ভোগ তোমার ভাগ্যে নেই সোমিলক! আমি বিধাতা পুরুষ, আঁতুড় ঘরে আমিই তোমার কপালে লিখে দিয়েছি—মোটা ভাত মোটা কাপড় ছাড়া কোনদিন কিছু জুটবে না তোমার।'

মনের দুঃখে বিধাতা পুরুষেরও সম্মান রেখে কথা কইতে পারল না সোমিলক। 'আমার মোহরগুলো হল কি? ভোগ না হয় না-ই করতাম, উপার্জ্জন যখন করেছি—তখন মোহরগুলো আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া আপনার উচিত হয়নি।'

বিধাতা পুরুষের মুখখানি সমবেদনায় করুণ হয়ে এল। 'ভোগই যখন করতে পারবে না, তখন অর্থ দিয়ে হবে কি? যখের মত আগলাবে সারাজীবন? সে যে মানুষের চরম দুর্গতি! তুমি লোক ভাল, তাই সে দুর্গতি থেকে তোমায় রক্ষা করবার জন্যই আমি মোহরগুলো সরিয়ে নিয়েছি তোমার।'

সোমিলক মরিয়া হয়ে উঠেছিল মনে মনে। ক্রুদ্ধভাবে বলল—'ভোগ আর যখের মত আগলানো—এছাড়া কি আর অন্যভাবে অর্থের ব্যবহার করা যায় না? আমি বিলিয়ে দেব আমার টাকা! যেখানে যত দীন দুঃখী আতুর আছে—'

হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে উঠল সোমিলকের। মাটিতে বসে পড়ে সে চোখ বুজল।

চোখ মেলে আবার চাইল যখন, তখন ভোরের আলোয় বনভূমি হেসে উঠেছে! অবাক্ হয়ে সোমিলক দেখল—গাছতলায় সে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে; আর ততোধিক অবাক্ হয়ে সে অনুভব করল—কোমরের গেঁজে আগের মতই মোহরে ভর্ত্তি।

নবাব-বাড়ীর চুন্নু মিঞা

আশা দেবী

রকের উপর উবু হয়ে বসে মৃত্যুঞ্জয় ওরফে মেতামামা ছুঁচোর মত মুখ করে বিড়িতে একটা টান দিলেন। সামনে ব্রতকথা শোনবার ঢং-এ বসে থাকা বিনু বললে, মামা, তুমি এতো হতাশ হচ্ছো কেন? চাকরী নেই বলে? ব্যবসা কর।

পিঠের ওপর একটা ছোট্ট চাঁটি দিয়ে মেতামামা বললে, টাকা দেবে কে? তুই?

বিনু যেন কেমন ঘাবড়ে গেল! বললে, আমি দেব কেন? তুমিই দেবে তোমার চাকরীর টাকা!

—আমিই দেব? তা হলে আর রকে বসে বিড়ি খাই কেন?—ক্রুদ্ধ মেতামামা খেঁকিয়ে উঠলো।

বিনু এবার কথাটা আরো ভাল করে বুঝিয়ে বললে, দেখ মামা, আমাদের অঙ্কের স্যার বলেছেন, ব্যবসায় সব সময়ই যে মূলধন লাগে, তা নয়, সামান্য আট আনায় দোকান দিয়ে লোকে লাখপতি হয়। জানো 'লাক'—সবই 'লাক'! বিনু এবার গম্ভীর দৃষ্টি মেলে দিলো।

—হুঁ!—মেতামামা তার থুতনির ওপর গোটা দশেক চুলওলা ছাগলদাড়িতে হাত বোলাতে লাগলো। বিনুর কথাটায় যেন কেমন চিন্তিত হয়ে পড়লো মামা!

—আমি একটা বুদ্ধি দিতে পারি। তুমি মুরগী কেন। ডিম হবে, বিক্রী করবে। বাচ্চা হবে, খাবে, বিক্রি করবে। দেখো দুদিনে বড়লোক! পাত-কুড়োনো খাবে, খেতে দেবারও খরচ নেই। আমাদের পাড়ার শিবুর বাবার কথা ভুলে গেলে?

—হাঁ, তাই তো বটে!—মেতামামা মাথা চুলকোতে লাগলো।—কিন্তু কিনবো কি করে? টাকা কই?

—কেন? আমার কাছে টিফিনের আট আনা আছে, ধার দিতে পারি।

—দূর ছাগল! আট আনায় মুরগী হয় না, মুরগীর ডিম হতে পারে।

—ওই ডিম ফুটেই বাচ্চা হবে, চল না হাটে—কথা শোন!—বিনু বোঝাতে চাইলো।

—বেশ যাব কিন্তু টাকা যদি না দিতে পারিস তবে গাঁট্টা মেরে তোর মাথা ফাটাব।—মামা তার টেরা চোখটা আরো টেরা করে বললে বিনুকে।

—নিয়ে যান বাবু! পাঁচ সিকেয় চলে যাচ্ছে মুরগী, খাঁটি নবাব-বাড়ীর মাল! নীলেমে বিক্রী হচ্ছে। হারালে সুযোগ আর পাবেন না। খাবে ভাত, দেবে ডিম, নিয়ে হবেন রাজা! এ ফুঁস্ মন্তরের মুরগী বাবু—

মেতামামা বটগাছের তলায় ঠ্যাং বাঁধা মুরগীটার দিকে তাকিয়েই চমকে গেল। ভাবলো, এত সস্তায়!

বিনু বললে, চল না মামা, কাছে যাই।

মুরগীওয়ালার চীৎকারে লোক জমেছে মন্দ নয়। সবাই মজা দেখছে যেন! দরও বিশেষ কেউ করছে না তবে দাঁড়িয়ে আছে মুরগীটাকে ঘিরে।

কঁক্! একটা শক্ত জোরে টান পড়লো দড়িতে আর তার সঙ্গে পাশের ভিখারী বুড়ীর হাঁই-মাই কান্নাঃ কি অলপ্যেয়ে মুরগী বাবা, মাথায় একটা ঠোকর দিয়ে দিলে! হাঁ গা, তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ?

—বুড়ি মা, এতো রেগো না। মুরগী আমার ময়লা দেখতে পারে না, তাই তোমার মাথার উকুন বেছে দিচ্ছিল। ওতে রাগ করো না।

—তাই বই কি? আ মলো। ঝ্যাঁটা পিটে করবো তোকে। ঘাড়ের ওপর এসে বসেছে মুরগী নিয়ে। চোখ বোঁজবার উপায় নেই।

মুরগী বললে, কঁর্—কর্-কঁ—অ

—আ মলো, আবার গান ধরেছে দেখ না! গলার আওয়াজ কি রে বাবা, যেন বাজ পড়লো! কি গো বাছা, কিনবে তো কেন না! হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি বায়স্‌কোপ দেখছো, না জীবনে কখনো মুরগী দেখনি? পছন্দ যদি হয়েই থাকে, কেন না—আমায় বাঁচাও—

মেতামামা যেন কেমন ঘাবড়ে গেল! বুড়ীর চোখের দিকে চেয়ে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত বললে, কিনতে তো পারি, তবে দামটা—

মুরগী এবার মেতামামার একেবারে কাছে এগিয়ে এসে ল্যাং মারতে চেষ্টা করতে লাগলো।

—একি?—আ—মলো!

—মুরগীটা বড্ড রাগী কিনা, তার ওপর নবাব-বাড়ীর মেজাজ, আপনার দর-দাম করা দেখে অপমানিত হয়েছে। দেখুন না কেমন ফুলছে রাগে! মুরগী হলে কি হয়, ওরও তো জান-প্রাণ বলে একটা জিনিস আছে দাদু!

—নিয়ে নাও, ড্যাম চিপ্ মেতামামা!

পকেট থেকে পয়সাটা গুনে দিতে দিতে মেতামামা বললে, চারটে পয়সা যে কম হচ্ছে!

—যান, যান। তবে সাবধান, মুরগীকে কিন্তু যত্নে রাখবেন। নবাব-বাড়ীর মুরগী—চুন্নু মিঞা এর নাম।

মুরগীর পায়ে বাঁধা দড়িটা মেতামামার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মুরগীওলা গাছের পাশ কাটিয়ে সামনের বাঁধা কালো ধুলোভরা পথে অন্তর্দ্ধান করলো।

বুড়ীও চলে গেছে কখন। মেতামামা বললে, চল্ বিনু—যাই।

মুরগীর দড়িতে টান পড়লো।

—কঁক্—কোর্!—চুন্নু মিঞা প্রতিবাদ জানালো।

—সে কিরে?

বিনু বললে, টানো জোরে।

—মুরগী দড়ি কাটবার চেষ্টা করছে যে!—মেতামামা চীৎকার করে উঠলো।

—ওরে শয়তান, তোকে কেটেই খাব!—বিনু সামনের ঝোপ থেকে স্যাওড়ার ডালটা ভেঙ্গে নিলো। মুরগী মেতামামার ঘাড়ে উঠে বসলো।

—চল্ ঘাড়েই চল্! বড়লোকের আদরের মুরগী বটে বাবা! নাম আবার চুন্নু মিঞা!—মেতামামা বকতে বকতে চললো।

—ওরে বাবারে—এ যে কামড়ায় গো! মেতামামা খানিকটা এগিয়েই চীৎকার করে উঠলো।

—চল—চল, আর পথ বেশী নেই।—বিনু অভয় দিয়ে পেছনে পেছনে আসছে।

—উ—হুঁ—হুঁ!—চুন্নু মিঞা এবার মামার পৈতে ছেড়ে দিয়ে মাথায় সযত্নে রাখা টিকিটা ধরে প্রাণপণে ঝুলতে লাগলো।

—দাও তো আমাকে! কী ভয়ানক মুরগী বাবা! বিনু ওটাকে মাথায় তুলে নিলো।

বাড়ীর সামনে এসে মুরগী বিনুর কানটা কট্ করে কামড়ে ধরলে।

—ওরে বাবা, ও মামা, তোর মুরগীর নিকুচি করেছি। তোকে কাট্‌লেট্ করে খাব।

হাতের শ্যাওড়ার ডালটা দিয়ে বিনু সপাং করে এক ঘা কষিয়ে দিলো।

—কঁক্—কর্—র—অ! মুরগী পরাজয় স্বীকার করলে। কিন্তু দুচোখে ভরা জিঘাংসা।

বাড়ীর ভেতর ঢুকে মেতামামা বললে, এখন উপায়? মা তো মুরগী দেখলে আর আস্ত রাখবে না। কী করি?—

পকেট থেকে রেশনের থলিটা বের করে বিনু বললে, এর মধ্যে ভরে নাও।

—মরে যাবে যে!

—ওর জান শক্ত আছে, মরবে কী?

—ওরে ও বিনু, ওর মধ্যে কীরে?

মেতামামা মাথা চুলকোতে লাগলো।

—একটা কাঁঠাল পিসিমা! হাটে সস্তায় পেলাম, বুদ্ধি খাটিয়ে নিয়ে নিলাম। কি রাগ করলে?

—না—না, রাগ করবো কেন? পিসিমার জন্যে এত চিন্তা! বাবা আমার, রাখ ঐ থানটায় চাপা দিয়ে। নইলে গন্ধে শেয়াল আসবে।

পিসিমা বেরিয়ে গেলেন।

রাতে বিছানায় শুয়ে মেতামামা বললে, সকালে কী হবে?

—কেন? বিনু বললে।

—বাড়ীতে আর কেউ নেই, মা গেল ঠাকুরমার বাড়ী। পিসেমশায় যদি শোনে মুরগীর কথা, পিটিয়ে পাটিসাপ্‌টা বানিয়ে দেবে।

—চুপ করে শুয়ে থাক্। কানের কাছে মশার মত গুন গুন করিস নে।

—কঁক্—কর্—কঁ—

ভোরের আলোয় ধামাচাপা মুরগীর ভৈরবীতে বাড়ী ভরে গেল।

—মুরগী ডাকে না?—পিসেমশায় বললেন।

—না—না, ও অন্য কোথাও—

—কঁক্—কুর্—র্!

—ওগো শুনছো—বড্ড কাছে যে মনে হচ্ছে।

—না—না—

মেতামামা আর বিনু ভয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে বালিশ কামড়ে পড়ে রইলো।

—ওগো—ওঠ তো! ঘরেই মনে হচ্ছে না? শুনছো, ও মা!

বিনু মেতামামাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো।

—কি হবে মামা?

—কর্—র্!

—চল মামা, প্যান্টের ফিতা খুলে ওটার ঠোঁট শক্ত করে বেঁধে দি।—

—ওগো ওঠ, চল তো! ঘরের মধ্যেই যে মনে হচ্ছে!

—বল কি?

পিসেমশায় লাফিয়ে উঠলেন। লণ্ঠনটা তুলেই অবাক কাণ্ড! ধামার তলা থেকে মুরগীর গলা টিপে মামা-ভাগ্নে বসে!

—ওরে এই বুঝি তোর কাঁঠাল?

—দাঁড়া, আমি তোদের পিঠে তাল দিচ্ছি!

হাত থেকে ঝপ্ করে মুরগীটা ঝেড়ে ফেলে মামা বিনুর দিকে চাইলে।

—ওরে, ও হতভাগা, তোকে খড়ম পেটা করবো। ভজুয়া, এই দুই শয়তানকে শক্ত করে খুঁটির সঙ্গে বাঁধ তো! আমি ওদের কাঁঠাল খাওয়াচ্ছি!

—ওরে কি হলো রে!—পিসিমা বিকট সুরে যেন প্রভাতী ধরলেন।

মুরগী এত চেঁচামেচি মোটেই পছন্দ করে না। সে গলা ফুলিয়ে প্রতিবাদ জানালোঃ কুঁর্—র্—র্!

মুক্তির আনন্দে এবার তার গলার সুরে সপ্তকের ঝঙ্কার!

পিসেমশায় পেটে বেল্ট বেঁধে ভুঁড়িকে নিজের 'কন্ট্রোলে' আনতে আনতে গড়গড়ে গলায় সাড়া দিলেনঃ ডাক তো বেঁটে গয়লাকে, পচা ঘোল ঢেলে দিক ওদের মাথায়। একটা নাপিত ধরে আন।

বিনু চোখ বুজে ছিল। মেতামামা একবার ভীমকান্তি পিসেমশায়ের দিকে চেয়েই বিকট এক চীৎকার করে উঠলো।

আর রক্ষে নেই! পিসেমশায়ের ক্ষমাহীন গোলআলুর মত চোখ দুটো ইলেকট্রিক আলোর মত জ্বলতে লাগলো।

বিনু ভয়েতে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাঁচতে লাগলো। মেতামামা আর্ত্তনাদ করে উঠলো, ওমা, ও যে পচা ঘোল!

—তোর চেঁচানো বার করছি! পেঁচামুখো—ছুঁচো কোথাকার!

—ওরে কি জ্বালারে!

পিসিমার গলাকে ছাপিয়ে দিয়ে চুন্নু মিঞা হুঙ্কার ছাড়লো, কঁক্—কুর্—র্—উ!

—চুন্নু মিঞা!—

টেলিগ্রাম-পিয়ন এসে কড়া নাড়ছে। চুন্নু মিঞা লটারীতে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে!

পিসেমশায়ের চোখের আগুন ফিউজ হওয়া বাল্বের মত ফস্ করে নিভে গেল! পিসিমা কেন্নর মত কুঁকড়ে গেলেন!

পিয়ন বিস্তারিত বিবরণ বললেঃ নবাব তাঁর আদরের মুরগী চুন্নু মিঞার নামে লটারী-টিকিট কিনেছিলেন। মুরগী যার কাছে থাকবে, সেই টাকাটা পাবে। কাজেই মেতাবাবু এই টাকার মালিক!

বাড়ীতে বাজ পড়লো! পিসিমা ছুটে এসে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে মেতাকে বিনুকে চোখে-মুখে জল দিয়ে [illegible] করে সবটা বুঝিয়ে দিলেন।

—ওরে মুরগী ডাক্ শীগ্গির, ও যে পালায়!

বিনু ছুটে গিয়ে ধরতে গেল, বললে, মুরগী যে ঘরে ঢুকে পড়লো!

—তাতে কি হয়েছে?—পিসিমা আঁচল ভরে চাল উঠোনে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, আয়রে আয় চুন্নু মিঞা তোকে সোনার মল বানিয়ে দেব। ওরে, বিনু আর মেতার জন্যে ভরপেট রসগোল্লার অর্ডার দাও।

চুন্নু মিঞা সমর্থন করে জবাব দিলে—কঁক্—কর—র

যুদ্ধ শেষ হবার পরেও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর দেখতে দেখতে প্রায় দশ বছর হয়ে গেল কিন্তু এখনও যেন ঠিক আগেকার মত সহজ দিনটি ফিরে এল না! নিত্যকার প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি নানান জিনিস আজও তেমনি চড়া দরে কিনতে হচ্ছে; এটা নেই, ওটা নেই—শুনতে শুনতে কান এখনও তেমনি ঝালাপালা। বাজার থেকে খাঁটী জিনিষ সেই যে উধাও হয়েছে, আর তার পাত্তা মেলা ভার। লোকগুলোও যেন কেমন বদলে গেছে—খাঁটী জিনিষের মত খাঁটী লোকেরও যেন অভাব! তার ওপর আছে গৃহসমস্যা,—মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত মিলছে না বহুলোকের।

কিন্তু এসব হচ্ছে যুদ্ধের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া। এত বড় একটা ব্যাপারের (যজ্ঞির ব্যাপারের?) পর স্বভাবতঃই এ সব সামলে নিতে সময় নেবে। কষ্টকর সন্দেহ নেই, কিন্তু মারাত্মক নয় হয়তো। কিন্তু যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল থেকেও যে মা বসুন্ধরা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি, সে খবর হয়তো অনেকেই রাখ না। কিসের কথা বলছি, তা নীচের ঘটনাটি থেকেই বুঝতে পারবে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি ম্যানিলা উপসাগর। গঞ্জালেস ছিল ঐ অঞ্চলের এক সাহসী জেলে। মাছ-ধরা ছোট নৌকোটি নিয়ে সে যখন-তখন একা একা সমুদ্রে ঘুরে বেড়াত, আর মাছের সন্ধান পেলেই ছুঁড়ে দিত তার চেকনাই জাল। ইয়া বড় বড় মাছও রেহাই পেত না তার অব্যর্থ জালের হাত থেকে।

একদিন গঞ্জালেস অভ্যাসমত নৌকো নিয়ে বেরিয়েছে। খানিকক্ষণ ঘুরতেই হঠাৎ তার চোখে পড়ল—একটা অদ্ভুত ধরণের জলজীব জলের ভেতর থেকে মাথা তুলে যেন তারই দিকে ভেসে আসছে! মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না তার, কিন্তু কী বিরাট মাথা! মাথার দু'পাশে আবার দু'টি শিং-এর মত কি খাড়া হয়ে আছে। মস্ত এবং নতুন ধরণের শিকার মনে করে গঞ্জালেস হয়তো মনে মনে বেশ একটু খুশী হয়েই জাল হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়াল, আর যেই না কাছে আসা অমনি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সবলে ছুঁড়ে দিল সেই মাথা লক্ষ্য করে তার চেকনাই জাল।

কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র। তার পরই এক বিকট শব্দে সমুদ্রের জল তোলপাড় হয়ে উঠল। কি হল বুঝবার আগেই গঞ্জালেস তার সাধের জাল আর সাধের নৌকো সমেত টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় যে ছড়িয়ে পড়ল তার ঠিক নেই। সেই সঙ্গে অদৃশ্য হল সেই অদ্ভুত জলদৈত্যটাও। শুধু একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ আর তীব্র কালো ধোঁয়া সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস আর নীল জলকে খানিকক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করে রাখল।

যুদ্ধ শেষ হবার ছ'বছর পরের ঘটনা এটি। গঞ্জালেস হয়তো তাই কল্পনাও করতে পারেনি যে আসলে ঐ বিরাট মুণ্ডুটা কোন অজানা জলজন্তুর নয়—ওটি একটি "ভীম ভাসমান মাইন"—ইস্পাতের খোলের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরক-ভরা মারণাস্ত্র—যা নাকি ফিলিপাইন আক্রমণের সময় জাপানীরা ব্যবহার করেছিল এবং যা নাকি এ যাবৎ ফাটবার কোন সুযোগই পায়নি। হয়তো কোন কালেই সে সুযোগ ওটির জুটত না, যদি না গঞ্জালেসের জাল তাকে আঘাত করে যান্ত্রিক সাহায্য করত।

বিরাট মাইন ভাসতে ভাসতে ডাঙ্গায় এসে ঠেকেছে।

কিন্তু এ তো গেল ফিলিপাইনের দরিয়ার ঘটনা—যেখানে জাপানী আক্রমণ এবং লড়াইটা বেশ জোরেই হয়েছিল। খোদ আমেরিকার মাটিতেও এরকম কাণ্ড অনেকবার ঘটেছে। আমেরিকা যুদ্ধ করলেও খাস আমেরিকার জলে বা ডাঙ্গায় কোন দিনই যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ধরণের ফেলে-আসা মাইনের হাত থেকে সেও রেহাই পায়নি। এই সেদিনও একদল ছেলেমেয়ে সমুদ্রতীরে চড়ুইভাতি করতে গিয়ে এই রকম এক সজীব মাইনের খপ্পরে পড়েছিল। মাইনটা বালির নীচে গেঁথে গিয়েছিল। দৌড়াদৌড়ি করবার সময় একজন গিয়ে তার ওপর পা দিতেই প্রচণ্ড শব্দে সেটা ফেটে যায়। তারপর, চড়ুইভাতি তো চুলোয় গেল, কয়েকজন সেখানেই সাবাড়। বাকি ক'জন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় চলল হাসপাতালে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে যে সব বোমা, মাইন ইত্যাদি মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, যুদ্ধের পর সেগুলি নিয়ে তাঁদের মহা সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ তার অনেকগুলিই কেবল পাতা হয়েছিল, ফাটবার অবসর পায়নি। যুদ্ধের পর সেগুলিকে নিরাপদ আয়ত্তে আনতে সময় লেগেছিল প্রায় পনেরো বছর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই সব মারণাস্ত্র আরও অনেক ব্যাপকভাবে এবং আরও বহু বহু

বোমা-ফাটানো "সাপ"। সাপের মত বিরাট লম্বা খোলের মধ্যে বিস্ফোরক পুরে. ..

গুণ বিস্তৃত এলাকার ওপরে ফেলা হয়েছে। বনে-জঙ্গলে, মাঠে-ঘাটে, সমুদ্রে-নদীতে, গ্রামে-সহরে,—কোথায় না? এবারকার যুদ্ধে বিমানের ব্যবহার বেড়েছে হাজার গুণ, মারণাস্ত্রও তদনুযায়ী তৈরী হয়েছে এবং ছোঁড়াও হয়েছে তেমনি এলোপাথাড়িভাবে। এদের কতগুলি সত্যকার কাজ করেছে এবং কতগুলি সে সুযোগ না পেয়ে এখনও "সজীব অবস্থায়" এখানে-ওখানে বিশ্রাম করছে,—তার হিসাব পাওয়া কঠিন। এবং এসব "দেখতে-নিরীহ—আসলে কালসর্প" পদার্থগুলিকে নির্ম্মূল করতে আরও যে কত বছর লাগতে পারে তা ভাবলেও আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়।

বিজ্ঞানীরা তাই বলে চুপচাপ বসে নেই। যে ধরিত্রীকে তাঁরাই একদিন কলঙ্করেখায় আচ্ছাদিত করেছিলেন, তাকেই আজ কলঙ্কমুক্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁরা। এজন্য বিশেষজ্ঞরা গবেষণাও করছেন দস্তুরমত। কাজটা তো সহজ নয়,—জল-মাইন, স্থল-মাইন, ডেপ্‌থ্‌ চার্জ্জ, আগুনে-বোমা, অতিকায়-বোমা—কোন্‌টার ভিতরকার রহস্য কি, ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। নইলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। নিজেদেরটা জানা হয়তো অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু শত্রুপক্ষদের তৈরী ঐ সব মারণাস্ত্র সম্বন্ধে সব রকম খবর সংগ্রহ করা তো আর সহজ ব্যাপার নয়। আর সে জিনিষ, নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে দেখা আরও বিপজ্জনক। তা ছাড়া জার্ম্মান-বিজ্ঞানীরা যে কত রকম নতুন ধরণের বোমা আবিষ্কার এবং ব্যবহার করেছিলেন তার আর লেখাজোখা নেই।

এর ফল যে তাঁদের নিজেদেরও ভুগতে হয়নি এমন নয়। সেই যে কবি লিখে গেছেন—"সাধনায় শব জাগি' সাধকের মুণ্ড ঘন ঘন করে দাবী ভৈরব-মন্ত্রে।" এও যেন তাই! যুদ্ধের শেষ দিকে যখন বিপক্ষ দলের সম্মিলিত চাপে পড়ে জার্ম্মান সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটতে হল, তখন তারা শত্রুর অগ্রগতিকে বাধা দেবার জন্য, সমস্ত পরিত্যক্ত পথ জুড়ে মাটির তলায় চোরা মাইন বিছিয়ে বিছিয়ে চলতে থাকে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, অত করেও তারা শত্রুকে ঠেকাতে পারেনি, কিন্তু ঐ সব "জীবন্ত" বা "তাজা" বোমা এখন, এই শান্তির সময়ও, নিদারুণ অভিশাপের মত ঐ সব অঞ্চলকে ভয়াবহ করে রেখেছে। অবশ্য হালে বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় ঐ সব জায়গা নিরাপদ করবার খুব জোর চেষ্টা চলছে।

সমর বিভাগের যে সব লোকেরা এই সব মৃত্যুবাণ উদ্ধারের ভার নেন, তাঁদের কাজটা যে কি বিপদসঙ্কুল

তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। এজন্য তাঁদের দীর্ঘদিন দস্তুরমত শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কোন্ জটিল অবস্থায় কি করতে হবে, কোথায় কি ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কোন্ মারণাস্ত্রের শক্তি কিভাবে নষ্ট করতে হবে—এই ধরণের হরেক ব্যাপারে হরেক রকমের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। বলা বাহুল্য এসব কাজে যেমন দরকার মনের সাহসের, তেমনি উপস্থিত বুদ্ধি আর একাগ্রতার প্রয়োজন। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে, এ ধরণের বিপজ্জনক কাজেও এগিয়ে আসবার লোকের অভাব নেই এবং কী অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে তাঁরা কার্য্যোদ্ধার করে যাচ্ছেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সর্ব্বত্রই এঁরা কাজ করছেন এবং এ পর্য্যন্ত এ ধরণের লক্ষ লক্ষ অস্ত্র ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছেন। এজন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতিও বার করা হয়েছে। কিছুদিন আগে ইংল্যাণ্ডে এই রকম একটি সজীব বোমাকে "মারা" হয়েছে। এটির ওজন ছিল ৪০০০ পাউণ্ড। মাটির তলায় ৫৭ ফুট নীচে এটি বসে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য এ বোমাটি জার্ম্মানদের তৈরী এবং তাদেরই ফেলা।

শুধু বোমা বা মাইন জাতীয় পদার্থই নয়, নানারকম বিস্ফোরক, নানা জাতের বিষাক্ত গ্যাস নষ্ট করাও এঁদের কাজ। কোন কোন বিস্ফোরক এত সংক্রামক যে, যে মাটিতে পড়ে, সে মাটিকেও বিস্ফোরক করে তোলে, এমন কি সেই মাটি-ধোয়া জল নর্দ্দমা দিয়ে বেরিয়ে এলেও পরে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। কোন কোন গ্যাস এত বিষাক্ত যে, কোথাও একবার ছাড়লে বহু বহু বছর ধরে সেখানকার আবহাওয়া বিষাক্ত করে রাখে। বিজ্ঞানীরা অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কৌশলে এসব 'শয়তান'কে সায়েস্তা করবার উপায় বার করেছেন। এজন্য তাঁদের বিশেষ বিশেষ রকমের পোষাক, বিশেষ বিশেষ রকমের মুখোস ইত্যাদি প্রস্তুত করতে হয়েছে। একবার একটি পোষাক ব্যবহার করা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ৭৮ পর্দ্দা পুরু নাইলন (প্লাষ্টিক জাতীয় কৃত্রিম রেশম)। হাতেও ঐ রকম দস্তানা ব্যবহার করা হয়েছিল, আর মুখে যে মুখোস চাপা দেওয়া হয়েছিল তাও তৈরী করা হয়েছিল অভঙ্গুর কাচ দিয়ে।

কেনার কেরামতি

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

হেঁদোরাম হালদার
বেচে ঘি দালদার।
দেশ তার ছিল খোদ পাবনায়।

ছোট ভাই কেনা তার—
ঘি খেতে মানা তার,
তাই কেনা পড়ে গেছে ভাবনায়।

রুটি লুচি ছক্কা
খেলে পাবে অক্কা—
ডাক্তার বলে তারে নিত্য।

জিভে জল আসে তার,
লুচি ভাজা বাসে তার
ছটফট করে শুধু চিত্ত।
একদিন ভাবে সে
কাঁচা ঘি-ই খাবে সে,—
থাকা যায় এইভাবে কয়দিন?

পরদিন দু'পরে
মই বেয়ে উপরে
উঠে দেখে ঘি আছে নয় টিন।

রোখা তারে যায় কি?
দুই হাতে খায় ঘি—
পরিণাম ভুলে কেনা শুধু খায়।

পরদিন চীৎকার—
নিয়ে আয় ডাক্তার,
ঘি খেয়ে প্রাণ আজ যায় যায়।

নিধিরাম সর্দ্দার

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

হেসোনা খবরদার, নিধিরাম সর্দ্দার—
চেহারা জবর তার—দেখনি ?
নাই ঢাল তলোয়ার, তোমরা যা বলো আর,
নিকটেতে চলো তার—এখনি।
চলো তার আখড়ায়, দুটো বাঘ পাকড়ায়,
বগলেতে আঁকড়ায়—খেলাতে;
দেখিনি কো চক্ষেই, শুনেছি অলক্ষ্যেই,
হাতী তোলে বক্ষেই—হেলাতে!
লাথি মেরে পর্ পর্, গাছ ভাঙে মড়্ মড়্,
দাঁত করে কড়্ মড়্—রাগিয়া;
যত বীর মদ্দই, কাছে এলে সদ্যই,
যায় সবে সত্যই—ভাগিয়া!
সকাল ও সন্ধ্যায়, দু'হাজার ডন দ্যায়,
ভোজনেতে মন্ দ্যায়—সে হেসে;
ডাল-রুটি রাশ রাশ, শেষ করে বাস্ বাস্,
নাহি করে হাঁস্-ফাঁস্—খেয়ে সে।
সাগরের চারধার, ঘিরে থাকে বারবার,
অদ্ভুত কারবার—বাপু রে;
পড়িয়া বে-কায়দায়, সকলেই হায় হায়,
হিংসায় যায় যায়—গা' পুড়ে।
এলে তার সাম্‌নেই, কারো কোনো দাম নেই,
কারো কোনো নাম নেই—আহারে;

ভয়ে যায় কুঁক্‌ড়িয়ে, কেঁদে যায় ডুক্‌রি
শুধু ওঠে মুখ দিয়ে—'হা হা' রে!
নিধি এলো বাংলায়, কেবা বলো সাম্‌ল
ভাগে সব হ্যাংলায়—ত্বরিতে;
কেউ কাছে ঘেঁষে নাই, তার সনে মেশে ন
তার জুড়ি দেশে নাই—লড়িতে।
হোলো বুঝি বিধি বাম, হায় সেই নিধির
শুয়ে থাকে অবিরাম—ঘরেতে;
ম্যালেরিয়া ধরে তার, কাবু করে জ্বরে ত
কাঁপে শুয়ে ঘরে তার—জ্বরেতে।
দুর্দ্দশা এ কী তার,
ভালো হবে সেকি আর?
ক্ষোভ হয় দেখি তার—দশা যে;

যে কখনো হারে নাই,
কারো ধার ধারে নাই,
কাবু করে তারে ভাই—মশা যে!

এমনটি শুনেছ ?

ইন্দিরা দেবী

কালো কুৎসিত কাফ্রি পুতুলটা কেমন করে একটা নীল রংয়ের কোট আর একটা চমৎকার টাই যোগাড় করেছে। টিলটিলে পায়জামা পরাই ছিল ; তার সঙ্গে নীল কোট আর টাই ঝুলিয়েছে—মাথার চুলগুলো সোজা হয়ে আছে আর খুসীতে সাদা দাঁতগুলো আর ঢাকতেই চাইছে না। খেলাঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে আর একবার করে খেলাঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছে যাচ্ছে, ঘুরে ফিরে নিজের মুখ দেখছে আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে ফেটে পড়ছে যেন—মনে মনে কখনও বা মুখ ফুটেই বলে ফেলছেঃ কী চমৎকার দেখাচ্ছে আমায়!

ওর রকম-সকম দেখে সাহেব পুতুল গম্ভীর হয়ে বসে আছে, অন্য পুতুলরা মুখ টিপে হাসছে, ছোটরা তো হেসে গড়াতে আরম্ভ করেছে। পেটমোটা ভালুক সবাইকে ধমকাচ্ছেঃ এত হাসি কিসের বল তো? তোদের জন্য কেউ কিছু করবে না?

কোঁকড়া চুল নীল চোখ মেম পুতুল জোরে হেসে উঠলোঃ কিন্তু দেখছো কি ভালুক খুড়ো, সাজটা কি রকম হয়েছে? নীল কোট, টাই আর পায়জামা, মাথার চুলগুলো তো সোজা, চোখ দুটো মনে হচ্ছে ঠেলে বেরিয়ে এলো বলে—ঐ ভঙ্গিমায় আবার ঘন ঘন আয়নার কাছে যাওয়া হচ্ছে—ও কি ভাবছে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে? কি করে হাসি চাপি বল? ভালুক একবার ঘাড় ঘুরিয়ে কুচ্ছিত পুতুলটাকে দেখে নিলে, সাদা দাঁত একটু বার করে মুচকি হাসলে, তারপর বল্লেঃ যাও যাও চা করগে, কখন সকাল হয়েছে এখনও এক কাপ চা পেলাম না। কি রকম যে সব ব্যবস্থা!

—চা তো রেডি। এসো তোমরা।

সকলে মিলে চায়ের টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলে—এর মধ্যে কখন যে গিন্নী বৌ পুতুল সব ব্যবস্থা করে রেখেছে তা কেউ জানে না। গরম সিঙারা, টোস্ট, বিস্কুট সব থরে থরে সাজানো আর টি-পটে চা ভিজছে।

—কই রে খরগোস, সকলকে ডাক—তোরাও আয়। ভালুক খুড়ো হাঁক দিল।

কান উঁচু করে চকচকে চোখ ঘুরিয়ে দু'লাফে খরগোস এসে বল্লেঃ আমি তো এখানেই খেলছিলাম। হাতী মেসো বলেছে যে, কাছাকাছি কোথায় লেটুস পাতা পাওয়া যায়, তাই শুনছিলাম। চায়ের কাপে দুধ দিয়ে নাড়তে নাড়তে মেম পুতুল বল্লেঃ খবর তো কিছু রাখো না, কালই এ বাড়ীতে লেটুস পাতা এসেছে, রত্নাদের চাকর কাল এনেছে বাজারের সময়, আমি খেলাঘরে বসে স্বচক্ষে দেখেছি। রত্নার দাদা কাল স্যালাড করতে বলেছিল ওর মাকে—মা তাই বলে দিল বিট, গাজর, আর যেন সব কি কি, আর লেটুস পাতা। চাকরটা ফিরে এসে বল্লে কি জানো, বল্লে সারা বউবাজার, কলেজ ষ্ট্রীটে লেটুস পাতা নেই, এটা আনতে তাকে নিউ মার্কেটে যেতে হয়েছিল। তাই তো আমি সব শুনলাম। নিশ্চয় সব ফুরিয়ে যায়নি, ইচ্ছা করলে এক-আধটা যোগাড় করে নিতে পারো। এই বলে মেম পুতুল সকলের দিকে কাপসুদ্ধ চা এগিয়ে দিতে লাগলো।

সকলে যখন চা খাওয়া শুরু করেছে, এমন সময়

কাফ্রি পুতুল এসে হাজির—কই আমার চা ?

সত্যিই তো যাকে নিয়ে এত আলাপ-আলোচনা, তার চা'য়ের কথা একদম মনে নেই! কিন্তু একটাও তো আর কাপ নেই! এ কি হলো? বারোটা কাপ আছে, কিন্তু গুণে দেখা গেল এগারোটা এগার জনে খাচ্ছে কিন্তু আর একটা কাপ নেই। মেম পুতুল বল্লেঃ তোমার পেয়ালা কোথায় ?

—আমি কি জানি? কাল চা খেয়ে তো ঐখানেই রেখেছিলাম।

—তবে এটার দফা গয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়—কার কাজ? খরগোস তোমার?—খুড়ো হাঁকলো।

খরগোস ঘাড় নেড়ে বল্লেঃ নাঃ, আমি—মোটেই না!

—তাহলে হাঁসগিন্নীর নতুন বাচ্চাটা কিংবা টমের কাজ। টমের বয়স আর বুদ্ধি হলে কি হবে? খেলতে পেলে তো আর কিছু চায় না। কাপটাকে নিয়েই বলের কাজ করেছে হয়তো—ভারী গলায় হাতী মেসো বল্লে।

গিন্নী পুতুল বল্লেঃ যাইই হোক, পরে খোঁজ করলেই হবে, এখন কাফ্রি যা একটা কিছু নিয়ে আয়—চা খেয়ে নে।

—কি আবার আনবো, কোথায় কি পাবো? ঐ ডিসটায় দাও যা হয় করে—মুখ ভারী করে কাফ্রি পুতুল বল্লে।

—ডিসে করে খেতে গেলে তোমার জামায় পড়বে, জামাও যাবে, টাইও যাবে—তখন?—চোখ মটকে হলদে ঠোঁট নেড়ে হাঁসগিন্নী বল্লে।

—সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেল—যা চট করে আন—গিন্নী পুতুল তাড়া দিল।

কাফ্রি আর কি করে, খুঁজতে গেল। সকাল থেকে সে সেজেগুজে সকলকে দেখাচ্ছে আর নিজে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছে, নিজের রূপ দেখে নিজেই খুসী হয়ে উঠছে। আর এখন তাকে আবার চা খাবার পাত্র খুঁজতে হবে—আশ্চর্য্য! রাগ হলো খুব তার।

কিছুই পাওয়া গেল না, খুঁজতে খুঁজতে শেষে একটা প্লাষ্টিকের জিনিস পাওয়া গেল, সেটা রত্নার সেলাই-এর বাক্স থেকে। রত্না যখন সেলাই করে, আঙ্গুলে ওটা পরে নেয়।—ব্যস, আর কি, এতেই চা খাওয়া যাবে বেশ।

কিন্তু ভালুক খুড়ো ধমকে উঠলো, ঠিক যখন মেম পুতুল টি-পট থেকে চা ঢেলে দিয়েছে আর কাফ্রি সেটা মুখের কাছে উঠিয়েছে। এমন সময় ভালুক খুড়োর ধমকানোর ভারী আওয়াজে চমকে উঠলো কাফ্রি, কাপটা তো ছিটকে পড়লোই আর মাটির উপর যে চা পড়লো, তাতে পা পিছলে কাফ্রিও চিৎপটাং হলো।

সত্যি খুব লেগেছে। উঁ, উঁ, উঁ—কান্না আর থামে না। পায়ে খুব লেগেছে।

—সকালবেলা কার মুখ দেখে উঠেছিস বলতো, না হলো চা খাওয়া, আবার ভাঙ্গলো ঠ্যাং—গিন্নী পুতুল এগিয়ে এসে কাফ্রির চোখ মুছিয়ে, পা টেনে দিয়ে বলতে লাগলো

—তুমি আর ওকে আদর দিও না মাসী, সকালবেলা কাণ্ডখানা দেখ—তারপর রত্নার সেলাই-এর জিনিসটা কোথায় ছিটকে পড়লো খুঁজে পেলে হয়। এই সব, দেখ না তোরা! না যদি পাওয়া যায় রত্না কি ভাববে সেলাই করতে গিয়ে! তুমি ছেড়ে দাও মাসী, ও উঠুক, ওদের সঙ্গে খুঁজে দেখুক।

কাফ্রি পা টেনে টেনে উঠলো আর শুধু ছোটরা নয়—ভালুক খুড়ো, হাতী মেসো থেকে বড়রা পর্য্যন্ত এদিক্ ওদিক্ খুজতে লাগল। কিন্তু কেউই তো দেখতে পাচ্ছে না কিছু।

অবশেষে কাফ্রিই চেঁচিয়ে উঠলোঃ ঐ যে দেখা যাচ্ছে চিকচিক করছে। সকলে মিলে ঝুঁকে পড়লো সেইদিকে, সত্যিই তো কাফ্রি যা বলেছে ঠিক—ঐ তো দেখা যাচ্ছে।

—কিন্তু ওখানে তো আমার হাত পৌঁছবে না, কি হবে ?

খেলাঘরের সাদা ইঁদুরটা ছুটে এলো—কিচমিচ করে বল্লেঃ পাবে কি করে, ও তো আমাদের গর্ত্তের মধ্যে গিয়ে পড়েছে।

—দাও না ভাই দয়া করে এনে—কাফ্রি বলে উঠলো।

—অবশ্যই এনে দেবো, কিন্তু তুমি আমায় কি দেবে?

—যা বলবে, যা বলবে—চেঁচিয়ে বলে উঠলো কাফ্রি

গলার আওয়াজটা নরম করে ইঁদুর বল্লেঃ কিন্তু আমি চাইছি তোমার গলার ঐ সুন্দর টাইটা—দেবে তো?

—কখনও না—চীৎকার করে উঠলো কাফ্রি পুতুল তারপর গজরাতে গজরাতে বল্লেঃ জানো এটা কত দামী আর কত সুন্দর, এরকমটা কারুর নেই।

—বেশ, বেশ, তুমিও যখন ওটা দিতে পারবে না, আমিও তোমার কাজ করতে পারবো না, চললুম।

ইঁদুর তো চলে গেল কিন্তু কাফ্রির অবস্থা মনে করো! সব পুতুলরা এসে ঘিরে ধরলো তাকে—আর বকুনী আরম্ভ হলো।

—কাফ্রি এরকম করলে এ খেলাঘরে কি আর থাকতে পারবে?—মেম পুতুল বল্লে।

—তাছাড়া এরকম স্বার্থপর হলে তো চলবেই

না—হাতীর মোটা গলার আওয়াজ।

—আমরাই বা এরকম বরদাস্ত করবো কেন? রত্নার জিনিসটা হারিয়ে যাবে, আমরা তার বন্ধু হয়ে কিছু করতে পারবো না, এটা একটা কথা হলো!—সেপাই বল্লে।

—কী বলছে কাফ্রি, টাইটা ওকে দেবে না?—গিন্নী পুতুল বল্লে।

—ওসব রেখে দাও, ইঁদুরকে দিয়ে ওটা তোলাতেই হবে, তার জন্য কাফ্রিকে যা হয় দিতে হবেই! কাফ্রি!—ভালুক খুড়ো জোর দিয়ে ডাকলো।

কাফ্রি আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালোঃ কি বলছো খুড়ো?

—রত্নার সেলাই-এর বাক্স থেকে ওটা বার করেছিলে কেন? ওটা হারালে এখন কি হবে? ও আমাদের এত ভালোবাসে আর তুমি স্বার্থপরের মত কি করছো? ইঁদুর কি বলছে—তুলে দেবে না?

—ও যে টাইটা চাইছে, আমার খুব পছন্দ—

ধমকে উঠলো ভালুক খুড়োঃ তাহলে রত্নার ওটা উদ্ধার হবে না, তুমি ভারী স্বার্থপর তো হে ছোকরা!

গিন্নী পুতুল বল্লেঃ দে বাবা দে, আবার কত টাই পাবি, রত্না তো রোজই আমাদের জন্য জামাকাপড় তৈরী করছে, কত টুকরো পড়ে থাকে, আমি তোকে একটা টাই তৈরী করে দেবো।

হাঁসগিন্নী আপনমনে বলতে লাগলোঃ সকালবেলাই আজ কি বিভ্রাট রে বাবা! আর নিজের জাতীয় পোষাক ছেড়ে, পরের দেশের টাই-এর উপর এমন সৃষ্টিছাড়া লোভ তো কখনও দেখিনি।

কাফ্রি অবশেষে রাজী হলো—আর তখনি ইঁদুর গর্তে গিয়ে মুখে করে ওটা আনলো।

সকলে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো আর খরগোস সেটা মুখে করে নিয়ে গিয়ে চট করে রত্নার সেলাই-এর বাক্সে রেখে দিয়ে এলো।

কাফ্রি এককোণে গিয়ে নাক ফুলিয়ে আপনমনে বলছেঃ আমার মত দুঃখ তো কারুর হয়নি, তাই অত আনন্দ হচ্ছে সব। আমার অমন টাই-টা—

ভালুক খুড়ো ডাক দিলঃ কাফ্রি, এদিকে এসো!

কাফ্রি ভয় করে কেবল খুড়োকে আর ভালোবাসে গিন্নী পুতুলকে। তাই তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াতেই ভালুক বল্লেঃ কি হয়েছে? মুখ কালো করছো কেন? টাইটা খুলে তোমায় কত সুন্দর যে দেখাচ্ছে, যাও আয়নায় গিয়ে দেখগে।

কাফ্রি তখন হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে। কান্নাভেজা গলায় বল্লেঃ আমার টাই ছাড়া কেউ আমায় পছন্দ করবে না?

—কে বলেছে? হুঙ্কার দিয়ে উঠলো হাতী।—দেখগে কি রকম দেখাচ্ছে সুন্দর তোমায়।

—তাছাড়া, তুমি এইরকম স্বার্থত্যাগ করেছো বলে আজ তোমার জন্য আমরা একটা চায়ের আসরের ব্যবস্থা করেছি—যাও চোখমুখ ধুয়ে এসো টেবিলে—ভালুক খুড়ো সান্ত্বনার সুরে বল্লে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে এসে চায়ের টেবিলে জড় হলো। কাফ্রির মুখ তখন ফোলা ফোলা, দূরে দেখা যাচ্ছে টাইটা গলায় ঝুলিয়ে ইঁদুর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে।

গিন্নী পুতুল আপন মনে বলে উঠলোঃ আহা, দেখে আর বাঁচি না, সখ করে তো নেওয়া হলো, কালকের মধ্যেই তো কুট কুট করে কেটে ফেলবে—তার আবার অত।

কিন্তু চায়ের আসর জমিয়ে তুললো মেম পুতুল, খরগোস টম, সেপাই, হাঁসগিন্নীর ছেলেমেয়েরা। ভারিক্কী চালে ভালুক খুড়ো আর হাতী মেসো বসে রইল—একটু একটু হাসছিলও—

বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল কালো মুখে সাদা দাঁত বার করে কাফ্রি খুব হাসছে—আর গিন্নী পুতুলের তৈরী গোকুল পিঠে নিয়ে খরগোসের সঙ্গে মারামারি করছে।

হাতী আর ভালুক দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বল্লেঃ চল হে, ঠিক হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, এবার চায়ের আসরে বারোটা কাপই পাওয়া গেল, সে-খবরটা এতক্ষণ দেওয়া হয়নি।

বাঘের সঙ্গে মিতালী

শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদার

পশু ও মানুষ দুয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! কিন্তু এই দুজনেই আবার হয়ে উঠতে পারে পরম আত্মীয়! নিছক ভালবাসা ও সেবার দৌলতে তারা ভরিয়ে তুলতে পারে তাদের নিজেদের জীবন।

খুব শক্ত ছেলে ঐ সোমেশ্বর। বয়স মাত্র ষোলো হলে হবে কি? ওর মত পালোয়ান ও-দেশে কমই আছে। বয়সের আন্দাজে অতিরিক্ত লম্বা ত বটেই ও, দেহটা গড়ে উঠেছে যেন লোহা দিয়ে! নধর মসৃণ দেহে খেয়াল মত যখন-তখনই সে ফুলিয়ে তোলে ইস্পাতের মত শক্ত পেশীর মালা। তার উপর তরোয়ালের কোপও বসে না বোধ হয়।

সোমেশ্বরের বাবা এসেছিলেন চামরকাটা বাগানের কেরাণী হয়ে ত্রিশ বছর আগে। তিনি মারাও গেছেন আজ দশ বছর হল। বিধবা স্ত্রী আর নাবালক পুত্র ছাড়া দুনিয়ায় আর আপনার বলতে কাউকে রেখে যাননি ভদ্রলোক; বাংলাদেশের কোন্ অংশ থেকে যে তিনি এসেছিলেন তরাইয়ে, তা কেউই জানত না, বুঝি তাঁর স্ত্রীও না। জনশ্রুতিতে সাংঘাতিক রকমের বোমারু ছিলেন তিনি যৌবনে। পুলিশের চোখে ফাঁকি দেবার জন্যই ছদ্মনাম নিয়ে এসে লুকিয়ে ছিলেন চামরকাটায়; নিজের পূর্ব্ব-জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে তাই তাঁকে বাধ্য হয়েই নীরব থাকতে হয়েছিল।

যাক, বাবা ত মারা গেলেন, শিশুপুত্র নিয়ে মা যান কোথায়? বাগানের বাইরে বেওয়ারিশ কিছু জমি পড়ে ছিল। বিধবা সেইখানে ঘর বাঁধলেন গিয়ে। সামান্য যা কিছু টাকা হাতে ছিল, তাই দিয়ে কিনলেন এক দুগ্ধবতী মহিষী। সোমেশ্বর তারই দুধ খেতো, আর উদ্বৃত্ত দুধ থেকে মাখন ও ঘি তৈরী করে আশেপাশের বাগানেই বিক্রীর জন্য পাঠাতেন তার মা। এই থেকেই সংসার চলত।

সোমেশ্বর প্রায় এক সঙ্গেই দুই মাকেই হারালো—অর্থাৎ মা এবং মোষ। তবে তখন সে বড় হয়ে উঠেছে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে গেছে। কুড়োল ঘাড়ে করে জঙ্গলে ঢোকে, আর কাঠ কেটে আনে বোঝা বোঝা। ছোট্ট ঠেলাগাড়ী আছে ওর নিজের। তাইতে করে শালের গুঁড়ির টুকরো সব নিয়ে যায় মাটিগাড়ার হাটে। জলের দরেই বেচে অবশ্য, কিন্তু তাতেও সোমেশ্বরের মন্দ রোজগার হয় না।

সময়টা তার কাটে জঙ্গলে এবং রাস্তায়। কাজেই ঘরের কোন আবশ্যকতা হয় না তার। মায়ের তৈরী ঘর আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ে গেল, সর্ব্ব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সোমেশ্বর বনে বনে পথে পথে ঘুরতে লাগল মনের আনন্দে।

বেশ আছে, হঠাৎ এক গেরো বাধল! মুক্ত পুরুষের গলায় নতুন বাঁধন পরিয়ে দিলেন ভগবান্। সেই কথাই বলি।

তরাইয়ের জঙ্গল। এক এক জায়গায় সুন্দরবনকেও হার মানিয়ে দেয়। দুর্ভেদ্য ত বটেই, হিংস্র শ্বাপদেরও অভাব নেই। অজগর এবং বাঘ অহরহই চোখে পড়ে সোমেশ্বরের। সে ভ্রূক্ষেপও করে না। ওরা আবার কি করবে? কুড়োল হাতে না-ও যদি থাকে, গলা টিপেই সোমেশ্বর নিকেশ করতে পারে ওদের।

সেদিন কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল একটু বেয়াড়া। সান্‌কিঝোরার পাড়ে দাঁড়িয়ে সোমেশ্বর ও-পারের শিমূল-বনের দিকে তাকিয়ে আছে। যখনি তাকায়, তখনি নতুন করে অবাক হয়ে যায় সে। পাহাড়ের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত থাকে থাকে শিমূল-গাছের লাইন—ডাইনে বাঁয়ে যতদূর দু' চক্ষু যায়! আর সেই হাজার শিমূল-গাছের আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে একটা একটানা নিরবচ্ছিন্ন লাল রঙের বান ডেকে গেছে—উদ্বেল, উজ্জ্বল, তরঙ্গায়িত! অপরূপ!

বলছিলাম, ঐ ফুলের মায়ালোক পানে তাকিয়ে আছে সোমেশ্বর, ঝোরার পাড়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কোথায় যেন খুস্ করে একটু শব্দ হল! অত্যন্ত অস্পষ্ট। বাতাসে শুকনো পাতা ঝরে পড়লেও ওরকম একটা আওয়াজ হওয়া সম্ভব। কিন্তু শুকনো পাতা হলেও সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার বনচরের পক্ষে। না রাখলে বিপদের আশঙ্কা আছে। সোমেশ্বর বিপদকে ভয় করে না, কিন্তু খামাকা বিপদে

পড়বার মত নির্ব্বোধও নয় সে। সে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। আপনা হতেই তার হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠল কুড়োলের হাতলের উপর।

সে ভাল করে ফিরে দাঁড়াবার আগেই বিকট গর্জ্জন করে বাজ ডেকে উঠল যেন তার কানের কাছে! আর বনের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে একটা ছোটখাটো পাহাড় যেন এসে দড়াম্ করে আছড়ে পড়ল তার পায়ের তলায়! দুটো আগুনের গোলার মত গোল চক্ষু, তাতে হিংস্র দৃষ্টি!

বাঁ হাত-খানা এক সেকেণ্ডের ভিতর এগিয়ে দিল সোমেশ্বর। বাঘের থাবা এসে পড়ল তারই উপরে। ডান হাতে শূন্যে উঠল ভয়াল টাঙ্গি, খর রৌদ্রে ঝক্‌মক্ করে।

সোমেশ্বরের হাত থেকেও রক্ত ঝরছে। বাঘের মাথা থেকেও ঝরছে তেমনি। বাঘের রক্তে মানুষের রক্ত মিশে স্রোত বইতে লাগল—সানকিঝোরার জলের পানে। বাঘের মাথায় আঘাত লেগেছে দারুণ, তার রক্ত-চক্ষু ঘোলাটে হয়ে এল।

সোঁ-সোঁ রবে ঘুরতে লাগল টাঙ্গি, আঘাতে আঘাতে ঘায়েল হয়ে ধরাশয্যা গ্রহণ করল বিশালবপু শার্দ্দুল। উঃ, এত বড় বাঘ ত তরাই জঙ্গলে দেখা যায় না সচরাচর!

বাঘকে ছেড়ে দিয়ে নিজের দিকে মনোযোগ দিল সোমেশ্বর এবার। বাঁ হাতখানাই দারুণ জখম হয়েছে। রক্ত ত পড়ছেই অঝোর ধারে, হাড়ও ভেঙ্গেছে বোধ হয়। কী এখন করা যায়? শেষকালে হাসপাতালে যেতে হবে না কি সোমেশ্বরকে? ধিক্! তার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল ছিল।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। তার মায়ের শেষ সময়ে এক বুড়ো পাহাড়ী তাঁর কাছে আসত। কি করে মায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল বুড়োর, তার কোন খবরই জানত না সোমেশ্বর। মা তাকে ডাকতেন 'বাবা' বলে, এবং সোমেশ্বরকে সে ডাকত 'দাজু'। মা একদিন বুড়োকে বললেন—"বাবা! দাজুকে তুমি একটা কিছু দাও!"

সোমেশ্বর চমকে উঠেছিল। "দাও!" সে কেন দান নিতে যাবে এই নোংরা পাহাড়িয়ার কাছে? মায়ের কি মরণকালে মতিচ্ছন্ন হল না কি?

কিন্তু বুড়ো বেশ সপ্রতিভভাবেই বলল—"দেব? আচ্ছা, দিই!"

চট্ করে উঠে সে জঙ্গলের দিকে চলে গেল, ফিরে এল মিনিট দশেকের ভিতর। ফিরে এল একটা ছোট চারা-গাছ হাতে করে। এসে সেইটে সোমেশ্বরের হাতে দিয়ে বললে—"এই নে দাজু! বিশল্যকরণী একেই বলে!"

ওর গুণ ব্যাখ্যা করতে বুড়োর পুরো একটি ঘণ্টা লেগেছিল। সব কি ছাই মনে আছে সোমেশ্বরের? হাঁ, একটা কথা ও ভোলেনি কিন্তু। বুড়ো বলেছিল—"এ ওষুধ যে জানে, তার উপর কিন্তু একটি আদেশ আছে মহাদেবের। আহতকে শত্রুজ্ঞান করলে চলবে না।"

কথাটা বেশ মনে আছে—এখনও। ওষুধের গাছ সান্‌কিঝোরার কূলেই পাওয়া গেল। পাথরের উপর পাথর দিয়ে থেঁৎলে সেই গাছের পাতা-ডাঁটি সব দিয়ে একটা মলম তৈরী করে ফেলল সোমেশ্বর। নিজের হাতে লাগিয়ে দিয়ে, এবারে বাঘের পানে চাইল সে। বাঘ তখন অবসন্ন, এত রক্ত পড়েছে যে নড়বার শক্তি আর নেই তার।

মহাদেবের আদেশ—আহতকে শত্রুজ্ঞান করলে চলবে না। সোমেশ্বর উঠে বাঘের কাছে গেল। জল নিয়ে এল সান্‌কিঝোরা থেকে। ক্ষতগুলি ধুইয়ে দিল সযত্নে। সোমেশ্বর এত কাছে বসে আছে যে, মরণাপন্ন হলেও একটি থাবায় বাঘ তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিতে পারে এখন। কিন্তু সে দিকে মন নেই তার। সোমেশ্বর যে এখন তার বন্ধু, বনের পশু তা সহজেই বুঝতে পেরেছে।

বাঘ আর মানুষ এক সাথেই সেরে উঠল।

তারপর?

তারপর বাঘ আর সোমেশ্বরকে ছাড়ে না। সোমেশ্বর কাঠ কাটে, সে চুপ করে বসে থাকে এক পাশে। ভাবটা এই—পারলে সে বন্ধুকে সাহায্য করে এই শ্রমসাধ্য কাজে। সোমেশ্বর ঠেলাগাড়ী নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যায় যখন, তখন বাঘ জঙ্গলের সীমানায় গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, বিদায়-সম্ভাষণ জানাবার জন্য। গরর্ গরর্ করে তার গলা থেকে কি-যেন আওয়াজ বেরোয়! হয়ত সে বলে—"তাড়াতাড়ি ফিরে এস বন্ধু! আমি এখানেই রইলাম তোমার প্রতীক্ষায়।"

সত্যই প্রতীক্ষায় থাকে সে। একদিন পরে হ'ক, দু'দিন পরে হ'ক—ফিরে এসে যেই জঙ্গলে পা দিয়েছে সোমেশ্বর অমনি 'হুম্' করে কোথা দিয়ে একলাফে তার সামনে এসে পড়বে বাঘা! ওরই পায়ের ভিতর মাথা গলিয়ে দিয়ে ঘড়র ঘড় শব্দ করবে আদুরে বেড়ালের মত!

সোমেশ্বর হেসে ফেলে। পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় বন্ধুর! বলে—"তুই ত বড়ই আট্‌কে ফেললি আমায় বাঘা! এতটা ভাল নয়!"

ভাল সত্যিই নয়। একদিন ভীষণ ব্যাপার ঘটল এ থেকে। মাটিগাড়ার হাটে কাঠ বিক্রী করে সোমেশ্বর যেমন ফিরতে

যাবে জঙ্গলের দিকে, তার দেখা হল চামরকাটার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। ভদ্রলোক বড়ই ভালবাসতেন ওকে। ভদ্রসন্তান হয়েও সে বনবাসী, সুন্দর সুপুরুষ হয়েও সে কাঠুরে মজুর। এই যে তার চরিত্রের ভিতর পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্য, এতেই তিনি বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন সোমেশ্বরের প্রতি। দেখলে আর ছাড়তে চান না।

যাই হক, এবার আর ডাক্তারবাবুর হাত ছাড়াতে পারল না সোমেশ্বর। কাজেই আজ দীর্ঘদিন পরে চামরকাটায় ফিরে এল সোমেশ্বর। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মাতৃস্নেহে গ্রহণ করলেন তাকে।

দেখতে দেখতে তিন দিন কেটে গেল। সোমেশ্বর রোজই ভাবে—"না, না, কাল সকালে উঠেই পালাবো। এরকম নেশা ভাল নয়। বাঘা ওদিকে ভাবছে।"

বাগানের ভিতরেই একটা বেঞ্চের উপর পড়েছিল সোমেশ্বর, তারায়-ভরা নীলাকাশের নীচে। ঘুম তার চিরদিনই গাঢ়। কানের কাছে ঢাক পেটালেও ভাঙ্গতে চায় না সে ঘুম। আজও তেমনি প্রগাঢ় সুষুপ্তি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকে।

হঠাৎ একটা হৈ হৈ কোলাহল! শত কণ্ঠের চীৎকার একসঙ্গে, ঢাক-ঢোলের শব্দ এবং বন্দুকের আওয়াজ। হঠাৎ সব কিছু ছাপিয়ে বিকট গর্জ্জন শোনা গেল একটা। আর সেই গর্জ্জন শুনেই লাফিয়ে উঠল সোমেশ্বর। এ যে বাঘা! তারই বাঘা! বাঘা তার হারানো বন্ধুকে খুঁজতে এসে বিপদে পড়ে গেছে! নিজের জীবনের চিন্তায় সে ব্যস্ত নয় মোটেই। সে চারিদিকে খুঁজে ফিরছে শুধু সোমেশ্বরকে।

সোমেশ্বর এক লাফে গিয়ে পড়ল বাঘার সম্মুখে। তাকে জড়িয়ে ধরল দুই হাতে, তারপর স্তম্ভিত মূক হতভম্ব জনতাকে বাঁ হাত তুলে নিবৃত্ত করে বাঘাকে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে ব্যূহ ভেদ করে। বাঘার মুখ থেকে বিজয়োল্লাসে নিঃসৃত হল—এক অনুচ্চ গরর্ গর্ গর্জ্জন!

আর কখনো লোকালয়ে দেখা যায়নি সোমেশ্বরকে। পাহাড়ীদের মধ্যে জনশ্রুতি রটে গেল ক্রমে ক্রমে—সোমেশ্বর তরাই ছেড়ে পাহাড়ে উঠে গেছে। নিভৃত পুষ্পিত উপত্যকায় সে ঘোরে ফেরে তার বাঘা বন্ধুর সঙ্গে। একই গুহায় ঘুমোয় দুজনে, একই খাদ্য খায় একত্র বসে। আর প্রভাতে-সন্ধ্যায় রক্ত-সূর্য্যের পানে নির্নিমেষে তাকিয়ে দুজনেই ধ্যান করে একসাথে সেই বিশ্বদেবতার,—পশু ও মানুষ দুইয়েরই অন্তরে যিনি যুগপৎ বিরাজমান!

ঠাকুর্দ্দা আর নাতি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আমরা দু'জন ঠাকুর্দ্দা আর নাতি,
গাছে লাগাই জাল-আঁকশি
পুকুরে ফাঁদ পাতি।
ফল পাড়ি আর মাছ ধরি
তা-ধেই তা-ধেই নাচ করি
নানান কাজে খাটাই মাথা
ঘুমিয়ে রাতারাতি।

এই যে সুতোয় ঝুলছে জুতো
বঁড়শি দিয়ে গেঁথে,
পুকুর থেকে আনছি তুলে
ছিপ্ দিয়ে ফাঁদ পেতে।
জাল-আঁকশি নাতির হাতে
ফল পেড়েছে গভীর রাতে
সবগুলো তা'র ফুরিয়ে গেছে
চাখ্‌তে খেতে খেতে।

আবা খাবা গোমড়া মুখে
আমরা হাসি মনের সুখে
ভেংচি কেটে রাগাও যদি
লাগবে হাতাহাতি!
ডিগবাজীতে মাতিয়ে দেবো
ঠাকুর্দ্দা আর নাতি।

ব্রহ্মদত্যি আর বাজনদার

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

একদিন ভুঁইমালীরা নাকি ছিল বিরাট বড়লোক! এ বড়লোকী তাদের দু-এক পুরুষের ঠুনকো বড়লোকী নয়, সাত পুরুষের বড়লোকী। আজ কিন্তু তারা নিশ্চিহ্ন। দুনিয়ায় তাদের আর কোন অস্তিত্বই নেই। জল-হাওয়ার সাথে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তারা।

শোনা যায় সাত পুরুষ আগে ঈশ্বর ভুঁইমালী নাকি পোড়ো টাকা পেয়ে রাতারাতি ফেঁপে ফুলে মোটা হয়ে উঠেছিল। গাঁয়ের জমিদারদের জাঁকে প্রাসাদোপম অট্টালিকা হাঁকিয়েছিল। ঘর ভরে দিয়েছিল বিচিত্র আরাম-বিলাসের উপকরণে।

তারপর? তারপর মূর্খ পুত্র আর অকর্মণ্য বিলাসী বংশধরদের হাতে পড়ে 'ছিল ঢেঁকি হোলো তুল, কাটতে কাটতে নির্মূল!' হয়ে গেছে! স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধলঙ্কায় পরিণত হয়েছে। দুরন্ত কালের বুকে নীরব সাক্ষী হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে আছে হাড়-পাঁজর-দাঁত-বের করা বাড়িটা। সর্বত্র ভরে গেছে আগাছার ঘন জঙ্গলে। আর সেখানে বাসা বেঁধেছে যত রাজ্যের সাপখোপ ভূতপ্রেত রাক্ষস-খোক্কসের দল।

কি করে ঈশ্বর ভুঁইমালী পোড়ো ধন পেয়েছিল তা সঠিক কেউ কিছু বলতে পারে না। নানা জনে নানা কথা বলে, 'নানা মুনির নানা মত' প্রচলিত আছে। কেউ বলে, ঈশ্বর খুব ভোরে নদীর ঘাটে নাইতে গিয়ে নদীর চরে 'গজগিরি' পেয়েছিল। কেউ বলে, বাস্তুভিটেয় পূর্বপুরুষের গাড়া ধন পেয়েছিল। আবার অনেকে বলে, ঈশ্বর 'যখের ধন' পেয়েছিল। কিন্তু আমরা শুনেছি, ঈশ্বর ব্রহ্মদত্যির টাকা পেয়ে বড়লোক হয়েছিল। সে সম্বন্ধে একটি উপকথাও প্রচলিত আছে। লোকের মুখে প্রায়ই এ কাহিনীটি শোনা যায়।

ঈশ্বর ভুঁইমালীর জাতীয় পেশা বাজনা বাজানো। দলবল নিয়ে সে যেতো দেশবিদেশে বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন পুজোআর্চা উপলক্ষে বাজনা বাজাতে। একবার নাকি বিরাট এক বড়লোকের বাড়ির বিয়েতে বাজনা বাজাতে গিয়েছিল ঈশ্বর তার দলবল নিয়ে। আর আর বাজনদাররা বাজনা শেষ করে বেলা থাকতেই বাড়ি রওনা দিয়েছিল। আর ঈশ্বর বাবুদের মনোরঞ্জন করে বকশিস-ফকশিস আদায় করে যখন মাঠে নেমেছিল, তখন আর বেলা ছিল না। সূর্য ডুবু-ডুবু। বিশ্ব জুড়ে নেমে এসেছিল গোধূলির ধূসর ছায়া। মাইল খানেক আসতে না আসতে গাঢ় হয়ে উঠেছিল অন্ধকার। চারিদিক্ থমথম করছিল। ঈশ্বর তখনও চলছিল মাঠের মধ্য দিয়ে। মাঠটির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল বড় বিশ্রী এবং ভয়ংকর। নামটাও একটু ভুতুড়ে-ভুতুড়ে। শুনলেই গায় কাঁটা দেয়। আঁতকে উঠতে হয়। ভয়ের শিহরণ নামে সর্বাঙ্গে। প্রতি লোমকূপে।

মাঠের দক্ষিণধারে কুখ্যাত কালীখোলা। সেখানে দাঁড়িয়ে তিন-মানুষ উঁচু বিরাট শ্মশানকালী মূর্তি। কণ্ঠে নরমুণ্ডমালা। ডান হাতে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড। বাঁ হাতে খড়্গ। কালীখোলার পাশেই বাঁধান বট অশথ গাছ। বাঁধান শ্মশানঘাট। মাঠটার নাম 'ব্রহ্মদত্যির মাঠ'। সুতরাং পরিবেশটি রীতিমত ভৌতিক এবং রহস্যপূর্ণ। এখান দিয়ে সন্ধ্যের পরে পথ চলতে অতিবড় সাহসীরও নিঃসন্দেহে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হবে। তাই সন্ধ্যের পরে এ পথে কেউ চলে না। এ স্থানটির সম্বন্ধে বহু ভয়ের কাহিনীই প্রচলিত আছে। দুঃসাহসী ঈশ্বর কিন্তু নির্ভয়েই পথ চলছিল। ও ছিল অদ্ভুত শক্তিশালী এবং লম্বাচওড়া জোয়ান। সাহসও ছিল ওর দারুণ।

দুজনেই শুরু করে তাণ্ডব নৃত্য।

নিঃশব্দে পথ চলতে চলতে হঠাৎ ঈশ্বরের মনে হোলো, তার পেছনে কেউ হাঁটছে। কানে আসছে মানুষের পায়ে চলার শব্দ। ফিরে তাকালো ঈশ্বর। দেখলো, এক বিরাট পুরুষ নৃত্য করতে করতে তার দিকে আসছে। পুরুষপ্রবর উঁচু দশ ফুটের কম নয়। চেহারাখানা গিরিরাজের মতোই প্রশস্ত এবং বিশাল। গলায় ধবধব করছে শুভ্র সুদীর্ঘ একগোছা যজ্ঞোপবীত। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের কণ্ঠমাল্য। কপালে রক্তচন্দনের রক্তলেখা। চোখে অলোকসামান্য ঔজ্জ্বল্য। সর্বাঙ্গে নৈসর্গিক দীপ্তি। মরুপ্রভার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির মতো।

ব্রহ্মদত্যিকে দেখে ঈশ্বর একটুও ভয় পেল না। ফিরে দাঁড়ালো এবং ব্রহ্মদত্যির মতো সেও তালে তালে নৃত্য শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে লাগলো তার গলায় ঝুলানো ঢোলকটা। টাগ ডুমা ডুম ডুম! টাগ ডুমা ডুম ডুম!! টাগ ডুমা ডুম ডুম!!!

ওধারে দাঁড়িয়ে নাচে ব্রহ্মদত্যি, এধারে নাচে বাজনদার। দুজনেই শুরু করে তাণ্ডব নৃত্য—উদ্দাম নৃত্য—চঞ্চল নৃত্য।

বাজনদার জিজ্ঞাসা করে, "ওকি, তুমি নাচো কেন, ব্রহ্মদত্যি ?"

"নাচি কেন ?" খলখল করে হেসে ওঠে ব্রহ্মদত্যি ঃ "নাচি আজ বহুদিন পরে একটি মানুষ দেখে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন! সুস্বাদু নররক্ত পান করবো, নরমাংস পেট পুরে খাবো। আচ্ছা বাজনদার, তুমি নাচো কেন ?"

"আমি নাচি কেন ?" উদ্দাম নৃত্য করতে করতে বলল বাজনদার। টাগ ডুমা ডুম ডুম! টাগ ডুমা ডুম ডুম!! "একশো ব্রহ্মদত্যি মেরে এই ঢোলকটি ছেয়েছি। তোমাকে মেরে ছাইবো এর ফুটোটি।" টাগ ডুমা ডুম ডুম! টাগ ডুমা ডুম ডুম!! বাজনার তালে তালে শুধু নাচতে লাগলো বাজনদার।

ব্রহ্মদত্যির ভয় হোলো। বাজনদার বলে কি! মানুষ হয়ে সে একশো ব্রহ্মদত্যি মেরেছে! আর সেই চামড়া দিয়ে ছেয়েছে তার ঢোল! এবার আমাকে মেরে ছাইবে ঢোলের ফুটো! বাপ্‌রে! কি সাংঘাতিক কথা! কি ভয়ংকর ব্যাপার! অন্তরে দারুণ শিউরে উঠলো ব্রহ্মদত্যি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি আমার ছাল খসাবে কেন বাজনদার ?"

"যারে! আমার যে দারুণ দরকার! একশো ব্রহ্মদত্যির চামড়ায় এই ঢোলটি ছেয়েছি। তোমার চামড়ায় ছাইবো এর ফুটো।" টাগ ডুমা ডুম ডুম! টাগ ডুমা ডুম ডুম!! টাগ ডুমা ডুম ডুম!!!

"তুমি আমার ছাল খসিও না!" নরম হোলো ব্রহ্মদত্যি।

"তাই কি পারি! ঢোলটা আমার অকেজো হয়ে পড়ে আছে। দিনরাত ব্রহ্মদত্যি খুঁজছি। পাইনি। আজ যখন তোমায় পেয়েছি তখন আর ছাড়ি কি করে? এই যে কোঁকড়া লাঠিটা দেখছো, এই দিয়ে আস্তে আস্তে তোমার চামড়া খুলে নেবো। তারপর তাই দিয়ে ছাইবো আমার ঢোলের ফাঁসাটি। কেমন ?"

টাগ ডুমা ডুম ডুম বাজাতে বাজাতে ব্রহ্মদত্যির দিকে এগোলো বাজনদার।

"দোহাই তোমার বাজনদার! তুমি আমার ছাল খসিও না। তুমি যা চাও আমি তাই দেবো। টাকাপয়সা সোনাদানা মোহর দিয়ে তোমায় রাজা করে দেবো। আমায় রক্ষে করো!"

"দূর ছাই টাকাপয়সা আর মোহর! ঢোলকটা ছাইতে পারলে যে আমি মণিমুক্তো কতো আয় করতে পারবো!" টাগ ডুমা ডুম ডুম! "আগে তোমার ছালটা খসিয়ে নি!" টাগ ডুমা ডুম ডুম! "যেও না ব্রহ্মদত্যি। ঐখানে দাঁড়াও একটু।"

"তোমার পায়ে ধরি বাজনদার! তুমি আমার ছাল খসিও না! তোমায় আমি এক ঘড়া মোহর দেবো। আমাকে বাঁচাও!"

"মোহর দিবি!" এবার নরম হোলো বাজনদার ঃ "তবে চল্‌, মোহর আমার বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবি। চল্‌।"

"হ্যাঁ, তাই দেবো। তুমি আমার ছাল খসিও না বাজনদার। দোহাই তোমার ধম্মের! তুমি যা বলবে তাই শুনবো।"

ব্রহ্মদত্যি মোহর এগিয়ে তো দিতে চাইলো, কিন্তু আগে হাঁটতে রাজী হোলো না। ভাবলো, আগে আগে চললে পেছন থেকে বাজনদার তার কোঁকড়া লাঠিটা দিয়ে যদি তার ছাল খুলতে শুরু করে তবে সে ঠেকাবে কি করে?

আর বাজনদার ভাবলো, সে আগে চললে পেছন দিক থেকে ব্রহ্মদত্যি যদি তার ঘাড়টি মটকে দেয়! তবে?

শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মদত্যিই আগে চলতে রাজী হোলো। কিন্তু চলতে চলতে কেবলই তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি বাজনদার পেছন থেকে কোঁকড়া লাঠি বাধিয়ে দিল! ছাল খুলল। দারুণ একটা আতঙ্কে মোহরের ঘড়া নিয়ে আগে আগে চলছিল ব্রহ্মদত্যি। চলতে চলতে সে আপনমনে বললো, "এই আজরাইলের হাত থেকে যদি আজ রেহাই পাই, তবে আগামী অমাবস্যায় হাজার ব্রহ্মদত্যিকে ভোজন করাবো। তাদের হাজার মোহর ভোজনদক্ষিণা দেবো।"

বাড়ি অবধি মোহর পৌঁছে দিয়ে চলে গেল ব্রহ্মদত্যি। আর বাজনদার সেই রাত্তিরেই মাটির নীচে পুঁতে ফেলল মোহরগুলো সব।

পরদিন সকালে পরামাণিক এলো বাজনদারকে কামাতে। ঈশ্বর বাজনদার ছিল হাড়কিপটে। হাত দিয়ে ওর জলফোঁটাও গলতো না। নামে ওর হাঁড়ি ফাটতো সাতটা। পরামাণিক ওকে কামায়। নেহাত কলাটা মুলোটা ছাড়া কোনদিন ঈশ্বর তাকে একটি নগদ পয়সা দেয় না। পাওনাদারকে উবুড়হস্ত করা বুঝি ঈশ্বরের কোষ্ঠীতে নেই! নিত্যকার অভ্যাসবশে পরামাণিক সেদিনও ঈশ্বরের কাছে পয়সা চাইলোঃ "আমায় আজ কিছু দাও না ঈশ্বর ভাই! আমার আজ বড্ড ঠেকা!"

ঈশ্বর অন্য দিনের মতো শুকিয়ে পড়লো না বা হা-হুতাশও করলো না। স্ত্রীকে ডেকে বললো, "পরামাণিক ভাইকে একটা টাকা এনে দাও।" নীরবে পরামাণিকের হাতে একটি টাকা এনে দিল সে।

পরামাণিক তো অবাক্। কি ব্যাপার? ঈশ্বরের আজ কি হোলো? যে কোনদিন হাতে করে একটি পয়সা দেয়নি, যার হা-হুতাশে সুমুদ্দুর শুকিয়ে যায়, আজ সে গোটা একটা টাকা দিল! 'মানুষের মধ্যে নাপিতই তো ধূর্ত।' সুতরাং সে অবিলম্বেই অনুমান করলো, শালা বাজনদার নিশ্চয়ই মোটা দাঁও কিছু একটা মেরেছে। বাজনদারকে ধরে বসলো পরামাণিক, কি ব্যাপার তাকে বলতে হবে। নতুবা সে বাজনদারকে ছাড়বে না।

পরামাণিকের কথায় বাজনদার যেন আকাশ থেকে পড়লো। পরামাণিক বলে কি? পোড়োধন আবার কে পেলে? অনেক মোড়ামুড়ি, অনেক শপথ, প্রতিজ্ঞা করলো সে। কিন্তু পরামাণিক কিছুতেই ছাড়লো না। শেষ পর্যন্ত পরামাণিকের ষোলো চুঙ্গো বুদ্ধিরই জয় হোলো। বাজনদার সব সংক্ষেপে বললো তাকে। আর বলে দিল, "আগামী অমাবস্যায় তোমায় নিয়ে আবার যাবো। তুমি এসো পরামাণিক ভাই।" পরামাণিক স্বীকার করে বাড়ি গেল, এবং অমাবস্যার প্রতীক্ষায় রইলো।

সেদিন অমাবস্যা।

বিকেলবেলাই পরামাণিককে নিয়ে নৌকো চেপে রওনা হোলো বাজনদার। সন্ধ্যে নাগাদ সেখানে পৌঁছোলো দুজনে। পৌঁছে, পরামাণিককে নিয়ে বাজনদার কি করলো জানো? তাকে সেই মাঠের এক প্রকাণ্ড বটগাছের নীচু ডালে বসিয়ে রাখলো, আর নিজে উঠে গেল উঁচু ডালে।

ক্রমে দিন ফুরোলো, সাঁঝ হোলো। বিশ্ব জুড়ে নামলো অমানিশার ঘন তিমির। একটু বাদে হঠাৎ ওদের কানে

ব্রহ্মদত্যিই আগে চলতে রাজী হোলো।

এলো একটা কোলাহল। দেখলো বিকট আকৃতির কতগুলো ব্রহ্মদত্যি কিলবিল করে এগিয়ে আসছে। মাথায় তাদের সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া ইত্যাদি বিভিন্ন মণ্ডা-মিঠাইয়ের বিরাট বিরাট বোঝা। এগিয়ে এসে তারা বোঝাগুলো নামালো এবং সাজিয়ে রাখলো সারা মাঠে। এমনি করে প্রচুর খাদ্য এলো।

রাত দশটার পরে আসতে আরম্ভ করলো ব্রহ্মদত্যিরা। সে কি একজন-দুজন! সে অনেক! পালে পালে দলে দলে আসতে লাগলো সব। সাদা কালো কটা ধূসর তামাটে—সে কতরকম যে রং তাদের! আর ছোট বড় উত্তম অধম বেঁটেখাটো উঁচু লম্বা—সে কতরকম যে আকৃতি তাদের তার ইয়ত্তা নেই! কোনটার কানগুলো বিরাট বিরাট। যেন এক একখানা আধমুনি কুলো! কোনটার নাকটা উঁচু হয়ে ঠেকেছে আকাশে। কারো চুল নেমেছে পিঠ বেয়ে কোমর ছাড়িয়ে পা পর্যন্ত। কারো মাথা যেন বেলটি। প্রত্যেকের গলায় ধবধব করছে এক গোছা করে সুদীর্ঘ শুভ্র যজ্ঞোপবীত। অঙ্গ ঘিরে শ্বেতশুভ্র বা গৈরিক বসন।

ব্রহ্মদত্যিদের আসা শেষ হোলো।

বিরাট সভা করে বসলো সব সারি সারি। তারপর দাঁড়িয়ে উঠলো ব্রহ্মদত্যিদের রাজা। চেহারাখানা তার বিরাট। উঁচু ঠিক তালগাছের মতো। যে ব্রহ্মদত্যি ভোজ দিচ্ছিলো তাকে শুধালো সেই রাজামশাই, "ওহে, তুমি আজ এ ভোজ দিচ্ছ কেন?"

"সে কথা আর শুনে কাজ নেই মহারাজ! সে এক বিশ্রী ব্যাপার।"

"হোক বিশ্রী। তুমি বলো কি ব্যাপার।" সবাই বলে

উঠলো একসঙ্গে।

"মহারাজ, সে একটা মানুষ। কিন্তু বিক্রম তার বড় বেশী। একশো ব্রহ্মদত্যি নাকি এ পর্যন্ত সে বধ করেছে। তাদের চামড়া দিয়ে একটা ঢোল ছেয়েছে। ঢোলে একটি ফুটো হয়েছে। সেই ফুটোটি ছাইবার জন্য সে ব্রহ্মদত্যির চামড়া খুঁজছিল। আমায় পেয়ে অমনি চাইলো চামড়া খুলতে আমার। শেষে অনেক হাত-পায় ধরে এক ঘড়া মোহর দিয়ে তবে বেঁচেছি। এবং সেই দিনই মানত করেছি ব্রহ্মদত্যি ভোজ দেব।"

"ওরে বাপ্‌রে! ব্রহ্মদত্যির কাছে আবার মানুষ! আসুক দেখি!"

"কোথায় সে?" বলে যেই সে তালগাছের মতো উঁচু গোদা ব্রহ্মদত্যিটা লম্বা একটা হাত ওপরে তুললো, অমনি সে হাতের ঠেলায় টপকে পড়ে গেল পরামাণিক একেবারে ব্রহ্মদত্যিদের গায়ের 'পরে। সঙ্গে সঙ্গে বাজনদার ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, "ছোট্টা রেখে বড্ডারে ধর! ছোট্টা রেখে বড্ডারে ধর! দেখিস গোদাটা যেন না পালায়! সব বেটাদের ধর! সব বেটাদের ধর! এক একখান করে আজ সব চামড়া খুলে নেবো! কাউকে ছাড়বো না! কাউকে না!"

আর যায় কোথা! বাজনদারের গলা শুনে সব ব্রহ্মদত্যিগুলো ছুটলো হুড়মুড় করে। কোথা দিয়ে কে যে কোথায় ছুটলো তার কোন হদিস রইলো না। ছুটতে ছুটতে সেই পালকে পাল ব্রহ্মদত্যি চলে গেল সে রাজার রাজ্য ছেড়ে অনেক দূরে।

বাজনদার তখন গাছ থেকে নামলো। এবং পরামাণিককে নিয়ে নৌকোয় তুললো সেই স্তরে স্তরে সাজানো বিবিধ খাদ্যসামগ্রী। তুললো সেই এক হাজার মোহর। তারপর চললো বাড়ির পথে নৌকো বেয়ে। বাড়ি পৌঁছে মোহরগুলো পাঁচশো পাঁচশো করে দুজনে সমান ভাগ করে নিল। অন্যান্য জিনিস যে যতোটা পারলো টেনেটুনে বাড়ি নিল। বাজনদারের একেবারে 'গজকপাল'। এর পর সে ফেঁপে ফুলে শীগ্‌গিরই মোটা হয়ে উঠলো। পরামাণিকেরও সৌভাগ্যলক্ষ্মী ফিরে এলো এই থেকে।

শিউলি বনের ছুটি

ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপকথা আজ বলবে মোরে শরৎ-ভোরের আলো,
এই ভুবনের সবারে আজ বাসবো আমি ভালো।

শিউলি-বনের হাওয়া আমায় হাতছানিতে ডাকে,
মন হারালো আজ যে আলোর ভরা নদীর বাঁকে।

সবুজ ভুবন চেয়ে আছে নীল গগনের পানে,
কোন দেশেরি দেখ্‌ছে স্বপন কেই বা তাহা জানে।

ছুটি-ছুটি——আজ যে আমার শিউলি-বনের ছুটি,
শিশির-ঝরা ঘাসের 'পরে আদুড় গায়ে লুটি।

দূর পাহাড়ের নীল মেয়েটি পরীর দেশের হাসি,
মন ভুলালো শালের বনের কালো ছেলের বাঁশি।

রেলের গাড়ির শব্দ শুনি দূরের ইস্টিশানে
চেয়ে থাকি ঢেউ-খেলানো মেঠো পথের পানে।

কেউ বা ঘরে আস্‌ছে ফিরে, কেউ বা ঘরে যায়,
হাসির সুরে বাঁশি বাজে নদীর কিনারায়।

ইস্কুল আজ বন্ধ হল, বই রেখেছি তুলে,
হাওয়ার সাথে করব খেলা বনের দোলায় দুলে।

রূপকথা আজ হয়ে এলো, শিউলি-বনের ছুটি
শরৎ-ভোরে শিশির ভেজা ঘাসের 'পরে লুটি।

জাগোরে ধীরে

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

—প্রথম দৃশ্য—

এই দৃশ্যে যারা যাওয়া-আসা করেছে, তাদের পরিচয়ঃ

বিকাশ....মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।

আশা.....নারীরূপিণী।

দারিদ্র্য....পুরুষের বেশে।

মামা.....বিকাশের মামা।

[বৈশাখের দাহন-দীর্ণ দ্বিপ্রহর। হু' হু' করে গরম বাতাস বইছে রুক্ষ পথের ধূলো উড়িয়ে। দূরে মাঠের মাঝখানে নিঃসঙ্গ বটগাছটার মাথায় বসে ক্রমাগত একটা চিল ডাকছে, আর তারই তলায় বসে, রাখাল-ছেলে বাঁশী বাজাচ্ছে। চিলের স্বর আর বাঁশীর সুর মিলে মধ্যাহ্নের রৌদ্রদগ্ধ শূন্যের মধ্য দিয়ে যেন একটি অখণ্ড মায়ালোকের জাল বুনে চলেছে!

বিকাশ বসে আছে তাদের ঘরের জানালার কাছে। কোলকাতা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে সে নিজের গ্রামে ফিরে এসেছে। হাতে কোন কাজ নেই, অথচ আছে প্রচুর অবকাশ। পাশ সে করবে নিশ্চয়ই কিন্তু আর পড়া হবে কিনা, সে কথা বাবা জানেন।

সকাল থেকেই একটা দ্বিধায় দুলছে তার মন। তাই বৈশাখের মধ্যাহ্নে সে আজ তার ঘরের জানালার ধারে এসে চুপ করে বসেছে। বাইরের প্রকৃতির নিঃস্পৃহ আলস্যটুকু উপভোগ করছে সর্ব্ব দেহ-মনে।

এক ঝলক গরম হাওয়ার সঙ্গে চিলের ডাক, বাঁশীর সুর, আর খানিকটা ধূলো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।]

বিকাশ—(আপন মনে) ভারী ভাল লাগছে ...কোলকাতার ট্রাম-বাসের গণ্ডগোল ছেড়ে এই ছোট আর শান্ত গ্রামটিতে ফিরে এসে আমি যেন বেঁচে গেছি! আমার যেন নবজন্ম হয়েছে! দূরে মাঠের মাঝখানে এই সাথীহারা বটগাছ...তার ওপর একটা চিল...তার নীচে কালো রাখাল বাঁশী বাজাচ্ছে। মিষ্টি গেঁয়ো সুরে... আঃ...কতদিন পরে নিজেকে ফিরে পেলাম...প্রায় দুবছর! দুবছর ধরে দেখছি শুধু মানুষে মানুষে হানাহানি। ঠাসাঠাসি বাড়ী...চাঁদও নেই, তারাও নেই...রক্তহীন রোগীর মত হলদে রঙের গ্যাসের আলো জ্বেলে রাতের কোলকাতা তার মুখ দেখে।...তবু পড়তে যে কত ভাল লাগে, নতুন নতুন বই, নতুন নতুন জগৎ...নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। ...বাঙালী ছেলের জীবন কত ছোট, কত অল্প!...আঃ! কী মিষ্টি ওই রাখালের বাঁশীর সুর! ওই সুর যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে! কালো রাখাল! কোথায় তোমার বাড়ী? কোন্ গাঁয়ে কোন্ দীঘির ধারে তোমার বাড়ী, কালো রাখাল? বাঁশী তোমার কী বলে? সভ্যতার নাম-গন্ধহীন গেঁয়ো সুরে তোমার বাঁশী কেন কাঁদে, কালো রাখাল?

[ধীরে ধীরে চোখ দুটো তার তন্দ্রার ভারে বন্ধ হয়ে এল! বিকাশ ঘুমিয়ে পড়লো। জানালাটা তেমনি খোলাই রইল; বাইরে গরম ঝোড়ো হাওয়া, তেমনি জোরেই বইতে লাগলো। রাখাল ছেলের বাঁশীও

ক্লান্তি মানে না। শুধু চিলের ডাকটা আর শোনা যায় না, তার বদলে শোনা যাচ্ছে একটি ঘুঘুর ডাক—ঘু-ঘু—ঘু-ঘু! বিকাশ স্বপ্ন দেখছে।]

বিকাশ—কে তুমি ভাই?

স্বপ্ন—আমি আশা।

বিকাশ—তুমি আশা? কেন তুমি এই রোদ্দুরের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছ ভাই?

আশা—আমি ক্লান্ত মানুষের মনে উৎসাহের আগুন জ্বালিয়ে তুলি। দুঃখ-জীর্ণ অবসাদের পরে আমিই জাগিয়ে দিই নূতন প্রাণ-চেতনা।

বিকাশ—কিন্তু কেন তুমি এই সময় মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছ তাতো বললে না ভাই?

আশা—আমি? আমি এই বৈশাখের দাহন-দীর্ণ মাঠের বুকে জাগিয়ে তুলবো আষাঢ়ের মেঘের আশা! ওই জ্বলে-যাওয়া আকাশের কূলে কূলে দেখা দেবে জলভরা কালো মেঘের পুঞ্জ, নতুন বর্ষণে তৃষ্ণার্ত্ত ধরণী ফিরে পাবে তার শস্য-সম্ভাবনা, শিউরে উঠবে কদম, ফুটবে কেয়া।

বিকাশ—আঃ! আমি যেন সেই প্রথম বর্ষণের স্পর্শ পাচ্ছি ভাই আশা! আচ্ছা বলতো আমি কি এবার পাশ করতে পারবো?

আশা—আশা করো বিকাশ, আশা করো।

বিকাশ—তাই করবো। কিন্তু আমি কি আর পড়তে পাবো না?

আশা—ভবিষ্যৎ-বাণী আমি করিনে বিকাশ! আমি শুধু শিখিয়ে দিই আশা করতে। দুঃখে-শোকে, ব্যথায়-আনন্দে, শুধু আশা করো, আশা করো।

বিকাশ—সবাইকে কি এই একই কথা বলো তুমি?

আশা—হ্যাঁ, একই কথা। জীর্ণবাসা ভিখারিণীর কানে আর কোটিপতি রথচাইল্ডের কানে আমি এই একই কথা বলি। জমিদারের অত্যাচারে রক্তাক্ত-দেহ মৃতপ্রায় চাষী আর উদ্ধত মদগর্ব্বী হিটলার আমাতেই আশ্রয় করে বাঁচে। তুমিও আমাকে আশ্রয় করো বিকাশ, তোমারও জীবন ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।...আমি যাই!

বিকাশ—কোথায় যাচ্ছো, আশা?

আশা—একটা কান্না শুনতে পাচ্ছো না? হরিশ চক্রবর্ত্তী এইমাত্র মারা গেছে, তারই স্ত্রী কাঁদছে অমন করে। আমি যাই, ওর কানে কানে বলে আসি যে, স্বামীর মৃত্যুতে তার কোন ক্ষতি হবে না; কারণ, হরিশ চক্রবর্ত্তীর পাঁচ হাজার টাকার জীবন-বীমা আছে। অতএব, অত জোরে না-কেঁদে আস্তে কাঁদলেও চলবে।

বিকাশ—আশা! আশা! যেও না ভাই, আশা!

[আশা চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্ন বদল হলো; স্বপ্নের ঘোরেই সে দেখলো এক কুৎসিত মূর্ত্তি!]

মূর্ত্তিটি এগিয়ে এসে তাকে ডাকলো, "বিকাশ!"

বিকাশ—কে? কে তুমি? ওঃ! কী কুৎসিত তোমার মূর্ত্তি, জীর্ণ-শীর্ণ সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে! চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ! ক্রমাগত একটা বাঁকা হাসি হেসে মুখের রেখা তোমার বদলে গেছে, মাথার চুলে তেল নেই, পরণের কাপড় ছেঁড়া...কে তুমি?

মূর্ত্তি—আমি দারিদ্র্য।

বিকাশ—তুমি যাও, তোমাকে তো আমি চাইনি। আশা কোথায় গেল? আশা! আশা!

দারিদ্র্য—আশা কোথাও নেই। মরু-পথচারী পথিকের চোখে মৃগ-তৃষ্ণিকার মত সে একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে। পৃথিবীতে সত্য হচ্ছি একমাত্র আমি...দারিদ্র্য।

বিকাশ—কী তোমার কাজ?

দারিদ্র্য—দেশ থেকে দেশান্তরে শুধু হাহাকার করে কেঁদে বেড়ানো! সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আমি বঞ্চিত। বৈশাখের আগুনে ঝল্‌সে-যাওয়া ওই মাঠ আর আকাশের দিকে চেয়ে দেখো—আমার সঙ্গে এতটুকু অমিল দেখতে পাবে না। আজকের এই ঝোড়ো-হাওয়ার চাইতে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস একটুও কম গরম নয়।

বিকাশ—ওঃ! কী কষ্ট তোমার, দারিদ্র্য! আচ্ছা, তুমি কেন আশা করো না? তোমার কি কোন আশা নেই?

দারিদ্র্য—আশা আছে বৈকি! নিশ্চয় আমার আশা আছে।

বিকাশ—কী আশা তোমার?

দারিদ্র্য—আমার আশা...আমি যেন ধনীর সুসজ্জিত মোটরের তলায় চাপা পড়ে মরতে পারি! আমার আশা...গৃহস্থের ঘরের সামনের রাস্তায় ডাষ্টবিনের মধ্যে আমি যেন ভুক্তাবশিষ্ট ভাত খেতে পাই! আমার আশা...অনাহারের জ্বালায় একটি মাত্র তামার পয়সার জন্য দ্বারে দ্বারে হাত পেতে আমি যেন গালাগালি ও প্রহার লাভ করি। আমার আশার কি অন্ত আছে, বিকাশ? কিন্তু তবু আমি গান গাই, তা জানো?

বিকাশ—গান গাও! তুমি গান গাও! বল কি দারিদ্র্য, তুমি গান গাও?

দারিদ্র্য—হ্যাঁ, আমি গান গাই। বিনা চিকিৎসায় মরে-যাওয়া একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তার বৃদ্ধ পিতামাতার কণ্ঠস্বরে শুনতে পাবে আমার গান; প্রবঞ্চিতা ভিখারিণীর

সন্তান পালনের দুঃসহ দায়িত্বে আছে আমার গান; দেশ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে আর অগ্নিকাণ্ডে আমি গান গাই। তুমি কি কোন দিন কান পেতে শুনেছ আমার গান?

বিকাশ—তুমি যাও, তোমাকে আমি সহ্য করতে পাচ্ছিনে—তুমি দূর হও!

[একটা বিকট হাসির সঙ্গে স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। বিকাশের মামা ঘরে প্রবেশ করে তাকে জাগিয়ে দিলেন। বিকাশ ফ্যাল-ফ্যাল করে মামার মুখের দিকে চেয়ে রইল।]

মামা—হতভাগা ছেলে, এই গরমে জানলা খুলে ঘুমোচ্ছিস্? দেখ দেখি, কী দশা হয়েছে চেহারার? ধূলোতে, বালিতে, ঘামে—ছি-ছি-ছি-ছি! তোর কি বয়স বাড়ছে না, বিকাশ?

বিকাশ—মামা!

মামা—কী রে?

বিকাশ—আচ্ছা মামা, দারিদ্র্য কি কোন আশা করে না?

মামা—কী বলছিস তুই?

বিকাশ—ও! না আমি কিছু বলিনি।

মামা—বেলা চারটে বেজে গেছে, চা খাবিনে? তোর মা ডাকছে যে!

বিকাশ—হ্যাঁ, চলো! (যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে) ও কে কাঁদছে, মামা?

মামা—কোথায় কে কাঁদছে?

বিকাশ—ওই যে দূরে মাঠের মাঝখানে বিনিয়ে বিনিয়ে কে কাঁদছে না?

মামা—নাঃ! কোলকাতায় গিয়ে তোর দেখছি সব ভুল হয়ে গেছে! ওতো ঘু-ঘু ডাকছে।

বিকাশ—ও হ্যাঁ, ঘু-ঘু ডাকছে, তাই বটে! আমি ভেবেছিলাম দারিদ্র্য আবার কাঁদছে বুঝি!

[মামা চেয়ে দেখলেন বিকাশের চোখে জল]

মামা—কী হয়েছে রে, কাঁদছিস্ কেন?

বিকাশ—আজ আমি দারিদ্র্যের কান্না শুনতে পেয়েছি, মামা! বড় করুণ, বড় মর্ম্মভেদী সে কান্না! চলো মামা!

[মামা হতভম্বের মত বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, পরে বললেন]

মামা—কোলকাতা থেকে তোর বন্ধুরা এসেছে জন্মতিথিতে আনন্দ করতে।

বিকাশ—তাই নাকি? চলো, চলো।

এই আধুলিটা নিয়ে যাও।

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

এই দৃশ্যে যারা যাওয়া-আসা করেছে, তাদের পরিচয়ঃ

বিকাশ....মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।
চারু....
বিমল....
কমল....
শ্যামল.... } বিকাশের বাঙালী বন্ধু।
প্রতাপ সিং....বিকাশের বন্ধু কিন্তু অবাঙালী।
ভিখারী....একটু বয়স্ক।

[অপরাহ্ণকাল। বিকাশদের বৈঠকখানার বারান্দা-সামনে বাগান। আজ বিকাশের জন্মতিথি-উৎসব। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে তার কয়েকজন সহপাঠী আসিয়াছে। তাহাদের উগ্র উজ্জ্বল পোষাকে তাহারা সহরের সভ্যতা ও আধুনিকতার বার্ত্তা বহিয়া আনিয়াছে। দৃশ্যারম্ভে বারান্দায় দেখা গেল একজন গান গাহিতেছে। অন্য সকলে শুনিতেছে। বন্ধুদের নাম—বিমল, কমল, চারু, শ্যামল,

প্রতাপ সিং।]

চারু—চমৎকার!

বিমল—চমৎকার!

প্রতাপ—এইবার একটু বিশ্রাম নাও ভাই! পরে আবার দেখা যাবে।

(একটু পরে)

বিমল—আচ্ছা, ওটা কি গাছ?

চারু—শুনেছি ওকে বলে শিমুল।

কমল—সুন্দর ফুলগুলো তো!

শ্যামল—ওই অবধি।

বিমল—কেন?

শ্যামল—রূপই আছে, গুণের নামমাত্রও নেই।

কমল—তাই নাকি? গন্ধ ভাল নয়?

শ্যামল—একেবারেই গন্ধ নেই।

চারু—বারে! অত বড় গাছ, অত সুন্দর ফুল—গন্ধ নেই?

শ্যামল—একটা ভাল কথা বলে তোর কথার জবাব দিচ্ছি। বর্ত্তমান যুগে সব চাইতে ওরই দাম বেশী।

বিমল—যেহেতু?

শ্যামল—যেহেতু ওই গাছটি বেশ জানে কেমন করে নিজের ঢাক নিজে পিটতে হয়।

[সকলে হাসিয়া উঠিল।]

কমল—কিন্তু তুই বা এত কথা জানলি কি করে?

শ্যামল—অভিজ্ঞতা থেকে নয়—বই থেকে।

চারু—(দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভান করিয়া) হ্যাঁ, তুই তো ভাল ছেলে!

শ্যামল—ভাল ছেলে মন্দ ছেলের কথা হচ্ছে না! কিন্তু সংসারে শিমুল গাছকেও কি চিনে রাখার দরকার নেই?

বিমল—আমার তো মনে হয় পণ্ডশ্রম! সংসারে শিমুল চিনতে গিয়ে সময় নষ্ট করার চাইতে—রজনীগন্ধার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভাল।

শ্যামল—দ্যাখ বিমল—এক এক সময় তুই গায়ের জোরে তর্ক করিস্! রজনীগন্ধাকে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। সে এক ডাকে বলে—আমি রজনীগন্ধা, আমি ভীরু, আমি ভঙ্গুর, স্বাস্থ্য আমার মোটেই ভাল নয়। কিন্তু শিমুলের সুর একেবারে অন্য রকম। সে বলবান, প্রকাণ্ড তার দেহ, তার ফুলগুলো যেন একটু বেশী রকম লাল। সে সবার ওপর মাথা তুলে সব চাইতে বেশী চেঁচিয়ে বলে, এদিকে এস।

চারু—তুই কবি হবি?

শ্যামল—বাংলাদেশে ওর চেয়ে সহজ কাজ আর নেই।

প্রতাপ—কেন?

শ্যামল—যেহেতু ওই পদবীলাভ করতে পরিশ্রম করতে হয় না। খেতে পাচ্ছো না? কবিতা লেখো!—চাঁদ উঠেছে? কবিতা লেখো!—বিয়ে হবে? কবিতা লেখো!—বাপ মরেছে? কবিতা লেখো!

কমল—না, আজ তুই কথায় কথায় বড্ড বেশী ভাবুক হয়ে পড়েছিস শ্যামল! আমরা এখানে এসেছি আনন্দ করতে—দেহ-তত্ত্ব অথবা প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচনা করতে নয়।

শ্যামল—আচ্ছা বেশ, আমি চুপ করলাম।

চারু—যাই হোক—পল্লীগ্রাম বাপু আমার একেবারেই ভাল লাগে না।

শ্যামল—তার কারণ তুই নিজে পল্লীগ্রামের ছেলে বলে।

কমল—আবার!

শ্যামল—না ভাই, থেমে গেলুম।

কমল—নাঃ! কথা না থাকলেই কথায় কথায় ঝগড়া বাধবে। তার চাইতে বিমল, তুই একটা গান গা।

বিমল—ভাল লাগছে না। কী গাই বল্‌তো!

কমল—এই বৈশেখী বিকেলে অন্য কোন গান জমবে না। সেই গ্রীষ্মের গানটা গা।

বিমল—আচ্ছা বেশ।

বিমলের গান

এস বৈশাখ, এস বৈশাখ, প্রলয়-শঙ্খে গাহিয়া গান,
বন্দনা করে ক্লান্ত কপোত করুণ কণ্ঠে তুলিয়া তান।
স্বপ্ন যা কিছু লুটায়ে ধূলায়
নয়নে বহ্নি-তুলিকা বুলায়,
দূর প্রান্তরে শ্যাম বনরাজি আজি হেরি তাই বেদনা-ম্লান।
স্বচ্ছ অতল জল-তল-বুকে জলের পিপাসা জাগে,
লজ্জিত মুখে কুসুম-বিতান নীরবে মরণ মাগে।
পন্থা-বিহীন কণ্টক-বনে
ওঠে ওরে গান আর্ত্ত রোদনে
কাঁদে মানবের অন্তর-তলে তোমার পরম দান।

[গানের শেষে সকলে হাততালি দিল। এমন সময় দেখা গেল দূরে বাগানের গেট দিয়া একটি ভিখারী প্রবেশ করিতেছে। অকস্মাৎ এই বাড়ীতে এতগুলি লোক-সমাগম দেখিয়া ভীত চোখে সে ইহাদের দিকে চাহিল এবং ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করিল]

ভিখারী—জয় রাধেকৃষ্ণ! চাট্টি ভিক্ষে বাবা।

প্রতাপ—কেন বাবা! জয় হবার বেলা রাধেকৃষ্ণ, আর ভিক্ষে দেবার বেলা আমরা! কেন? রাধাকৃষ্ণের কাছে যাও না!

ভিখারী—কী বলছেন?

কমল—বলছি ভিক্ষেটাও রাধেকৃষ্ণর কাছে চাইলেই হয়। আমাদের কাছে ভিক্ষে চাইলে আমাদের জয় হোক বলতে হবে।

ভিখারী—আপনাদের জয়-গানই তো রাতদিন করছি বাবা! আপনারা ভাল থাকুন, সুখে থাকুন, তবেই তো আমরা দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবো।

কমল—হুঁ! বেশ মিষ্টি কথাগুলো তোমার। ভিক্ষের পক্ষে ওটা একটা বড় গুণ! বাড়ী কোথায়?

ভিখারী—পাশের গাঁয়ে।

বিমল—ছেলেবেলা থেকেই ভিক্ষে করছো ত?

ভিখারী—না বাবা! ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা যায়। বড় হয়ে বিয়ে করলাম ভাল গেরস্থ ঘরে। হঠাৎ একদিন ক্ষেত থেকে ফিরে এসে দেখি, বৌটা সাপের কামড়ে মরে পড়ে আছে। কোলে দুটি ছেলে—তাদের নিয়ে যে আমি কী বিপদে পড়লাম তা কী বলবো! জমি-জমা যা ছিল—জ্ঞাতি-শত্তুররা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নিলে। থালা বাসন-কোশন গায়ের গয়না যা ছিল, বেচে বেচে ছেলে দুটোকে মানুষ করতে লাগলাম। তারপর নিজের হলো জ্বর। তারপর হাঁপানী। কিন্তু এই হাঁপানীর ব্যায়রাম হওয়া অবধি আর খেটে খেতে পারিনে। কষ্টের কথা আর কী বলবো বাবা! আজ দুদিন থেকে ঘরে যা খুদকুঁড়ো ছিল—ছেলে দুটোকে দিয়েছি, কিন্তু আমি নিজে কিছুই খাইনি।

চারু—বাঃ! বেশ বাবা, না খেয়ে আছ? কষ্ট হচ্ছে?

ভিখারী—না কষ্ট নয়—তবে হাত-পাগুলো একটু একটু কাঁপছে।

কমল—সে কি! আমরা ব'য়ে পড়েছি—না খেলে কষ্ট হয়। কিন্তু হাত-পা কাঁপে সে কথা তো লেখা নেই। আজকালকার বইগুলোর এই এক দোষ। ঠিক কথা কিছুতেই লিখবে না।

ভিখারী—বড় তেষ্টা পেয়েছে, আমায় একটু জল দেবেন?

কমল—তেষ্টা পেয়েছে? তাইত! জল আছে সেই বাড়ীর ভেতর—মজলিশটা জমেছে ভাল—এমন সময়, আচ্ছা দেখছি। বোয়! বোয়!

[শ্যামল নীরবে উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।]

বিমল—ধ্যাৎ! কে এখন যাবে জল আনতে! জল বাপু তুমি আর এক বাড়ীতে গিয়ে খেও। তারপর কী হলো বলো? গান-টান গাইতে পার?

ভিখারী—না।

কমল—তবে কী করে তুমি ভিক্ষের আশা করতে পারো? আমি তোমাকে একটা পয়সা দান করলে তুমি আমায় কিছু প্রতিদান দেবে ত? গানটা হচ্ছে সেই প্রতিদান। বুঝলে?

বিমল—তাছাড়া তুমি ভিক্ষে কর কেন? চাকরী করলে পারো! ভিক্ষে করা মানে অপরের উপার্জ্জনে অনর্থক ভাগ বসাতে চাওয়া।

ভিখারী—আমার শরীর যে বড় দুর্ব্বল। নইলে চাকরীই তো করতাম। একটু জল—

কমল—জল পাওয়া শক্ত। একবার বললে বোঝ না কেন? তোমার জন্য কে এখন অত কষ্ট করতে যাবে?

ভিখারী—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি বাবা। একটা পয়সাও দেবেন না?

বিমল—না। সে আমাদের নিয়ম-বিরুদ্ধ; আমরা ভিক্ষে দিইনে—

[ভিখারী ম্লানমুখে ফিরিয়া চলিল। এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে শ্যামল প্রবেশ করিল; তাহার এক হাতে এক ঘটি জল, অন্য হাতে দুটি ক্ষীরের নাড়ু। সে ডাকিল।]

শ্যামল—ওহে! জল খেয়ে যাও।

[ভিখারী ফিরিয়া আসিল, তারপর কহিল]

ভিখারী—শুধু জল হলেই হবে।

শ্যামল—না, শুধু জল খেতে নেই।

[ভিখারী জল ও খাবার লইল। তারপর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই]

শ্যামল—এই আধুলিটা নিয়ে যাও। তোমাকে নিয়ে আমার বন্ধুরা অনেকক্ষণ খেলা করেছেন এটি তার দাম।

[ভিখারী ইহার অর্থ বুঝিল না। শুধু ছল-ছল চোখে আধুলি লইয়া অস্ফুট কী আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল]

প্রতাপ—(দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভাণ করিয়া) স্বামী শ্যামলানন্দের জয় হোক্!

[শ্যামল এই কথায় আঘাত পাইয়া সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তারপর একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল]

শ্যামল—আমি জানি, দারিদ্র্যকে ঠাট্টা করা আধুনিকতা,

কিন্তু দরিদ্রকে সাহায্য করা নিয়ে ঠাট্টা করার নাম তোমরা জান ?

প্রতাপ—তুমিই বলো শুনি ?

শ্যামল—বর্ব্বরতা।

কমল—হিয়ার, হিয়ার !

শ্যামল—তোমাদের এই আধুনিকতা পরগাছার মত। সমাজের গায়েই গজিয়ে উঠেছে সমাজের সম্মতি না নিয়ে। তার সঙ্গে মাটির কোন যোগ নেই। হঠাৎ তোমরা দেখা দিয়েছ, আবার হঠাৎই শুকিয়ে যাবে।

প্রতাপ—যেহেতু আমাদের অপরাধ আমরা বাংলার পল্লীকে নিন্দে করেছি, আর একটি পাড়াগেঁয়ে ভিখারীকে ভিক্ষে দিইনি !

শ্যামল—শুধু এই নয়, তোমরা তার খেতে না পাওয়াকে ঠাট্টা করেছো। তাছাড়া তোমার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আমি কোন আলোচনা করতে রাজী নই প্রতাপ !

প্রতাপ—কারণ ?

শ্যামল—কারণ, তুমি বাংলাদেশের ছেলে নও, ব্যবসার খাতিরে তোমার বাবা এসেছেন বাংলাদেশে। যতদিন না তোমার বাবার লাভের পসরা পূর্ণ হয়, ততদিনই তুমি এখানে লেখাপড়া শিখবে, আমাদের সঙ্গে মিশবে, আমাদের দারিদ্র্য আর অনাহারকে ঠাট্টা করবে ; কিন্তু যেই তোমাদের লাভের তহবিল ভরে উঠবে, অমনি তোমরা বাংলাদেশকে ভুক্তাবশিষ্ট আমের আঁটির মত ফেলে চলে যাবে নিজেদের দেশে।

প্রতাপ—এসব কথা খুবই অপমানজনক ; তোমাদের কোন বাঙালী কি বিদেশ থেকে লাভ করে নিয়ে আসে না বাংলাদেশে ?

শ্যামল—তোমাদের চাইতে তারা সংখ্যায় ঢের কম। মেজরিটি দিয়ে জাতি বিচার করে দেখো। কাজেই তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। শুধু এইটুকু অনুরোধ করবো, তুমি আমাদের বিদেশী বন্ধু, বাংলাদেশ সম্বন্ধে কথা বলবার সময় আত্মবিস্মৃত হয়ো না।

প্রতাপ—তুই আমার একটা উপকার করলি শ্যামল ! তুইই আজ আমায় প্রথম মনে করিয়ে দিলি যে আমি বাঙালী নই।

বিমল—এসেছি বিকাশের জন্মতিথিতে আনন্দ করতে ; মাঝে থেকে তুই এমন এক একটা কাণ্ড করে বসিস্ শ্যামল, যে তার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা সবাই এখানে বন্ধু। এর মধ্যে বাঙালী-অবাঙালীর প্রশ্ন উঠতে পারে না।

প্রতাপ—না, শ্যামল আমার উপকার করেছে বিমল ! আমি এখন থেকে ভাবতে চেষ্টা করবো আমি বাঙালী নই, তোমাদের আনন্দোৎসবে যোগ দেবার আমার কোন অধিকার নেই।

বিমল—আঃ ! মনটা এমন কাঁচা করো না প্রতাপ !

[প্রতাপের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে কোনমতে দমন করিয়া ভারী গলায় উত্তর দিল]

প্রতাপ—না, মন কাঁচা-পাকার কথা এ নয়। তোমরা যদি বাংলাদেশকে এমন করে সব দেশ থেকে ভাগ করে নিতে পারো, তবে আমিই বা কেন আমার স্বদেশের কথা ভুলে যাবো ? দেশ তোমাদেরও যেমন আছে, আমারও তেমনি আছে।

চারু—দেশ বলো না, প্রদেশ বলো !

প্রতাপ—যাই হোক। এরপর আমার আর এক দণ্ডও এখানে থাকা উচিত নয়। বিকাশকে একবার ডাকো, তার কাছে বিদায় নিয়ে আমি পরের ট্রেণেই চলে যাবো।

[হঠাৎ যেন কী একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সকলেই হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সামান্য হাস্য-পরিহাস যে এমন করিয়া একটি গুরুতর কলহের স্তব্ধ পূর্ব্বাভাষে পৌঁছিবে, ইহা কেহ মনে করিতে পারে নাই।

শ্যামল বারান্দার শেষ প্রান্তে চেয়ারে বসিয়া দূরের বটগাছের দিকে চাহিয়া রহিল, প্রতাপ ঘন ঘন জামার হাতায় চোখ মুছিতে লাগিল। অন্যান্য ছেলেরা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হাসিমুখে সেখানে প্রবেশ করিল বিকাশ]

বিকাশ—ভদ্রমহোদয়গণ ! আপনাদের চা এবং জলখাবার—একি !

[সকলের মুখের দিকে চোখ পড়িতেই সে থামিয়া গেল, এবং বিস্মিতদৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল]

বিকাশ—কী হয়েছে রে শ্যামল ?

[শ্যামল উত্তর দিল না।]

বিকাশ—আ গেল যা ! কী হয়েছে বল্ না ?

বিমল—শ্যামল প্রতাপকে অপমান করেছে।

বিকাশ—কেন ?

প্রতাপ—না ভাই, মান-অপমানের ব্যাপার নয়। আমি যে তোমাদের কেউ নই, মানে বাঙালী নই, সেই কথাই শ্যামল আজ আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে।

বিকাশ—একথা উঠলো কেন ?

প্রতাপ—একটু আগে একটা ভিখিরী এসেছিল—তাকে আমরা ভিক্ষে দিইনি বলে।

বিকাশ—এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় শ্যামল! তোমার মনে রাখা উচিত ছিল যে আজ তুমিই আমার একমাত্র অতিথি নও। এরাও আমার অতিথি এবং বন্ধু। আয় প্রতাপ, ওর কুচুটে মন তোকে যাই ভাবুক, আমি তোকে আমার বাঙালী বন্ধু বলেই জানি।

চারু—ওর চাল-চলনে কোন্ জায়গাটায় অবাঙালী শুনি?

বিকাশ—নিশ্চয়। আমি ওর হয়ে তোর কাছে ক্ষমা চাইছি প্রতাপ, আয়!

[প্রতাপকে লইয়া সকলে চলিয়া গেল, রহিল কমল ও শ্যামল। কমলও চলিয়া যাইতেছিল, কী ভাবিয়া দাঁড়াইল, তারপর শ্যামলের দিকে চাহিয়া বলিল]

কমল—প্রতাপের বাবা ইচ্ছে করলে তোর মত সাতটা শ্যামলকে চাকর রাখতে পারেন, এ কথাটা ভুলিসনে। সব ক্ষেত্রেই ছোট-লোকমির একটা সীমা আছে।

[কমল গট্ গট্ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। শ্যামল নীরবে বসিয়া রহিল। তাহাকে কেহ ভিতরে আহ্বান করিল না, দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুর বান ডাকিল।]

—তৃতীয় দৃশ্য—

এই দৃশ্যে যারা যাওয়া-আসা করছে, তাদের পরিচয়ঃ

১ম বালক (সমীর)...
২য় বালক...
৩য় বালক...
৪র্থ বালক...
গণেশ... } গ্রাম্য বালকগণ।

বিকাশ, চারু, প্রতাপ,
কমল ও শ্যামল } বন্ধুগণ।

হারু...গ্রাম্য সেবা-পরায়ণ বৈষ্ণব।

[মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি বটগাছ। বিকাশের জানালা হইতে সে বটগাছ দেখা যায়; অপরাহ্নের ম্লান আলোয় সমস্ত মাঠ মায়াময়। দূরে কোথায় রাখালিয়া বাঁশী বাজিতেছে। কাছাকাছি কোন একটা গাছ হইতে মাঝে মাঝে "বউ কথা কও" পাখী ডাকিতেছে। চমৎকার একটি পরিবেশ! শ্যামলের মন ভাল ছিল না, সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে বটগাছটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কাছেই কতকগুলি ছেলে কাঠি-নাচ নাচিতেছিল এবং মুখে ছড়া বলিতেছিল। তাহারা খেলায় মত্ত ছিল বলিয়া শ্যামলকে দেখিতে পাইল না।

একখানা গান গাও না হারুদা!

নাচ শেষ হইলে দেখা গেল, গ্রামের হারু বৈষ্ণব আসিতেছে; গেরুয়া রঙের একখানি কাপড় পরনে, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, হাতে একতারা, নাকে রসকলি। সে আসিতেই ছেলেরা খেলা ফেলিয়া তাহার চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইল, এবং একখানি গান গাহিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।]

১ম বালক—একখানা গান গাও না হারুদা!

২য় বালক—ও হারুদা, তোমার পায়ে পড়ি হারুদা!

হারু—যাঃ! এখন কি গান গাইবার সময়? দেখছিস না আমি পলাশপুর যাচ্ছি!

৩য় বালক—এখনও অনেক বেলা আছে হারুদা! আমাদের একখানা গান শুনিয়ে দিয়ে যাও।

৪র্থ বালক—কতকাল তোমার গান শুনিনি হারুদা!

হারু—আচ্ছা, থাম্, থাম্! চেঁচাসনি। তোর মা কেমন আছেন সমীর?

সমীর—(১ম বালক) ভাল আছেন।

হারু—ভাত খেয়েছেন?

সমীর—হ্যাঁ।

হারু—একটু সাবধানে থাকতে বলিস বাপু! যা দিনকাল পড়েছে, চারদিকে বড্ড অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। জানি না, গোবিন্দের মনে কী আছে! পলাশপুর তো উজাড় হয়ে গেল!

২য় বালক—পলাশপুরে কলেরা এখনো থামেনি?

হারু—কোথায় থামলো?

৩য় বালক—কেন? তোমার ওষুধ তো খুব ভাল হারুদা। আমার ভায়ের ডবল নিমোনিয়া কেমন চট্ করে সারিয়ে দিলে!

হারু—ওরে, ডবল নিমোনিয়া আর কলেরা এক হলো? তোর ভাইকে ভগবান সারিয়েছেন, আর এদের যে তিনিই মারছেন।

৩য় বালক—তবে যে বাবা বলছিলেন, পলাশপুরে কলেরা একটু কমেছে! বাবা তোমার কতো সুখ্যেত করলেন!

হারু—তোর বাবার যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ফাঁক পেলেই আমার সুখ্যেত করেন। রোগ একটু কমেছে বৈকি! কিন্তু একেবারে না কমলে শান্তি কই? এইতো, কালকে রাত্রেও রহিম শেখের ছেলেটা মরে গেল।

[শ্যামল দূরে দাঁড়াইয়া মন দিয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। এইবার অগ্রসর হইয়া আসিল। হারু এই নবাগতকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল]

হারু—তুমি কে গো?

শ্যামল—আমি বিকাশের বন্ধু। গরমের ছুটিতে বেড়াতে এসেছি।

হারু—বেশ, বেশ! কোলকাতায় থাকো বুঝি?

শ্যামল—হ্যাঁ।

হারু—থাকবে এখন কিছুদিন?

শ্যামল—বলতে পারিনে। যদি ভাল লাগে থাকবো।

হারু—গাঁয়ের কী ভাল লাগবে বাবা তোমাদের? আলোর চেয়ে অন্ধকার, সুখের চেয়ে দুঃখ, আনন্দের চেয়ে বিষাদ যেখানে বেশী, সেখানে কোন্ আকর্ষণে তোমরা টিকে থাকতে পারবে বলতো?

শ্যামল—মানুষের আকর্ষণে। ধরুন, যদি বলি, আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, শুধু আপনারই জন্য আমি আরও কিছুদিন এ গাঁয়ে থেকে যেতে পারি, তাহলে কি খুব অন্যায় বলা হবে?

হারু—আমার জন্যে!

শ্যামল—হ্যাঁ, কেন নয়? ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার গুণপনা শুনছিলাম যে!

হারু—আমার গুণপনা? হায়! হায়! গুণ থাকলে কি আর গাঁয়ে পড়ে থাকি বাবা? তাহলে তো সহরে গিয়ে ইস্কুলের মাষ্টারী করে কত পয়সা রোজগার করতে পারতাম!

শ্যামল—যা করছেন, তার চাইতে কি সেটা ভাল হতো বলছেন?

হারু—হতো না?

শ্যামল—নিশ্চয় না। যে কাজ মানুষকে দিয়ে করাবার জন্য এত মিটিং, এত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি, সেই কাজ কত সহজে গ্রামের বুকে বসে করছেন! আপনার নাম কী?

হারু—হারু বোষ্টম।

শ্যামল—এই কি আপনার আসল নাম?

হারু—আসল-নকলের বালাই ঘুচে গেছে ভাই! আমি শ্রীহরির দাস।

শ্যামল—আপনি বুঝি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন?

হারু—ওই আছে একটা বাক্স। বই দেখে দেখে ভগবানের নাম করে দিয়ে দিই যা হয় একটা ওষুধ। লাগে তাক্, না লাগে তুক্!

সমীর—কই, তুমি তো বই দ্যাখো না হারুদা!

হারু—হ্যাঁ, তুই তো সব জানিস! দেখি বইকি! বাড়ী থেকে বই দেখে আসি। (শ্যামলকে) কী করবো বলো? বাধ্য হয়ে এই ওষুধের বাক্সটি আনাতে হয়েছে। অজ পাড়াগাঁ, ডাক্তার এখানে বড়লোকদের জন্যে। গরীবদের ডাক্তার ডাকবার পয়সাও নেই, সাহসও নেই। একেবারে বিনা চিকিৎসায় মরবে, তাই। এক ফোঁটা ওষুধ খেয়ে মরলে সেও শান্তিতে মরতে পারবে, বাড়ীর লোকেও খানিকটা সান্ত্বনা পাবে, কী বলো?

২য় বালক—তুমি আজ খালি বাজে বকছো হারুদা! গান গাও, বারে!

হারু—বাজে বকছি, না? বেশ, তবে গানই গাই! গান শোন গো, কেমন? গান শোন।

শ্যামল—বেশ তো!

[হারু একতারায় সুর দিল। তারপর তাহার সুরেই মিলাইয়া গান গাইতে সুরু করিল]

গান

মাগো ধ্যানের আঁধারে জ্বালো চরণ দুটি
আজ জ্ঞানের আলোতে কালো উঠুক ফুটি।
তামসের তমসার
কর ভোর খোল দ্বার
নব অরুণ-সোনায় প্রাণ ভরুক মুঠি
আজ জ্ঞানের আলোতে কালো উঠুক ফুটি।

সত্যের ছোঁয়া দাও মিথ্যারে কর দূর
নিত্যেরে কর বুকে আনন্দে ভরপুর।
চরণের বরণের
জীবনের মরণের
সর্ব কাজ এক হোক পড়ুক লুটি
তুমি ধ্যানের আঁধারে জ্বালো চরণ দুটি।

শ্যামল—দেখুন, আমায় নেবেন আপনার সঙ্গে?

হারু—আমার সঙ্গে তুমি কোথায় যাবে বাবা?

শ্যামল—যেখানে আপনি যাবেন। "যেথায় থাকে সবার অধম, দীনের হতে দীন"—সেইখানে। আপনার সঙ্গে গিয়ে তাদের রোগে সেবা করবো, শোকে সান্ত্বনা দেবো, দুঃখে সহানুভূতি আর সুখে গান গাইবো।

হারু—তুমি পারবে না বাবা! আজন্ম সহরে মানুষ তুমি। তোমাদের কল্পনার দুঃখের সঙ্গে এ দুঃখ তো মিলবে না বাবা! তুমি পারবে না।

শ্যামল—কেন পারবো না? আমিও মানুষ। লেখাপড়া শিখতে পারি, কিন্তু রোগীর সেবা করতে আমিও জানি। এই বিরাট ব্রতে আমি আপনার সঙ্গী হবোই।

হারু—বেশ। তবে বাড়ীতে বলে এস।

শ্যামল—কোন দরকার নেই। আমার জন্য ভাববার এখানে কেউ নেই।

হারু—(মৃদু হাসিয়া) বেশ। ওরে তোরা বাড়ী যা। সন্ধ্যে হয়ে এল যে!

[সকলের প্রস্থান! বিকাশ, চারু, প্রতাপ, কমলের প্রবেশ]

বিকাশ—এই যে! বেশ ছেলে যা হোক্। ভেবে মরি, কোথায় গেল, কোথায় গেল!

হারু—ভালই হয়েছে। তোমার এই বন্ধুটিকে বাড়ী নিয়ে যাও তো বিকাশ! ওর হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, আমার সঙ্গে পলাশপুরে যাবে—রোগীর সেবা করতে।

বিমল—রোগীর সেবা অমনি মুখের কথা, না?

কমল—তার পর রোগীটিকে নিয়ে বাড়ী ফের, ব্যস্! ষোলকলা পূর্ণ হোক্ আর কি!

বিকাশ—তুই কথা কইছিস্‌নে কেন? বাড়ী চল্!

শ্যামল—না।

বিকাশ—না মানে?

শ্যামল—আমি পলাশপুরে যাব।

বিকাশ—কলেরা রোগীর সেবা করতে?

শ্যামল—হ্যাঁ।

বিকাশ—Nonsense! ঝগড়াঝাঁটি আর কাদের হয় না? তাই বলে রাগ করে কলেরা রোগীর সেবা করতে যেতে হবে?

হারু—ও! তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

বিকাশ—হ্যাঁ হারুদা! সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে—

প্রতাপ—বেশ তো, তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, ক্ষমা কর।

শ্যামল—আর আমরা সময় নষ্ট করছি কেন হারুদা? চলো!

হারু—কিন্তু তুমি যে আমাকে বড্ড মুস্কিলে ফেললে বাবা! তোমাকে নিয়ে গেলে তোমার বন্ধুরা রাগ করবেন, অথচ না নিয়ে গেলে, তুমি রাগ করবে। আমি এখন কী করি বলতো? এ যে আমার উভয়-সঙ্কট হলো!

[দূর হইতে একটি কান্নার শব্দ ভাসিয়া আসিল, দেখা গেল একটি বছর বারো-তেরো বয়সের ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে। সে নিকটে আসিতেই হারু প্রশ্ন করিল]

হারু—কী হয়েছে যে গণেশ, কাঁদছিস্ কেন?

গণেশ—আমার ভাইকে ওরা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে হারুদা!

হারু—কারা? কে?

গণেশ—ওই যে জমিদারবাবুর মেয়ের ছেলে বীরু!

হারু—কী, হয়েছিল কী?

গণেশ—কিছুই না। ওর একখানা ঘুড়ি গিয়ে জমিদারবাবুর বাগানে পড়ে। খ্যাঁদা গিয়েছিল সেখানা আন্‌তে। বীরুবাবু তখন ওখানে বেড়াচ্ছিল। সে এসে ঘুড়িখানা তুলে নেয়। খ্যাঁদা গিয়ে বললে—আমার ঘুড়ি দিন। বীরুবাবু তখন রেগে গিয়ে বললে—তোর ঘুড়ি তার প্রমাণ কী? ব্যাটা ছোটলোক!

বিকাশ—আ গেল যা! ব্যাটা কেঁদেই খুন হলো! তারপর কী হলো, তাই বল্ না!

শ্যামল—তুমি অনর্থক ওর ওপর রাগ করছো বিকাশ!

ওর তো কোন দোষ নেই! তারপর কী হলো বলতো ভাই?

গণেশ—তারপর খ্যাঁদা বললে আমার ঘুড়িটা দিয়ে দিন। মিছামিছি গালাগালি দিচ্ছেন কেন? বীরুবাবু তখন আরও রেগে গিয়ে বললে—ঘুড়ি তুই পাবিনে, এ ঘুড়ি আমার। তুই আমাদের বাগানে চুরি করতে ঢুকেছিলি। বেরিয়ে যা বলছি! খ্যাঁদারও খুব রাগ হয়েছিল; সে বললে, দেবেন না, তাই বলুন! বীরুবাবু বললে, দেবই না তো! কী করবি তুই আমার? ব্যাটা হারামজাদা চোর! এই বলে হাতের লাঠিটা দিয়ে খ্যাঁদার মাথায় মেরে, দরোয়ান দিয়ে তাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে বাগান থেকে বার করে দিয়েছেন।

হারু—দ্যাখ দিখিনি কাণ্ড! খ্যাঁদা কই?

গণেশ—ওর মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছিল! বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, বামুনদের নশু খুড়ো তাই দেখতে পেয়ে ওকে বাড়ীতে নিয়ে গেছেন ওষুধ দিয়ে দেবেন বলে।

বিকাশ—তোদেরও বাপু, সবটাতেই বাড়াবাড়ি। বীরু যখন বললো ঘুড়ি দেবো না, চলে এলেই হতো। কী দরকার শুধু শুধু ঝগড়াঝাঁটি করে! ওরা হলো বড়লোক!

শ্যামল—বড়লোক বলে মাথা কিনে নিয়েছে নাকি?

হারু—দুঃখ করে লাভ নেই বাবা! পাড়াগাঁয়ের বড়লোকেরা নিজেদের তাই ভাবে, ভাবে পৃথিবীসুদ্ধু লোকই বুঝি এদের প্রজা।

শ্যামল—আজকে আর তা ভাবলে চলবে না। ভাল করে সমঝে দিতে হবে।

প্রতাপ—কে সমঝে দেবে শুনি? তুমি?

শ্যামল—হ্যাঁ, আমি।

প্রতাপ—জমিদার বাড়ী থেকে তাহলে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে হবে না। ওইখানেই ওরা তোমায় কবর দিয়ে দেবে।

শ্যামল—তোমাদের মত বেঁচে মরে থাকার চাইতে মরে বাঁচা অনেক ভাল।

হারু—না-না, পাগলামী করো না। তুমি দু-একদিনের জন্য গ্রামে বেড়াতে এসেছ, এসব দুঃখ-কষ্ট দেখে তোমাদের বিচলিত হলে চলে না। তাছাড়া বিচলিত হয়ে তোমরা শুধু এদের দুঃখটাই বাড়াবে বাবা, প্রতিকার করতে কিছু পারবে না।

শ্যামল—কেন পারবো না?

হারু—তার কারণ, এটা ওদের একদিনের এক পুরুষের মার খাওয়া নয়, পুরুষানুক্রমেই মার খেয়ে আসছে। এই নিয়ে বেশী কিছু করতে গেলে, হয়ত গণেশের বাবা চণ্ডী কামারকে ভিটেমাটি ছেড়ে অকূলে ভাসতে হবে।

শ্যামল—হাঁ! অকূলে ভাসতে হবে! মগের মুল্লুক কিনা!

হারু—(হাসিয়া) মুল্লুকটা এখনও কিন্তু মগেরই আছে বাবা! কোলকাতায় বসে এ খবর তোমরা পাও না, কিন্তু গ্রামের জমিদারদের মধ্যে সেই মগ আর তাদের অত্যাচার আজও বেঁচে আছে। যাক্‌গে, আমি চলি বিকাশ, তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে বাড়ী যাও। গণেশ, বাড়ী যা। নশু খুড়ো খ্যাঁদাকে ঠিক পৌঁছে দিয়ে যাবে। আর তোর বাবাকে আমার নাম করে বলিস্, এ নিয়ে যেন আর চেঁচামেচি না করে। যাই বাবা, আবার দেখা হবে।

[হারু চলিয়া গেল। সকলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গণেশ তখনও কাঁদিতেছিল; তাহার দিকে চাহিয়া শ্যামল কহিল]

শ্যামল—চলো গণেশ, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বিকাশ—কোথায় যাবি?

শ্যামল—জমিদার বাড়ী।

বিকাশ—দ্যাখ্ শ্যামল, ছোট ছেলে-পুলেদের মারামারি নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করিস্‌নে।

শ্যামল—না, আমি যাব।

বিকাশ—তোকে বাড়ীতে নিয়ে এসে আমি তো বড় বিপদে পড়লাম শ্যামল! এমন জানলে আমি কখনোই তোকে নেমন্তন্ন করতাম না। দুঃখ-কষ্ট সব দেশেই আছে, অত্যাচারও একটু-আধটু সব জায়গাতেই হয়; তাই বলে রাতারাতি তুই তার প্রতিকার করবি, এটা পাগলামি তোর!

শ্যামল—যতটা পারি করবো।

কমল—এক ছটাকও পারবিনে। মাঝে থেকে গাঁয়ে বিকাশদের একটা বদনাম হবে। সবাই বলবে, কোলকাতা থেকে ওর কতকগুলো জানোয়ার বন্ধু এসেছিল।

শ্যামল—বেশ, আমি বিকাশদের বাড়ীতে আর যাবো না, ওখান থেকেই সোজা ষ্টেশনে চলে যাব।

বিকাশ—শ্যামল, তোর পায়ে পড়ি, এমন করিসনে, বাড়ী চল্।

শ্যামল—না, অন্যায়কে চোখ বুজে এড়াতে গেলে তার ক্ষমতা বেড়ে যায়। অন্যায়ের সঙ্গে সোজা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখতে হবে তার চেহারা। জিতি যদি ভালই, হেরে গেলেও দুঃখ নেই। এস গণেশ!

[শ্যামল গণেশের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল, অবশিষ্ট বন্ধুগণ বোকার মত পরস্পরের মুখ

চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল]

—চতুর্থ দৃশ্য—

এই দৃশ্যে ও পরবর্ত্তী দৃশ্যে যারা যাওয়া-আসা করেছে, তাদের পরিচয়ঃ

রবি সেন—জমিদারবাবুর পুত্র-কন্যার সঙ্গীত-শিক্ষক।
শোভন—জমিদার-পুত্র।
ছোটমামা—শোভনের মামা।
শ্যামল, বিকাশ—দুই বন্ধু।
বাউল—ভিক্ষুক।

[জমিদার-বাড়ীর ভিতরের একখানি সুসজ্জিত কক্ষ। জমিদার অবনী রায়ের দ্বিতীয় পুত্র শোভন অর্গ্যান বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। কাছে বসিয়া তাহার সঙ্গীত-শিক্ষক রবি সেন। অবনী রায়ের এক পুত্র, এক কন্যা—শোভন ও সুষমা। সুষমার পুত্র বীরু। সুষমার স্বামী জমিদারবাবুর ঘর-জামাই। গানের মাঝে মাঝে রবিবাবু ভুল সংশোধন করিয়া দিতেছিলেন। ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল।]

গান

পথের ধারে কাঁটায় ভরা
বাবলা ফুলের বন
সেথায় কেন ক্ষণে ক্ষণে
হারায় বল মন?
মৌমাছিরা কিসেয় মাতে
নেশার খুশি লাগে কেন
আমার চোখের পাতে?
আমার হৃদয় কেন স্বপন-দোলায়
দোলে অনুক্ষণ?
সেথায় কেন ক্ষণে ক্ষণে
হারায় বলো মন!

[এই অবধি গাহিয়া শোভন থামিল। রবিবাবু কহিলেন]

রবি—আজ এই অবধি থাক্। এইটেই আজকে ভাল ক'রে তোল আগে। কালকে বাকীটা শিখিয়ে দেব।

শোভন—আচ্ছা।

রবি—সুষমা কোথায়?

শোভন—বীরুমণিকে নিয়ে ব্যস্ত। সে বুঝি কাকে মেরেছে, ভাই—

রবি—কাকে মারলো?

শোভন—ওই যে আমাদের গাঁয়ের চণ্ডী কামারের ছেলে খ্যাঁদা। সে বুঝি বাগানে ঢুকে ওকে যা-তা বলেছিল; অমনি দিয়েছে লাঠিখানা মাথায় বসিয়ে।

রবি—বীরু দিন দিন বেশ দুষ্টু হয়ে উঠছে, কিন্তু এখন থেকেই ওকে একটু শাসন করা দরকার।

শোভন—ওতো দুষ্টু হবেই। ওর আগে একটা হয়ে মরে গেছে কিনা! বাবার ও হল দু'চক্ষের মণি। শাসন করার কথা বলছেন? ওরে বাবা, একবার আমি ওকে একটা চড় মেরেছিলাম, জানেন? বাপরে! সেই যে ছেলে নীল হয়ে ঢলে পড়লো, সে ফিট্ আর ভাঙে না। বাড়ী সুদ্ধু তো কেঁদেই খুন! শেষকালে অনেকক্ষণ ধরে মাথায় জল-টল দিতে, তবে জ্ঞান ফিরে এল। সেই থেকে আমি—নাকে-কানে খৎ দিয়েছি যে আমি বীরুকে আর কিছু বলবো না।

রবি—কিন্তু লেখাপড়া কিছু না শিখলে চলবে কেন? এখনো বর্ণ-পরিচয় হয়নি যে!

শোভন—সে হবে। ওর বয়সই বা কী? এইতো সবে দশ। দিদির পনেরো বছর বয়সের ছেলে। দেখছেন না মা আর দিদি ওকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারে না! আর সত্যি কথা বলতে কি মিঃ সেন, লেখাপড়া শিখবার ওর কীই বা এমন দরকার? খাবে তো সেই প্রজার মাথায় পা দিয়ে।

রবি—তা বটে।

শোভন—তবে?

[শ্যামল প্রবেশ করিল। উত্তেজনায় সে হাঁপাইতেছিল। শোভন ও রবিবাবু তাহার দিকে চাহিয়া অচেনা এই ছেলেটিকে অকস্মাৎ সন্ধ্যাবেলায় এমন-ভাবে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। শ্যামল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল]

শ্যামল—জমিদারবাবু কোথায়?

রবি—তিনি আহ্নিকে বসেছেন। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

শ্যামল—আপাততঃ এখান থেকেই আসছি। আমার বাড়ী কোলকাতায়।

রবি—ও।

শোভন—আপনি একটু বসুন না। বাবা হয়তো আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাছারীতে নামবেন।

শ্যামল—আপনি বুঝি জমিদারবাবুর ছেলে?

শোভন—হ্যাঁ।

শ্যামল—বীরু আপনার কে?

শোভন—আমার ভাগ্নে। আমার দিদির ছেলে।

শ্যামল—তাহলে আপনার দিদিকে দয়া করে একবার

ডেকে দিন।

রবি—আপনার দরকারটা কী বলুন তো।

শ্যামল—আপনাদের কাছে বলে কোন লাভ নেই।

শোভন—বীরু সম্পর্কে কিছু কি বলতে চান?

শ্যামল—নিশ্চয়।

শোভন—বলুন।

শ্যামল—আপনার দিদিকে ডাকুন।

শোভন—তিনি এখন আসতে পারবেন না, আপনার যা বক্তব্য আমায় বলতে পারেন। আমি বীরুর মামা।

শ্যামল—মামাকে বললে চলবে না, আমি তার মাকেই বলতে চাই।

শোভন—আপনি চোখ রাঙিয়ে কথা কইছেন, দেখতে পাচ্ছি।

শ্যামল—চোখ রাঙাবার কারণ ঘটেছে বলেই চোখ রাঙাচ্ছি।

শোভন—তাই নাকি?

রবি—বাজে কথা বলছেন কেন? আসল কথাটা কি তাই বলুন না!

শ্যামল—আসল কথা হচ্ছে, আমি জানতে চাই, আপনাদের বীরু ওই কামারদের গরীব ছেলেটাকে মেরেছে কেন?

শোভন—মারবার কাজ করেছে বলেই মারা হয়েছে!

শ্যামল—মোটেই না। সে তার নিজের ঘুড়ি নিতে আপনাদের বাগানে ঢুকেছিল। এই তার অপরাধ!

শোভন—না বলে জমিদারের বাগানে কেনই বা ঢুকবে সে?

শ্যামল—না বলে আপনাদের ছেলেই বা অন্যের ঘুড়ি নেবে কেন?

শোভন—হুঁ। আপনি কি বলতে চান?

শ্যামল—বলতে চাই ছেলেটিকে একটু শাসন করুন। তাকে বলুন খ্যাঁদার কাছে ক্ষমা চাইতে।

শোভন—আপনার হুকুমে?

শ্যামল—হুকুমে না হয়, আমার অনুরোধেই হল।

[দরজার উপর শোভনের ছোটমামা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং মন দিয়া এই নবাগতের কথাবার্তা শুনিতেছিল। ছোটমামা কথাবার্তায় মেয়েলী, বয়স বছর পঁচিশ, কথার মধ্যে একটু গ্রাম্য টান আছে। অগ্রসর হইয়া সে আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্যামলকে দেখিয়া লইয়া শোভনকে প্রশ্ন করিল]

ছোটমামা—কী হয়েছে রে শোভন?

শোভন—ইনি এসেছেন, বীরুকে শাসন করতে।

শ্যামল—শাসন করতে নয়, শাসন করবার অনুরোধ জানাতে।

শোভন—অনুরোধ?

রবি—অনুরোধ করার attitude হয় অন্য রকম।

ছোটমামা—থামো তোমরা। তা, হ্যাঁ ভাই! কী করেছে আমাদের বীরু?

শ্যামল—সে মিছিমিছি ওই কামারদের ছেলেটাকে মেরেছে।

ছোটমামা—সে মিছিমিছি মেরেছে, এই খবরটি তুমি কী করে জানলে মাণিক?

শ্যামল—যাকে মেরেছে, সেই বলেছে।

ছোটমামা—সেই যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, তাই বা তুমি জানলে কী করে?

শ্যামল—দেখুন, এটা তর্কের ব্যাপার নয়। আপনাদের ছেলে অন্যায় করেছে এবং সেটা আপনাদের প্রশ্রয় পেয়েই হয়েছে।

শোভন—তাই নাকি?

শ্যামল—নিশ্চয়। গরীবের ছেলে, সে বহুকষ্টে একখানা ঘুড়ি কিনেছিল; আপনারা বড়লোক, আপনার ভাগ্নের তাতেও লোভ! এখন থেকে তাকে লোভী হবার তালিম দিচ্ছেন।

রবি—কিন্তু আপনার এসব কথা আমাদের শোনাবার কী অধিকার আছে জানতে পারি?

শ্যামল—গরীবেরা কথা বলতে পারে না। আপনাদের দাপটে তাদের কণ্ঠরুদ্ধ। কাজেই একজনকে তাদের হয়ে কথা বলতেই হয়!

ছোটমামা—ওরে শোভন, এ ছেলেটা কেরে?

শোভন—জানিনে মামা।

ছোটমামা—জামাইবাবু শুনলে যে এখনি একে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে, রে! তুমি পালাও যাদু, পালাও। ও সব গরম গরম কথাবার্ত্তা শোনা আমাদের অভ্যেস নেই বুঝেছ? চণ্ডী কামারের সেই হারামজাদা বিচ্ছু ছেলেটা তোমায় এসব কথা বলেছে বুঝি?

শ্যামল—যেই বলুক, সেটা আপনাদের জানবার বিষয় নয়। বীরু তার ভায়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, আর সে একথা বলে থাকলে ভারী অন্যায় করেছে না?

ছোটমামা—না, ন্যায়-অন্যায়ের কথা হচ্ছে না। কিন্তু দশ বছরের কচি ছেলে বীরু, মেরে একেবারে ছোঁড়ার মাথা ফাটিয়ে দিলে, এ কথাই বা বিশ্বেস করি কী করে

বলতো দেখি?

শ্যামল—বিশ্বাস না হয় নশুবাবুর বাড়ীতে গেলেই টের পাবেন। নশুবাবু তাকে নিয়ে গেছেন, মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে দেবেন বলে!

শোভন—আবার নশুবাবুও জুটেছেন এর মধ্যে?

ছোটমামা—ওরে শোভন, মরবো নাকি হেসে হেসে আমি? বামুনপাড়ার নশে চক্কোত্তি হল নশুবাবু! বলি "কালে কালে কতই হল, পুলি পিঠের ন্যাজ বেরুল!" (হাসি) ছোঁড়াটাকে কালকে একবার ডেকে পাঠাস তো শোভন! চারটে পয়সা দিয়ে দিলেই হবে।

শোভন—আচ্ছা।

শ্যামল—ব্যস্!

রবি—আবার কি?

শ্যামল—এতেই ওর মাথার যন্ত্রণা মিলিয়ে যাবে?

রবি—নিশ্চয়!

ছোটমামা—শোন, শোন, আমাদের বীরু যে ও ছোঁড়ার গায়ে হাত দিয়েছে—এই ওর বাবার ভাগ্যি। ছোটলোকের ছেলে, রোগের ডিপো; বীরু এখন ভাল থাকলে বাঁচি!

শ্যামল—বীরুকে ক্ষমা চাইতে হবে।

শোভন—কী করতে হবে?

শ্যামল—বীরুকে ক্ষমা চাইতে হবে ওর কাছে।

[সহসা বিকাশের প্রবেশ]

বিকাশ—যা ভেবেছি ভাই! তুই বুঝি এখানে এসে জুটেছিস্ শ্যামল? চল্ বাড়ী চল্!

শ্যামল—না।

ছোটমামা—ছোঁড়াটা বুঝি তোদের বাড়ীতে এসেছে রে বিশে?

বিকাশ—হ্যাঁ মামা!

ছোটমামা—কোলকাতার ছেলে! তাইতো বলি, আমাদের গাঁয়ের ছেলের মুখ দিয়ে তো এত গরম গরম বুলি বেরোয় না! বই-পড়া বিদ্যে কিনা! তা হ্যাঁরে! কোলকাতা থেকে তোর এই সব বন্ধুদের মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে আসিস কি আমাদের অপমান করবার জন্যে?... গালমন্দ যা দেবার, তা' তোরা নিজেরা এসে দিয়ে গেলেই পারিস!

বিকাশ—কী যে বলো মামা, তার ঠিক নেই। তোমাদের গালমন্দ দিতে যাবো আমরা কোন্ দুঃখে? আমরা ওকে পাঠাতে যাব কেন? ও নিজেই এসেছে!

ছোটমামা—নিজে কি আর এমনি এমনি আসতে পারে রে? নিশ্চয় এর মধ্যে আর কারুর হাত আছে। নইলে তোমার কোলকাতার বন্ধু—যাকে আমরা চিনিনে, জানিনে, সে এসে কোন্ সাহসে যাচ্ছে-তাই করে আমাদের গালাগালি দিয়ে যায়?

শ্যামল—আমি গালাগালি দিইনি।

শোভন—যা দিয়েছেন ভদ্রভাষায় তাকে গালাগালিই বলে।

ছোটমামা—আমাদের গালাগালি দিয়ে পার পেয়ে যায়, এমন একটা মানুষও তো আজ অবধি দেখিনি বিশে! শোভন, তুই ভেতরে গিয়ে জামাইবাবুকে একবার খবর দে তো! বল্‌বি—এক্ষুণি যেন একবার এঘরে আসেন।

[শোভন ও রবি চলিয়া গেল]

বিকাশ—তোর জন্যে কি আমরা আত্মহত্যা করবো শ্যামল? কেন এলি তুই কোলকাতা থেকে?

ছোটমামা—আমি বুঝেছি, তোর বন্ধুর এতে কোন দোষ নেই। এ সেই ছোটলোক হারামজাদা চণ্ডে কামারের কাজ; ব্যাটা বড্ড বাড় বেড়েছে! আচ্ছা!

শ্যামল—না-না, সে আমায় কোন কথা বলেনি।

ছোটমামা—বলেছে কি বলেনি, সে আমরা বুঝবো। এই সেদিন ব্যাটার এক বছরের খাজনা জামাইবাবু মাপ করে দিয়েছেন। এই তার প্রতিফল? আচ্ছা! তুই তোর বন্ধুকে নিয়ে বাড়ী যা বিশে!

বিকাশ—আয় শ্যামল!

শ্যামল—যাচ্ছি। কিন্তু চণ্ডী কামার কোন দোষ করেনি, একথা আমি আবার আপনাকে বলে যাচ্ছি।

ছোটমামা—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমায় আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকালতি করতে হবে না মাণিক! বাড়ী যাও। আমার জামাইবাবুর সাতপুরুষ এই গ্রামে জমিদারী করে গেছেন,—জামাইবাবু আজও করছেন, তোমাদের ওই দুটো কেতাবী বুলিতে আমরা ভয় পাব না, আর চণ্ডে কামারের ফোঁসফোঁসানিও আমরা চিনি। অমন দু-পাঁচশো চণ্ডী কামারের মাথা, এই গাঁয়ের মাটির নীচে পোঁতা আছে, তা জানো?

বিকাশ—কিছু মনে করবেন না মামা! আমার এই বন্ধুর মাথার একটু গোলমাল আছে। আয়।

[বিস্মিত চোখে শ্যামল বিকাশের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু বিকাশ তাহার দিকে না চাহিয়া শুধু তাহার ডান হাতখানি সজোরে চাপিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহিরে লইয়া গেল। মামা সেই দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল]

ছোটমামা—মাথার গোলমাল আছে! ন্যাকামী দেখে

আর বাঁচিনে! ওরে, জামাইবাবুকে খবর দিলি? আচ্ছা দাঁড়া, আমি নিজেই যাচ্ছি।

—পঞ্চম দৃশ্য—

[পথ। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিতেছে। দূরে খঞ্জনীর বাজনা শোনা যাইতেছে। দেখা গেল একটি বাউল ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তাহার কণ্ঠের এই বাউল গানটি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।]

গান

ওরে, ভোর হবে—ভোর হবে,
এই নিশীথের নিকষ-কালো
আলোয় কথা কবে।
ভোর হবে, ভোর হবে!
যাহার লাগি চলিস্ একা
এই আঁধারে পাস না দেখা,
সেই অজানার সোনার কিরণ
ঊষায় ডেকে লবে,
ওরে, ভোর হবে—ভোর হবে।

[ঠিক এই সময় সেই পথে বিকাশ ও শ্যামল আসিয়া দাঁড়াইল। পথের এক কোণে দাঁড়াইয়া তাহারা এই গান শুনিতে লাগিল। শ্যামলের কাছে ইহা দৈববাণীর মত লাগিল। মনে হইল, জাতির ভাগ্য-বিধাতা যেন এই বাউলের কণ্ঠের মধ্য দিয়া তাঁহার অভয়বাণী শ্যামলকে শুনাইতে আসিয়াছেন!]

গান

আজ কেন তোর নেইরে বুকে বল?
কাহার লাগি নয়ন ছলো ছল্?
দুঃখ সে তো আছেই আছে,
দুঃখহারী কাছে আছে,
সেই ভরসায় প্রাণ সঁপে তুই
চলবি একা ভবে—
ওরে, ভোর হবে—ভোর হবে।

[বাউল চলিয়া গেল। বিকাশ বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। শ্যামলকে দেখা গেল, সে জামার হাতায় নিজের চোখ দুইটি মুছিতেছে। বিকাশ তাহার দিকে বিস্মিত চোখে চাহিতেই সে অগ্রসর হইল। তখনও দূরে বাউলের কণ্ঠ শোনা যাইতেছে—"ভোর হবে—ভোর হবে।"]

—ষষ্ঠ দৃশ্য—

এই দৃশ্যে যারা যাওয়া-আসা করেছে, তাদের পরিচয়ঃ

কমল, বিকাশ, বিমল, চারু, প্রতাপ, শ্যামল } ...বন্ধুগণ।
স্বপ্ন...আশা।

[বিকাশের বাড়ী। শয়ন-কক্ষ, পিছনের দেওয়ালে একটি বড় জানালা, তাহার মধ্য দিয়া দেখা যায় ঘরের বাহিরে কালো রাত্রি থম্থম্ করিতেছে! ঘরের মধ্যে একখানি ছোট খাট, তাহাতে বিছানা পাতা।

ঘরের এক কোণে একটি ছোট টেবিল ও একখানি চেয়ার। টেবিলের উপর কেরোসিন তেলের টেবিল-ল্যাম্প জ্বলিতেছে। টেবিলের উপর কয়েকখানি বই। বাম দিকের দেওয়ালে একটি ব্র্যাকেট, তাহাতে দু'খানি কাপড়, একটি জামা, একখানি তোয়ালে ঝুলিতেছে।

কথা কহিতে কহিতে ঘরে চারু, কমল, বিমল, প্রতাপ, বিকাশ প্রবেশ করিল।]

কমল—Hopeless, Hopeless, শ্যামলটা একদম Hopeless! তারপর কী হলো?

বিকাশ—তারপর আর কী হবে? আমি ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে হয়ত গলাধাক্কা দিয়ে তারা ওকে বার করে দিত!

বিমল—ছি ছি, কী কেলেঙ্কারী, বল্ দিকিনি!

চারু—আমরা এসেছি বেড়াতে—

প্রতাপ—আমাদের সম্বন্ধে একটা bad impression হয়ে গেল ওদের!

কমল—সবটাতেই ফোঁপর-দালালী করা আজকাল যেন ওর একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে!

বিকাশ—তাতেই কি ছেলের জেদ কমছে! তবু ঘাড় বাঁকিয়ে বলছে, বীরুকে খ্যাঁদার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে!

বিমল—দ্যাখো কাণ্ড!

প্রতাপ—যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন ও বেশ sentimental হয়ে পড়ছে! দেশকে কি আমরা ভালবাসি না? কিন্তু তার একটা স্থান-কাল-পাত্র আছে। এ কী!

বিকাশ—মাঝে থেকে ওর হয়ে ওকালতী করতে গিয়ে আমি কতকগুলো কড়া কথা শুনে এলাম।

চারু—উপায় কী? এরকম খামখেয়ালী বন্ধু নিয়ে বাস করতে গেলে অনেকেই অনেক কিছু বলবে।

বিমল—কী করছে এখন?

বিকাশ—খেতে বসেছে। মা একটু মিষ্টি মিষ্টি বকলেন কিনা!

প্রতাপ—মা বলেছেন তাহলে?

বিকাশ—বলতেই হয়। কেননা ওঁরা হলেন গাঁয়ের জমিদার। তোরা জানিসনে, কিন্তু আমরা তো জানি—কি অসম্ভব প্রতাপ ওঁদের! আজকাল তবু তো কমেছে। আগে আগে শুনেছি, কথায় কথায় মানুষের মাথা নিতো। আজ ওদের সঙ্গে একটা মন-কষাকষি হলে—গাঁয়ে বাস করা আমাদের পক্ষে শক্ত হয়ে উঠবে।

বিমল—বটেই তো!

বিকাশ—তোমরা হয়তো কাল কি পরশু চলে যাবে। তারপর? তারপর ওঁদের সঙ্গে তো এক গাঁয়ে বাস করতে হবে আমাদের?

প্রতাপ—নিশ্চয়।

বিকাশ—বাবা একথা শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন। আর শুনবেনও নিশ্চয়। কেননা জমিদারবাবু ভয়ানক রগচটা লোক। বাবাকে ডেকে নিশ্চয় একথা বলবেন।

চারু—ছি ছি! ওর হয়ে আমরা তোর কাছে ক্ষমা চাইছি ভাই!

প্রতাপ—বিকেল বেলায় দেখ না, ফট্ করে কী কাণ্ডটা করে বসলো।

বিমল—ওকে আমাদের বয়কট্ করা উচিত।

প্রতাপ—হতে পারে আমি তোমাদের মতো বাঙালী নই, কিন্তু আমার কোন্‌খানটা অবাঙালী আমায় দেখিয়ে দিতে হবে।

বিকাশ—Rubbish! সে কথা উঠতেই পারে না। যাই হোক, তোরা যদি আরও দু'-চারদিন থাকতে চাস্ তো থাক্—কিন্তু ওকে কিছু মনে করো না ভাই! ওকে আমি কালকেই কোলকাতায় পাঠিয়ে দেব। কেননা বেশী দিন থাকলে ও যে কখন কী কাণ্ড করে বসবে, কিছুই ঠিক নেই।

[শ্যামল প্রবেশ করিল। বেদনা এবং লাঞ্ছনার ভারে তাহার সুন্দর মুখখানি বিষণ্ন করুণ। সে কোন বন্ধুর দিকে না চাহিয়া নিজের বিছানায় আসিয়া বসিল। বন্ধুরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল]

বিমল—বিকাশ চাইছে, তুই কালকেই কোলকাতা চলে যাস্ শ্যামল!

শ্যামল—(তাহার দিকে উদাস চোখ মেলিয়া) যাব।

বিমল—তাহলে ওকে আর বিরক্ত করে কাজ নেই। রাতও এদিকে প্রায় দশটা বাজে; আমরা গল্প-টল্প করিগে।

প্রতাপ—তাই চল্।

বিকাশ—তুই কি এখুনি শুয়ে পড়তে চাস্ শ্যামল?

শ্যামল—না, একটু বসি।

বিকাশ—বেশ, তাহলে শোবার সময় আলোটা কমিয়ে দিস্, কেমন?

[শ্যামল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলে সকলে চলিয়া গেল। ঘরটি মুহূর্ত্ত মধ্যে ফাঁকা হইয়া গেল। শ্যামল উঠিয়া আলোটি কমাইয়া দিতেই বাহিরের অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আসিয়া খাটে বসিল। জানালার বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া জোনাকী জ্বলিয়া উঠিতেছে, কান পাতিয়া থাকিলে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়।

অকস্মাৎ সেই স্তব্ধতার বুক চিরিয়া দূরে একটা মিশ্রিত কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দূরের অন্ধকার দিগন্ত আগুনের শিখায় লাল হইয়া উঠিল। কোথায় যেন আগুন লাগিয়াছে!

কাছেই যেন একটি নারী-কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল, "তোমরা কে কোথায় আছ গো, শীগগির এসো। ওগো আমার কী সর্ব্বনাশ হলো গো!"

বিমূঢ়ের মত শ্যামল বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—বিকাশ, বিমল, কমল, প্রতাপ, চারু ইত্যাদি। বিকাশ ঘরে ঢুকিয়া আলোটি বাড়াইয়া দিতেই জানালার পিছনের রক্তাভা ম্লান হইয়া আসিল। শুধু বহুকণ্ঠের একটি চাপা আর্ত্তনাদ ইহাদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বিকাশ ছুটিয়া গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া রহিল।]

বিমল—কোথায় আগুন লেগেছে?

বিকাশ—(না চাহিয়া) চণ্ডী কামারের ঘরে।

কমল—কী ভয়ানক! কী করে লাগলো আগুন?

বিকাশ—ওই যে বলে গেল! জমিদার-বাড়ী থেকে চণ্ডীকে ডেকে পাঠিয়েছে, সে গেছে সেখানে, ছেলে দুটোকে নিয়ে তার বৌ শুয়ে ছিল ঘরের মধ্যে, ইতিমধ্যে—

প্রতাপ—তাহলে বাইরে থেকে কেউ লাগিয়েছে বল্!

বিকাশ—নিশ্চয়! সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

[একটু চুপচাপ]

বিমল—কিন্তু অসহায় গরীবের এই ঘরখানা পুড়িয়ে দিয়ে কার কী লাভ হলো?

বিকাশ—লাভ কারুর হোক্ বা না হোক্, ক্ষতি একজনের হলো বৈকি!

কমল—কিন্তু সে বেচারার অপরাধটা কী?

বিকাশ—অপরাধ? (শ্যামলকে দেখাইয়া) ওই ওকে

জিগ্যেস করো, সদুত্তর পাবে।

শ্যামল—আমি?

বিকাশ—হ্যাঁ, তুমি! ন্যাকা সাজবার চেষ্টা কোরো না শ্যামল! আজকে চণ্ডী কামারের এই এত বড় ক্ষতির জন্য দায়ী তুমি।

[সকলে চুপ]

বিকাশ—তুমি যদি আজ বিকেলে গরীবের দুঃখে একটু কম বিচলিত হতে, তাহলে হয়তো এত বড় দুর্ভোগ ওদের কপালে ঘটতো না। চণ্ডী কামারের ছেলের জন্য গায়ে পড়ে মোড়লী করতে গিয়ে দ্যাখো, কী করেছো!...এবার? এবার? কী করবে? আজ যে ওদের মাথা গুঁজবার একমাত্র আশ্রয়টুকু পুড়ে গেল, তার জন্য কী ক্ষতি-পূরণ দেবে তুমি?

প্রতাপ—আমি তো বাঙালী নই, আমার এ সম্বন্ধে কোন কথা বলবার অধিকারই নেই। তবুও একথা ঠিক, এ কাজ করতে আমাদের লজ্জা হতো। পয়সা দিয়ে যার উপকার করতে পারবো না, লেকচার দিয়ে তার অপকার করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

বিমল—ছি ছি, কী করলি বল্ দেখি তুই?

কমল—আচ্ছা, এ আগুন কি ওই জমিদার—

বিকাশ—সে কথা উচ্চারণ না করাই ভাল ভাই! আমরা জানি সব, বুঝি সব, কিন্তু আমাদের কথা বন্ধ।

[নেপথ্যে নারী-কণ্ঠঃ—"ওগো আমাদের কী সব্বোনাশ হলো গো!"]

শ্যামল—কিন্তু আমি তো অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়েছিলাম ভাই!

বিকাশ—অন্যায় কাকে বলিস্ তুই? শহর থেকে এসে যেটা তোর অন্যায় বলে মনে হয়, গ্রামে হয়তো সেইটেই ন্যায়। শহরের অপমান, গ্রামের সম্মান। চণ্ডী কামারের ছেলে এই মার আজ প্রথম খেলো না; ওর বাপ, ওর ঠাকুর্দ্দাও ঠিক এইভাবেই জমিদার-বাড়ী থেকে মার খেয়ে এসেছে। যে পিঠে চাবুক পড়ার জন্য ওঁরা কেঁদেছে, সেই পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিলেই ওরা হেসেছে! এই তো ওদের হাসি-কান্নার দাম!

শ্যামল—তাহলে কীভাবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি বল্!

বিকাশ—কাল সকালে উঠে সে ব্যবস্থা করা যাবে। প্রায়শ্চিত্ত আর কি, আমরা চাঁদা করে ওর একখানা ঘর তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো, আজ থাক্।

বিমল—একবার ওখানে গেলে হতো না?

বিকাশ—পাগল হয়েছিস? বলবে, মজা দেখতে এসেছে। আজকের মতো সব শুয়ে পড়ো, কালকে সকালে উঠে চণ্ডীকে ডেকে পাঠিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

কমল—কিন্তু আজ আর ঘুম হবে না ভাই, বাইরে ওই গরীবের কান্না।

বিকাশ—বাইরেই তো গরীব কাঁদে ভাই! বাইরে কাঁদে গরীব, আর ভেতরে বসে হাসে গরীবের ভাগ্য-বিধাতা। ওর জন্য মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। বাইরের সৃষ্টিই তো হয়েছে গরীবদের থাকবার আর কাঁদবার জন্যে; চলে আয়।

[শ্যামল ব্যতীত সকলে বাহির হইয়া গেল]

[শ্যামল উঠিয়া জানালার কাছে গেল। দূরে, আগুনের রক্তিমাভা তখন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া একটি মিশ্রিত কণ্ঠের চাপা আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ শ্যামল দাঁড়াইয়া রহিল। যখন সে জানালা হইতে সরিয়া আসিল, তখন দেখা গেল তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সে আসিয়া বিছানার উপর বসিল, তারপর ক্রন্দন-বিজড়িত অস্ফুট কণ্ঠে হাত দুইটি জোড় করিয়া কহিল]

শ্যামল—ভগবান! আমাকে ক্ষমা করো। আমি এর জন্য এতটুকু দায়ী নই। আমি চেয়েছিলাম অন্যায়ের প্রতিকার করতে, আমি চেয়েছিলাম দরিদ্রের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে; কিন্তু তার জন্য ওরা এত বড় শাস্তি দেবে এ আমি ভাবিনি। ভগবান! তোমার পৃথিবীতে কেন এত কষ্ট? এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে ভরা বিচিত্র পৃথিবী, যাকে তুমি মধুর করে তুলেছ মানুষের ভালবাসা দিয়ে, মোহন করেছ সমুদ্র-পর্ব্বত দিয়ে, কোমল করেছ ফুল দিয়ে, ভীষণ করেছ ভুল দিয়ে।

মানুষের উপর মানুষের এই অত্যাচার, তুমি তা বন্ধ করো প্রভু! পাঠাও আকাশ থেকে তোমার শান্তির মন্ত্র। নতুন ঊষার আলোর আশীর্ব্বাদ পড়ুক এদের মুখে, অন্ধকারের দুঃস্বপ্ন দিয়ে ভরা পৃথিবীর উপর থেকে কেটে যাক্ এই দুঃখের রাত্রি, নির্ম্মল হোক মানুষের জীবন, নিষ্পাপ হোক্ তাদের পরিবেশ।

দুর্ব্বলেরা কি শুধু চিরকাল কেঁদেই যাবে? প্রবলের অত্যাচার আর কতকাল তোমার সৃষ্টির কলঙ্ক প্রচার করবে? হে ভগবান্, জাগ্রত করো ওদের আত্মচেতনা, উদ্যত করো তোমার বজ্র, গতানুগতিকতার পঙ্কতল থেকে উর্দ্ধায়িত হয়ে উঠুক ওদের ব্যথার কমল, আত্ম-উপলব্ধির নতুন

প্রভাতে ওদের নবজন্ম হোক, মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে তোমারি বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত হোক প্রভু!

[শ্যামলের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ সে অভিভূতের মত বসিয়া রহিল, তারপর উঠিয়া গিয়া আলোটি নিভাইয়া দিতেই কৃষ্ণা অষ্টমীর চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সে আসিয়া বিছানার উপর বসিল। সেই ম্লান আলোয় ঘরের সমস্ত বস্তুই অপরূপ এবং রহস্যময় দেখাইতেছিল। দেখা গেল, শ্যামল ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল। দূরাগত আর্ত্তনাদ পুনরায় শোনা গেল—"ওগো আমাদের কী সব্বোনাশ হলো গো! আমাদের যে গাছতলা সার হলো গো! মা কালী, তোমার মনে কি এই ছিল মা?"

শ্যামল ঘুমাইয়া পড়িতেছে, হঠাৎ ঘরের মধ্যে প্রথম দৃশ্যে বিকাশের দেখা সেই স্বপ্নের আবির্ভাব হইল। একটি উজ্জল আলো স্বপ্নটিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।]

শ্যামল—কে তুমি?

স্বপ্ন—আমি আশা।

শ্যামল—তুমি আশা?

স্বপ্ন—হ্যাঁ, আমি আশা।

শ্যামল—কিসের আশা তুমি?

স্বপ্ন—মানুষের আশা।

শ্যামল—আমার কাছে কেন এসেছ?

স্বপ্ন—আজকের ঘটনায় তুমি ভেঙে পড়েছ বলে—তোমাকে বলতে এসেছি, "হতাশ হয়ো না; এমন রাত্রি নেই, যার প্রভাত হয় না!"

শ্যামল—কী করবো বলো?

স্বপ্ন—আশায় বুক বাঁধো। সংসারে দুঃখ, নৈরাশ্য আছেই, ব্যথা-বেদনা ব্যাঘাত থাকবেই; কিন্তু তাতে দমে গেলে চলবে না, ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে থাকো, পরিণামে জয় হবেই।

শ্যামল—আচ্ছা, তা না হয় থাকলাম। কিন্তু আমাকে বলতো ভাই আশা, এই যে আজ চণ্ডী কামারের ঘরখানা, তার মাথা গুঁজে থাকবার একমাত্র আশ্রয়টুকু, তারই চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সে কী আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

স্বপ্ন—নতুন ঘর তৈরীর আশা নিয়ে। আকাশের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করো শ্যামল! কালবৈশাখীর কালো মেঘ যখন তার বিদ্যুতের কশাঘাত করে আকাশের বুকখানাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়, তখন কি তুমি কল্পনা করতে পারো এই আকাশের বুকে কোনদিন আবার চাঁদ উঠবে? তারা ফুটবে? কিন্তু সেই দুর্য্যোগ—তার পূর্ণ বিক্রমে নীল আকাশকে নিষ্পেষিত করে যখন ক্লান্ত হয়ে মিলিয়ে যায়, ঠিক তার পরক্ষণেই আত্মপ্রকাশ করে অনন্ত নীল অফুরন্ত মাধুর্য্য। তার কারণ, আলোই হচ্ছে চিরন্তন সত্য, কালোটা মিথ্যা।

শ্যামল—আরো বলো!

স্বপ্ন—পাখীর কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করো শ্যামল! সে তার একটুখানি ঠোঁট দিয়ে একটি একটি করে কুটো সংগ্রহ করে চমৎকার একখানি নীড় বাঁধলো। একদিনের একটা দমকা ঝড়ে সেই নীড় ভেঙ্গে ধূলায় গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কিন্তু তাই বলে পাখী তার নীড় রচনা কি বন্ধ করে? না—আবার সে নতুন উদ্যমে বেরিয়ে পড়ে কুটো সংগ্রহ করতে! তার কারণ, পৃথিবীতে উদ্যমই হচ্ছে সত্য, উৎপীড়ন মিথ্যা। শুধু তোমার দুঃখই দেখছো? শুধু চণ্ডী কামারের লাঞ্ছনাটাকেই নিজের কাঁধে নিয়ে নিজেকে দায়ী করবার চেষ্টা করছো কেন? প্রত্যেক ভারতবাসীই কি আজ ওই চণ্ডী কামার নয়? গোটা ভারতবর্ষ কি ওই চণ্ডী কামারের ঘর নয়? দুঃখে দীর্ণ, অনাহারে শীর্ণ, বেদনায় জর্জ্জরিত—ওই চণ্ডী কামারের মতই কি তোমরা ওপরের দিকে চেয়ে বিধাতাকে অভিসম্পাত দেবার চেষ্টা করছো না?

শ্যামল—কিন্তু কী করলে এই অসহায়তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে সে কথা বলে দাও।

স্বপ্ন—আশা করো। পৃথিবীতে দুঃখও যেমন সত্য, সুখও তেমনি সত্য। অন্ধকার যেমন সত্য, আলোও তেমনি সত্য। হারানোও যেমন সত্য, পাওয়াও তেমনি সত্য। চাওয়া যদি ঐকান্তিক হয়, পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

শ্যামল—কিন্তু কে দেবে আমাদের সেই পাওনা?

স্বপ্ন—ভগবান দেবেন।

শ্যামল—কোথায় আছেন ভগবান?

স্বপ্ন—তোমার মনে। তোমার অন্তরের অন্তরতম গহনে। তিনিও আজ তোমার সঙ্গে ওই চণ্ডী কামারের দুঃখ সমান ভাগ করে নিচ্ছেন; তোমার আনন্দে হাসছেন, শোকে কাঁদছেন। তোমার ভেতরে তাঁকে জাগাও, তুমিও জাগবে। তাঁকে বাঁচাও, তুমিও বাঁচবে। আশা করো, আশা করো শতাব্দীর এই কালি, শতাব্দীর এই কলঙ্ক মুছে যাবেই যাবে। দানবের অত্যাচার এক দিনের, কিন্তু দেবতার আশীর্ব্বাদ কল্প-কালের। এই কথাটি মনে রেখে অধীর না হয়ে এগিয়ে যাও, দেখবে সমস্ত কালোর উপর ফুটে

উঠেছে একটি আলোর শতদল—জাতির যুগ-সঞ্চিত সহনশীলতার জয়-পতাকার মত একটি সহস্রদল ব্যথার কমল।

[স্বপ্ন মিলাইয়া গেল। ঘুমের মধ্যে শ্যামল পাশ ফিরিয়া শুইল। হঠাৎ তাহার কানে একটি গান বাজিয়া উঠিল। গানটি আজ সে জমিদার-বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে শুনিয়াছিল—"ওরে, ভোর হবে—ভোর হবে।"

স্বপ্নের মধ্যে বাউলের গান চলিতে লাগিল, শ্যামল নিঃস্পন্দ নিদ্রিত অবস্থায় সে গান শুনিতে লাগিল। জানালা দিয়া দেখা গেল পূর্ব্ব-গগনে ধীরে ধীরে ভোরের আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।]
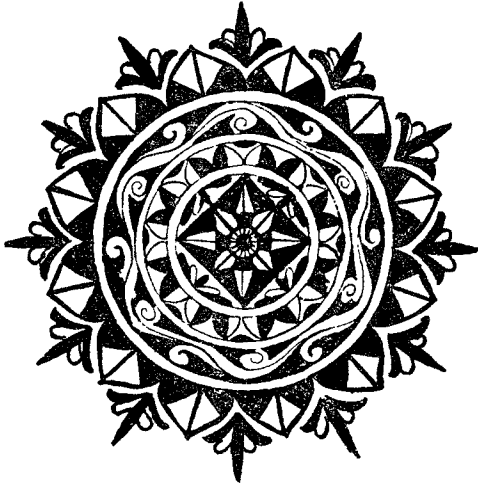
কাতুকুতু

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

বাঘকে করি না ভয়
সাপকে করি না ভয়
ভয় করি নাকো ভূতুকে
আর কোনো ভয় নাইকো আমার
ভয় শুধু কাতুকুতুকে।
জ্যাঠামশায়ের বাড়ী
জন্মের মতো আড়ি
ভুলছি না কোনো হুজুকে
দেখলেই খালি কাতুকুতু দেয়
ভয় করি কাতুকুতুকে।
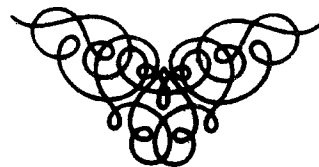
দৃষ্টিহীন

হরুর মাথাটা ঘুরিয়ে দিলেন আমাদের থার্ড মাস্টার অনঙ্গবাবু। বাংলা পড়াতেন তিনি। টিফিনের আগে তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন।

বেঁটেখাটো চেহারা। গায়ের রং ফর্সা না হলেও কালো বলা যায় না। পাঞ্জাবির ওপর সদাসর্বদা থাকতো একটা চাদর। মাথায় বাবরিকাটা চুল।

আমরা আড়ালে বলতাম—রত্নাকর, অর্থাৎ আদি কবি।

শুনতাম মাসিক পত্রিকায় তিনি নাকি কবিতা-টবিতা লেখেন। সেই জন্যেই বোধহয় নামটা রত্নাকর হয়েছিল। আমরা তো শ্রদ্ধায় ভেঙে পড়তাম। সাধারণ দু'লাইন গদ্য লিখতে গিয়ে যেখানে আমরা পাঁচটা গাঁট্টা খাই, সেখানে তিনি লাইনের পর লাইন মিলিয়ে কবিতা লেখেন! তাও আবার ছাপা হয়!

সেবার, কোয়ার্টারলি পরীক্ষা হয়ে গেছে। স্কুল বন্ধ হতে মাত্র আর একটি দিন বাকি। এমন সময় একরাশ খাতা নিয়ে তিনি ক্লাসে ঢুকলেন।

আমরা তো যে যার জায়গা ছেড়ে দাঁড়ালাম। বুঝলাম প্রত্যেকবারের মতন অনঙ্গবাবু আমাদের খাতা ফেরত দেবেন আর তার সঙ্গে চলবে বকুনি আর উপদেশের পালা।

নিয়মমত তাঁর প্রথমেই ডাকা উচিত আমাদের ফার্স্ট বয় রমেনকে। কিন্তু আমাদের বিস্মিত করে তিনি রমেনকে না ডেকে ডাকলেন একেবারে হরুকে। হরু অর্থাৎ হরিহরকে।

হরু কোনদিনই ছেলে ভাল নয়। কোন রকমে ক্লাসে ওঠে। আমাদের সকলকারই বুক টিপটিপ করতে লাগলো। না জানি হরু কি করেছে! হয়তো নকল করেছে, নয়তো কিছু লিখতে পারেনি। অত্যন্ত বিশ্রী খাতা বলে তারই ডাক পড়েছে প্রথম।

চড়, গাঁট্টা তো এখন চলবেই, কি জানি ব্যাপারটা হেডমাস্টার অবধি এগুবে কি না!

হরু ভয় পেয়ে গিয়ে সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললো—আমাকে বলছেন ছ্যার?

এইখানে বলে নিই, খুব একটা আনন্দ পেলে বা ভয় হলে সে একটু তোতলা মেরে যেত। কথাগুলো বেয়াড়াপনা করে মুখ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বের হত না।

নিশ্চিন্তমুখে অনঙ্গবাবু বলেন—হ্যাঁ, তোকে বলছি,

এদিকে আয়।

হরু সীট ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে অনঙ্গবাবুর দিকে এগুতে থাকে। আর আমরা দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে থাকি, ভাবি এই বুঝি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে।

হরু স্যারের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো। আমরা আশঙ্কা করছি এখুনি বুঝি চড় বা গাঁট্টা বর্ষিত হবে হরুর মাথায়। কিন্তু তেমনটি কিছুই ঘটলো না।

খাতার বাণ্ডিল থেকে একখানা খাতা বার করে নিয়ে অনঙ্গবাবু বললেন—এই নে তোর খাতা। বেশ বাংলা লিখিস তো! ভবিষ্যতে চেষ্টা করলে তুই একজন কবি হতে পারবি। তোর লেখার মধ্যে চমৎকার একটা ছন্দ আছে।

হরু যেন কেমন হয়ে গেল। সে বললো—আ—আ—আ—মি, কো—কো—কো—বি হতে পারব?

এর পরে তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুলো না।

আমরা তো সকলেই তখন অবাক!

অনঙ্গবাবু সস্নেহে বললেন—কেন পারবি না? চেষ্টা কর। আর ভাল কথা—রবিবাবুর জীবনীটাও পড়ে নিস। কেমন করে লেখা নিয়ে তিনি সাধনা করতেন তা ভাল করে পড়ে নিস। মন দিয়ে লেখাপড়া করিস। তা হলে তুইও একদিন কবি হতে পারবি!

সেই দিন বিশ্রামের ঘণ্টার পর থেকেই হরু বা হরিহরের নাম হল "কবিবর"। কিন্তু ছেলেদের এই ঠাট্টাতে হরিহর রাগলো না বা প্রতিবাদ করলো না। কেমন যেন গুম খেয়ে গেল।

কেবল আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল—তোর কাছে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিটা আছে? এর ওর কাছ থেকে চেয়ে অন্ততঃপক্ষে খান তিন-চার রবীন্দ্রনাথের জীবনী সে পড়লো। এমন কি রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা জীবনস্মৃতিও বাদ গেল না।

তারপর থেকেই তার শুরু হল সাধনা। সেই কথাই এখন বলব।

খেলার মাঠে হরিহর সাধারণতঃ অনুপস্থিত থাকতো না। পরপর ক'দিন তাকে খেলার মাঠে না দেখে গেলুম তার বাড়িতে অসুখ করেছে মনে করে।

এইখানে বলে রাখা ভাল আমাদের বাড়িটা ছিল কলকাতা থেকে দশ-বারো মাইল দূরে একটা আধা শহরে। ন'টার ট্রেন স্টেশনে আসতে না আসতেই বাদুড়ঝোলা হয়ে গ্রামের পুরুষের দল চলে আসতেন কলকাতায়।

তখন সারা গ্রামটা জুড়ে থাকতো আমাদের মত পড়ুয়ার দল আর মেয়েরা।

হরুর বাবা অফিসে বেরিয়ে যেতেই গিয়ে হাজির হলুম ওদের বাড়িতে। হরুর মা তখন রান্না করছেন। বাড়ির সামনে কারুকে দেখতে পেলুম না তাই ভেতরে ঢুকে ডাক দিলাম—হরু!

দু'একবার ডাকবার পর হরুর মা বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখেই আমি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললাম—হরু কোথায় মাসিমা?

তিনি বললেন—ঐ তো, ছাতের ঘরে বসে আছে। তা তুমি কেমন আছ সুলাল?

আমি বলি—ভাল আছি মাসিমা। হরু ক'দিন খেলতে যায়নি, তাই ভাবলুম অসুখবিসুখ করলো কিনা, সেইজন্যে খবর নিতে এসেছি।

হরুর মা বললেন—না অসুখবিসুখ কিছু করেনি, নিজের খেয়ালে ছাতের ঘরে পড়াশুনা করছে। যাও না তুমি ওপরে।

তারপর কি ভেবে বললেন—আচ্ছা বাবা সুলাল! তোমাদের মা যদি দিনের বেলা তোমাদের কাছে যান, তা হলে তোমাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়?

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বললাম—না তো!

—তবে হরু ও-কথা বলে কেন? ও বলে, তুমি সন্ধ্যের সময় আমায় ডেকে পাঠাবে, আমি তোমার ঘরে গিয়ে গল্প, কবিতা পড়ব। দিনের বেলায় তুমি অত খাটো কেন? রান্নাই বা করতে যাও কেন? তোমার শরীর খারাপ—তুমি শুয়ে থাকবে। হ্যাঁ বাবা সুলাল, তুমি বল, একটু-আধটু শরীর খারাপ হলে কি গেরস্থবাড়িতে শুলে চলে? এতগুলো লোক খাবে কী? আমি একদিন শুলে সকলকে যে ফলার খেতে হবে!

সর্বনাশ! হরুটার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এরকম ধরনের কথার অর্থ?

কিছু না বুঝেই গেলুম ওপরে। দেখি ছাতের ঘরে দরজা বন্ধ করে, জানলাগুলো খুলে দিয়ে সে চুপ করে বসে আছে।

আমি ডাকতে বললে—দরজা খোলা আছে, ভেতরে আয়।

ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ঢুকেই তো আমি তাজ্জব। একটা খাতা আর পেনসিল নিয়ে হরিহর বসে আছে।

একটু কাছে এগিয়ে যেতে দেখি, তাকে ঘিরে গোল করে দেওয়া রয়েছে একটা সাদা খড়ির দাগ। তারই মাঝখানে সে বসে আছে।

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করি—এ কি রে?

সে নির্বিঘ্ন চিত্তে বললো—আমার কবি হবার সাধনা চলছে।

—তা, এ খড়ির দাগটা কেন,—প্রশ্ন করি আমি।

গম্ভীর মুখে সে জবাব দেয়—জানিস না চাকরে রবীন্দ্রনাথের চতুর্দিকে খড়ির দাগ দিয়ে ছাতের ঘরে বসিয়ে রাখতো? আর সেইখানে বসেই সামনের বটগাছ আর পুকুর দেখতে দেখতে তিনি কবিতা লিখতেন।

আমি তো বিস্মিত। তবুও বলি—তুই বটগাছ এখন পাবি কি করে? পুকুরই বা কোথায় তোর?

সে একটু চিন্তিত মুখে বললে—ঐটাই যত গোলমাল। ঘোষেদের পুকুরটা উত্তর দিকে আছে বটে, কিন্তু এখান থেকে খালি চোখে ভাল করে দেখা যায় না। একটা দূরবীন-টুরবীন পেলে মন্দ হত না।

—কিন্তু ওর পরেই তো আমাদের খেলার মাঠ, বটগাছ কোথায় রে?

হরু বলে—সেটাও একটা সমস্যা বটে! সে সমস্যার সমাধানের কথা আমি মনে মনে ভেবে রেখেছি।

আমি বললুম—কি ভাবলি?

সে গম্ভীর মুখে জবাব দিল—সে এখন বলব না। আগে হোক। তখন দেখতে পাবি।

বুঝলাম হরু কিছুতেই বলবে না।

তাই জিজ্ঞেস করলাম—কি রকম কবিতাটবিতা লিখছিস? একটু পড়ে শোনাবি না?

সে একটু গম্ভীর মুখে বললো—এখন নয়। আগে ছেপে বের হোক, তারপর। আর তাছাড়া—

—তাছাড়া কী রে হরু?

—এই যত গণ্ডগোল করছে আমার বাবা-মা।

—তাঁরা আবার কি করলেন তোর?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হরু বললো—দ্যাখ, আমার বাবা তো এ বাড়ি ছেড়ে কখনও কোথাও যাবে না!

আমি প্রশ্ন করি—তার মানে?

হরু বলে—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বছরের অনেক সময় ডালহাউসীতে থাকতেন।

আমি বলি—তা তো থাকতেন, কিন্তু তোর কী?

হরু বললো—মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হত। তখন তিনি তাঁকে বোলপুরে নিয়ে যেতেন। আর আমার বাবা কোথায় ছাতিমগাছের তলায় বসে আমাকে উপাসনা করতে শেখাবে, তা নয়, অফিস থেকে বাড়ি এসে খালি 'হরু' 'হরু' করে চেঁচাবে। আমার লেখা গান কবিতা শুনে খুশী হয়ে পাঁচশো টাকার উপহার দেবে, তা নয়, পরশুদিন আমি গান গেয়েছিলুম বলে কান ধরে থাপ্পড় মেরে বললে—এবার কি লেখাপড়া ছেড়ে যাত্রাদলের সখী সাজবি?

কি বলি! বললুম—তা তো বটেই, তা তো বটেই।

হরু একটু উৎসাহিত হয়েই বললো—নোবেল প্রাইজ না পাওয়া অবধি এ কষ্টটা আমায় করতেই হবে। তাই ঠিক করেছি হাতের লেখা গান, কবিতা কাউকে পড়ে শোনাবো না। একেবারে ছেপে বেরুবার পর তবে শোনাবো।

আশায় হরুর চোখ দুটো চকচক করে উঠলো।

আমি বলি—কিন্তু তোর মাকে সকালে আসতে বারণ করেছিস কেন?

হরু বলে—বাঃ রে! রবীন্দ্রনাথের মা কি বার বার রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন? না তাঁকে রান্না খাওয়ার জন্যে দিনরাত বলতেন?

এতক্ষণে বুঝলাম সব কথাগুলো।

বললুম—কি আর করবি বল্? সবই আমাদের ভাগ্য।

হরু বলে—হ্যাঁ, দেখি কতদূর কি হয়!

সেদিন চলে এলাম। ভাবলাম—কি আর হবে বেশী ভেবে। হরুর খবর নিতেও তার বাড়িতে বিশেষ যেতাম না।

স্কুল খুললো। হরু কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতো না। মাঝে মাঝে যা দু'একটা কথা বলতো তা কেবল আমার সঙ্গে। যে কথাগুলো বেশীর ভাগ হত, তা হল এই।

তার চোদ্দ বছর বয়েস হয়ে যাচ্ছে। এখনও বিলেত যাওয়ার কোন সম্ভাবনা সে দেখতে পাচ্ছে না। তার এমন একটা দাদা-বৌদিও বিলেতে থাকে না যার কাছে সে যেতে পারে। কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনীতে আছে যে তিনি ঐ বয়েসে বিলেতে গেছলেন।

ইংরেজ কোন্ কবিকে দিয়ে সে তার প্রথম বই 'গীতঅর্ঘ্য' অনুবাদ করাবে?

আমি বললাম—শুনেছি তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনুবাদ করেছেন।

আমার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে সে বললো—যা যা, ওসব হচ্ছে শোনা কথা। ওসব লিখতে হয়। তাছাড়া আমিও যদি বছর দু'-এক বিলেতে থাকতে পারি, তা

আর কবিতা লিখবি কখনও?

হলে ও রকম ইংরেজীতে কবিতা আমিও লিখতে পারি।

আমি একটু বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলি—বলিস কি রে—তুই রবীন্দ্রনাথ হবি?

মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে হরিহর বললো—কেন হব না? বাধাটা কোথায়? গ্রেট ম্যানের চিহ্ন কি জানিস? পর পর দুটো ভগবানের নাম তাদের নামের সঙ্গে থাকে। যেমন ধর ঈশ্বরচন্দ্র। 'ঈশ্বর' মানে ভগবান, আর 'চন্দ্র' মানে চাঁদ। তারপর দেখ 'রামকৃষ্ণ'।

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলি—রবীন্দ্রনাথের নামের মধ্যে তো দুটো ভগবানের নাম নেই।

এইবার বিজ্ঞের মত হেসে সে বললো—তা যদি বুঝতে পারবি মুখ্যু তা হলে তো তুই কবি হতিস। 'রবি' মানে হল সূর্য, আর 'ইন্দ্র' মানে হল দেবতার রাজা। তাই তো তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। আর আমার নাম দেখ, হরি—মানে 'কেষ্ট'। তার পরে আছে—হর অর্থাৎ 'মহাদেব'। দুটো মিলিয়ে হচ্ছে—আমি আরও বড় কবি হব। আর সে জায়গায় তোর নাম কী? সুলাল! অর্থাৎ ভাল লাল। একটা ডেঞ্জার সিগন্যাল।

নামেতে হেরে গিয়ে সত্যিই মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। যাক পর পর যখন অত বড় দুটো ভগবানের নাম ওর নামের সঙ্গে মিশেছে তখন ও আমার চেয়ে বড় স্বীকার করে নিলাম। যত রাগ গিয়ে পড়লো আমার নিজের মা'র ওপর। কেন তিনি একটা ভাল নাম রাখেননি আমার! তা হলে তো আমিও বড় হতে পারতুম। কি করব আর, ওটা নিতান্ত দৈব বলেই চুপ করেই রইলাম।

পূজোর আগে সেবার পরীক্ষা হল না। কারণ গ্রামেতে হঠাৎ মহামারী দেখা দিল। স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই পূজোর ছুটি হবার কুড়ি দিন আগে। তাই সেবার স্কুল খুলতেই হেডমাস্টারমশাই বললেন—তোমাদের বাৎসরিক পরীক্ষাটা তাড়াতাড়ি হবে।

আমরা সকলে পড়তে লেগে গেলাম। ঠিক দিনে পরীক্ষাও হয়ে গেল। হরিহর ক'দিনই খুব মন দিয়ে কি লিখলো দেখলাম। আমরা সকলে ধরেই নিয়েছিলাম এবার রমেন কাৎ, হরিহরই পরীক্ষায় প্রথম হবে। ক্রমে ফল বেরুবার দিন এগিয়ে এলো। রেজাল্ট বেরুবার দিন সকাল সকাল দুরুদুরু বক্ষে আমরা সকলে গেছি ক্লাসে। হেডমাস্টারমশাই সকলকার নাম ডাকলেন। ডাকলেন না কেবল হরিহরের।

ক্লাস থেকে যাবার সময় গম্ভীর মুখে তিনি বলে গেলেন—হরু, তোমায় থার্ড মাস্টারমশাই অনঙ্গবাবু ডাকছেন।

হরু ফেল করেছে জেনে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

হরুর মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি সেখানে কোন দুশ্চিন্তার চিহ্ন নেই।

আমাকে সে চুপি চুপি বললো—এ আমি জানতাম। আমাকে বুঝতে পারে এমন মাস্টার বা ছেলে নেই। কেবল অনঙ্গবাবু নিজে কবি বলে আমাকে বোঝেন। তাই বোধ হয় তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

টিচার্স রুমের কাছে গেলাম হরুর সঙ্গে। দেখি সেখানে তিনি কি বলেন। হরু বিজয়ীর মত ঘরে ঢুকলো। আমরা বাইরে থেকে উঁকি মারতে লাগলাম।

হরু বললো—আমাকে ডেকেছেন স্যার?

অনঙ্গবাবু হরিহরকে দেখেই বোমার মতন ফেটে পড়লেন। বললেন—হ্যাঁরে বাঁদর, ওসব কি হয়েছে?

সে জবাবে বললো—কেন স্যার?

অনঙ্গবাবু আরও রেগে গিয়ে কান ধরে বললেন—কেন, বুঝিয়ে দেব? বই পড়ার নাম নেই কবিতায় উত্তর লিখেছ!

পাশেই সৌমেনবাবু বসে ছিলেন। তিনি আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই। তিনি বললেন—কী ব্যাপার অনঙ্গবাবু?

—আর মশাই বলেন কেন, 'বিষ' দিয়ে বাক্য রচনা করতে দিয়েছি, লিখেছে—"অমুকের বিষের নাম সুপ, উলটো মানে লুপ"। তারপরে 'ধ্বজা' দিয়ে বাক্য করতে দিয়েছি, লিখেছে—"ধ্বজা, বুকের মাঝে খোঁচা, চলে গেল সোজা"।

হরু ভেবেছিল আজকে বোধহয় অনঙ্গবাবু খুশী হয়ে কিছু বলবেন তাকে।

সে ভয় পেয়ে গিয়ে বললো—আ—আ—আ—

অনঙ্গবাবু বললেন—ফের কথা! জানেন সৌমেনবাবু, 'রাজা'র অর্থ লিখতে দিয়েছি মশায়, বাঁদরটা লিখেছে কিনা—"রাজা দেখতে লাগে মজা, যাত্রায় পোশাকে সাজা"। দেখুন তো মশায় এসব ছেলেকে কি বলব! তার ওপর সংস্কৃত শুনবেন—শব্দরূপ কি রকম লিখেছে?

ইদানীং আমাদের পণ্ডিতমশায়ের অসুখ করাতে অনঙ্গবাবু সংস্কৃতও পড়াতেন।

—'গজ' শব্দের রূপ লিখতে দিয়েছি। লিখেছে কিনা—"গজ, গজৌ, গজা—খেতে লাগে মজা, ঘিয়ে দিলে তাজা, জিভের কেবল খোঁজা, আহা টাটকা গজা ভাজা"।

সারা বছরটা ধরে খেটে পড়িয়ে শেষ পর্যন্ত এই! ধমক, মার খেয়ে হরু তখন কেঁদে ফেলেছে। অনঙ্গবাবু তখনও চেঁচিয়ে চলেছেন—আর কবিতা লিখবি কখনও?

নাকী সুরে কাঁদতে কাঁদতে হরু বললো—না স্যার!

অনঙ্গবাবু ছেড়ে দিলেন তাকে। প্রমোশনের জন্যে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। আমরাও যে যার বাড়ি যেতে শুরু করলাম। হরু কেবল স্কুলের ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওকে দেখে আমার যেন কেমন মায়া হল। বললাম—হরু, বাড়ি যাবিনে?

সে বললো—কী করে যাই তাই! আজকেই ঠিক আবার বাবা শরীর খারাপ বলে অফিস যায়নি। বাড়িতে গেলেই ধরবে রিপোর্টের জন্যে। তার চেয়ে তুই সঙ্গে চল। তুই থাকলে হয়তো কম মারবে।

অগত্যা গেলাম হরুর সঙ্গে তার বাড়ি অবধি। গেলাম—তার অনুরোধটা এড়াতে পারলাম না। গেট পার হতে দেখি হরুর বাবা ছাতে একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে কি বলছেন। মেজাজটা তাঁর ভাল নয় তা বুঝতে পারা গেল তাঁর চিৎকার শুনে।

হরুর মুখের দিকে চাইতেই সে বললো—এই রে বাবা হয়তো টের পেয়েছে!

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলি—কি টের পেয়েছে—এই তো আমরা বাড়ি এলুম।

হরু বললো—তা নয় রে! ছাতের আলসের ইঁট একটা ভেঙে বর্ষাকালে আমি একটা বটের বীচি পুঁতে দিয়ে তাতে মাটি চাপা দিয়েছিলাম। তার থেকে একটা গাছ বেরিয়েছিল। ক'দিন ধরে বাবা নীচের ঘরে জল বসছে কেন, জল বসছে কেন করছিলো। আজ তাই বোধ হয় মিস্ত্রী নিয়ে ওপরে গিয়ে জানতে পেরেছে আমার কর্ম,—কী হবে তাই?

বেশী ভাববার সময় আমরাও পেলাম না। ঠিক সেই সময় শিবচরণবাবু ছাতের সামনের দিকে এগিয়ে আসায় আমাদের দেখতে পেলেন।

ডাকলেন—হরে, এদিকে আয়!

হরু কাঁপতে কাঁপতে ওপরে গেল। আমিও তাড়াতাড়ি পেছন ফিরলাম। যাবার সময় হরুর বাবার গলার আওয়াজ শুনতে পেলামঃ আমি মনে করি ছাতের ঘরে নিজের পড়াশুনা করে, তা নয়, বাঁদরটা আলসের ইঁট সরিয়ে গাছ তৈরী করেছে! খাতা ওলটাতে গিয়ে দেখি লিখেছে "গীতঅর্ঘ্য"। আর "গাছের কুঞ্জ ছায়া, হল যেন গয়া"। তোমার গয়া-কাশী এখুনি আমি দেখাচ্ছি।

পরের ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়েছিলাম। কিন্তু এরপর থেকে হরুকে আর আমরা কবিতা লিখতে দেখিনি, পাসও সে বরাবরই করতো।

বঙ্কা রাজার কাহিনী

পূরবী দেবী

বঙ্কা রাজা হয়ে দেখলে তার দেশে যত সৈনিক ছিল, সেনাপতি ছিল তাদের দ্বিগুণ। বয়স হলেও রাজার বুদ্ধি ছিল কম। তাই সে বুঝতে পারেনি যে এত সেনাপতি থাকলে যুদ্ধের সময় তারা কোন কাজে আসবে না।

তখন দেশে যুদ্ধবিগ্রহও কিছু ছিল না আর হবার সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। তাই সৈনিক আর সেনাপতি নিয়ে বঙ্কা রাজা মাথা ঘামালে না। বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল তার দিন। রোজ সকালে সাজগোজ করে এসে সভায় বসত। মন্ত্রী, ওমরাহ ও সেনাপতিরা এসে বড় বড় সেলাম করে বলত, মহারাজের জয় হোক! খুশী হয়ে রাজা তাদের বসতে দিত। কোন কাজকর্মও ছিল না। তাই দাবার ছক পেতে বসে যেত রাজা বঙ্কুচন্দ্র মন্ত্রীর সঙ্গে কিস্তিমাৎ খেলতে।

ছক পাতা হতেই চারদিক থেকে সেনাপতি আর ওমরাহরা রাজাকে ঘিরে খেলা দেখত। রাজা চাল দিলেই বলে উঠত, বাঃ কি চাল! এত বুদ্ধি আমাদের নেই। সে কথা শুনে রাজার হাতটা আপনিই গোঁফের কাছে উঠে আসত। গোঁফ তো নেই। কিন্তু সে তার বাবাকে গোঁফ পাকাতে পাকাতে ভাবতে দেখেছে। তাই মনে মনে গোঁফের কাছে একটু তা দিয়ে নিত।

এমনি করে দিন যায়।

একদিন একটা দরজী এসে হাজির হল রাজসভায়।

রাজা বললে, কি চাই?

—চাকরি।

—কি কাজ কর?

—আমি দরজী। খুব তাড়াতাড়ি পোশাক তৈরি করে দিতে পারি।

—বেশ, সেনাবাহিনীর পোশাকের ভার তোমার ওপর দেওয়া হল।

কিছুদিন বাদে একটা গাইয়ে এসে হাজির হল রাজসভায়।

রাজা বললে, তোমার কি চাই? কি জান তুমি?

—আজ্ঞে মহারাজ, আমি গান গেয়ে লোককে কাঁদাতে পারি।

—তাই নাকি! তবে তুমি তো বড় ওস্তাদ দেখছি। তোমায় সেনাবাহিনীর ড্রাম-বাজানো বিভাগের বড়কর্তা করে দিলুম।

এবার এল একটা রাখাল। সে গরু চরায়। হঠাৎ তার গরুগুলো বাঘে ধরে নিয়ে যাওয়ায় সে বেকার হয়ে পড়েছে। তাই চাকরির জন্যে রাজার কাছে তাকে আসতে হয়।

রাজা তাকে সেনাদের খাদ্যবিভাগের হেড বাবু করে দিলে।

সব শেষে এল এক শিকারী। সে খুব ভাল তীর ছুঁড়তে পারে। তাই রাজা তাকেও চাকরি দিলে সেনাবিভাগে।

এতগুলো নতুন লোককে বড় বড় চাকরি দেওয়ায় রাজার পুরানো সেনাপতিরা মনে মনে খুবই চটেছিল। রাজকোষ থেকে শুধু শুধু এত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা কথাটা রাজার কানে তুললে একদিন। রাজা সে কথায় কান দিলে না। যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

এদিকে হয়েছে কি, ভিন দেশের রাজা সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে বঙ্কা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসছেন। তারা যখন নদীর ওপারে এসে তাঁবু ফেললে, তখন রাজার চর এসে খবর দিলে ভিন দেশের রাজা যুদ্ধ করতে এসেছেন। নদীতে এখন অনেক জল তাই জল না নামা অবধি তারা ওপারে অপেক্ষা করবে।

বলার দরকার ছিল না রাজাকে। প্রাসাদের ওপর থেকে

সে নিজেই সব দেখেছে। এখন চরের মুখে সব শুনে তার মুখ গেল শুকিয়ে। তখুনি গোনা শুরু হয়ে গেল রাজ্যে কত সেনা আছে। দেখা গেল সেনাদের সংখ্যা মোটে পাঁচশ আর সেনাপতির সংখ্যা দেড় হাজার। সেনাপতিরা তো আর যুদ্ধ করে না, উপদেশ দেয়। তাই রাজা পড়ল মহা ফাঁপরে। এখন উপায়!

কোন উপায় না দেখে রাজা ঘোষণা করলে—কে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার?

রাজার ঘোষণায় সেনাপতিরা সব মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু কেউই কোন বুদ্ধি দিতে পারে না।

এমন সময় দরজী এগিয়ে এসে বললে, রাজামশাই! আমি এর একটা উপায় বের করেছি। তবে অনেক টাকা খরচ হবে।

রাজা বললে, বেশ তো, তোমার যত খুশী টাকা কোষাগার থেকে নাও।

রাজার আদেশ নিয়ে দরজী চলে গেল।

তারপর সে রাজ্যে যত দরজী ছিল সকলকে ডেকে কাজে লাগিয়ে দিলে। হাজার হাজার লাল নীল বেগুনী বাদামী সবুজ হলদে পোশাক তৈরি হতে লাগল।

তার পরদিন সকালে দেখা গেল, বক্কা রাজার সৈন্যেরা নদীর এদিকে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে।

প্রথমে গেল পুরানো ছেঁড়া পোশাক পরে একদল সৈনিক। তাই দেখে নদীর ওপার থেকে ভিন রাজার সেনারা হো হো করে হেসে বিদ্রূপ করতে লাগল।

ছেঁড়া পোশাক পরা সৈন্যেরা চলে যাওয়ার পর এল লাল পোশাক পরা সেনারা। তাই দেখে ভিন রাজার সেনারা এবার আর ঠাট্টা করলে না।

লাল পোশাক পরা সেনাদের পেছনে এল বেগুনে পোশাক পরা সৈন্যেরা। ভিন রাজার সৈন্যেরা ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে উঠল।

এইভাবে সারাদিন ধরে কুচকাওয়াজ করতে লাগল নদীর এপারে কখনও লাল, কখনও বেগুনী, হলদে, সবুজ, বাদামী পোশাক পরা সেনার দল।

ভিন রাজার সেনারা সারাদিন ধরে তাদের গুনেছিল। দিনের শেষে দেখলে, বক্কা রাজার অধীনে আছে দশ হাজার সেনা আর তারা এসেছে মোটে চার হাজার। এত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা মানেই প্রাণটা রেখে যাওয়া। ব্যস, সে রাতেই তাঁবু গুটিয়ে ভিন রাজা সেনাদের নিয়ে সরে পড়লেন।

ধাপ্পা চিরদিন চাপা থাকে না। বক্কা রাজার ধাপ্পাও গুপ্তচরের মুখে ভিন রাজার কানে এল। —'কি—আমায় ঠকানো, দেখে নেবো এবার', এই বলে তোড়জোড় করে আবার ভিন রাজা এসে তাঁবু ফেললেন সেই নদীর ধারে। জলটা কমলেই নদী পার হয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করবেন।

বক্কা রাজা এবার গাইয়েকে ডেকে বললে, তুমি একটা উপায় বার কর বন্ধু! দরজীর ধাপ্পায় তো এবার উদ্ধার নেই।

গাইয়ে বললে, ভাববেন না মহারাজ! আজই এর বিহিত করব।

সেদিন রাত্রে গাইয়ে তার বাজনাটা নিয়ে দক্ষিণদিকের এক পাহাড়ে গিয়ে বসল। দক্ষিণদিক থেকে উত্তরে হাওয়া বইছিল। তাই গাইয়ের গান বাতাসে ভেসে সোজা ভিন রাজার তাঁবুর দিকে চলে গেল।

খুব করুণ করে গাইয়ে একটা কীর্তন শুরু করলে।

গানের সুর এসে ভিন রাজা আর তাঁর সেনাদের কানে লাগল। তারা কান খাড়া করে শুনতে লাগল। তারপর তাদের নাকে ফোঁসফোঁসানি শুরু হল। চোখগুলো জলে ভিজে এল।

এমন সময় গাইয়ে কেঁদে কেঁদে আর একটা করুণ গান ধরলে। তার মানে হচ্ছে, বাড়িতে ছেলেমেয়েরা বাপেদের জন্যে কত ভাবছে। যুদ্ধে বাবা মারা গেলে তারা অনাথ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে।

সেই গান শুনে শুধু সেনারা নয়, রাজার মনটাও কেমন বিষাদে ভরে গেল। রানী আর রাজপুত্রদের জন্যে মনটা কেমন করে উঠল। তিনি কাউকে কিছু না বলে তাঁবু ছেড়ে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। রাজাকে চলে যেতে দেখে সেনারাও তাঁবু-টাঁবু ফেলে দেশের দিকে পা বাড়ালে। ব্যস্, বিনাযুদ্ধে এবারও বক্কা রাজা বেঁচে গেল।

দেশে ফিরে রাজার আবার খেয়াল হল। আবার তাঁকে ঠকিয়েছে দেখছি। এবার নিজের আর সেনাদের কানে তুলো লাগিয়ে তিনি এসে তাঁবু গাড়লেন নদীর ধারে।

এবার দেখছি আর রক্ষে নেই। বক্কা রাজা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে আর মন্ত্রী তার মাথায় ঠাণ্ডা তেল ঘষছে।

কি উপায়?

এমন সময় সেই রাখাল এসে বললে, আমায় ভার দিন। আর দু'হাজার তেজী দ্রুতগামী ছাগল দিন।

তথাস্তু।

সেগুলি নিয়ে ভিন রাজার চোখ এড়িয়ে নদী পার হয়ে রাখাল এল ভিন রাজার সেনাদের তাঁবুর কাছে। তারপর তাদের ভয় দেখিয়ে দিলে ভীষণ তাড়া।

প্রাণের ভয়ে ছাগলরা ভিন রাজার তাঁবুর পাশ দিয়ে ছোটাছুটি করে পালাতে লাগল।

এদিকে ভিন রাজার সৈন্যদের রসদের খুব টানাটানি পড়েছিল। এতগুলো ছাগলকে ছোটাছুটি করে পালাতে দেখে তারা ধর ধর করে তাদের পেছনে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে তারা অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। অস্ত্রশস্ত্র সব তাঁবুতে পড়ে রইল।

তাই দেখে রাখাল এসে সব তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিলে।

এইভাবে বক্কা রাজা তিনবার যুদ্ধ না করেই বাঁচল।

বার বার ধাপ্পা মেরে বাঁচা যাবে এটা বোকা হলেও বক্কা রাজার বুঝতে দেরি হল না। অথচ সেনাসংখ্যা না বাড়ালেও চলবে না। বাড়াবার মতো রাজকোষে টাকা নেই। তখন শিকারীকে ডেকে বললে, এইবার তুমি একটা উপায় কর।

শিকারী বললে, যো হুকুম মহারাজ! তবে আপনি আদালতের বিচারপতিদের আদেশ দিন যে যারা মামলা করতে আসবে তাদের তীর ছোঁড়ার পরীক্ষা নেবে। যে জিতবে সেই মামলার রায় পাবে।

শিকারীর কথামত রাজা আদালতের বিচারপতিকে সেই রকম আদেশ দিয়ে দিলে।

তখন শিকারী রাস্তায় গিয়ে প্রথম যে লোকটাকে দেখতে পেলে তার পায়ে মারলে এক লেঙ্গি। ধপাস করে লোকটা পড়ে গেল। তারপর উঠে ধুলো ঝেড়ে চলল আদালতে। সেখানে শিকারীর নামে সে মামলা শুরু করলে।

বিচারক বললে, তীর ছোঁড়। দেখি তোমাদের মধ্যে কে লক্ষ্যভেদ করতে পারে।

বিচারকের কথা শুনে লোকটা একেবারে অবাক। কিন্তু কি আর সে করবে। তাই তীর ছোঁড়া শেখার জন্যে সময় চেয়ে নিল। এর পর শিকারী যাকেই দেখতে পায় তাকেই লেঙ্গি মারে। আদালতে নালিশ করে লোকটি সময় চেয়ে নেয় তীর ছোঁড়া শেখার জন্যে।

দেখতে দেখতে দেশসুদ্ধ লোক তীর ছোঁড়া অভ্যেস করতে লাগল।

এ খবর গিয়ে পৌঁছুল ভিন রাজার কানে। তিনি শুনলেন, যুদ্ধ করবার জন্যে বক্কা রাজার সব প্রজারা তৈরী হচ্ছে। এ খবর শুনে তিনি যুদ্ধ করার কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

বক্কা রাজার দেশে আবার শান্তি ফিরে এল। রাজসভায় আবার দাবার ছক পড়তে লাগল। তবে এবার সেনাপতি রইল মোটে চারজন—দরজী, গাইয়ে, রাখাল আর শিকারী। বাকী সকলকে বক্কা রাজা সাধারণ সেনা করে দিলে।

টুনটুনিটা

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

জাফ্‌রিকাটা পেঁপের গাছে
টুনটুনিটা ওই যে নাচে—
আসছে না ও মিতার কাছে
একটিবারও কেন?

সারাটা দিন বাগান-বনে
বেড়ায় নেচে আপন মনে,
মন বসে না ঘরের কোণে
দুষ্টু পাখির যেন!

টুনটুনি, এই টুনটুনিটা—
ভালোবাসে ছোট্ট মিতা
কতই তোকে, জানিস কি তা'?
তুই ভারি চঞ্চল!

এই এখানে, হঠাৎ উড়ে
ফুড়ুৎ করে পালাস দূরে;
দেখ্‌না মেয়ের দু'চোখ জুড়ে
অমনি গড়ায় জল॥

উড়ো খৈ

অবধূত

ব্যবসা ব্যাপারটা একটিবার মাথার মধ্যে ঢুকলে সহজে বেরুতে চায় না। দিবারাত্র অষ্টপ্রহর কারবারের পোকা মাথায় কিলবিল করতে থাকে। খালি লাভ আর লোকসান, শতকরা পঁচিশ না পঞ্চাশ, হাজারে পাঁচশ' না আড়াইশ', লাখে তাহলে কত, এই ধরনের হিসেবের প্যাঁচে জট পাকিয়ে যায় বুদ্ধিশুদ্ধি। তখন চোখের সামনে যা পড়ে তা' বেচতে পারলে, বেচে আর কিছু কিনে ফের বেচতে পারলে, তারপর সেই লাভের টাকায় আর এক জাতের ব্যবসা করতে পারলে, এই ভাবে শুধু কেনা আর বেচা, বেচা আর কেনা করতে করতে তামাম দুনিয়াটাকেই শেষ পর্যন্ত বেচবার মতলব পাকাতে থাকে মগজের মধ্যে। এই ব্যাপারটার নামই হোল কারবারের বুদ্ধি। এবং তার ফলই হচ্ছে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, অর্থাৎ কিনা বাণিজ্য করলেই বড়লোক হওয়া যায়।

বড়লোক হবার বাসনাটা কার মাথায় প্রথম উদয় হোয়েছিল তা' বলতে পারব না। হঠাৎ দেখা গেল যে ব্যবসা ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সবাই মাথা ঘামাতে শুরু করেছি। পাঁচজনে এক জায়গায় জমলেই আর কথা নেই, বেচা কেনা কেনা বেচা শুরু হয়ে গেল। ভন্টার এক জেঠামশাই থাকেন বর্মাদেশে। তিনি একটি পয়সাও সঙ্গে না নিয়ে বাড়ি থেকে পালান। কারণ ক্লাসে উঠতে পারতেন না বলে তাঁর ওপর খুব অত্যাচার শুরু হোয়েছিল। তারপর জাহাজের বয়লারে কয়লা ঠেলবার কাজ জুটিয়ে নিয়ে চলে যান বর্মায়। তারপর কারবার, বিনা পুঁজিতে কারবার, স্রেফ কাটতে লাগলেন জঙ্গলের গাছ আর বেচতে লাগলেন। কাটতে লাগলেন আর বেচতে লাগলেন, বেচতে লাগলেন আর কাটতে লাগলেন। বর্মাদেশের জঙ্গল, সারা জীবন ধরে কাঠ কাটলেও সে জঙ্গল ফুরবে না। জঙ্গল যেমন ছিল তেমনিই রইল। মাঝখান থেকে ভন্টার জেঠামশাই মস্ত বড়লোক হোয়ে বসলেন। এখন আর তিনি নিজে হাতে গাছ কাটেন না, হাজার হাজার লোক দিয়ে জঙ্গল কাটান। এক পাল হাতি পুষেছেন, জঙ্গল থেকে সেই কাঠ বার করে আনার জন্যে। জাহাজ বোঝাই করে সেই কাঠ চালান দিচ্ছেন আর টাকা গুনছেন। টাকার পাহাড় জমে যাচ্ছে। বোঝ, বিনা পুঁজিতে কারবার করে বড়লোক হওয়া যায় কি না বোঝ।

ভন্টার জেঠামশাই বর্মার জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটেছিলেন, সতুর পিসেমশাই গামছা বেচতে বেচতে কাপড়ের কল খুলেছেন আমেদাবাদ গিয়ে। বিশুর জামাইবাবু ধানবাদে গর্ত খুঁড়ে কয়লা তুলছেন। আভাইয়ের মেজমামা নারকেল ছোবড়া কিনছেন সাউথ আফ্রিকায় বসে, সেই ছোবড়া পুড়িয়ে ছাই করছেন প্রকাণ্ড এক কারখানায়, সেই ছাই থেকে গায়ে মাথার পাউডার তৈরী হচ্ছে। সেই পাউডার আমেরিকায় যাচ্ছে জাহাজ বোঝাই হোয়ে এবং সেখানকার মেমসাহেবরা নাকি সেই পাউডার গায়ে মেখেই বরফের ওপর দিব্যি সুখে ঘরসংসার করছেন, ঠাণ্ডায় তাঁদের হাত পা জমে যাচ্ছে না। শুধু গল্প, কে কেমন করে বড়লোক হোয়েছেন সেই সমস্ত গল্প, পাঁচজনে এক জায়গায় জমলেই জমে ওঠে গল্প। বড়লোক আমাদের হোতেই হবে এবং কারবার না করলে বড়লোক হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু কারবার করতে হবে বিনা পুঁজিতে, তার কারণ, সামান্য যা কিছু পুঁজি আমাদের, তার সমস্তটাই খরচা হয় ঘুড়ি লাটাই সুতো কেনার পেছনে। ওধারে বিশ্বকর্মা পূজো প্রায় এসে গেল, মাঞ্জা দেবার হাঙ্গামাও আছে। এধারে আমাদের সবার মাথার মধ্যে কারবার সেঁধিয়ে বসেছে।

অবশেষে বেষ্টা পথ দেখালে।

ব্যবসা যদি করতেই হয় তো ঘিয়ের ব্যবসা। খাঁটী ঘি, যা খেলে দেশসুদ্ধ মানুষ বাঁচবে, মানুষের মাথায় ঘিলু বাড়বে, ফলে সবাই লেখাপড়া শিখবে, এবং লেখাপড়া শেখার ফলে ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনটি পাবে। সুতরাং ঘি, ঘি ছাড়া গতি নেই। লুচি পরোটা কচুরি শিঙাড়া নিমকি গজা বালুসাই খাজা জিলিপি অমৃতি, তারপর এধারে পান্তুয়া লেডিকেনি দরবেশ মিহিদানা, তারপর ধর পোলাও কালিয়া কোর্মা কোপ্তা, ঘি লাগে না কিসে! হোম যাগযজ্ঞ আছে, শ্রাদ্ধশান্তি আছে, হবিষ্যি আছে, বারব্রত কত কি আছে। সবতাতেই ঘি চাই, ঘি কাটবেই, খাঁটী ঘি পেলে লোকে আলু পটল বেগুন কুমড়োও ঘি

দিয়ে ভেজে খাবে। টিনে ভরতি করে শুধু বাজারে বার করলেই হোল, হুহু করে উড়ে যাবে।

ব্যাপারটা আমরা বুঝলাম এবং তৎক্ষণাৎ বেষ্টাকে সমর্থন করা হোল। যে মাল বাজারে বার করতে পারলেই বিক্রি হোয়ে যাবে, সেই রকম মাল নিয়েই কারবারে নামা উচিত। একটা ঝুঁকি তো কাটল। বিক্রি হবে না তৈরী মাল, এই বিষম ঝুঁকিটা নেই। অতএব ঘিই ঠিক হোল।

বেষ্টা আমাদের মোটামুটি বুঝিয়ে দিলে কেমন করে ঘি বানাতে হবে। তার পিসী দুধ থেকে মাখন তুলে ঘি বানায়। আমরা সবাই একদিন সকালে সরজমিনে গিয়ে বেষ্টার পিসীর মাখন তোলা দেখে এলাম। পিসী আমাদের এক এক গেলাস মাঠা খাইয়ে দিলে। তারপর আর ঘি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এতটুকু মতভেদ রইল না।

এখন দুধ জুটলেই হয়।

দুধ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়েই গরু মোষ এসে পড়ল। তারপর ঘাস খড় খোল বিচালি গুড় ভুষি নানা জাতের জিনিসের কথা উঠে পড়ল। ঝামেলার যেন শেষ নেই, গরু মোষ তো না খেয়ে দুধ দেবে না।

"সর্বপ্রধান প্রশ্ন,"—সতু বললে—"আসল কথাটা হচ্ছে গরু মোষ পাওয়া যাবে কোথায়? মনে থাকে যেন, আমরা বিনা পুঁজিতে ব্যবসা করতে যাচ্ছি।"

ভণ্টা বললে—"ওটা একটা প্রশ্নই নয়। ছোট ছোট বাচ্চা ধরতে হবে। গড়ের মাঠে ওত পেতে থাকতে হবে। বিস্তর মোষ গরু চরাতে আনে, ছোট বাছুরও থাকে দু'চারটে। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই—"

বিশু বললে—"বাছুর বড় হবে, তারপর তার বাচ্চা হবে। এমনি ভাবে বাড়তে থাকবে মোষ গরু। সুতরাং মোষ গরু একটা সমস্যাই নয়।"

ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে আমরা ও নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। খড় বিচালি খোল ভুষি পাওয়া যাবে কেমন করে, এই ভাবনাতেই আমরা তলিয়ে গেলাম। আভাইটা বিশেষ কিছু বললে না, সমস্ত শুনে স্রেফ ছুঁচো মুখ করে শিস দিতে লাগল।

তারপর সেই বক্তৃতা। উঃ, সে কি বক্তৃতা! বক্তৃতা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম, বড় হোয়ে আভাই হাইকোর্টের উকিল হবে। যেমন যুক্তি, তেমনি সব জলজ্যান্ত প্রমাণ। আমরা কেউ ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারলাম না, হাঁ করে সবাই আভাইয়ের মুখপানে তাকিয়ে রইলাম। আভাই বলতে লাগল—

"বন্ধুগণ!

গরু মোষ পুষে দুধ দুইয়ে নিয়ে তা' থেকে মাখন তুলে ঘি বানানো, এই সমস্ত আদ্যিকালের ব্যাপার শুরু করলে কি কোনও কালে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব? এ দেশে গরু মোষের দুধ থেকে মাখন তুলে ঘি বানাবার প্রথাটা বহুকাল ধরে চালু আছে। কিন্তু ক'টা লোক ঘি বেচে বড়মানুষ হোয়েছে শুনি? ঘিয়ের ব্যবসা করে যারা দুটো টাকা করেছে তারা ঘিয়ে নানা জাতের জিনিস ভেজাল দেয়। এ কথা কে না জানে যে সাপের চর্বিও ঘিয়ের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে। খাঁটী ঘি বেচতে হোলে গরু মোষ বাদ দিতে হবে। মোষ গরু পুষতে হোলে ঘাস বিচালি খোল ভুষি চাই। তারপর আছে ওদের মাথায় দুটো করে শিং, বাগে পেয়ে গুঁতিয়ে বসলেই কারবার একেবারে লাটে উঠল। অত ঝামেলায় যায় কে! তার চেয়ে সহজ পন্থা বার করতে হবে। আসল কথা হোল মাখন, মাখন পেলেই ঘি পাওয়া যাবে। মোষ গরু বাদ দিয়ে মাখন পাওয়ার উপায় যদি আমরা খুঁজে না পাই, তা'হলে আমরা করলাম কি। গড়ের মাঠ থেকে বাছুর সরিয়ে আনাও বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি যে আমাদের ঘিয়ের কারবার থেকে মোষ গরু বাদ দেওয়া হোক।"

ঐ পর্যন্ত বলে আভাই একবার সবায়ের মুখপানে তাকাল। আমরা একেবারে স্পীক্ টু নট্ হোয়ে আছি। বলে কি রে বাবা! দুধ ছাড়া মাখন, এ যে একেবারে সুতো ছাড়া ঘুড়ি ওড়াবার চেষ্টা করার মত কাণ্ড! দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত, কি মতলব ওর মগজে গজিয়েছে।

একটু পরেই আভাই আবার শুরু করলে। বললে—"আমি এবার কয়েকটি সহজ প্রশ্ন এই সভায় উপস্থিত করছি। যে কেউ উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দাও। তা'হলেই দেখবে, কত সহজে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। আচ্ছা—এবার প্রথম প্রশ্ন—বি ইউ টি টি ই আর কি হয়?"

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—"বাটার।"

"বাটার মানে কি?" আভাই প্রশ্ন করল।

"মাখন।"

"এফ এল ওয়াই কি হয়?"

"ফ্লাই।"

"ফ্লাই মানে কি?"

"মাছি।"

"কিন্তু বাটারফ্লাই কথাটার মানে কি?"

"প্রজাপতি।"

বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হোয়ে আভাই বলতে লাগল—"ঐ হোল সমাধান। বাটারফ্লাই মানে প্রজাপতি। কেন, মাখনমাছি নয় কেন? ঐখানেই যত কারচুপি লুকিয়ে রয়েছে। মৌমাছি মৌচাক বানায়, সেই চাক ভেঙে মধু পাওয়া যায়, এ কথাটা জানে না কে? মৌমাছি যখন মৌচাক বানায়, মাখনমাছি তখন মাখনচাক বানাবে না কেন শুনি? জাহাজ বোঝাই করে রাশি রাশি মাখনের টিন আসছে বিদেশ থেকে, সেই টিন কেটে মাখন নিয়ে রুটিতে মাখিয়ে আমরা খাচ্ছি। অথচ সেই মাখনের উৎপত্তি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছি না। বাটারফ্লাই কথাটার মানে করেছি আমরা প্রজাপতি, একটিবারও আমরা ওর আসল মানেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না। সাহেবদের দেশে কি শুধু সবাই গরু মোষ চরিয়ে বেড়াচ্ছে যে রাশি রাশি মাখন বানাবার জন্যে রাশি রাশি দুধ পাওয়া যাচ্ছে? তা'ছাড়া সে দেশে বছরে ন' মাস বরফ পড়ে। বরফের তলায় কি ঘাস গজায়? অত গরু মোষ কি খেয়ে দুধ দিচ্ছে তা'হলে? আসল কথা, দুধের জন্যে ওরা পরোয়া করে না। ওরা জানে, মাখনমাছি কোথায় কি ভাবে মাখনচাক বানায়। সুন্দরবনে ঢুকে এ দেশের মানুষ যেমন মৌচাক ভেঙে মধু নিয়ে আসে, ও দেশেও তেমনি মাখনচাক ভেঙে মাখন সংগ্রহ করা হয়। বাটারফ্লাই থাকতে মাখনের জন্যে লোকে বাজে ঝামেলায় যাবে কেন?"

যাকে বলে থ বনে যাওয়া, আমরা সবাই সেই থ বনে গেলাম। বেষ্টা শুধু তার আটকানো দমটা সজোরে ছেড়ে দিয়ে বললে—"বোঝ ঠেলা!"

কিন্তু বাটারফ্লাই কথাটার মানে কি?

ঠেলা বোঝবার বাকী তখনও অনেক। সর্বাগ্রে শুরু হোল প্রজাপতি নিয়ে মাথা ঘামানো। দু'দশটা প্রজাপতি সবাই দেখেছি, বিশেষ নজর করে পর্যবেক্ষণ করবার কখনও দরকারই হয়নি। যদু দত্ত মশায়ের বাগানে নানা রকম ফুলের গাছ আছে। ফুল চুরি করতে গিয়ে তাড়াহুড়োর মধ্যে কাজ সারতে হয়। সে সময় প্রজাপতির ওপর নজর দেবার ফুরসত কোথায়! তবে হ্যাঁ, প্রজাপতি আছে দত্ত মশায়ের বাগানে, কাঁটালিচাঁপা গাছের চতুর্দিকে উড়ে বেড়ায়। কিন্তু ওরা আসে কোথা থেকে! যায়ই বা কোথায়! প্রজাপতিদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কিছুই যে জানা নেই। ফ্যাসাদ আর কাকে বলে!

ফ্যাসাদ আছে বলে পিছিয়ে পড়লে তো চলবে না। কারবার করতে নামলে একটু-আধটু ফ্যাসাদ পোহাতেই হবে। ঠিক হোল, প্রজাপতিদের স্বভাবচরিত্রের ওপর নজর রাখতে হবে। বেদম চেষ্টাচরিত্র করে সতু তিনটে প্রজাপতি ধরে ফেললে। তিনটেই তিন রকমের। রঙের মিল নেই, দেখতে এক রকম নয়, তিনটের মাপও সমান নয়। কাঁচের বোয়েম একটা নিয়ে এল বিশু, তার মধ্যে ওদের তিনজনকে ভরে চারিদিক ঘিরে বসে আমরা ওদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে লাগলাম। বার কয়েক ফরফর করে সেই বোয়েমের মধ্যে চক্কর দিলে তারা, তারপর ডানা মেলে মুখ থুবড়ে বসে রইল। নড়নচড়ন নাস্তি, মরে গেল না বেঁচে রইল তাই বা কে বলবে।

বেষ্টা বললে—"এবার ওদের কিছু খেতে দিলে হয় না!"

ভন্টা বললে—"কি খায় ওরা!"

সতু বললে—"ফুলের পরাগ খায় বোধ হয়!"

আভাই বললে—"স্রেফ বাটার। খাঁটী মাখন একটুখানি তুলোয় মাখিয়ে ঐ বোয়েমটার মধ্যে ফেলে দেখ, সবাই সেই তুলোটা চাটতে থাকবে।"

দৌড়লো বেষ্টা খাঁটী মাখন আনতে, তুলোও এল। অতি সন্তর্পণে আঙুলে একটু মাখন ঘষে তুলোর ওপর আঙুলটা একটু বুলিয়ে দিলে আভাই, তারপর সেই তুলো বোয়েমের মধ্যে ছাড়া হোল। এবং আমরা দম বন্ধ করে একদৃষ্টে সেই বোয়েমটার পানে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ঘটল সেই ভয়ংকর কাণ্ড। ভয়ংকর কাণ্ড নয়ত কি! প্রতিটি নতুন আবিষ্কারই আবিষ্কারের প্রথম মুহূর্তটিতে ভয়ংকর।

ভয়ংকর না বলে বলা উচিত অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। কি ভাবে ঘটল ব্যাপারটা ভাবতেই আমার এখন গায়ের রোম খাড়া হোয়ে উঠছে। চোখ মেলে, ছ' ছ' জোড়া চোখ মেলে আছি আমরা। এক ডজন মেলা চোখের সামনে প্রজাপতি ক'টা আবার একটু একটু নড়তে লাগল। চেষ্টা করতে লাগল যেন ওড়বার জন্যে, একটু একটু করে এগিয়ে গেল সেই তুলোটার কাছে। তারপর সেই তুলোর ওপর মুখ ঠেকিয়ে থেমে রইল। এবং আমরা স্পষ্ট দেখলাম, তিনটে প্রজাপতির ছ'টা শুঁড় খুব আস্তে আস্তে নড়ছে।

এর পর আর কিছু প্রমাণের প্রয়োজন আছে?

চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি আমরা যে মাখনমাছি মাখনমাখানো তুলো চাটছে। হ্যাঁ, ঐ শুঁড় নাড়া হোল চাটা, প্রজাপতি মাছি এরা শুঁড় নেড়েই চাটা কর্মটি সমাপন করে। তার কারণ পাঁঠা ছাগল গরুর মত ওদের জিভ নেই।

আভাইয়ের নামে তিন তিন বার আকাশফাটানো জয়ধ্বনি দিয়ে তখনকার মত আমরা আমাদের গবেষণা বন্ধ করলাম।

আবার সভা বসল।

এই সভাই হোল সত্যিকারের যাকে বলে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে পরিকল্পনা করার সভা। আজকাল তোমরা আকছার পরিকল্পনা কথাটা শুনছ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করছেন একটার পর একটা আমাদের দেশের সরকার আর দেশময় কত সব ড্যাম তৈরী হোয়ে যাচ্ছে। সেই তখনকার দিনে দেশে ঐ পরিকল্পনা কথাটা মোটে শোনাই যেত না। খুব সম্ভব, আমরাই এই দেশে সর্বপ্রথম পরিকল্পনা ব্যাপারটা চালু করেছিলাম। হায়, আমাদের নাম কিন্তু কোনও খবরের কাগজে ওঠেনি!

আমাদের সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, মাখনমাছিরা কোথায় মাখনচাক বানায় তা' খুঁজে বার করার জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

সভা করতে গেলেই একজন সভাপতি চাই। নিজেদের মধ্যে একজনকে সভাপতি করলেই হাঙ্গামা চুকে যেত। কিন্তু অতবড় একটা অসামান্য ব্যাপারের জন্যে যে সভা হচ্ছে, সেই সভায় একজন বেশ নামকরা সভাপতি না হোলে সবায়েরই মন খুঁতখুঁত করবে। এধারে আবার এমন একজনকে সভাপতি করতে হবে যিনি প্রজাপতি সম্বন্ধে দস্তুরমত ওয়াকিবহাল। আমাদের পাড়ায় তখন একজন কবি থাকতেন, বয়েস তাঁর যথেষ্ট হোয়েছিল। পাকা চুল ঘাড়ের নীচে ঝুলত তাঁর, চওড়া কাল পাড় ধুতি পরতেন। কোঁচার নীচেটা ঠিক ফুলের মত করে সাজিয়ে এক হাতে ধরে পথ চলতেন, গায়ে থাকত গিলেকরা পাঞ্জাবি। পাড়ার যত বিয়ে হোত, সব বিয়ের কবিতা তিনি লিখে দিতেন। সেই কবিতা যে সব কাগজে ছাপানো হোত, সেই সব কাগজে বড় বড় প্রজাপতির ছবি থাকত। আমরা ঠিক করলাম, সেই কবিকেই সভাপতি করতে হবে। প্রজাপতির ব্যাপার নিয়ে যখন সভা হচ্ছে, তখন প্রজাপতি ছাপা কাগজে যাঁর কবিতা ছাপা হয়, তিনিই সেই সভার সভাপতি হবার একমাত্র উপযুক্ত লোক।

সহজেই রাজী হোয়ে গেলেন কবি। আমরা এধারে ঠিক করলাম যে আমাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সভাপতিকে কিছুই জানানো হবে না। উনি সভা থেকে চলে গেলে তখন আসল কাজ করা যাবে।

সভাপতি হোয়ে কবি এলেন। কিন্তু বিপদ দেখ, তাঁর হোয়েছে বেদম সর্দি। অনবরত হাঁচছেন আর রুমালে নাক ঝাড়ছেন। সভাপতি বরণের পরে বেশীক্ষণ বসতে পারলেন না তিনি। কয়েক লাইন কবিতা আওড়ে চলে গেলেন। সেই কয়েকটি লাইন এখনও আমার মনে আছে। এখানে তুলে দিচ্ছি—

'কেন এ কে জানে' এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে;
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে।
বসন্তের নানা ফুলে গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরনগানে;
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি, কেন এ কে জানে॥

যদি তোমরা এখন চেষ্টা কর তা'হলে নিশ্চয়ই বার করতে পারবে এই কবিতাটি কোন্ কবি লিখেছেন। আমাদের পাড়ার কবি অবশ্য তখনই আমাদের বলেছিলেন আসল কবির নামটি। সেটি এখন তোমাদের বললাম না। তোমরা নিশ্চয়ই বার করতে পারবে।

যাক যা বলছিলাম, সভাপতি মশাই বিদেয় হবার পরে আসল প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। ভণ্টা বললে—"তা'হলে এখন ঠিক করা যাক, প্রজাপতির চাক খোঁজবার জন্যে কি আমরা করব।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"প্রজাপতি নয় মাখনমাছি। এখন থেকে মাখনমাছি কথাটা চালু হোক। অনর্থক মাখনমাছিকে প্রজাপতি বলে আমরা গণ্ডগোল বাধাতে যাই কেন।"

সবাই আমার কথায় সায় দিলে।

বিশু বললে—"যাওয়া যাক কোন্নগরে। আমার মাসতুতো বোনের বিয়ে হোয়েছে সেখানে। তারা খুব বড়লোক। আর আমার সেই জামাইবাবুর দুটো বন্দুক আছে'

জামাইবাবু একবার একটা বাঘ মেরেছিলেন গুলি করে। বাঘটা বরজের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।”

“বরজ আবার কি?” জিজ্ঞাসা করলে সতু।

বিশুকে তখন বুঝিয়ে দিতে হোল বরজ কাকে বলে। বরজ হচ্ছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর। পান গাছ যেখানে হয়, সেখানটা আগে ঘেরা হয় বেড়া দিয়ে। সাধারণতঃ পাঁকাটি দিয়েই বেড়া দেওয়া হয়। বড় বড় মাঠ ঘেরা হয় বেড়া দিয়ে, ওপরটা পাতলা করে ছেয়ে দেওয়া হয় খড় ঘাস দিয়ে। পান গাছ একেবারে রোদ সইতে পারে না কিনা, তাই ঐ ব্যবস্থা। কোন্নগরের চারিদিকে বড় বড় বরজ আছে। রেল লাইনের দু'পাশে শুধু বরজ, খালি মাঠ মোটে দেখাই যায় না।

আভাই বললে—“আমরা তো পান চাষ দেখতে যাচ্ছি না, আমরা খুঁজব মাখনচাক। সেই বরজের দেশে মাখনচাক আসবে কোথা থেকে।”

বিশু বললে—“হবে, উপায় একটা হবেই। আমার জামাইবাবু বন্দুক নিয়ে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। রাঁচী হাজারিবাগ দেওঘর মধুপুর তিনি তন্নতন্ন করে ঘুরেছেন। মাখনচাক যদি পাওয়া যায়, পাহাড় জঙ্গলেই পাওয়া যাবে। জামাইবাবুকে যদি দলে পাওয়া যায় তা'হলে হয়তো চট্ করে আমরা মাখনচাকের সন্ধানটা পেয়ে যেতে পারি।”

বেষ্টা বললে—“কোন্নগরই ভাল। পিসীর সঙ্গে বোশেখ মাসে তারকেশ্বর যাই আমি, গাড়ি কোন্নগর ছাড়িয়ে রিষড়ে শ্রীরামপুর সেওড়াফুলি হোয়ে তারকেশ্বরের লাইনে যায়। কোন্নগর বেশী দূরও নয়। ওখান থেকেই চেষ্টা করা শুরু হোক না কেন, তারপর দেখা যাক কত দূরের জল কত দূর গড়ায়।”

সেই কথাই ভাল। কোন্নগরের চেয়ে অন্য কোনও ভাল নগরের নাম যখন কেউ বলতেই পারলে না, তখন বিশুর প্রস্তাবই মেনে নেওয়া হোল। বিশু বললে, সে তার দিদিকে চিঠি লিখবে। দিদি তা'হলে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে জামাইবাবুকে পাঠাবে। জামাই এসে আমাদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেলে কারও বাড়ি থেকে বিশেষ আপত্তি-ওজরও উঠবে না। অতএব দেখা যাক, সামনে ছুটির মধ্যে কোন্নগর গিয়ে একটা কোনও উপায় করা যায় কি না। কারবার যখন ফাঁদতে হবেই, তখন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না।

কোন্নগর থেকে বিশুর জামাইবাবু আমাদের নিতে এলেন। ভদ্রলোকের বয়েস আমাদের চেয়ে বিশেষ বেশী নয়। বড় জোর ডবল। যেমন দেখতে তেমনি স্বাস্থ্য তেমনি স্বভাব। ওঁর ঠাকুরদাদা সর্বপ্রথম মাটির তলা থেকে কয়লা বার করবার কারবার চালু করেন। ওঁর বাবা একটার পর একটা কয়লার খনি খুলেই যাচ্ছেন। উনি নিজেও নাকি মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাটির তলায় কয়লা থাকলে তার গন্ধ পান। ভদ্রলোককে দেখে মোটে জামাই জামাই মনে হোল না। জামাই পরে থাকবে ধনেখালির ধুতি সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে থাকবে জামাইমার্কা জুতো, হাতে থাকবে গোটা তিন-চার আঙটি। কোথায় কি! জুতো মোজা হাফ প্যাণ্ট আর হাফ সার্ট গায়ে দিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে এসে উপস্থিত হোলেন ভদ্রলোক। তখনকার দিনে এখনকার মত বেহুদা মোটর গাড়ি চড়ে মানুষ বেড়াত না। তখন মোটর গাড়ি চড়তে পাওয়াটাই একটা বিশেষ রকমের অভিযান বলে গণ্য হোত। আমরা যখন শুনলাম সেই গাড়ি চড়েই আমাদের কোন্নগর যেতে হবে, তখন সত্যি বলতে কি, মাখনচাকের কথাটা পর্যন্ত আমরা প্রায় ভুলে মেরে দিলাম।

বিশুর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে ঘুরে গেলেন। এমন মিষ্টিভাবে কথাবার্তা বললেন যে কারও বাড়ি থেকেই কোনও আপত্তি উঠল না। ব্যাপারটা তো খুবই সামান্য, পূজার সময় তিনি বিশুকে আর বিশুর বন্ধু কয়েকজনকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে চান। কারণ বাড়িতে পূজা, যাত্রা থিয়েটার গান বাজনা কত কি হবে, কয়েকটা দিন বন্ধুদের নিয়ে বিশু গেলে খুবই আমোদ-আহ্লাদ হবে। অর্থাৎ নিমন্ত্রণ, অত বড়লোকের ছেলে নিজে এসেছেন নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে, এতে কি আর কারও আপত্তি করা চলে! তা' ছাড়া আমরাও বেশ বড় হোয়েছি তখন, মায় বেষ্টার পিসী পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে যে তার নয়নের নীলমণিকে আর ঘরে আটকে রাখা ভাল দেখায় না। অতএব মায় বেষ্টা আমরা তাঁর সেই গাড়িতে উঠলাম। পেছনে চারজন, সামনে সেই ভদ্রলোক আর দু'জন, একটু ঠাসাঠাসি হোল। তা' হোক, কারবার করতে নামলে কষ্ট একটু করতেই হয়।

এই ফাঁকে ভদ্রলোকের নামটি তোমাদের বলে রাখি। নামটি খুবই উঁচু জাতের নাম—হিমাদ্রিশেখর। অত উঁচু নামটা অবশ্য তিনি আটপৌরে ব্যবহার করতেন না। সে জন্যে আর একটি ছোট্ট নাম ছিল—বিলু। আমরাও ওঁকে বিলুবাবু বলে ডাকতে শুরু করলাম।

গাড়ি আমাদের নিয়ে তখনকার দিনের সেই ভাসমান সেতুর ওপর দিয়ে হাওড়ায় গিয়ে উঠল।

অভিযানের আইন মাফিক সেবার আমরা বেষ্টাকে ক্যাপ্টেন করেছিলাম। কে যেন আভাইয়ের নামটা তুলেছিল। মাখনমাছির চাকে মাখন পাওয়া যাবে, এই মতলবটি ছিল আভাইয়ের, সুতরাং আভাই ক্যাপ্টেন হোক। আভাই রাজী হোল না। বললে—"মতলবটা আমার হবে কেন? আমাদের সকলের মতলব, আমাদের দলের মতলব। দলের মধ্যে যার মাথাতেই যে মতলব আসুক, একবার সেই মতলব মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে সেটা আর তার নিজস্ব থাকে না। তারপর দলসুদ্ধ সবাই যদি সেই মতলব নিয়ে নেয়, তা'হলে সেটা আমাদের সকলের মতলব হোয়ে দাঁড়ায়। তোমরা বিচার-বিবেচনা করে তবে কাজে নেমেছ। কাজেই এখন আর আমার একার দায়িত্ব নয়। দল পরিচালনা করার ভার বেষ্টা নিক। বেষ্টা কখনও বেরয় না আমাদের সঙ্গে, এই প্রথম সঙ্গে রয়েছে। ওকেই এবার ক্যাপ্টেন হোতে হবে।"

কথাটা খুবই সমীচীন বলে মনে হোল সকলের। বেষ্টা একটু গাঁইগুঁই করে তারপর ঘাড় পাতলে। আমরা ওর ঘাড়ে দল চালাবার ঝক্কি চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোলাম।

মোটমাট সেবার আমরা ছ'জন গিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন বেষ্টা, বিশু, সতু, ভণ্টা, আভাই আর আমি। কোন্নগরে পৌঁছে আরও দু'জনকে আমরা দলে পাই। বিলুবাবুকে আর বিশুর দিদি সুধাময়ীকে। সুধাময়ীরও একটা আটপৌরে নাম ছিল—জটী। বিশুর চেয়ে অতি সামান্যই বড় হবেন হয়তো তিনি, বিশু তাঁকে দিদিও বলত না, সুধাময়ীও বলত না, স্রেফ জটী। জটী নামটা হবার কারণ নাকি তাঁর চুল, অমন কোঁকড়ানো চুল এ পর্যন্ত আমি কারুও মাথায় দেখিনি। আর সে কি চুলের ছিষ্টি! একটা ছোট্ট মাথায় অত চুল কি করে গজাতে পারে, ভাবতেই এখন কেমন অবাক কাণ্ড বলে মনে হয়। ঐ চুল অসম্ভব রকম জট পাকিয়ে যেত বলে বিশুর মাসিমা মেয়ের নাম রেখেছিলেন জটী। তা' সেই জটীও আমাদের দলে ভিড়ে গেল। অর্থাৎ মোট আটজন হোলাম আমরা। এবং এই আটজনেই আমরা সেবার মাখনচাকের জন্য অভিযান চালিয়েছিলাম।

অভিযানের কথা পরে আসছে, আগে কোন্নগরে পৌঁছবার কথাটাই বলে নি। হাওড়ার পর লিলুয়া তারপর বেলুড় বালি উত্তরপাড়া তারপর কোন্নগর, আমাদের গাড়ি ছুটছে। সন্ধ্যা হবার বেশি দেরি নেই তখন। বিলুবাবু বললেন, সন্ধ্যা হোতে হোতেই আমরা পৌঁছে যাব। শুনে মন খারাপ হোয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাব! তার মানে কতটুকু আর যাচ্ছি বাড়ি থেকে! কোন্নগর জায়গাটা বাড়ির এত কাছে জানা ছিল না। সাধ মিটিয়ে মোটর গাড়ি চড়াটাও হবে না। অন্ততঃ অর্ধেক রাত পর্যন্ত গাড়িতে চড়ে যেতে পারলে তবু খানিক যাওয়া হোত।

বেষ্টা বসে ছিল বিলুবাবুর পাশে। আমাদের সকলের মনের কথাটা কি জানি কেমন করে সে টের পেয়ে গেল। বললে—"এত তাড়াতাড়ি আপনার বাড়িতে পৌঁছে গেলে মজাই হবে না। তার চেয়ে চলুন আমরা অন্য কোথাও ঘুরে যাই।"

বিলুবাবু বললেন—"আমারও তাই মত।" বলে হঠাৎ গাড়িখানাকে খুব জোরে ছোটাতে লাগলেন। ছোটাতে লাগলেন তো ছোটাতেই লাগলেন। গাড়ি আর থামতে চায় না। ঘর বাড়ি বাগান পুকুর হুহু শব্দে গাড়ির দু'পাশ দিয়ে পেছন দিকে পালাতে লাগল। ঝাঁকুনি খেতে খেতে আমরা প্রায় বেদম হোয়ে পড়লাম। তখনকার গাড়ি এখন আর সহজে তোমাদের চোখে পড়ে না। সেই গাড়ির নাম ছিল ফোর্ড, পাদানি রাস্তা থেকে এক হাত উঁচু। পাদানিতে পা দিয়ে গাড়ির ভেতর উঠলে মনে হোত কোমরসমান উঁচুতে উঠে পড়েছি। গাড়ির পাশে দাঁড়ালে দরজার মাথা প্রায় বুকের কাছে ঠেকত। রথ যাকে বলে, সেই রথে চড়ে বসলে সত্যিই মানুষ অনেকটা উঁচুতে উঠে যেত। পায়ে হেঁটে যারা চলেছে তাদের নেহাতই তুচ্ছ বলে বোধ হোত। এখন আর সেদিন নেই, এখনকার গাড়ি পথের ওপর বুকে হেঁটে চলে। তাই এখন মোটর গাড়ি চড়ে বেড়ালেও কেউ ফিরে তাকায় না।

যতই মানইজ্জত থাকুক না কেন তখনকার সেই রথের মত উঁচু উঁচু গাড়িগুলোয় চড়ে কিন্তু এতটুকু স্বস্তি পাওয়া যেত না। ঝাঁকুনির চোটে পেটের নাড়িভুঁড়ি সব মুখ দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে পড়বার যোগাড় করত। তবে একটা সুবিধে ছিল, ইচ্ছে হোলে সেই গাড়ি থেকে লাফ মেরে পালাবার সুবিধে ছিল। কারণ এখনকার গাড়ির মত সেই সব গাড়ির মাথায় ইস্পাতের ছাত ছিল না। মোটা ক্যাম্বিশের ঢাকা থাকত সেই সব গাড়িতে, যার নাম হুড। ইচ্ছে হোল, হুড খুলে দাও, মাথার ওপর আকাশ দেখতে দেখতে হু হু শব্দে ছুটে চল। আবার—রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে চাও, হুড বন্ধ কর। এখন যেমন সাইকেল রিক্‌শায় মাথা ঢাকবার ব্যবস্থা থাকে, হুবহু সেই রকম। সেই জাতের গাড়ি এখনও দু'চারটে দেখা যায়। নজর রেখ, ঠিক একদিন দর্শন পাবে।

দাঁতে দাঁত চেপে বসে আমরা প্রাণপণে ঝাঁকুনি সহ্য
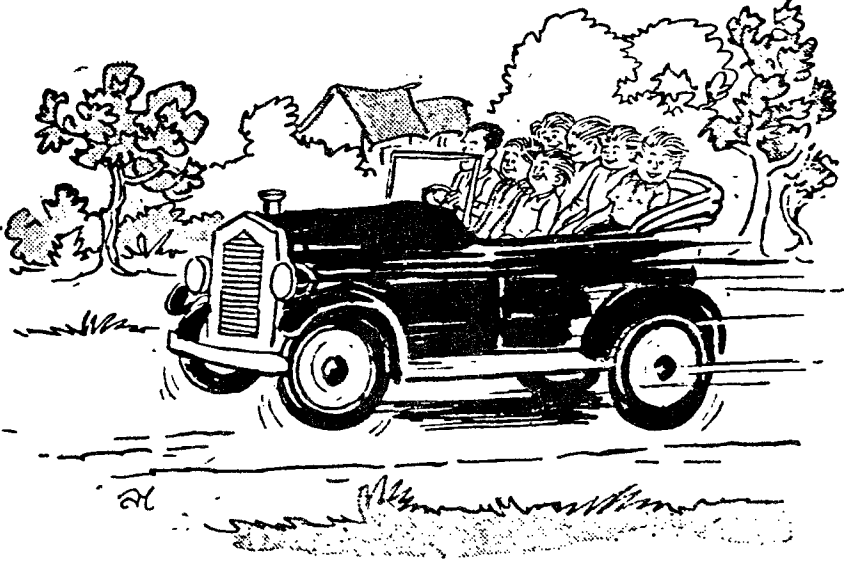
গাড়িখানাকে খুব জোরে ছোটাতে লাগলেন।

করছি, গাড়ি ছুটছে। হঠাৎ আভাই একটা আজগুবী কথা বলে ফেললে—"আচ্ছা বিলুবাবু, এই গাড়ি থেকে কি কেউ কখনও ছিটকে পড়েনি?"

গাড়ির দৌড় বেশ খানিকটা কমিয়ে সামনে থেকে বিলুবাবু জবাব দিলেন—"পড়েছিল একবার আমার মায়ের একটা কেঁদো বেরাল। মা বেরালটাকে সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যেতেন না। সেবার বাবা গাড়ি চালিয়ে আসছেন কলিয়ারি থেকে, আমি বসে আছি বাবার পাশে, মা বেরালটাকে নিয়ে পেছনে বসেছেন। হঠাৎ মা চেঁচিয়ে উঠলেন—ঐ যাঃ! আমি পেছন ফিরে তাকালাম, ব্যাপারটা কি হোল বুঝতেই পারলাম না। মা তখন কথা বলতেও পারছেন না, চোখ কপালে উঠে গেছে। স্পীড কমিয়ে গাড়ি রুখতে রুখতে প্রায় আধ মাইল এগিয়ে এলাম আমরা। তারপর মায়ের মুখে কথা ফুটল, বেরালটা ছিটকে বেরিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ গাড়ি ঘুরিয়ে গিয়ে আবার সেইখানে ফিরে যাওয়া হোল—"

গল্প বন্ধ হোল, গাঁক গাঁক করে একখানা লরি ছুটে আসছে সামনে থেকে। বিলুবাবু সাবধান হোলেন। রাস্তার একেবারে বাঁ পাশ ঘেঁষে খুবই আস্তে আস্তে চালাতে লাগলেন গাড়ি, সাঁ করে লরিখানা ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর আবার রাস্তার মাঝখানে গাড়ি তুলে এনে বিলুবাবু স্পীড দিলেন। বেন্টা বললে—"তারপর?"

"তারপর লাগল তুলকালাম কাণ্ড"—বিলুবাবু সেই বেরালের গল্প শুরু করলেন আবার। "ঠিক কোনখানে লাফিয়ে পড়েছিল বেরালটা তা' আন্দাজ করা গেল না। গাড়ি থেকে নেমে মা চেঁচাতে লাগলেন—মিনু ও মিনু, আয় আয় মিনু। কোথায় মিনু, আশপাশ থেকে কয়েক জন লোক এসে জুটল। বাবা বললেন, যে বেরাল এনে দেবে তাকে দশ টাকা দেবেন। মা বললেন, হাতের এক গাছা চুড়ি খুলে দেবেন। লাঠিসোঁটা নিয়ে সেখানকার লোকেরা দু'পাশের বনবাদাড় ঠেঙিয়ে বেড়াতে লাগল। বেরুল অনেকগুলো পাতিশিয়াল আর গোসাপ, বেরিয়ে তারা পাঁইপাঁই করে ছুটে পালাল। মিনুর দেখা নেই।

ওধারে মা পণ করেছেন, বেরাল ফেলে তিনি কিছুতেই ফিরবেন না।

বসে রইলাম আমরা গাড়ি নিয়ে একটা গাছের তলায়। রাত বাড়তে লাগল। মাঝে মাঝে মা গাড়ি থেকে নেমে খানিক এধার-ওধার এগিয়ে যান আর মিনু আয় মিনু বলে ডাকতে থাকেন। ক্রমে সব নিস্তব্ধ হোয়ে এল। দশ টাকা বা একটা সোনার চুড়ির জন্যে কাঁহাতক মানুষে জঙ্গল ঠেঙাবে। অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতেও কারও সাহস হচ্ছে না, সাপখোপের ভয় আছে। কাজেই যে যার বাড়ি চলে গেল। আমরা শুধু বসে রইলাম।

হঠাৎ—"

বিলুবাবুকে আবার থামতে হোল, কারণ হঠাৎ তাঁকে ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে হোল। আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনও রকমে সামলে গেলাম। কি ব্যাপার! এক ছাগলী তার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে।

ছাগলী নির্বিঘ্নে পার করলে তার বাচ্চাদের, তারপর আবার গাড়িতে স্পীড দিলেন বিলুবাবু। এধারে কখন যে অন্ধকার হোয়ে গেছে, গাড়ি হেড লাইট জ্বালিয়ে ছুটছে, তা' আমরা বুঝতেই পারিনি। সর্বপ্রথম বিশুর খেয়াল হোল। বললে—"কোথায় যাচ্ছি আমরা? এধারে যে রাত হোয়ে গেল।"

ভন্টা বললে—"যাক, যেতে দে। বেরালটাকে না নিয়ে তো কিছুতেই ফেরা যায় না। বলুন স্যার আপনি, তারপর কি হোল।"

বিলুবাবু বললেন—"অনেক কষ্টে মাকে বুঝিয়ে আমরা গাড়ি ছাড়বার যোগাড় করলাম। হ্যাণ্ডেল মেরে বাবার পাশে উঠতে গেলাম আমি। বাবা বললেন—তোমার মায়ের কাছে গিয়ে বস। দরজা খুলে ভেতরে পা দিয়েছি, অমনি একটু ছোট্ট আওয়াজ হোল—মিউ। বাবা তখন স্টার্ট দিয়েছেন। ঝুপ করে কি একটা পড়ল মায়ের কোলের ওপর। মা আর একবার কি বলে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি খপ করে বেরালটাকে দু'হাতে চেপে ধরলাম।"

চেঁচিয়ে উঠল আভাই—"ছিল কোথায় বেরালটা?"

"গাছের ডালে," বিলুবাবু একটা মস্ত বড় ফটকের মধ্যে গাড়ির মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন—"গাছের ডালে লুকিয়ে বসে ছিল। আমরা চলে আসছি দেখে লাফিয়ে পড়ল।"

অস্পষ্টভাবে ভন্টা বলে উঠল—"বাঁচা গেল বাবা!"

আমাদের গাড়ি তখন মস্ত এক অট্টালিকার সামনে থেমে পড়েছে।

পূজার ক'দিন যে কোথা দিয়ে কি ভাবে কেটে গেল তা বলা মুশকিল। সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী চার চারটে দিন আর চার চারটে রাত আমরা যেন নিশ্বাস নেবারও সময় পেলাম না। কাজ কাজ আর কাজ, হয় পরিবেশন করছি নয় যাত্রা থিয়েটার দেখছি। চারটে দিনের মধ্যে ও বাড়িতে কেউ বিছানার মুখই দেখল না। সকালে পূজা হোম বলিদান, দুপুরে লোক খাওয়ানো, বিকেলে ভিড় সামলানো, রাত্রে যাত্রা থিয়েটার। যাকে বলে হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড। কি ছিষ্টির মানুষ যে খেল চার দিনে তার হিসেব নেই। বিশ-তিরিশটা বামুনে দিনরাত রেঁধে গেল, পঞ্চাশ-ষাট জন লোক জল তুললে বাটনা বাটলে কুটনো কুটলে। আর আমরা ক'জন কোমর বেঁধে পরিবেশন করতে লাগলাম। শুধু কি আমরা ছ'জনেই পরিবেশন করেছিলাম, আরও অন্ততঃ ত্রিশজন ছেলে-ছোকরা শুধু পরিবেশন করার জন্যেই হামেহাল হাজির রইল।

পূজা তো চুকল। একাদশীর দিন বিকেল নাগাদ বাড়ি ফাঁকা হোয়ে গেল। সন্ধ্যার পরেই আমরা পড়লাম বিছানায়, উঠলাম একেবারে দ্বাদশীর রাত পার করে। সত্যিই তাই, দ্বাদশীর দিন আমরা নেয়েছিলাম খেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। ওঁরা যদি জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে স্নান করিয়ে জোর করে দু'টো না গেলাতেন, তাহলে আমরা কেউ নড়তামও না। অর্থাৎ সত্যিকারের কথা হোল ত্রয়োদশীর দিন সকালে ঘুম ভাঙলে আমরা সজ্ঞানে সুস্থ চিত্তে স্নান করলাম, প্রচুর লুচি তরকারি সন্দেশ দিয়ে জলযোগ সমাধা করলাম। তারপর বসলাম কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে। আসল কাজ হোল সেই মাখনচাক খুঁজে বার করা, যার ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। হৈ চৈ করা যাত্রা থিয়েটার দেখা যথেষ্ট হোল, এবার কাজের কাজ যাতে হয়, সেই দিকে নজর দেওয়া যাক।

বিশু বললে—"আমাদের দলে আর একজনকে যোগ করে নিতে পার। আমার বোন জটী আমাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজী হোয়েছে। জটীকে আমি সব বুঝিয়ে বলেছি—"

ভন্টা ফোঁস করে উঠল—"কি বললি! কার হুকুমে তুই আমাদের কারবারের মূল ব্যাপারটা ফাঁস করতে গেলি!"

"ইংরেজী কথাটা হোল ট্রেড সীক্রেট"—কথাক'টি আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে আভাই ভয়ংকর রকম হতাশ হোয়ে পড়ল।

সতু বললে—"এত দিন এরা কয়লা খুঁড়ে যা টাকা করেছে, তার একশ' গুণ রোজগার করবে এবার ঘি বেচে।"

বিশু বললে—"তোমাদের মাথায় স্রেফ গোবর ঠাসা আছে। আগে থাকতেই হাত-পা ছেড়ে দিচ্ছ। ব্যাপারটা বলতেই দিলে না আমাকে ভাল করে। জটীকে মাখনচাকের কথাটা বলব কেন আমি, প্রজাপতির কথা বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম—তোদের এধারে কেমন প্রজাপতি পাওয়া যায় র্যা? জটী বললে—এন্তার, একদম এন্তার। দুর্গা ঠাকুরের জন্যে যেখান থেকে পদ্মফুল আসে, সেখানে এন্তার প্রজাপতি উড়ছে। ঝাঁক বেঁধে উড়ছে সেই পদ্মবিলের ওপর। প্রজাপতির জ্বালায় নাকি কেউ সেই পদ্মবিলের কাছে সহজে ঘেঁষতে পারে না।"

ভন্টা আবার কি বলতে গেল, বেষ্টা বাধা দিল জিভ দিয়ে হিস্‌হিস্‌ করে। তার মানে সেই সময় বিলুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। বলতে বলতেই ঢুকলেন আসল কথাটা—"এইমাত্র আমি জানতে পারলাম যে তোমরা

প্রজাপতির খোঁজ করছ। বিশুবাবু বলেছে ওর বোনকে। খুবই ভাল কথা। তা'হলে আমাদের আজ সন্ধ্যার পরেই বেরিয়ে পড়তে হয়। রাত ভোর হবার আগে পদ্মবিলের কাছে পৌঁছানো চাই। ভোরের সময় প্রজাপতিদের মেজাজ ভাল থাকে। রোদ উঠলেই ওরা লুকিয়ে পড়ে। তাই বলছিলাম—"

ক্যাপ্টেন বেষ্টা অতি সংক্ষেপে আমাদের সকলের হোয়ে জানিয়ে দিল—"আমরা রেডি"—

"আমি তা'হলে গাড়িখানাকে তেল জল গেলাইগে। বিশুবাবু, তুমি তোমার বোনের কাছে গিয়ে বল যে ব্রেফ পরোটা আর মাংস, রাতে আমরা আট জনে খাব। সন্দেশ কিছু বর্ধমান থেকে নিয়ে নেওয়া যাবে।" বলতে বলতে বিলুবাবু বেরিয়ে গেলেন।

মিনিটখানেক আমাদের কারও মুখে কথা ফুটল না। অবশেষে আভাই একটি স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললে—"যাক বাবা, তা'হলে আমরা সারা রাত মোটরে দৌড়চ্ছি।"

ক্যাপ্টেন বেষ্টা হুকুম করলে—"দরকারী জিনিস সমস্ত গুছিয়ে নাও।"

আমরা কাজে লেগে গেলাম।

একটার পর একটা অভিযান চালাতে চালাতে কতকগুলো দরকারী জিনিসপত্র আমাদের জুটে গিয়েছিল। আমাদের প্রত্যেকের কাছে আসল ইস্পাতে গড়া একখানি করে ছুরি থাকত। তিনটে টর্চ, খুব শক্ত কড়ে আঙ্গুলের মত সরু একশ' হাত লম্বা একগাছা দড়ি, দশ-পনেরো হাত তফাত থেকে কাগজে বা কাপড়ে আগুন ধরানো যায় এমন জাতের বেশ শক্তিশালী একটা আতশী কাঁচ, তিন হাত দূর থেকে এক ছটাক ওজনের লোহা টেনে আনে এমন জোরালো এক টুকরো চুম্বক, এই ধরনের টুকিটাকি জিনিসপত্র অভিযানে বেরলেই আমরা সঙ্গে নিতাম। সেগুলো বার করে আর একবার মিলিয়ে দেখা হোল। বিশু তার বোন জটীর কাছ থেকে আধখানা পরিষ্কার পাতলা কাপড় নিয়ে এল। এক শিশি আইডিন আর খানিকটা তুলো পকেটে না পুরে আমি অভিযানে বেরতাম না। দু'চারটে যন্ত্রপাতিও জুটেছিল। খালি হাত-পা নিয়ে অভিযান চালানো যায় না, এটা আমরা জানতাম।

এবারকার অভিযানে সঙ্গে চলল এক-ডেকচি রান্না মাংস আর একগাদা পরোটা। বিলুবাবু তাঁর বন্দুকটাকে আমাদের পায়ের কাছে শুইয়ে দিলেন। জটী একটা পেতলের কলসী সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠল। ওতে খাবার জল আছে। সামনে বিলুবাবু, জটী আর বিশু বসল, পেছনে আমরা পাঁচজন। দস্তুরমত ঠাসাঠাসি করে বসা হোল। আমরা যাত্রা করলাম। ত্রয়োদশীর চাঁদ তখন আকাশে হাসছেন।

কোন্নগর থেকে বেরিয়ে বড়রাস্তায় উঠে বিলুবাবু বললেন—"এখন থেকে আমি তোমাদের বলে যাব কোন্ কোন্ জায়গা আমরা পার হোয়ে চলেছি। সামনেই রিষড়া তারপর শ্রীরামপুর সেওড়াফুলি বদ্যিবাটি চাঁপদানী ভদ্রেশ্বর, এমনি ভাবে বলতে বলতে যাব। তোমরা বুঝতে পারবে কখন কোন জায়গা পার হচ্ছ। আচ্ছা, এই আমরা রিষড়ায় ঢুকছি।"

তিন মিনিট চার মিনিট পরই বিলুবাবু হাঁকতে লাগলেন, অমুক জায়গা পার হোলাম, অমুক জায়গায় ঢুকছি। খুবই মজা লাগল আমাদের, গাড়ি চড়ে ছোটবার একঘেয়েমি থেকেও রেহাই পাওয়া গেল। আমরা চন্দননগরে ঢুকলাম। তখন ফরাসীরা চন্দননগর দখল করে বসেছিল। নতুন রকমের সাজপোশাক-পরা পুলিসে আমাদের গাড়ি রুখে কি যেন জিজ্ঞাসা করলে বিলুবাবুকে। তারপর বেশ সাড়ম্বরে এক সেলাম ঠুকে গাড়ি ছেড়ে দিলে। মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা চন্দননগর পার হোয়ে গেলাম। ফরাসীদের রাজত্ব শেষ হোল।

খুব জোরেও নয় খুব আস্তেও নয়, এমনি ভাবে গাড়ি চালিয়ে ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে বিলুবাবু আমাদের নিয়ে বর্ধমান শহরে পৌঁছলেন। সন্দেশ কেনা হোল। জটী জিজ্ঞাসা করলে—"খাওয়াদাওয়া হবে কোথায়?"

বিলুবাবু বললেন—"আরও খানিক এগিয়ে। চাঁদের আলোয় ফাঁকা জায়গায় বসে খাওয়া হবে।"

বেষ্টা বললে—"এর মধ্যে খাওয়া কি? সন্ধ্যের আগেই তো সবাই গাণ্ডেপিণ্ডে গিলেছি।"

আমরা সবাই সমবেত কণ্ঠে বেষ্টাকে সমর্থন করলাম। বিলুবাবু গাড়ির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিলেন। তারপর গল্প শুরু হোল। শুরু করালে আভাই—"আচ্ছা বিলুবাবু, যেখানে আমরা যাচ্ছি, সেখানে আপনি নিশ্চয়ই অনেকবার গেছেন। জায়গাটা বোধ হয় খুব জঙ্গল, তাই না?"

বিলুবাবু বললেন—"মোটেই না, গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। ধু ধু করছে এবড়োখেবড়ো মাঠ, উঁচুনিচু পাথুরে জমি। মাঝখানে প্রকাণ্ড এক দিঘি, দিঘি না বলে বিল বলাই ভাল। দিঘি পুকুর মানুষে কাটায়, এটাকে কেউ কাটিয়ে বানায়নি। আপনাআপনি তৈরী হোয়েছে। মনে হয়, কলিয়ারি ছিল আগে। কয়লা বার করে নেবার পরে বালি বোঝাই করতে হয় খনিতে, নয়ত জমি বসে গিয়ে

ঐ রকম বিল হোয়ে যায়। ওটাও বোধ হয় সেই রকম ভাবে সৃষ্টি হোয়েছে। আগে মানুষ কয়লাই বার করে নিত, বালি বোঝাই করত না।”

বিশু বললে—“তাহলে সেটা আপনার সেই কলিয়ারির দেশে! এতক্ষণ বলতে হয়।”

“না, ঠিক কলিয়ারির দেশে নয়,” বিলুবাবু বলতে লাগলেন—“এখন যে সব জায়গায় কয়লা পাওয়া যায়, সেখান থেকে ঐ বিলটা প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে। ঐ বিলটার চতুর্দিকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এখন কোনও খনি নেই। খনি নেই, চাষ-আবাদ হয় না, কোনও মানুষও সেখানে বাস করে না। অনেক দূরে পাহাড় দেখা যায়, পাহাড়ের আগাপাস্তলা জঙ্গলে ঢাকা। আগে কিন্তু ওখানে মানুষ বাস করত, তার চিহ্ন আছে।”

“কি রকম?” ভন্টা এতক্ষণ পরে চাঙ্গা হোয়ে উঠল, রহস্যের গন্ধ পেয়েছে। গরমমসলা দেওয়া মাংসের গন্ধে আমাদের জিভে যেমন জল আসে, রহস্যের গন্ধ পেলে ভন্টার জিভও তেমনি লাফিয়ে ওঠে।

শুরু করলেন বিলুবাবু। তাঁর হাত পা চোখ ঠিকঠাক কাজ করতে লাগল, গাড়ি ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে দু'চোখে আগুন জ্বালিয়ে, গল্পও ভেসে আসতে লাগল পিছন দিকে। আমরা কান পেতে রইলাম।

বিলুবাবু যা বলেছিলেন তা' তোমাদের এখন আমি সংক্ষেপে জানিয়ে দিচ্ছি। সেখানে সেই দিঘি বা বিলের পুব-উত্তর কোণে বিরাট এক অট্টালিকা খাড়া আছে। তিনতলা বাড়ি, উত্তর দক্ষিণে বিরাট বিরাট থামের মাথায় পেল্লায় মোটা কাঠের কড়ির ওপর মস্ত বড় বড় দালানের ছাত। ঘর যে কতগুলো তা' আর কে গুন্‌তে গেছে! যত ঘর তত দরজা জানলা, দরজা জানলা সব হাঁ-হাঁ করছে। কপাট চৌকাঠ পাল্লা খড়খড়ি একটারও নেই। দূর থেকেই দেখা যায় তেতলার ছাত ধ্বসে পড়েছে। বাড়িটার চারিদিকে একসময় পাঁচিল ছিল, এখন আর নেই। পাঁচিলের বদলে নোনা-ধরা শেওলা-পড়া রাশি রাশি ইঁট জমা হোয়ে আছে। অত বড় বাড়ি কে বানিয়েছিল তা জানবারও উপায় নেই। বিলুবাবুর বাবা খুব ছোটবেলায় বাড়িখানাকে ঠিক ঐ অবস্থাতেই দেখেছিলেন। বিলুবাবুর ঠাকুরদা তাঁর ছেলের কাছে একটা গল্প বলেছিলেন ঐ বাড়ি সম্বন্ধে। সেই গল্পটা যদি বিশ্বাস করতে হয় তা'হলে মানতে হবে যে একশ' দেড়শ' বছর আগে ঐ বাড়িতে যারা বাস করত তারা ভারতবর্ষের মানুষ ছিল না। পালতোলা জাহাজে সাগর পার হোয়ে দুনিয়ার উলটো পিঠ থেকে তারা এসেছিল।

বিলুবাবুর ঠাকুরদা তাঁর ছেলেবেলায়, ছেলেবেলায় মানে যে বয়সে তিনি প্রথম ওদিকে কয়লার খোঁজে গিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেন এক বুড়ো সাঁওতালের কাছ থেকে, কারা বাস করত ঐ বাড়িতে। সাঁওতালটি নাকি তাদের দেখেছিল। অদ্ভুত সাজপোশাক ছিল তাদের, টকটকে লাল কাপড়ের তৈরী প্যাণ্ট পরত, সেই রকম কাপড়ের জামা দিয়ে সারা অঙ্গ ঢেকে রাখত। মাথায় দিত মস্ত বড় বড় টুপি, টুপিতে আবার রাশীকৃত পালক আটকানো থাকত। কোমরে ঝুলত বাঁকানো তলোয়ার, সেই তলোয়ারগুলোর বাঁকানো খাপের গায়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলত হীরে মণি মুক্তা। কুচকুচে কালো বেঁটে বেঁটে ঘোড়া ছিল তাদের, সেই ঘোড়াদের ঘাড়ে অপর্যাপ্ত চুল ছিল। সেই ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়ত। কখনও তারা ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগাত না, পিঠে জিন চাপাত না। বাঁ হাতে ঘোড়ার চুল মুঠি করে ধরে ডান হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে হাওয়ার বেগে তারা অদৃশ্য হোয়ে যেত। দশ পনেরো বিশ দিন পরে ফিরে আসত রাশি রাশি ধনদৌলত ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে। কোথা থেকে কি উপায়ে যে সে সমস্ত আনত তা' সাঁওতালটি বলতে পারেনি।

আমরা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম। সতু বললে—“তখনকার দিনের ডাকাতের দল, ডাকাতি করে ঐ সমস্ত মাল নিয়ে আসত।”

ভন্টা বললে—“হয়তো তারা এদেশের লোকই ছিল। পাছে কেউ চিনতে পারে এইজন্যে ঐভাবে সাজপোশাক পরে বেরুত।”

আভাই জিজ্ঞাসা করলে—“আচ্ছা বিলুবাবু, আপনি কি কখনও সেই বাড়িটার মধ্যে ঢুকেছিলেন?”

“বেজায় সাপ আছে যে” বলতে বলতে বিলুবাবু স্পীড কমিয়ে দিলেন গাড়ির। রাস্তার ডান ধারে একটা বাঁধানো চাতালের সামনে গাড়ি খাড়া করে বললেন—“ভাঙাচোরা ইঁটপাটকেলের মধ্যে বেজায় সাপ আছে। আমার একটা ভুটানি কুকুর ছিল। একবার পুজোর সময় লোকজন নিয়ে গেছি পদ্মফুল আনতে, কুকুরটা সঙ্গে গেল। কি তার খেয়াল হোল, গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে একদৌড়ে ঢুকল গিয়ে সেই বাড়িতে। কয়েক মিনিট পরে বিকট চিৎকার করতে করতে ছুটে এসে আছড়ে পড়ল আমার সামনে। পড়ে ধড়ফড় করে মরে গেল। ব্যাপারটা কি ঘটল দেখবার জন্যে আমরা এগিয়ে গেলাম ভাঙা পাঁচিলের কাছে। পাঁচিল আর পেরতে হোল না। দূর থেকে দেখতে পেলাম, মস্ত বড় ফণা ধরে এক কালকেউটে দেড় হাত উঁচু হোয়ে

দাঁড়িয়ে হিস্‌হিস্‌ করছে।"

আমরা নামলাম। সেই চাতালের ওপর বসে চাঁদের আলোয় খাওয়াদাওয়া করা গেল। ওধারে জটী আর বিলুবাবু যখন আমাদের মাংস পরোটা পরিবেশন করতে ব্যস্ত তখন আমরা এ ওর গা টিপে মতলবটা পাকা করে ফেললাম। অর্থাৎ সেই ভাঙা অট্টালিকায় আমাদের ঢুকতেই হবে।

যদি তোমরা জানতে চাও, কখন সেই পদ্মবিলের ধারে আমরা পৌঁছেছিলাম, তা'হলে ফ্যাসাদে পড়ে যাব। তার কারণ তখন আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা বিশ্রীরকম চেঁচামেচির চোটে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলাম, গাড়ি থেমে রয়েছে। সামনের আসনে একলা শুধু জটী, বিশুও নেই বিলুবাবুও নেই।

বেশ কুয়াশা জমেছে চারিদিকে, গাড়ির হুড তোলা রয়েছে আমাদের ওপর। একরকম আঁটিবাঁধা অবস্থায় বসে আমরা ঘুমচ্ছিলাম। আঁটি ছাড়িয়ে নেমে পড়লাম সবাই গাড়ি থেকে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, রাশি রাশি পেঁজা তুলো নীল আকাশের নীচে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। একদম নীলের বুক ছুঁয়ে রক্তবর্ণ আগুনের আভা ফুটে উঠেছে। আমাদের গাড়ির আশেপাশে তখনও বেশ অন্ধকার, গাড়ির হুডটা ভিজে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন বেন্টা হুংকার ছুড়লে—"রেডি।"

আমরা আমাদের টুকিটাকি জিনিসপত্রগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে নিলাম। বিলুবাবুর বন্দুকটা জটী নিজের কাঁধে তুলে নিলে। টোটা ভরতি একটা ছোট্ট চামড়ার খাপ বার করে নিলে ওদের আসনের তলা থেকে। তারপর আমরা রওয়ানা হলাম। কোথায় রইল মাখনচাক খোঁজা, কোথায় গেল ঘিয়ের কারবার করে বড়লোক হওয়ার চিন্তা! তখন স্রেফ সরষে ফুল, পাঁচ জনের দশটা চোখ শুধু সরষে ফুল দেখতে লাগল। যদি ওদের খুঁজে না পাওয়া যায়! যদি ওরা সেই কেউটে গোখরোগুলোর সামনে পড়ে থাকে! যদি যদি যদি, পিল পিল করে যদির পর যদি মনের মধ্যে লাইন দিতে লাগল। মুখ টিপে আমরা এগিয়ে চললাম।

ক্রমে ফরসা হোয়ে উঠল। আস্তে আস্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই পদ্মবিল। এঁকেবেঁকে বিলটা সেই পাথুরে জমির মধ্যে নিশ্চিন্ত হোয়ে পড়ে আছে। পড়ে আছে না বলে বলা উচিত ঘুমিয়ে আছে। লাল-কালো এবড়োখেবড়ো পাথরের চাঁই মাথা জাগিয়ে আছে জলের মধ্যে। আর ফুটে আছে পদ্ম, শুধু পদ্ম আর পদ্ম, পদ্ম ছাড়া অন্য কিছু নজরেই পড়ল না।

মস্ত বড় ফণা ধরে এক কালকেউটে......

হঠাৎ ভন্টা চেঁচিয়ে উঠল—"ঐ যে, ঐ যে সেই বাড়িটা দেখা যাচ্ছে।"

তখন আমাদের সব ক'জোড়া চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই বাড়িটার ওপর। দূরে পদ্মবিলের ওপারে বাড়িটাকে সত্যিই দেখা যাচ্ছে। একটা অতিকায় দৈত্য যেন, মস্ত বড় হাঁ, থামগুলো সব দাঁত। দাঁত বার করে দৈত্যটা যেন আমাদের পানে তাকিয়ে আছে।

হুকুম দিল বেন্টা—"চেঁচা সবাই, আমাদের চেঁচানি শুনলে নিশ্চয়ই তারা এগিয়ে আসবে।"

শুরু হলো চেঁচানি—"ও বিশু, ও বিলুবাবু!" সেই নিস্তব্ধ প্রভাত আমাদের গলার কসরতে ফেটে-ফুটে চৌচির হোয়ে গেল। পদ্মগুলো দারুণ রকম চমকে উঠে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগল। চেঁচাতে চেঁচাতে আমরা এগিয়ে চললাম সেই বাড়িটার দিকে। ডান দিক দিয়ে বিলটা ঘুরলে সেই বাড়ির কাছে পৌঁছনো যাবে।

চেঁচাতে চেঁচাতে চলেছি আমরা। হঠাৎ আভাইটা দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ উঁচু করে কয়েকবার শ্বাস টেনে বললে—"গন্ধ পাচ্ছিস তোরা কিছুর?"

আমরাও মুখ উঁচু করে শ্বাস টানতে লাগলাম। বেন্টা

বললে—“কেমন যেন ওষুধ ওষুধ গন্ধ মনে হচ্ছে। কার্বলিক সাবান! হুঁ, নিশ্চয়ই সেই সাবানের গন্ধ, কার্বলিক সাবান মেখে কেউ এই বিলে স্নান করে গেছে।”

জটী বললে—“এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড নিয়ে এসেছিলাম আমরা, ওর গন্ধে নাকি সাপ পালায়। সেই বোতলটা গাড়িতে আছে কিনা দেখে এলে হোত। সেটা বোধ হয়—”

ভণ্টা বললে—“নিশ্চয়ই বিলুবাবু সঙ্গে নিয়ে গেছেন। সাপ খেদাবার জন্যে হয়তো সেই অ্যাসিড ছড়াতে ছড়াতে গেছেন।”

“আমি যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম”—প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থায় জটী বলতে লাগল—“কখন যে তারা গাড়ি থেকে নেমে গেল, কি কি সঙ্গে নিয়ে গেল কিছুই জানতে পারিনি। আমাকে জাগিয়ে গেলেও তো পারত।”

সতু বললে—“গেল কেন? কেন গেল তারা? আসল ব্যাপারটা হোচ্ছে, হঠাৎ ওরা গাড়ি থেকে নেমে গেল কেন?”

আমি বললাম—“হয়তো এমন একটা কিছু হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল যে—”

আমাকে আর শেষ করতে হোল না কথাটা। ভণ্টা বললে—“কিংবা এও হতে পারে, কেউ তাদের জোর করে—”

বেষ্টা বললে—“সাট আপ্! ওসব কথা তাদের সঙ্গে দেখা হোলেই জানা যাবে। এখন চেঁচা, প্রাণপণে চেঁচা আর এগিয়ে চল। আগে ঐ বাড়িটার কাছে আমরা গিয়ে পৌঁছুই!”

আভাই তখনও মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে শ্বাস টানছিল। বললে—“ঐ ধার থেকেই যেন হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে গন্ধটা, তাই না র‍্যা?”

আভাইয়ের কথার জবাব দেবে কে! আমরা তখন আবার চেঁচানি শুরু করেছি—“ও বিশু—ও বিলুবাবু!”

কার্বলিকের গন্ধটা ক্রমেই তীব্র হোয়ে উঠতে লাগল। জলের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় সেই বাড়িটার সামনে আমরা পৌঁছে গেলাম। আমাদের ডানদিকে সূর্যদেব উদয় হোলেন। তখন আমাদের জলের ধার ছেড়ে পাড়ের ওপর উঠতে হবে।

“ও মা গো”—বিদকুটে জাতের একটা চিৎকার করে উঠল জটী। সবায়ের পেছনে আসছিল সে, ঘুরে দাঁড়ালাম আমরা। দাঁড়িয়ে যা দেখলাম তারপর আর আমাদের হাত-পা নাড়বার মত অবস্থা রইল না।

এক চাঙড় পোড়া পাথুরে মাটির সামনে জটী বসে পড়েছে। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে সেই চাঙড়টার পানে এবং আমরাও দেখতে পেলাম যা দেখে জটীর ঐ অবস্থা হোয়েছে। জামা, বিশুর গায়ের জামা, সেই ডোরাকাটা সার্টটা যেটা এবার পূজায় সে বহু হাঙ্গামা হুজ্জত করে বানিয়েছিল, সেই সার্টটার দশা এমনই হোয়েছে যে সহজে চেনবার উপায় নেই। কাদায় মাখামাখি, কাদা মানে কালো পাঁক, পাঁকের ভেতর ফেলে কে যেন চটকেছে জামাটাকে। জামাটা সেই কালো চাঙড়টার ওপর বেশ একটি বলের মত হোয়ে বসে আছে।

প্রথম কথা বললে বেষ্টা—“খবরদার কেউ নড়বি না। ভণ্টা, তুই পায়ের ছাপ দেখে তোদের বাছুর খুঁজে আনিস! শিগ্‌গির দেখ, পায়ের ছাপ পাওয়া যায় কি না।”

সঙ্গে সঙ্গে ভণ্টা হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করলে। প্রায় মাটির সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে চার হাত-পায়ে একটু একটু করে ঘুরতে লাগল সে। চাঙড়টাকে এক পাক দিয়ে জটীর কাছে পৌঁছে থেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেইভাবে মাটি নিরীক্ষণ করে বললে—“হুঁ—আচ্ছা—বিলুবাবু কি রবার সোলের জুতো পায়ে দিয়ে—”

জটী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—“রবার সোল, রবার সোল, সেই জুতো পায়ে দিয়ে টেনিস খেলে।”

ভণ্টা সেই অবস্থাতেই বললে—“আর ঐ যে, এই হোল, এই যে—কিন্তু!”

আভাই চেঁচিয়ে উঠল—“কিন্তু কি?”

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভণ্টা বললে—“শুধু পা কেন?”

“কার শুধু পা?” গর্জন করে উঠল বেষ্টা।

ভণ্টা বললে—“বিশুর, কিন্তু ওর পায়ে তো সেই—”

বেষ্টা বললে—“সাট্ আপ্, দেখ শিগগির কোন্ দিকে গেছে পায়ের ছাপ। আমরা এধারে নড়তে পারছি না।”

সতু বললে—“তা'হলে তুই এগিয়ে যা, আমরা ফলো করি। আমরা আগে গেলে আমাদের পায়ের ছাপে সব গোলমাল হোয়ে যাবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—“জটীদি, তুমি বন্দুক চালাতে পার?”

জটী তাড়াতাড়ি খট্‌খট্ আওয়াজ করে বন্দুকের নলটা নুইয়ে টোটা পুরে ফেললে। বললে—“ছুঁড়তে তো পারি, কিন্তু গুলি হয়তো ঠিক জায়গায় লাগবে না!”

বেষ্টা বললে—“লাগাতে হবে না গুলি কোথাও, আওয়াজ কর। আকাশের দিকে তুলে ছোঁড় গুলি। আওয়াজ

হোক্। কাছাকাছি কোথাও ওরা থাকলে শুনতে পাবে।"

ফিসফিস করে আভাই আমার কানের কাছে উচ্চারণ করলে—"শোনবার মত অবস্থা কি আছে এখনও তাদের!"

ওর হাতে একটা চিমটি কেটে আমি বললাম—"চুপ।"

সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হোল।

তিন মিনিট চার মিনিট পর পর গুড়ুম গুড়ুম করে আওয়াজ হোচ্ছে, আকাশপানে বন্দুকের নল উঁচিয়ে জটী বন্দুক চালাচ্ছে। আমরা কেউ একটি কথা বলছি না, খানিকটা আগে ভন্টা চলেছে পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে। কয়েক পা হাঁটছে, কিছুক্ষণ গুড়ি মেরে চলছে, কোথাও কোথাও উবু হোয়ে বসছে। আমরা জানি, অসাধারণ একটা শক্তি আছে ভন্টার। পায়ের ছাপ কিছুতেই ওর নজর এড়াবে না। কিন্তু এমন রূপ ধারণ করছে মাটি, মাটি মানে কাঁকর পাথর আর পোড়ো কালো চাঙড়গুলো যে আর বুঝি ভন্টাও পারে না। এক এক বার সে হামাগুড়ি দিয়ে চক্কর দিচ্ছে মাটির সঙ্গে প্রায় মুখ ঘষতে ঘষতে। তারপর সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে দম নিয়ে কয়েক পা এগোচ্ছে।

চিৎকার করে উঠল বেষ্টা—"ঠিক আছে তো র‍্যা? গোলমাল হবে না তো?"

ভন্টা কিছু বলবার আগেই সতু চাপা গলায় তেড়ে উঠল—"চুপ, দাঁড়া সবাই—"

তৎক্ষণাৎ সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। আধ মিনিট পরে সতু বললে—"ঐ ঐ—শুনতে পাচ্ছিস?"

হাঁ পাচ্ছি, সবাই তখন শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কোন্ দিক থেকে আসছে ঐ আওয়াজটা!

বেষ্টা বললে—"আওয়াজটা যেন মাটির তলা থেকে আসছে।"

আমরা এগোতে লাগলাম। থেমে থেমে আওয়াজটা হোয়েই চলল—"ভট্ ভট্ ভট্ ভট্।"

একটা টিবির মত জায়গায় উঠে ভন্টা বললে—"ঐ সেই বাড়িটা।"

দৌড়ে গিয়ে আমরা সেই টিবির ওপর উঠলাম। বেষ্টা বললে—"আমরা বাড়িটার পেছন দিকে এসে গেলাম নাকি র‍্যা! এধারটা যেন অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে।"

সূর্যের পানে তাকিয়ে জটী বললে—"তাই। যখন প্রথম ওটাকে দেখি তখন সূর্য উঠছিল ডান দিক থেকে, এখন সূর্য বাঁ দিকে পড়েছে। তার মানে বাড়িটাকে আমরা পাক দিয়েছি।"

বেষ্টা বললে—"ভন্টা এগিয়ে যা।"

উবু হোয়ে বসে কি যেন দেখছিল ভন্টা। অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলে—"এ সব কি! কাদা এল কোথা থেকে!"

কাদা নয়, কালো পাঁক। এক খেবড়া কালো পাঁক খটখটে শুকনো পাথুরে জমির ওপর পড়ে রয়েছে। পাঁকটা নরম, পাঁকটা তাজা, পাঁকটা থেকে পেঁকো গন্ধ বেরুচ্ছে। কোথা থেকে এল এই পাঁক! কে আনলে! এই জাতের পাঁকেই মাখামাখি হোয়ে পড়ে আছে বিশুর জামাটা। ব্যাপার কি!

বেষ্টা হুকুম করলে—"ছুরি বার করে হাতে নে সবাই। জটীদি, বন্দুকে টোটা ভরে নাও। ঠিক জায়গায় আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।"

ঠিক জায়গা তখনও বহুদূর।

কার্বলিকের গন্ধটা হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল। ভট্ ভট্ আওয়াজটা তখনও শোনা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু বেশ অস্পষ্ট হোয়ে উঠছিল। ছোট ছোট দু'ডেলা নরম কাদা আবার আবিষ্কার করা হোল। তারপর আর কোনও চিহ্ন নেই। ভন্টা তখন পৌঁছেছে সেই ভাঙা পাঁচিলের পাশে। পৌঁছে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—"সাবধান, অন্যরকম পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি।"

"অন্যরকম পায়ের ছাপ!" বেষ্টার গলা কেঁপে গেল।

সতু বললে—"কই দেখি।" বলে ভন্টার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমরা কয়েক পা পেছনে থেমে পড়েছি। ওরা দু'জনে উবু হোয়ে বসল সেখানে। বসে মাথা হেঁট করে কি যেন দেখতে লাগল। হঠাৎ আমার মনে হোল, মানে স্পষ্ট যেন দেখলাম, দোতলার বারান্দায় মোটা থামের আড়ালে সট্ করে কি একটা সরে গেল। একটি কথা না বলে বেষ্টার কাঁধটা খামচে ধরলাম। বেষ্টাও ততক্ষণে যেন একটা কিছু সন্দেহ করে ফেলেছে। যে থামটার পানে আমি তাকিয়েছিলাম, সেটার দিকেই তাকিয়ে রইল বেষ্টা। একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোচড় দিয়ে আমার হাত থেকে কাঁধটা ছাড়িয়ে নিল। দু'পা পেছিয়ে গিয়ে জটীর পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললে জটীর কানে, জটীও তৎক্ষণাৎ সেই থামটার পানে বন্দুকের নল তাক করে তৈরী হোয়ে দাঁড়াল।

বোধহয় মিনিটখানেক কাটল সেইভাবে, তারপর গুড়ুম। বেষ্টা চিৎকার করে উঠল—"আর একটা"—আবার আওয়াজ হোল—গুড়ুম। সবাই তখন দেখতে পাচ্ছি একটা মস্ত বড় গিরগিটির মত জানোয়ার ইঁট-বার-করা থামটাকে আঁকড়ে টিকে থাকবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

খট্‌খট্ আওয়াজ করে আরও দুটো বুলেট বন্দুকে পুরে

ফেলল জটী। বেষ্টা বললে—"আর নয়।"

আভাই চেঁচিয়ে উঠল—"কি ওটা?"

ভণ্টা জবাব দিলে—"কুমীর বোধ হয়।"

জটী ঠিক কথাটা বলে ফেললে—"গোসাপ।"

আমি বললাম—"দুটো গুলিই ওর লেজে লেগেছে। লেজটা তাই ওভাবে ঝুলে পড়ল।"

সতু বললে—"অন্য জানোয়ারও আছে এখানে, নয়ত এরকম পায়ের ছাপ এল কি করে।"

একে একে গিয়ে নিচু হোয়ে আমরা ছাপগুলো দেখলাম। এক হাত লম্বা পা! কিন্তু ও আবার কি! পাঁচটা আঙুল তো নয়। মাত্র তিনটে আঙুলের ছাপ পড়েছে শুকনো লাল ধুলোর ওপর। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, মাত্র দুটো ছাপ দেখা যাচ্ছে। যার পায়ের ছাপই হোক না কেন, সে এখানে দু'পায়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারপর! তারপর উবে না গেলে নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে গেছে। তা'হলে অন্য ছাপগুলো গেল কোথায়!

বেষ্টা যেন বুঝতে পারলে আমাদের মনের কথা। বললে—"এইখান থেকে সে লাফ দিয়েছে। লাফ দিয়ে ঐ ভাঙা ইঁটের টিবি পেরিয়ে ভেতরে পড়েছে। তার মানে জন্তুটা লাফ দিতে পারে।"

ভণ্টা বললে—"দাঁড়া তোরা এখানে, আমি আগে পাঁচিল পার হব। ওপাশে গিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠব, তারপর তোরা এগিয়ে যাবি।"

কথাটা ভাল করে শেষও করলে না। তীরবেগে চড়ল গিয়ে সেই ভাঙা ইঁটের পাঁজার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে দিলে লাফ। একদম অন্তর্ধান, ওর হাতের ছুরির ফলাটা চোখ ধাঁধিয়ে দিল আমাদের। থ হোয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট দু'তিন সেইভাবে কেটে গেল। সর্বপ্রথম কথা বললে সতু—"ফাঁদ পেতে রেখেছে, ঐখানে পৌঁছলেই সেই ফাঁদে পড়তে হবে।"

বেষ্টা জিজ্ঞেস করলে—"দড়িটা কার কাছে আছে, বার কর শিগ্‌গির!"

আভাই তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে দড়ির ডেলাটা বার করলে। বেশ ভারী গোছের একটা পাথর বাঁধল তার এক মাথায় বেষ্টা। বাঁধা শেষ হোলে বললে—"একজন যা এই পাথরটা হাতে করে, ঐ যেখান পর্যন্ত গিয়ে ভণ্টা মিলিয়ে গেল, ওই জায়গাটা লক্ষ্য করে দূর থেকে ছুঁড়বি। খবরদার ঐ জায়গার কাছে যাবি না।"

তাড়াতাড়ি সমস্ত দড়িটা খুলে ফেলা হোল। আভাই আর সতু দড়িটার এক মাথা ধরে দাঁড়াল। দু'হাতে করে পাথরটাকে তুলে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আমি এগিয়ে গেলাম। কোনও রকমে উঠলাম খানিকটা সেই ভাঙা ইঁটের ওপর দিয়ে, তারপর বেশ চেষ্টা করে পাথরটাকে মাথার ওপর তুলে সামনে ছুঁড়ে দিলাম। সড় সড় করে সমস্ত দড়িটা আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এক মাথা তো আভাই সতুর হাতে ধরাই আছে।

বেষ্টা বললে—"পেল্লায় গর্ত।"

আভাই চেঁচিয়ে উঠল—"ধর ধর, শিগ্‌গির ধর দড়িটা, টানছে যে।"

দৌড়ে গিয়ে আমি দড়িটা ধরে ফেললাম। বেষ্টাও ধরল। বন্দুকটা মাটিতে ফেলে জটীও ধরল। তারপর টান, হেঁইও—হেঁইও। টানছি আর পিছিয়ে যাচ্ছি। একশ' হাত লম্বা দড়ি, পিছুতে পিছুতে অনেক পিছিয়ে গেলাম। তারপর আর দড়ি আসে না।

বেষ্টা বললে—"পেল্লায় ভারী কিছু উঠে এসেছে। আটকেছে সেটা ঐ ইঁটের আড়ালে। দাঁড়িয়ে থাক তোরা দড়ি ধরে। জিনিসটা কি আমি দেখিগে।"

আভাই বললে—"জটীদি, তুমিও যাও। আমরা তিনজনেই দড়িটা টেনে রাখতে পারব। বন্দুকে টোটা ভরে নাও। কি জানি—"

সতু বললে—"জড়া কোমরে", বলে দড়িটাকে কোমরের সঙ্গে ঠেকিয়ে কয়েকটা পাক খেলে। আমরাও তাই করলাম। হাতগুলো রক্ষা পেল। হাতের চেটো প্রায় ফালা ফালা হোয়ে উঠেছিল।

জটী আর বেষ্টা দৌড়ল। আমরা দেখতে পেলাম, জটী তার বন্দুকটা তুলে নিলে। তারপর সামনে বেষ্টা পেছনে জটী গুড়ি মেরে ইঁটের টিবিতে উঠতে লাগল।

কোমরে জড়ানো দড়ি, আমরা তিনজনে হেলে আছি পেছন দিকে। হাতগুলো রেহাই পেয়েছে। জ্বলছে হাতের চেটো, তবুও দড়ি ধরে আছি। কিন্তু হাতে করে আর টেনে থাকতে হোচ্ছে না। আচম্বিতে কি যেন কি হোল, কয়েক হাত পেছনে ছিটকে নিয়ে পড়লাম আমরা এ-ওর গায়ের ওপর। উঠে খাড়া হবার আগেই সামনে থেকে দু'বার আওয়াজ হোল—গুড়ুম গুড়ুম। আমরা শুনতে পেলাম, বেষ্টা চেঁচাচ্ছে—"লেগেছে লেগেছে।" পায়ের ওপর খাড়া হোয়েই আমরা দৌড়লাম।

লাগল কিসে!

কার গায়ে লাগল!

কে জবাব দেয়। জটী তখনও হাঁটু গেড়ে বন্দুক বাগিয়ে বসে আছে, পাশে উপুড় হোয়ে পড়ে আছে বেণ্টা। গলা বাড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গর্তটার মধ্যে। হাঁ, গর্ত—অন্ধকার এক গর্ত, আমরাও দেখলাম। আমি সতু আভাই, আমরা তিন জনেও হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম ওদের পাশে গিয়ে। তারপর সামনে ঝুঁকে সেই বিকট গর্তটার মধ্যে নজর ফেললাম।

গর্তটা কোনও মানুষে বানায়নি। এক নজর দেখেই আমরা বুঝতে পারলাম, ওটা একটা ফাটল। মা ধরিত্রী যেন হাঁ করে রয়েছেন। মুখটা গোল নয় তিনকোনা নয় চৌকো নয়, সে এক প্যাটার্নের। ঠিক হাঁ, বিশাল হাঁ, ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাঁ-টার পানে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কি আছে ওর মধ্যে!

বেণ্টা বললে—"জানোয়ারটা কোথায় লুকলো!"

আভাই জিজ্ঞাসা করলে—"কি জানোয়ার?"

জটী তখনও গর্তের মধ্যে তাগ করে বন্দুক ধরে আছে। এতটুকু না নড়ে নজর না সরিয়ে বললে—"রাক্ষস, আস্ত একটা রাক্ষস, কি সাংঘাতিক চোখ দুটো—"

বেণ্টা উঠে বসে বললে—"আর বড় বড় চুল। চুল নয়, ঠিক যেন সিংহের কেশর—"

জটী শেষটুকু বললে—"দড়ি ধরে উঠছিল, মাথাটা গর্তের ওপর উঠতেই—"

"আমি দড়িটা কেটে দিলাম"—বেণ্টা জুড়ে দিলে।

আভাই জিজ্ঞাসা করলে আবার—"তাহলে গুলি করলে কাকে?"

"সঙ্গে সঙ্গে আমি ফায়ার করলাম"—বলে জটী দম ছাড়ল।

"তার গায়ে গুলি লেগেছে কি না বুঝলে কেমন করে?"—জিজ্ঞাসা করলে সতু।

বেণ্টা জবাব দিলে—"ঐ শোন না, গর্তের ভেতর থেকে বিকট গোঙানি শোনা যাচ্ছে।"

খানিকটা সময় সবাই মুখ টিপে তাকিয়ে রইলাম সেই গর্তের মধ্যে। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলাম, শুধু সেই গোঙানিই শোনা গেল। টর্চ জ্বালিয়ে গর্তের মধ্যে ধরলে সতু, আমরাও আমাদের পকেট থেকে টর্চ বার করলাম। কিছুই বোঝা গেল না, যতদূর পৌঁছল টর্চের আলো কিচ্ছু নেই। টর্চের আলো যেখানে পৌঁছচ্ছে না, সেখানে কি আছে কে বলবে!

"এক কাজ করলে হয় না!" কি যেন বলতে বলতে আভাই থেমে গেল।
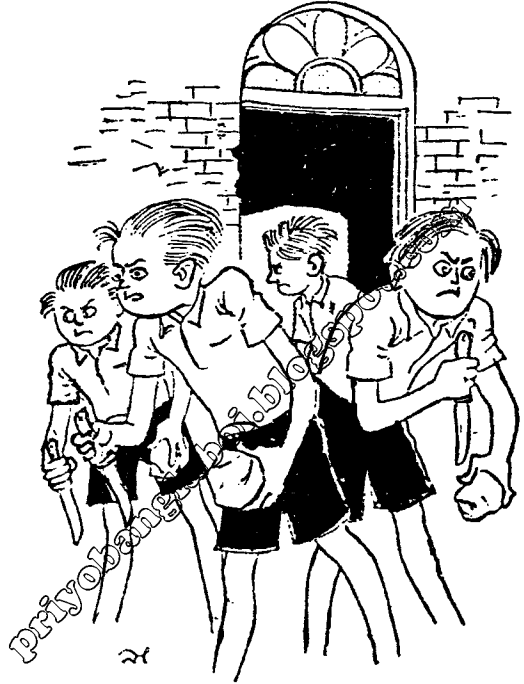
এক হাতে ছুরি, আর এক হাতে জুতসই একটা ঢিল......

সতু বললে—"আমিও তাই ভাবছিলাম।"

"দড়িটায় জ্বালানো টর্চগুলো বেঁধে নামানো যাক গর্তের মধ্যে"—বললাম আমি।

বেণ্টা বললে—"ঠিক বলেছিস।"

তারপর টর্চ চারটে বাঁধা হোল দড়ির মাথায়, জ্বালিয়ে দেওয়া হোল সব কটা, আস্তে আস্তে নামানো হোতে লাগল দড়ি। কোনও লাভ হোল না, দড়িটা আগাগোড়া নামাবার পরেও যেমন অন্ধকার তেমনি রইল। একদম পাতাল পর্যন্ত তো দড়ি পৌঁছবে না।

টর্চ কটা টেনে তুলে আমরা তৈরী হোলাম। বাড়িটার মধ্যে ঢুকতেই হবে। অনেক দেরি হোয়ে গেল, সত্যিই অনেক দেরি হোয়ে গেল। বিড়বিড় করে কি যেন উচ্চারণ করলে জটী, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিলে। কাঁদুক যত পারে, কিন্তু বসে বসে কাঁদবার সময় কোথায়। চল এগিয়ে, জলদি চল। যে ভাবে হোক, বাড়িটার মধ্যে আমাদের ঢুকতেই হবে।

গর্তটাকে বাঁয়ে রেখে ইঁটপাটকেলের স্তূপের ওপর দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। খানিকটা যাবার পরেই সুবিধে মত একটা জায়গা পাওয়া গেল।

"সাবধানে নামবি সবাই" বলে বেণ্টা পা বাড়ালে।

আলগা ইঁটপাটকেলের ওপর দিয়ে আলতোভাবে নামতে হবে। নামতে লাগলাম আস্তে আস্তে, পায়ের চাপে ইঁটপাটকেল সব গড়গড় করে গড়িয়ে নামতে লাগল।

সেই বাড়িটায় আমরা ঢুকলাম।

কি ভাবে ঢুকলাম, কেমন করে ঢুকলাম, জানতে চেও না। জানতে চাইলে একটি মাত্র জবাব পাবে। জবাবটি হচ্ছে—প্রতিমুহূর্তে সাপের ছোবল খাবার জন্যে তৈরী হোয়ে পা বাড়াতে লাগলাম আমরা। ভাঙা ইঁট টালি, চুন বালির চাপড়া, বরগা কড়ি—কত কি যে টপকালাম, কে তখন তার হিসেব রাখে। এ ঘর ও দালান, তারপর বারান্দা রোয়াক, তারপর আবার এ ঘর ও ঘর ঘুরতে লাগলাম মুখ টিপে। এক হাতে ছুরি, আর এক হাতে জুতসই একটা ঢিল নিয়ে ঘুরছি। ছোবল মারবার আগে সাপটাকে নজরে পড়া চাই। তাই নজর শুধু পায়ের দিকে। সত্যি কথাটা হোল একমাত্র সাপ ছাড়া সে সময়ে আমাদের মগজে কিছুই উদয় হয়নি।

তারপর সেই সিঁড়িটা দেখা গেল। দেখল প্রথম জটী, দেখেই একটা চাপা হুংকার ছাড়লে—"এই যে!" আমরা ফিরে তাকালাম। কি হোল?

আঙ্গুল দিয়ে জটী দেখিয়ে দিলে—"ঐ দেখ সিঁড়ি।"

দেখতে পেলাম সবাই, দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। কি কাণ্ড দেখ! এইভাবে আগে লোকে সিঁড়ি বানাতো নাকি!

একটা মস্তবড় ঘরের দরজা। কপাটা দু'খানা নেই। নেই বলেই সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। দু'হাতের বেশী চওড়া দেওয়াল, সেই দেওয়ালের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি বানানো হোয়েছে। দরজা খুললে সিঁড়িটা লুকিয়ে যাবে। কারণ বাঁ দিকের কপাটখানা দেওয়ালের ভেতরের সেই ফোকরের মুখটা আড়াল করে দেবে।

অদ্ভুত বুদ্ধি! জোর করে দরজা খুলে ঘরে ঢোক, ঢুকে যা পাবে লুটপাট করে নিয়ে যাও। ঘরের নিচে যে ঘর আছে, সেখানে পৌঁছবার জন্যে যে লুকনো সিঁড়ি আছে তা' মোটে জানতেই পারবে না।

কয়েকটি মুহূর্ত সেই ফোকরটার পানে তাকিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বেষ্টা হাঁকল—"রেডি!"

সতু জবাব দিল—"ঐ সিঁড়ি দিয়ে আমাদের নামতে হবে।"

আভাই যেন অস্পষ্টভাবে কি উচ্চারণ করলে। বেষ্টা বললে—"আমাকে ফলো কর।"

দম বন্ধ হোয়ে আসতে লাগল। অতি বিদকুটে চামচিকের গন্ধ। সিঁড়িটা কিন্তু আস্ত আছে। টর্চ জ্বেলে আমরা নামতে লাগলাম। এমন সাংঘাতিকভাবে নোংরা করেছে চামচিকেরা যে সিঁড়ির ধাপ দেখা যায় না। আর ঝুল, মাকড়সার জালে ফোকরটা প্রায় দুর্ভেদ্য হোয়ে উঠেছে। মুখে মাথায় হাতে পায়ে জড়াতে লাগল সেই জাল, কোনও রকমে চোখ বাঁচিয়ে আমরা নামছি। নামতে নামতে সিঁড়ি শেষ হোল। এবং তৎক্ষণাৎ আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলাম কুলকুল শব্দ। জল বয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পাতাল-গঙ্গা। নিশ্চয়ই আমরা পাতাল পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। কয়েক পা এগতেই জলে পা পড়ল।

বেষ্টা বললে—"সবশুদ্ধ একশ' বারটা সিঁড়ি। প্রতিটা সিঁড়ি যদি ছ' ইঞ্চি উঁচু হয়—"

সতু বললে—"ন' ইঞ্চি। দস্তুরমত উঁচু উঁচু ধাপ।"

আভাই ইতিমধ্যে মনে মনে হিসেব করে ফেলেছে, বললে—"আঠার ইঞ্চিতে হাত, মানে দুটো সিঁড়িতেই এক হাত। তার মানে আমরা পঞ্চাশ হাত নিচে পৌঁছে গেছি। তার মানে প্রায় চার তলা বা সাড়ে চার তলা।"

বেষ্টা ওর কথায় কানই দিলে না। আর একবার সেই আগের হুকুমটি শুনিয়ে দিলে—"আমাকে ফলো কর।" বলেই ডান দিকে ঘুরে হাঁটতে লাগল।

সতু জিজ্ঞাসা করলে—"ডান দিকে যাচ্ছিস কেন?"

"কারণ ঐ দিক থেকে জল আসছে। কোথা থেকে জল আসছে দেখে আসতে হবে।" বেষ্টা জবাব দিলে।

মুখ বুজে আমরা ওকে ফলো করলাম। করতেই হবে। বেষ্টা এই অভিযানের ক্যাপ্টেন, আমাদের নিয়ম ছিল, অভিযানে বেরিয়ে ক্যাপ্টেনের হুকুম বিনা ওজরে মানতে হবে।

ক্রমে আমাদের পায়ের গোছ ডুবল, তারপর জল হাঁটুর কাছে পৌঁছল। টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন, দেখছি একটা সরু গলি। দু'পাশের দেওয়াল নিকষ কালো, হাত আষ্টেক ওপরে ছাত, তাও ঝুলের মত কালো। যে জলের ভিতর দিয়ে হাঁটছি আমরা তাও কালো। কালো আর ঠাণ্ডা। এমন ঠাণ্ডা যে সর্বশরীর অসাড় হোয়ে এল।

কতক্ষণ যে চলেছিলাম সেই ভাবে তা' বলতে পারব না। তখন সময়ের হিসেব রাখার মত শরীরের বা মনের অবস্থা ছিল না। মাঝে মাঝে এক একবার শুধু মনে হচ্ছিল ওদের কথা। ওরা কি এখনও বেঁচে আছে! ওরা কি এখনও—!

মনকে চোখ রাঙিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। নিজেরা

বেঁচে ফিরে আর একবার আকাশের তলায় পৌঁছব কি না, সে চিন্তাটা একটিবারের জন্যেও মনের কোণে উঁকি মারলে না।

"থাম্"—ফট্ করে কথাটা কানে বাজল। ভয়ংকর রকম চমকে উঠলাম। তারপর বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। সবাই থেমে পড়েছি! ফিসফিস করে কে বললে—"কে যেন কাঁদছে!"

"কাঁদছে না গান গাইছে!" বলে উঠল আভাই।

বেষ্টা বললে—"গোঙাচ্ছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।"

জটী বললে—"জল পড়ার শব্দ নয় ত!"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর সবাই বুঝতে পারলাম। জলই পড়ছে, হুড়হুড় করে জল পড়ছে কোথায়, সেই শব্দটা গলির ভেতর দিয়ে পাক খেতে খেতে আসছে বলে কান্না, গান বা গোঙানির মত শোনাচ্ছে। তখন আমরা টের পেলাম যে জল প্রায় কোমর পর্যন্ত পৌঁছেছে। কতক্ষণ যে আমরা কোমর জলে হাঁটছি তাও খেয়াল করিনি।

সামনে আছে বেষ্টা, ও আমাদের সকলের চেয়ে লম্বা। ওর কাঁধের ওপর জল উঠলে আমরা ডুবব। সবচেয়ে ছোট আভাই, ওটার তখন কি দশা হবে!

"আরও খানিকটা যাওয়া যাক, তারপর ফিরব" বলে বেষ্টা এগতে লাগল।

আমি বললাম—"আভাই, আমার কাঁধটা ধর।"

আভাই বললে—"চল না, আমি একটু একটু সাঁতার জানি।"

আর বেশী যেতে হোল না। বেষ্টা চেঁচিয়ে উঠল—"ঐ দেখ্!"

সবাই দেখতে পেলাম তীরের মত আলো, খানিকটা সামনে জল চকচক করছে। মনে হোল, আলোটা যেন ছাত ফুটো করে এসে পড়েছে।

আলোর তলায় পৌঁছবার জন্যে ডবল জোরে পা চালালাম।

খানিকক্ষণ সেই ফুটোটার পানে তাকিয়ে থেকে বেষ্টা হুকুম দিলে—"জটীদি, ঐ ফুটোর ভেতর দিয়ে গুলি চালাও।"

শ্বাস বন্ধ করে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। বিকট আওয়াজ হোল দু'বার, বাইরে খোলা আকাশের তলায় গুলি ছুঁড়তে যে রকম আওয়াজ হোয়েছিল, সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে তার একশ' গুণ জোরে আওয়াজ হোল। গুম্‌গুম্ করে ঘুরতে লাগল আওয়াজটা অনেকক্ষণ ধরে। তারপর শোনা গেল, সেই ফোকরের মুখ থেকে নামল কথা কটি—"তোমরা কোথায়?"

প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল জটী—"এই যে এখানে।"

সতুও চেঁচিয়ে উঠল—"ঠিক নিচে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আপনি কি বিলুবাবু?"

জবাব মিলল—"হাঁ, আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি।"

তারপর বিশু কথা বললে—"একটা ইঁদারার ভেতর রয়েছি আমরা, উদ্ধার পাবার উপায় দেখছি না।"

বেষ্টা বললে—"খুঁড়ে ফেল। তোর কাছে ছুরি আছে তো, তাই দিয়ে কোনও রকমে বড় কর না ঐ ফোকরটা, তাহলেই তো আমাদের কাছে নেমে পড়তে পারবি।"

বিলুবাবুর গলা শোনা গেল—"সেই চেষ্টাই করছি আমরা। জানতাম না যে এর নিচে কি আছে। তোমরা সরে দাঁড়াও একটু। তোমাদের মাথায় কিছু পড়তে পারে।"

জটী বললে—"তোমরা সরে দাঁড়াও। আমি গুলি চালাব। এখনও অনেকগুলো টোটা রয়েছে। গুলি চালিয়ে ঐ জায়গাটা আমি ফাটিয়ে ফেলছি।"

বিলুবাবু বললেন—"বেশ! আমরা সরে দাঁড়াচ্ছি, আগে সেই চেষ্টাই কর।"

তারপর সেই আওয়াজ। উঃ সে কি উৎকট কাণ্ড! দু'কানে আঙ্গুল গুঁজে দিয়েও আমাদের কানগুলো রক্ষা পেল না। জটীর যেন কান নেই, গ্রাহ্যই নেই আওয়াজকে। অনবরত টোটা পুরতে লাগল আর ছুঁড়তে লাগল। তারপর পড়ল এক চাঙড় জলের ওপর, ছিটকে উঠল জল। আরও কয়েকটা গুলি করবার পরে বেশ বড় এক চাঙড় পড়ল। অনেকটা আলো এসে ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে। জটী থামল। ওপর থেকে বিলুবাবু বললেন—"আর দরকার নেই। আমরা গলতে পারব। কিন্তু কতটা নিচে পড়তে হবে?"

সতু বললে—"কোমর সমান জল এখানে। আগে ঝুলে পড়ুন, তারপর হাত ছেড়ে দিন।"

"আগে বিশুকে নামাচ্ছি, তোমরা ধরে নাও" বলে বিলুবাবু সরে গেলেন।

তারপর বিশুর পা দুটো ঝুলে পড়ল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আস্ত বিশুটাকে। বেষ্টা চিৎকার করে উঠল—"রেডি!"

সঙ্গে সঙ্গে বিশু পড়ল ঝপাং করে, বেষ্টা তাড়াতাড়ি আঁকড়ে ধরলে।

এক মিনিট পরে বিলুবাবুও সেইভাবে ঝাঁপ দিলেন।

তারপর ভন্টাকে উদ্ধার করার পালা।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সেই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে

এলাম। তা' পৌনে এক ঘণ্টা আন্দাজ লাগল। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে পৌঁছলাম যখন আবার খোলা আকাশের তলায় তখন মনে দ্বিগুণ জোর হোয়েছে। এখন ভন্টাকে খুঁজে পেলেই হয়।

বিলুবাবু বললেন—"চল, আগে সেইখানে যাওয়া যাক। যে গর্তে ভন্টা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার মধ্যেই আমাদের নামতে হবে। যে জীবটাকে জটী গুলি করেছে, সেই আমাদের ফ্যাসাদে ফেলেছিল। ভন্টাকেও নিশ্চয়ই সে কোথাও আটকেছে। মারবে না সে, মারবার ইচ্ছে থাকলে আমাদের মেরে ফেলত।"

সতু জিজ্ঞাসা করল—"সেটা কি?"

বেষ্টা বললে—"সে সমস্ত পরে শোনা যাবে। এখন গল্প শোনার সময় নেই। আগে ভন্টাকে পাওয়া যাক।"

বিশু বললে—"আমার জামাটাও খুঁজতে হবে তারপর।"

আভাই জিজ্ঞাসা করলে—"অমনভাবে পাঁকমাখা হোল কেন জামাটা?"

বিলুবাবু বললেন—"সে অনেক কথা, পরে সব বলব।"

বিশু একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বললে—"তাহলে জামাটা তোরা দেখতে পেয়েছিস! যাক বাবাঃ—"

"সাট্ আপ্!"—হুংকার দিয়ে উঠল বেষ্টা। অগত্যা আবার সব চুপ। মুখ বুজে আমরা ওকে ফলো করলাম।

ভেঁক্ ভেঁক্ ভেঁক্।

একটু পরে আবার ভেঁক্ ভেঁক্ ভেঁক্।

হতভম্ব হোয়ে দাঁড়িয়ে আমরা শুনতে লাগলাম—ভেঁক্ ভেঁক্ ভেঁক্। অনবরত ভেঁক্ ভেঁক্, আধ মিনিট অন্তর ঠিক তিনবার করে আওয়াজ হোচ্ছে।

চোখ দুটো বড় বড় করে জটী বললে—"আমাদের গাড়িতে না!"

তৎক্ষণাৎ বিলুবাবু দৌড়তে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। বিশু আর জটী শুধু হেঁটে আসতে লাগল।

অনেক আগে থেকে বেষ্টা চেঁচাতে লাগল—"ভন্টা ভন্টা..."

ভেঁক্ ভেঁক্ আওয়াজটা বন্ধ হোল। পদ্মবিলের ধার দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে দূরে আমরা গাড়িখানাকে দেখতে পেলাম। কই ভন্টা! কেউ তো নেই।

বিলুবাবু বললেন—"ঐ যে! ঐ যে কি একটা নাড়ছে গাড়ির ভেতর থেকে।"

বেষ্টা চেঁচাচ্ছে—"ভন্টা ভন্টা, ভন্টা সাড়া দে!"

আরও কাছাকাছি পৌঁছে আমরাও দেখতে পেলাম। গাড়ি থেকে হাত বার করে কে যেন একটা কাপড় নাড়াচ্ছে।

তারপর আমরা গাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম।

ভন্টা পেছনের সীটে শুয়ে আছে, ওঠবার শক্তি নেই। ওর বাঁ পাখানা, মানে পায়ের পাতা থেকে গোছ পর্যন্ত ফুলে ঢোল, না না। ঢোল নয়, এই ছোটখাট লাউয়ের মত হোয়ে উঠেছে।

প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় আভাই বললে—"কি করে হোল র‍্যা?"

বেষ্টা সর্বশেষ হুকুমটি সবচেয়ে চেঁচিয়ে উচ্চারণ করলে—"সাট্ আপ্! এখন কোনও কথা নয়, আগে আমরা এই শয়তানের আড্ডা থেকে পালাই।"

গরম গরম কচুরি শিঙাড়া আর জিলিপি এক ঠোঙা করে আমাদের প্রত্যেকের হাতে, রাক্ষসের মত আমরা চিবুচ্ছি। প্রথম যে শহরটা পাওয়া গেল সেখানে একটা হালুয়াইয়ের দোকান থেকে ওগুলো কিনলেন বিলুবাবু। তারপর শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চর্বণ শুরু হোল। ভন্টা বেচারার চিবুবারও শক্তি নেই। ওর জ্বর এসে গেছে। ঠোঙাটা হাতে নিয়ে বললে—"এইবার আপনি শোনান বিলুবাবু, কেন আপনারা চুপচাপ গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলেন।"

বিলুবাবু বললেন—"সাপের মণি দেখতে পেয়েছিলাম বলে।"

"সাপের মণি!" জটী একেবারে হাঁ হোয়ে গেল।

একমুখ শিঙাড়ার ভেতর থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বার করলে বিশু। যা বললে তার এক বর্ণও আমরা বুঝতে পারলাম না। ধীরেসুস্থে চিবুতে চিবুতে বিলুবাবু তখন ব্যাপারটা আমাদের শোনালেন।

বিলের ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিশু আর বিলুবাবু জেগে বসেছিলেন। ওদের মাঝখানে বসে জটীও আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর বিশু দেখতে পেল সাপের মণি, বেশ খানিকটা সামনে মাটির ওপর কি যেন একটা জ্বলছে। জ্বলছে মানে ভোরবেলার শুকতারার মত আলো বেরুচ্ছে সেটা থেকে। আর একটা সাপ ফণা ধরে দাঁড়িয়ে সেই জিনিসটার পাশে দুলছে।

হাত বাড়িয়ে বিলুবাবুর হাঁটুতে একটা চিমটি কাটল বিশু, তখন বিলুবাবুও দেখলেন। তারপর ওঁরা নিঃশব্দে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। তৎক্ষণাৎ মতলব ঠিক হোয়ে গেল। নামল গিয়ে বিশু পদ্মবিলে, জামাটা খুলে জামায় করে পাঁক নিয়ে এল। উদ্দেশ্য—দূর থেকে মণিটার ওপর
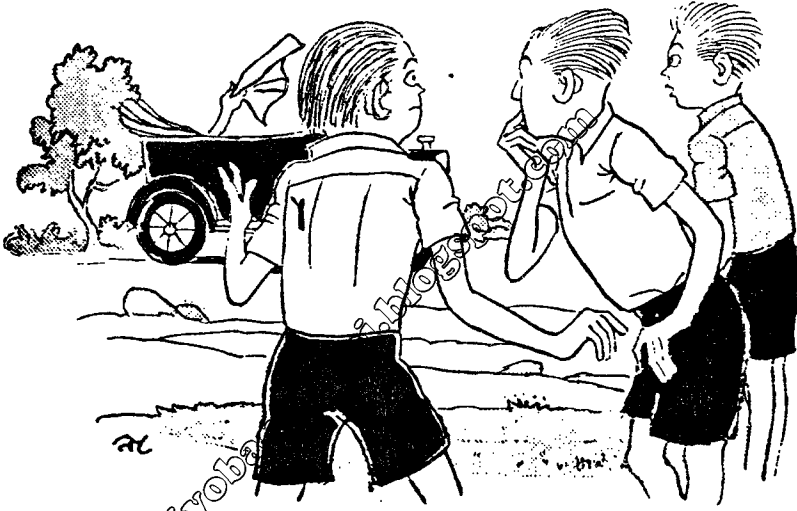
কে যেন একটা কাপড় নাড়াচ্ছে।

খানিকটা পাঁক ছুঁড়ে ফেলবে। তাহলেই মণিটা ঢাকা পড়ে যাবে। তারপর সাপ বেচারা মণিহারা ফণী হোয়ে তর্জনগর্জন করে নিশ্চয়ই স্বস্থানে প্রস্থান করবে। তখন ওঁরা মণিটিকে হাতাবেন।

হায় কপাল! পাঁক এসে গেছে, দু'হাতে করে খানিকটা নিয়েছেন বিলুবাবু, এবার সেই মণির ওপর ছুঁড়ে ফেলতে পারলেই কিস্তিমাত হয়। হঠাৎ সাপটার মাথায় শয়তানি চাপল। মণিটাকে মুখে পুরে সরসর করে সরে পড়ল।

ওঁদের ঘাড়ে তখন ভূত চেপে বসেছে—মণিভূত। কাউকে না জাগিয়ে সেই পাঁক নিয়ে ওঁরা সাপের পিছে ধাওয়া করলেন। দু'তিনবার সাপটা মণিটাকে বার করল তার মুখের ভেতর থেকে, মণির পাশে খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়ে ফণা ধরে মাথা দোলাতে লাগল। যেই ওঁরা কাছাকাছি গেছেন পাঁক নিয়ে অমনি খপ করে মণিটাকে মুখে পুরে রওয়ানা। এই করতে করতে ওঁরা গিয়ে পৌঁছলেন সেই বাড়িটার উঠোনে। সাপটাও যেন উধাও হোয়ে গেল। খোঁজ খোঁজ, কোথা গেল সাপ। সাপ খুঁজতে খুঁজতে সেই অন্ধকারের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন ওঁরা। কোথা দিয়ে যে কোথায় গিয়ে পড়লেন, সে খেয়াল নেই। হুঁশ হোল বিতিকিচ্ছি জাতের হাসি কানে যেতে। তখন অন্ধকারটা ফিকে হোয়ে উঠেছে। সেই আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলেন যমদূতের মত এক বিকট চেহারা ওঁদের পানে এগিয়ে আসছে।

তখন ওঁরা দৌড়তে শুরু করলেন। ওঁরা দৌড়ন আর সেই দানব লাফ দেয়। তার যদি ইচ্ছে হোত তাহলে ওঁদের দুজনকে দু'হাতে ধরে আছড়ে মেরে ফেলতে পারত! কিন্তু সে রকম একটা বদ মতলবই ছিল না তার মনে। সে যেন তামাশা জুড়ে দিলে, ওঁরা দু'জন প্রাণপণে ছুটে কয়েক হাত এগিয়ে যান, সেই দানব তখন একটি লাফ দেয়। এক লাফে একেবারে ওঁদের পেছনে এসে নামে। হাত বাড়িয়ে ধরলেই হয় তখন, তা নয়। শুধু সেই উৎকট হাসি, ওঁদের পেছনে পৌঁছেই হাসি জুড়ে দেয়। আবার ওঁরা ছুটতে থাকেন, আবার সে এক লাফে ওঁদের পেছনে পৌঁছয়।

এই প্রাণান্তকর খেলা যে কতক্ষণ চলেছিল তা বিলুবাবু ঠিক বলতে পারলেন না। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হোয়ে ওঁরা দৌড়চ্ছেন। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ পড়লেন সেই শুকনো ইঁদারায়। ইঁদারার মুখটা কে কবে তক্তা পেতে ঢেকে দিয়েছিল। তক্তার ওপর জমেছিল ধুলোবালি, দুই মূর্তি তার ওপর উঠতেই সেটা মড়মড় করে ভেঙে নেমে গেল। খুব বেশী চোট পেলেন না ওঁরা সেই কাঠগুলোর সঙ্গে নামবার জন্যে। কিন্তু উদ্ধারের আর কোনও আশা রইল না।

কি আর করবেন তখন বেচারারা! সেইখানেই বসে রইলেন আর সেই তক্তা ঠুকে ভট্ ভট্ আওয়াজ করতে লাগলেন।

জটী জিজ্ঞাসা করল—"কার্বলিকটা কোথায় ছড়িয়েছিলে?"

"বোতলটা যে কখন কোথায় পড়ে গেল"—বলতে বলতে বিলুবাবু চুপ করলেন।

আভাই প্রায় চুপি চুপি উচ্চারণ করলে—"সেটা যে কি জানোয়ার তা' মোটে বোঝাই গেল না।"

ভন্টা বললে—“বিরাট একটা বনমানুষ। আমি তাকে কাছ থেকে দেখেছি।”

বিশু বললে—“বনমানুষ মানে গরিলা। গরিলা আফ্রিকায় পাওয়া যায়। ওখানে গরিলা আসবে কোথা থেকে?”

বেন্টা গর্জন করে উঠল—“সাট্ আপ্! তা জানবার জন্যে আমাদের ঘুম হোচ্ছে না। আলবাত গরিলা, আমরা তার সেই ভয়ংকর চোখ দুটো দেখেছি।”

জটী বললে—“ঠিক দুটো চোখের মাঝখানে নল ঠেকিয়ে আমি ফায়ার করেছিলাম।”

ভন্টা বললে—“আর একটু হোলেই সেটা পড়েছিল আমার ঘাড়ে। ভাগ্যিস আমি এক ধারে সরে গিয়েছিলাম।”

আমি বললাম—“সেটা তো আগেই পড়েছিল সেই গর্তে, তাই আমরা মাত্র দুটো পায়ের ছাপ দেখেছিলাম।”

বিশু বললে—“ওর ঐ বদ স্বভাব, মোটে হাঁটতে পারে না। এক জায়গায় দু'পারে খাড়া হোয়ে উঠে লাফ দেয়।”

ভন্টা বললে—“লাফই দিয়েছিল। লাফ দিয়ে পড়েছিল সেই গর্তে। আমি বেচারা আচমকা হড়কে নেমে গেলাম। মানে পায়ের তলা থেকে আলগা ইঁটপাটকেল সরে গেল। পড়লাম তার ঘাড়ে। জানোয়ারটার তখন খুবই যন্ত্রণা হোচ্ছে। বেচারা কাতরাচ্ছিল। আমার হাতে ছুরি ছিল, কিন্তু—”

“ছুরি মেরেছিলি তাকে!” আভাই আঁতকে উঠল।

ভন্টা বললে—“আমি কাপুরুষ নই। আহত শত্রুকেও আমি আঘাত করি না। ছুরি হাতে করে ছোট্ট একটু জায়গায় গিয়ে আমি গুড়ি মেরে বসে রইলাম। সে কাতরাতে লাগল। তারপর তোরা পাথরবাঁধা দড়িটা নামিয়ে দিলি। দড়িটা সে আঁকড়ে ধরলে দু'হাতে। তারপর টানের চোটে একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগল। হঠাৎ দুই আওয়াজ—গুড়ুম গুড়ুম। সঙ্গে সঙ্গে নামতে লাগল নিচে সেই বিরাট লাশ। নামল ঠিক আমার পাশে। তখন সব শেষ হোয়ে গেছে। তারপর গলা চিরে চেঁচাতে লাগলাম। কে শোনে!”

আভাই বললে—“আমাদের টর্চের আলো দেখতে পেলি না তুই? আমরা দড়িতে টর্চ বেঁধে গর্তের ভেতর নামিয়ে দিয়েছিলাম তো।”

ভন্টা বললে—“দেখেছিলাম একটু একটু। চেঁচিয়েও ছিলাম প্রাণপণে, তোরা যে শুনেও শুনলি না।”

জটী বললে—“হায় ভগবান! আমাদের মনে হোল সেই জানোয়ারটা যেন গোঙাচ্ছে।”

বিলুবাবু বললেন—“অনেক নিচে থেকে ভন্টাবাবুর গলা ঐ রকমই শোনাচ্ছিল। তোমাদের দোষ নেই।”

এতক্ষণ পরে আমাদের ক্যাপ্টেন দস্তরমত ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে—“তা তুই কি করে রক্ষা পেলি ভাই? উঠে এলি কেমন করে?”

খুবই একটা শুকনো হাসি হেসে ভন্টা জবাব দিলে—“এই পা দুখানা আর হাত দুটোর জন্যে। সেই গর্তটার গা বেয়ে একটু একটু করে উঠতে লাগলাম। খাঁজে খাঁজে পা দুখানা ঢুকিয়ে দিলাম। তাই তো এই দশা হোল। হাতের অবস্থাও দেখ।”

ওর হাত দুখানা ধরে ক্যাপ্টেন দেখতে লাগল। দু'হাতের সব কটা আঙুলের মাথায় দগদগে ঘা হোয়ে গেছে!

সেই থেকে বড়লোক হওয়ার জন্যে আমরা আর চেষ্টা করি না। শ্যামাপূজার পরে আবার একটা সভা বসেছিল। মাখনচাকের কথাটা উঠতেই আভাই বলে বসল—“আবার! যেতে দে যেতে দে। উড়ুক বাটারফ্লাইরা, প্রাণভরে পাখা মেলে উড়ে বেড়াক। উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।”

প্রথম মহাকাশচারী

শ্রীবিমলেন্দু দাশগুপ্ত

ওয়ান-হু চেয়ারে গিয়ে বসল।

বন্ধু লিন-পিংকে পেয়ে ওয়ান-হুর খুব আনন্দ হল। লিন-পিং তার শৈশবের বন্ধু, একসঙ্গেই তারা পড়াশুনা করেছে। পাঠ্যাবস্থা শেষ হতে লিন-পিংকে শহরে তার বাবার কাছে যেতে হয়েছে ব্যবসার কাজ দেখাশুনা করার জন্য। ওয়ান-হু গ্রামেই রয়ে গেছে। সে জমিদারের ছেলে, বাপ মারা যেতে এখন নিজেই জমিদার। ব্যবসার কাজে লিন-পিংকে অনেক জায়গা ঘুরতে হয়েছে, চীনের সব বড় বড় শহরগুলো তার ঘোরা হয়ে গেছে। রাজধানীতে গিয়ে সম্রাটের দরবার পর্যন্ত সে দেখে এসেছে। সম্রাটের মেয়ের বিয়েতে আতশবাজি পোড়ানোর চমৎকার দৃশ্যের কথা সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ওয়ান-হুকে বলছিল। তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে হঠাৎ ওয়ান-হু বলে উঠলঃ বন্ধু, ক্ষমা করো, তোমার কথায় বাধা দিলাম। মানুষ অনেক সময়ই এমন অনেক কাজ করে যার প্রকৃত তাৎপর্য সে বুঝতে পারে না। আমোদ-প্রমোদটাই বড় নয়, যাতে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হয় এমন কাজই সকলের করা উচিত।

লিন-পিং বন্ধুর এই খাপছাড়া ব্যবহার ও রহস্যময় কথার কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওয়ান-হু তার মুখের ভাব দেখেই মৃদু হেসে আবার বললঃ বুঝলে না, না? বেশ, চলো আমার লাইব্রেরী ঘরে, সব বুঝিয়ে বলছি।

ওরা লাইব্রেরীতে এসে বসল। ওয়ান-হুর আদেশে একটি সপ্তদশী অপূর্ব সুন্দরী তরুণী একটি মদের পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ঃ এই নাও বন্ধুর প্রতি বন্ধুর প্রীতিপূর্ণ উপহার।—এই বলে ওয়ান-হু ইঙ্গিত করল তরুণীটিকে লিন-পিংকে মদ দেবার জন্য।—আমার নিজের ক্ষেতের আঙ্গুরের মদ সারা তল্লাটের সেরা জিনিস। তেমনি এ অঞ্চলের সেরা সুন্দরী হল এই চিং চেং; ওকে ওর বাবার কাছ থেকে আজই আমি কিনেছি একটা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে। আশা করছি আমার বাড়ি থেকে চলে যাবার পরও এ দুটো জিনিসের স্মৃতি তোমার মনে অনেকদিন জেগে থাকবে।
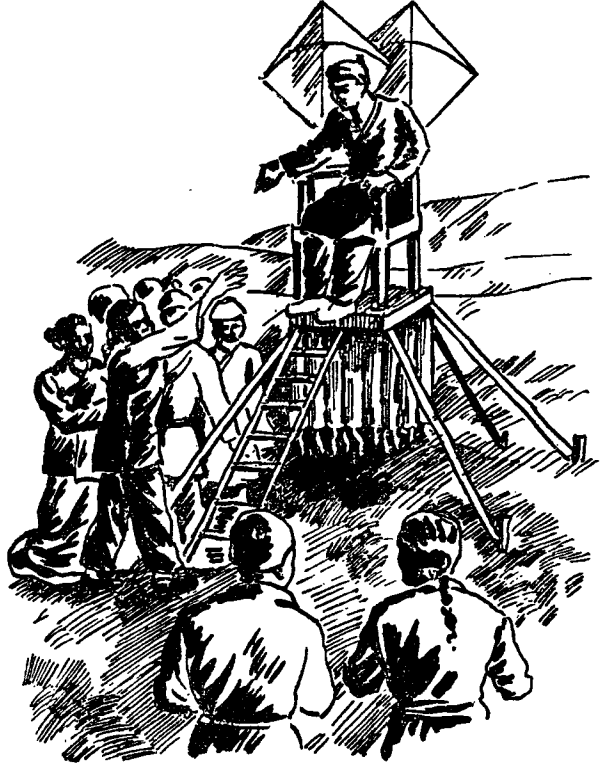
উত্তরে লিন-পিং বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মদের গ্লাস তুলে নিল।

ওয়ান-হু এমনিতে লোকটি খুবই ভালো। যেমন বিনয়ী তেমনি দয়ামায়াও আছে প্রাণে, আবার বিদ্যানুরাগও প্রবল। নিজের বাড়িতেই সে একটা বড় লাইব্রেরী করেছে দেশবিদেশ থেকে বই সংগ্রহ করে। অবসর সময়টা সে ফানুস উড়িয়ে কিংবা প্রজা ঠেঙিয়ে নষ্ট করে না। বরং লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনা করাতেই সে আনন্দ পায় বেশী। আর বন্ধুবান্ধবদের বলে যে, সে শীগগিরই এমন কিছু আবিষ্কার করবে, যাতে তার নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বন্ধুরা কেউই ওর কথা বিশ্বাস করে না।

লোকে বলে বেশী পড়াশুনা করার ফলে ওর মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে, এবং সেই মাথা খারাপের লক্ষণ এই একটি বিষয়েই প্রকাশ হতে দেখা যায়, যে বিষয় নিয়ে ওরা দুজনে একটু আগে আলোচনা করছিল। ওয়ান-হু সেইজন্যই বসবার ঘর থেকে সরে এসে লাইব্রেরীতে বসল এবং সে ঘরের মধ্যে এই নতুন বাঁদী ও লিন-পিং ছাড়া আর কাউকে থাকতে দিল না। কারণ পুরনো দাস-দাসীদের কারো কানে যদি এই আলোচনার কথা যায়, তবে সে

ছুটতে ছুটতে গিয়ে গিন্নীমাকে খবরটা দেবেই দেবে। তখন গিন্নীমা অর্থাৎ ওয়ান-হুর স্ত্রী এসে সমস্ত কিছু ভণ্ডুল করে দিয়ে যাবে। এমন হয়েছে বহুবার। যার ফলে ওয়ান-হু এই বিশেষ বিষয়টি সম্বন্ধে বেশী পড়াশুনা বা বিশদ আলোচনা করার সুযোগ পায় না। ফুকিয়েনের সেই প্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞ গণনা করে বলেছেন, যদি ওয়ান-হু এই বিশেষ বিষয়ে কোনদিন আলোচনা করে, তাহলে তার মাথায় বজ্রাঘাত হবে। কারণ, ভগবান্ চান না কেউ তাঁর রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করুক। দৈবজ্ঞের এই ভবিষ্যৎ কথনের পর থেকেই এই অবস্থা চলছে।

আজ সুযোগ পেয়ে ওয়ান-হু লাইব্রেরী ঘরে বসে বন্ধুর সঙ্গে তার প্রিয় বিষয়টি নিয়ে মনের আনন্দে আলোচনা করতে থাকে। একে একে সে তার মনের অন্দরে গোপন রাখা কথাগুলো বন্ধুকে শোনাতে থাকে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ওয়ান-হু মৃদুস্বরে বলেই যেতে থাকেঃ আজ না হোক, আমার কথা একদিন-না-একদিন সার্থক হবেই। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই সুন্দর দিনটির ছবি, যখন মানুষ এতে চড়ে দূরদূরান্তে চলে যাবে চোখের নিমেষে। পথ পর্যটনের এত দুঃখ, এত কষ্ট সব দূর হয়ে যাবে।

ওয়ান-হুর কথাবার্তা ও আচার-আচরণ প্রথম থেকেই লিন-পিংয়ের কাছে কেমন যেন অস্বাভাবিক ও হেঁয়ালিপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। তাই সে এখন আর থাকতে না পেরে বলে উঠলঃ বন্ধু, এভাবে আকাশে প্রাসাদ গড়ে কি লাভ? অসম্ভব আশা আর মরীচিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; ওদের এড়িয়ে চলতে হয়।

ওয়ান-হুর সঙ্গে সঙ্গে মাথা গরম হয়ে উঠল। কারণ লিন-পিং যা বলল, একথা সে এর আগে বহু লোকের মুখে শুনেছে; অনেক বিদ্রূপ ও উপহাসও সয়েছে এজন্য। সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলঃ অসম্ভব আশা? কে বলল তোমায় এটা অসম্ভব? আমি হাতেকলমে তোমার সামনে প্রমাণ করে দেব যে, আমি যা বলেছি তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। আমি প্রমাণ করে ছাড়ব।

লিন-পিং হেসে বললঃ থাক থাক, তোমায় কিছু প্রমাণ করতে হবে না। আর পাগলামো করো না।

যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল লিন-পিংয়ের এই কথায়। ওয়ান-হু আরো রেগে বলে উঠলঃ পাগলামো? তুমি পাগলামো বলছ? তার মানে আমাকে তুমি পাগল বললে। সকলেই আমাকে তাই বলে। আড়ালে হাসে। এ অসহ্য হয়ে উঠেছে—এর একটা হেস্তনেস্ত আমায় করতেই হবে। বলতে বলতে ওয়ান-হু উঠে দাঁড়াল যাবার জন্য। লিন-পিং সঙ্গে সঙ্গে ওয়ান-হুর মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিতভাবে উঠে দাঁড়াল ও বাধা দিয়ে বললঃ একি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

ঃ যাচ্ছি একটা কাজে। ওয়ান-হু গম্ভীরস্বরে বলল।—তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না, আর—আর তোমার সঙ্গে আমার যে আলোচনা হল, এর কথা বাড়ির কাউকে বলবে না। বলো—কথা দাও! বলতে বলতে ওয়ান-হু বন্ধুর দুটি হাত জড়িয়ে ধরে কাতরনয়নে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

লিন-পিংকে বন্ধুর কাতর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সাড়া দিতে হল। তাছাড়া সে তো জানত না ফুকিয়েনের সেই প্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী, কি করে বুঝবে সে, তার এই কাজের ফলেই ওয়ান-হুর জীবনের উপর নেমে আসবে অকালে ভগবানের রুদ্ররোষ? তাই সে যখন ওয়ান-হুকে প্রতিশ্রুতি দিল, এটাকে সম্পূর্ণ মদের ঝোঁক মনে করেই দিয়েছিল। তারপর যখন ওয়ান-হু ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আর সারাদিনে তার সঙ্গে দেখা করল না, তখনই তার মনে একটা খটকা দেখা দিল। খোঁজ নিয়ে জানল ওয়ান-হু বাড়ি নেই, কোথায় গেছে কাউকে বলে যায়নি। এক দিন, দু'দিন কেটে গেল—ওয়ান-হুর পাত্তা নেই। লিন-পিংয়ের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। এ কি পরীক্ষার মধ্যে পড়ল সে! তার মন বলছে একটা ভীষণ কিছু, একটা ভয়ানক কিছু ঘটতে চলেছে, আর সেজন্য দায়ী সে নিজে।...তাহলে—তাহলে কি ওয়ান-হু যা মুখে বলেছে সেটাই করে দেখাবে? সেইজন্যই—তার ব্যবস্থা করার জন্যই কি সে গেছে? অন্ধকার রাতের আকাশে যে আতশবাজির আলোকচ্ছটা দেখে তারা মুগ্ধ হয়—সম্রাটের মেয়ের বিয়েতে সে যে বাজির অপূর্ব প্রদর্শন দেখে এসেছে, সেই বাজি ওয়ান-হুকে নিয়ে যাবে আকাশে দেবতাদের মত। দেবতাদের মতই ওয়ান-হু হবে নভশ্চারী? না না, কি অসম্ভব কল্পনা করছে সে।—ভাবল লিন-পিং।

তিন দিনের মাথায় ওয়ান-হু বাড়ি ফিরে এলো হাসিমুখে। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। বাড়ি ফিরল বটে ওয়ান-হু, কিন্তু ভিতরে ঢুকল না। খবর দিয়ে সে সকলকে বাড়ির সামনে প্রশস্ত মাঠে জড়ো হতে বলল। তার অনেকদিনের স্বপ্নকে সে আজ সফল করবে। ওয়ান-হু সঙ্গী লোকের মাথায় একটা বিরাটকায় অদ্ভুত চেয়ার এনেছিল। চেয়ারের তলদেশে ৪৭টা লম্বা মুখবন্ধ চোঙ লাগানো এবং প্রত্যেকটি চোঙ থেকে একটি করে সলতে বেরিয়ে রয়েছে। চেয়ারের মাথায়

সূক্ষ্ম কাপড়ে তৈরী দুটি বড় ঘুড়ি শক্ত করে বাঁধা আছে। খবর পেয়ে ওয়ান-হুর স্ত্রী পাগলিনীর মত ছুটে এলো, তারপর স্বামীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সাশ্রুনয়নে ও করুণস্বরে তাকে এ কাজ করতে মানা করতে লাগল।

কিন্তু শত কান্নাকাটি অনুনয়বিনয় ওয়ান-হুকে তার সংকল্প থেকে টলাতে পারল না। সে নীরবে এই কান্নারোলের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ করতে থাকে। নিজের কর্মচারীদের মধ্য থেকে পাঁচজন দক্ষ লোক সে বেছে নিল সহকারী হিসাবে। তাদের একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে সে কয়েকটি কাজের কথা বুঝিয়ে দিল। সব কাজ চুকে যেতে, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ওয়ান-হু চেয়ারে গিয়ে বসল। তারপর লিন-পিংকে লক্ষ্য করে সে বললঃ বন্ধু, তুমি কেন মুখখানি এতটুকু করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার তো কোন দোষ নেই। এ কাজে যে বিরাট ঝুঁকি আছে, আমার থেকে তা ভাল আর কে জানে এখানে? তবু আমি সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে এই ঝুঁকি মাথায় নিয়েছি। অনেক ভেবেচিন্তেই নিয়েছি। ভেবে দেখলাম, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, মূর্খের উপহাস ও বিদ্রূপ-কণ্টকিত জীবন যাপন করতে হবে আমায়। না, আমি তা পারব না। তোমরা আমায় পাগল বলো আর যাই বলো, এ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া ভেবে দেখো, আমি যদি সফল হই, তাহলে সারা পৃথিবীর লোক আমায় স্মরণ করবে সকৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল। বীরের মৃত্যু সংগ্রামক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়—আমার সংগ্রাম মানুষের বিরুদ্ধে নয়, প্রকৃতির বাধার বিরুদ্ধে।...যদি হেরে যাই, দুঃখ করো না, যদি মরে যাই, কেঁদো না।...

সারা মাঠের লোক নির্বাক্ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে ওয়ান-হুর কথা শুনল। তাদের মনে পড়তে লাগল, কিভাবে এই ভালোমানুষটিকে তারা নিষ্ঠুর বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছে। মুখের উপর উপহাস করেছে কত। যত সেই সব কথা মনে পড়তে লাগল ততই সকলে হায় হায় করতে লাগল।

ওয়ান-হুর নির্দেশে এবার সেই পাঁচজন কর্মচারী জ্বলন্ত মশাল হাতে এগিয়ে এলো। চেয়ারের তলদেশে যে ৪৭টি চোঙ লাগানো ছিল, সেগুলি প্রত্যেকটিই এক-একটি রকেট। এখন মানুষকে দূর দেশে যেতে হলে ঘোড়ায় চড়ে, পায়ে হেঁটে, কিংবা নৌকায় যেতে হয়। তাতে সময় লাগে অনেক, বাধাও অনেক। দূর দেশেব যাত্রী অনেক সময়েই পথে প্রাণ হারায় দস্যু অথবা রোগের আক্রমণে, নাহলে অনাহারে, বিজন কান্তারে হিংস্র পশুর মুখে। এই সব অসুবিধা দূর করা যায়, যদি রকেটের সাহায্যে মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে। যাওয়া সম্ভব। ওয়ান-হু এই কথাই তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞানী-গুণীদের বুঝাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সকলেই পাগলের প্রলাপ বলে তার কথা উড়িয়ে দিয়েছে।

মশালের জ্বলন্ত শিখার সংস্পর্শে রকেটের সলতেগুলো জ্বলে উঠতেই একটা ভীষণ শব্দ ও ধোঁয়ার মধ্যে ওয়ান-হু আকাশে উঠে গেল। তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আলোর ঝলক দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওয়ান-হুর দেহাবশেষ তারপর খুঁজে বার করবার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু পাওয়া যায়নি। নিজের জীবন দিয়ে সেই বিজ্ঞান-পাগল, মানবদরদী মানুষটি প্রমাণ করে গেল, যে আতশবাজি পুড়িয়ে আনন্দময় মুহূর্তকে চিহ্নিত করি আমরা, তারই সাহায্যে মানুষের পক্ষে আকাশভ্রমণ সম্ভব। যদিও কাজটা বিপজ্জনক।

আজ যে রকেটে চড়ে রাশিয়া ও আমেরিকার মহাকাশচারীরা মহাকাশ পরিভ্রমণ করছেন, সেই রকেট আর আমাদের আতশবাজি (হাউই, উড়নতুবড়ি ইত্যাদি) একই জাতের জিনিস। অবশ্য আজকের মহাকাশগামী রকেটের মধ্যে বারুদের বদলে অন্য রাসায়নিক বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, এই হল পার্থক্য। সেকালের রকেটে বারুদ ব্যবহার করা হত এবং চীনারাই এ বস্তুটি আবিষ্কার করেছিল আজ থেকে প্রায় হাজারখানেক বছর আগে। রকেটের ব্যবহার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক এদের কাছ থেকে শিখেছিল। এমন কি রকেটে চড়ে যে আকাশে ওঠা যায়, এই চিন্তাটা প্রথমে চীনদেশেই দেখা দিয়েছিল; বর্তমান কাহিনীটি তার প্রমাণ। এটি ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ছয়শো বছর আগে।
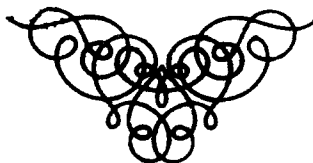
খাসিখেকো বাঁশী রায়

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ক্ষিদে বেশী হওয়া নিশ্চয়ই কোন অভিশাপ।
এক জমিদার তা ভালো করেই বুঝেছিলেন।

বাংলা এটা কত সাল ? এ প্রশ্ন বড়দের করলে অনেকেই জবাব দিতে পারবেন না। ইংরেজী ১৯৪৮ ঠিক মনে আছে, কিন্তু বাংলা ? "তাইত" ব'লে মাথা চুলকোতে দেখবে। কেউ বা হয়ত ব'লে বস্‌বে "১৩৪৮!" তোমাদের মনে থাকা স্বাভাবিক, কারণ বছর হিসেব ক'রে কাগজ নাও। সাল একেবারে মুখস্থ।

আমি আজ বল্‌ব তোমায় ১১০০ সালের কথা—অর্থাৎ আড়াই শো বছর আগেকার ব্যাপার। ক'দিনেরই বা কথা ? হিমালয়ের গহন গুহায় হয়ত এই বয়সের কত সন্ন্যাসী আজও ধ্যানস্থ ব'সে আছেন !

সেদিন কিন্তু কলকাতা ছিল না, ছিল সূতানুটি আর গোবিন্দপুর গ্রাম গঙ্গার ধারে ; মাঝখানে প্রান্তর আর অরণ্য। কালীঘাটের গভীর জঙ্গল অতিক্রম করে আদিগঙ্গা খেয়া-নৌকোয় পার হয়ে ওপারে অনেকখানি দক্ষিণে একখানি গ্রাম ছিল। সেখানে দু-চার ঘর ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস—তার নাম বঁড়শে। সেই বঁড়শেতে এক দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমিদার ছিল—ডাকাত থেকে জমিদার, নাম তার বাঁশী রায়।

আসল নাম ছিল বংশীবদন, প্রজারা বলত—হংশীবদন। ভদ্রলোকের প্রিয় খাদ্য ছিল পাতিহাঁস আর ঠোঁটের গড়নটা অনেকটা হাঁসের মতন। কালক্রমে সংক্ষেপে হয়ে গেল বাঁশী রায়।

যাক্, সেই বাঁশী রায় ত খেয়েই ফতুর! চার দিস্তে লুচির সঙ্গে সাড়ে বারোগণ্ডা কড়া পাকের সন্দেশ তার সকাল বেলার 'প্রাতরাশ'! আট কুন্‌কে চালের ভাত এক বেলার আহার!

এমন করে খেলে কি রাজস্ব দেওয়া যায় ? রাজস্ব বাকী পড়লো, নবাবের পেয়াদা এসে ধরে নিয়ে গেল। সেখানে নজরবন্দী করে রাখা হলো বাঁশী রায়কে, রাজস্ব না দিলে ছাড়া হবে না।

হাজার হোক্ জমিদার মানুষ, তার আহার্য্যের ব্যবস্থা ত করতে হবে! সদব্রাহ্মণ দুবেলা পোলাও-কালিয়া রেঁধে দিয়ে যায়, কিন্তু পরিমাণ ত বঁড়শের মতন হয় না! বাঁশী রায় দু'কুন্‌কে চালের পোলাও-এর সঙ্গে সের-দুই মাংস খেয়ে ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে।

বাড়ীর সামনে খানিকটা বাগান আছে, সেখানে পায়চারী করতেও ভয় হয়, যদি আরো ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়! একে ত এই যন্ত্রণায়ই অস্থির। চুপচাপ বসে ভাবে—

নবাবের পনেরো সেরী আর আধমণী দুটি খাসি নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করে। নবাবের খাসির গায়ে হাত দেয় এত সাহস কার ? আসে তারা বাঁশী রায়ের জানালার কাছে। সেই নধর দেহগুলি দেখে বাঁশী রায়ের জিভে জল আসে।

একদিন দুর্দ্দমনীয় লোভ আর সাম্‌লাতে পারে না, পনেরো সেরীটিকে ধরে ছ্যাডাং করে দেয়। তারপর তার মাংসটি কয়েক গরাসে শেষ করে (রেঁধে নিয়ে অবশ্য), চুপচাপ বসে থাকে। যেন কিছুই জানে না!

নবাবের কাছে খবর যায় পনেরো সেরীকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে যে সব রাখাল ছেলেরা ব্যাপারটা দেখেছে তারা ছড়া বাঁধে—

"খাসিখেকো বাঁশী রায়ের—
এবার হবে ফাঁসি,
বাসি মাংস হাসি মুখে
আমরা খাব মাসী!"

প্রাসাদের অলিন্দ থেকে নবাব শুনতে পায় চাষী ছেলেরা গান ধরেছে—

"বন-পলাশীর মাঠে—
ছ্যাডাং ড্যাডাং
ছ্যাডাং ড্যাডাং
খাসি কে ঐ কাটে ?
বাঁশী রায়ের কাণ্ড দেখে

ক'সে বাজাই কাঁশি,
খাসিখেকো বাঁশী রায়ের
হবে এবার ফাঁসি!"

আসল কথা, তারা কেউ ভাগ পায়নি বলে চটেছে।

নবাব ত শুনে বাঁশী রায়কে ডেকে পাঠালো। বল্‌লে, "তুমি আমার খাসি খেয়েছ?"

ডাকাত-জমিদার কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারে? সে বললে, "খেয়েছি।"

—"কেন?"

—"বেজায় ক্ষিদে পেয়েছিলো।"

পাত্র মিত্র অমাত্যরা ভাবলে, এবার বুঝি বাঁশী রায়ের গর্দ্দান যায়!

নবাব বল্‌লে, "কাল রাত্তিরে খেয়েছ?"

—"হ্যাঁ।"

—"আমার খাসি খাওয়ার শাস্তি তোমায় পেতে হবে। ভীষণ শাস্তি।"

সবাই ভাবে, নবাব বুঝি এবার বাঁশী রায়ের মাংস খাবে! ছুঁচটি পড়লে শোনা যায় এমন নিস্তব্ধতা!

নবাব গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লে, "কালকের মাংস এখনো হজম হয়নি, আজকে আধমণী খাসিটাকে তোমায় একলা খেতে হবে। একটি টুকরোও ফেল্‌তে পাবে না।"

যে কোনো লোকের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই একটা ভীষণ শাস্তি, মৃত্যুদণ্ডের নামান্তর।

কিন্তু বাঁশী রায় কৃতজ্ঞতায় নবাবকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আর কি! তার দুটোই একসঙ্গে খাবার ইচ্ছে হয়েছিল, সাহসে কুলোয়নি। ভাবলে, ভগবান্ এমন করে মুখ তুলে চাইবেন কে জান্‌ত?

বাঁশী রায় মাংস খেতে বসলো। খানকতক পরোটা, ধরো পঞ্চাশখানা হলে ভালোই হত! নবাবের অনুমতি পাওয়া গেল না, শেষটা ব্রহ্মহত্যা হয়ে গেলে হিন্দু প্রজারা ক্ষেপে উঠবে।

নবাব লোক দিয়ে খোঁজ নিতে পাঠালো, কতটা খাওয়া হয়েছে!

সে এসে খবর দিলে—"তিন ভাগ মেরে এনেছে।"

—"থাম্‌তে বলো, থাম্‌তে বলো।" নবাব উত্তেজিত

"এই পেট তুমি ভরাও কি করে?"

হয়ে উঠলো—"এক্ষুনি পেট ফেটে মরে যাবে!"

তার খাবার জায়গায় নবাবের যাবার উপায় নেই, বাইরে থেকে বল্‌লে—"যথেষ্ট হয়েছে, থামাও।"

তখন সব শেষ করে বাঁশী রায় ঢেঁকুর তুলছে!

সে হাত মুখ ধুয়ে এসে বল্‌ছে, "পেটটা ঠিক ভরলো না!"

নবাব বল্‌লে—"এই পেট নিত্য তুমি ভরাও কি করে?"

বাঁশী রায় বল্‌লে—"ভরাতে গিয়েই ত আপনার রাজস্ব দিতে পারি না, সব টাকাটাই পেটায় নমো হয়ে যায়, এটা আর বুঝতে পারেন না?"

নবাব বুঝতে পারে, কারণ, সেকালের নবাব সে! শুধু সেই বছরের রাজস্বই মাপ হয় না, চিরকালের জন্যে বাঁশী রায়ের জমিদারীর খাজনা মাপ হয়ে যায়।

বঁড়শের প্রজারা তখন গান বাঁধে—

"খাসিখেকো বাঁশী রায়ের
এবার পোয়াবারো—
ছাগল ভেড়া ঘরেতে আর
থাকবে না কো কারো!"

শঠে শাঠ্যং

বন্দে আলী মিঞা

শীতের রাত্রি।

দোকানের মালিক প্রিয়নাথ দোকান বন্ধ কর্‌বার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা—হাড়ে যেন কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়! জানালার শার্শি বন্ধ করবার জন্যে তিনি ঘরের কোণের দিকে সরে গেলেন। সেখান থেকে হঠাৎ ঘরের ভেতরে দৃষ্টি পড়তেই আতঙ্কে তাঁর সমগ্র দেহ শিউরে উঠলো।

দেখলেন, ঘরের মধ্যে একজন অতি-পরিচিত দাগী চোর। যদিও এককালে সত্যই সে চোর ছিল না, এমন কি, অর্থশালী বলে একটা খ্যাতিও তার ছিল। দূর মারবার থেকে ব্যবসা করতে এসে তার এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সে জুয়া-খেলায় এবং রেস-খেলায় মেতে উঠেছিল। ফলে হয়েছিল সর্ব্বস্বান্ত। অবশেষে সে ধরলো এই পথ। যাক্ সে কথা। প্রিয়নাথের মনে সহসা একটা কৌতূহল জাগলো। চোরটার গতিবিধির উপরে নজর রেখে সেখানেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেখলেন, চোরটা শেল্‌ফের কাছে এগিয়ে গেল। শেল্‌ফের উপর থেকে একতাল মাখন তুলে নিয়ে মাথার পাগড়িটা খুলে মাখনের তালটা মাথার টাকের উপরে রেখে পুনরায় আলগাভাবে পাগড়ি চাপা দিল।

এমন বিশেষ কিছু গুরুতর চুরি নয়, যে জন্য প্রিয়নাথকে পথের ভিখারী হতে হবে। চোরটার প্রতি তাঁর কেমন একটা সহানুভূতির মতো ভাব জাগলো! কিন্তু সামান্য একটু কৌতুক করবার লোভ তিনি শেষ অবধি সামলাতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি শার্শিটা বন্ধ করে প্রিয়নাথ ঘরে ঢুকতেই দরজার উপরে চোরের সঙ্গে কপালে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। প্রিয়নাথ বললেনঃ আরে শেঠজী যে, কখন এলে?

চোরটা নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখে-মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। পালাবার উপায় নাই।

—আমার সঙ্গে একটু দেখা করবে বলে এসেছিলে বুঝি? প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করলেন।

শেঠজী যথাসম্ভব স্বাভাবিকতা চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলে আস্তে আস্তে জবাব দিলঃ হ্যাঁ, অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্যে বসে আছি। কিন্তু আর আমি থাকতে পারছি না—কাজ আছে।

শেঠের কথা শুনে প্রিয়নাথ মনে মনে না হেসে পারলেন না। অনেকক্ষণ থেকেই বসে আছো বটে, কেননা, মিনিট পাঁচেক আগেই তিনি কেবল জানালা বন্ধ করতে বাইরে গেছেন। বললেনঃ কিন্তু শেঠজী, দেখতেই পাচ্ছো এটা শীতের সন্ধ্যা, সামনেই ভয়ানক রাত। একটু গরম চা না খাইয়ে তোমায় ছাড়তে কিছুতেই মন সরছে না। বিশেষতঃ, তুমি বহুক্ষণ আমার অপেক্ষায় বসে আছো।

শেঠ অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। কী করবে না করবে—সে ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কিন্তু প্রিয়নাথ তাকে ভাব্‌বার অবসর দিলেন না। বললেনঃ আরে, এসো—এসো,—কী ভাবছো এত? না হয়, একটু দেরীই হবে।

বলে শেঠজীর হাত ধরে সামনে বসিয়ে দিয়ে নিজে ষ্টোভ ধরাতে সুরু করলেন।

ষ্টোভের উপর চায়ের কেট্‌লিটা বসিয়ে বললেনঃ একটু চা খেয়ে চাঙ্গা না হলে এই শীতের রাত্রে বাইরে বের হওয়া মুখের কথা নয়। দু'টো ডিম, দু'খানা টোষ্ট আর দু'কাপ চা করতে কতটুকু সময়ই বা লাগবে!

খানিকক্ষণ বসে থাকবার পরেই শেঠ বুঝতে পারলে আগুনের কাছে থাকায় তার পাগড়ির নীচে থেকে মাখন গলতে আরম্ভ হয়েছে। মনে মনে সে প্রমাদ গুনলে। সে লাফিয়ে উঠে বললেঃ না, না, বড্ডো দেরী হয়ে যাবে। আমি যাচ্ছি।

প্রিয়নাথ বাধা দিয়ে বললেনঃ অত তাড়া কিসের? এই হয়ে এসেছে আর কি!

শেঠ অসহিষ্ণুভাবে পুনরায় বলে উঠলোঃ কিন্তু আমার গরুগুলোকে এখনো খাবার দেওয়া হয়নি কিনা! তা ছাড়া

অনেকটা দূর যেতে হবে, পথে এক বন্ধুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে। কাজেই এখন না উঠলে আমার চলবে না—না হয় আর একদিন আসবো।

প্রিয়নাথ বললেনঃ আর বেশী দেরী নেই। গরুগুলো একদিন দেরীতে খেলে কি আর এমন হবে? নেমন্তন্ন-বাড়ীতে একটু পরে গেলেই চলবে, কি বলো!

শেঠ বললেঃ তবু আপনি বরং একটু তাড়াতাড়ি চা তৈরী করে নিন।

—বেশ, তাই হোক। বলে প্রিয়নাথ চা তৈরী করতে করতে তার মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে ঠোঁট টিপে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

খানিকক্ষণের মধ্যেই চা তৈরী হয়ে গেল। শেঠের দিকে তিনি খাবার ও চা এগিয়ে দিলেন। ডিম ও টোস্ট গালের মধ্যে পুরে দিয়ে শেঠ তাড়াতাড়ি চায়ে চুমুক দিতে লাগলো।

একে আগুনের গরম—তার উপরে চা পান করায় দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হলো। মাখন হু-হু করে গলতে লাগলো।

কপালের উপরে যে গলিত মাখন গড়িয়ে আসছিল তা ঢাকবার জন্যে শেঠ একটু পাশ ফিরে বসলো। কিন্তু কোনো সুবিধে হলো না। ঘাড়ে ও মুখে তখন স্রোত নেমেছে।

ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনি ভাবে কৌতুকে চোখ দুটি মিট মিট করে প্রিয়নাথ বললেনঃ আজ বড্ডো শীত পড়েছে। কিন্তু, ওকি শেঠজী, তুমি অত ঘেমে উঠেছো কেন? তোমার পাগড়িটা বরঞ্চ খুলে ফেলো—গরম অনেকটা কম বোধ হবে। দাও—তোমার পাগড়িটা রেখে দিই।

এই বলে তিনি তার মাথার দিকে হাত বাড়ালেন।

শেঠ তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। বল্লে, না, না, আমার শরীর বড্ডো খারাপ বোধ হচ্ছে। আমায় যেতে হবে—আমায় যেতে দিন।

শেঠের পরিচ্ছদ সিক্ত করে তখন তৈলাক্ত জলপ্রপাত অবিরল ধারায় নির্গত হচ্ছিল। তার মাথা থেকে পা অবধি তখন তৈল-প্লাবিত।

সহাস্য কৌতুক-কণ্ঠে প্রিয়নাথ বললেনঃ আচ্ছা শেঠজী, নমস্কার! একান্ত যদি যেতেই চাও—যাও। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, একতাল মাখনের জন্য আমি তোমায় পুলিশে দেবো না। কারণ, তোমার সঙ্গে এতক্ষণ যে কৌতুক করলুম, তার দামও মাখনের দামের চেয়ে কিছু কম নয়।

চড়ুইভাতি

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

বনের ধারে চড়ুইভাতি ছেলেরা সব জুটল,
বিজন বনের বক্ষে যেন আনন্দ-বান ছুটল!

বালতি করে জল আনে কেউ, বাটছে বা কেউ বাট্‌না,
কেউবা কাকে চেঁচিয়ে বলে, "ডালটা গাছের কাট্‌না!"

পল্টা ভাঙে মড়মড়িয়ে শুকনো শাখা সাতটা,
রন্ধনে সে বেজায় পটু, বেশ পেকেছে হাতটা!

রান্না হবে খিচুড়ি শাক দালনা এবং সুক্ত,
জাতের বালাই নেইক, সবাই একই শ্রেণী-ভুক্ত।

দু-পাঁচ জনে কুটছে আলু, আধখানা তার ফেলছে,
জনা চারেক ঝোপের ধারে একটা কি যে খেলছে!

গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজায় পিক্‌লু, ভোনা, কেষ্টা,
বনানীতে মিলিয়ে যায় ভাটিয়ালীর রেশটা!

তুলছে কেহ কোঁচড় ভরে মিষ্টি সিঁয়াকুল যে,
নীচু ডালে চড়ে বা কেউ দুলছে দোদুল দোল যে!

বন-পুকুরে সাঁতার কাটে দারুণ শীতেও নাণ্টু,
খেজুর-রসের হাঁড়ি নামায় দস্যি ছেলে কাণ্টু!

হাঁক-ডাকেতে বনের বুকে জাগছে প্রাণের ছন্দ,
ছেলেদের এই বন-ভোজনে কতই না আনন্দ!

শুকতারা

নরেন্দ্র দেব

কবে তুমি ফুটেছিলে গগনের মাঝে,
গোধূলি শেষের এক নিরিবিলি সাঁঝে!
সেকথা তো লেখা নেই কোনো ইতিহাসে
অপরূপ রূপ শুধু আকাশেতে ভাসে!
পথে যেতে দেখি যেই, চলা যায় থেমে!
তুমি কি মাটিতে কভু আসিবে না নেমে?
যত আমি দেখি তব ঝিকি মিকি হাসি,
কালো চোখে আলো যেন—বড় ভালবাসি!
তুমি কি কপালে দিয়ে চুমকির টিপ,
আকাশ দেউলে জ্বালো সাঁঝের প্রদীপ?
তোমার কি নাম মোরে শুধায় যাহারা,
আমি বলি—চেন না কি? ও যে শুকতারা!
এর বেশি পরিচয় জানিনে তো কিছু;
মন তবু যেতে চায় ছুটে পিছু পিছু!

রাজার দাড়ি

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সিংহাসনে বসে রাজা
হঠাৎ গেলেন খেপে—
'বলতে পারো আমার শরীর
উঠছে কেন কেঁপে?'
মন্ত্রী বলেন—'ঝড় উঠেছে।'
রাজা বলেন—'বটে!
মাথায় তোমার গোবর ভরা
শুকিয়ে খটখটে।'
মন্ত্রী বলেন—'তবে অসুখ—থাকুন গে আজ শুয়ে।'
রাজা বলেন—'চুপ করে রও, মগজ দেব ধুয়ে।
কেউ জানো কি মশা আমায় কামড়ে গেল উড়ে'—
মন্ত্রী বলেন—'কোথায় হুজুর? গেল কত দূরে?'
রাজা রেগে বলেন—'মন্ত্রী,
বকবকানি ছাড়ো,
মশা তোমার দাড়ির মাঝে—
পারলে খুঁজে মারো।'
দাড়ির ভেতর মশার বাসা—
অবাক মন্ত্রী শুনে,
নাপিত ডেকে কাটান দাড়ি
বিপদ মনে গুনে।
রাজা হেসে বলেন—'মন্ত্রী,
সত্যি তুমি বোকা!
তা যদি নও, সরল সিধে তিন বছরের খোকা।
মশা-টশা মিথ্যে ও সব, বানানো মনগড়া,
তোমার দাড়ির বৃদ্ধি ছিল সত্যি অবাক করা!
মন্ত্রীর দাড়ি বড় হবে রাজার দাড়ির চেয়ে—
তাই তো আমি রাগে কাঁপি, ঘেমে উঠি নেয়ে।
তোমার দাড়ি সাফ হওয়াতে আমার দাড়ি রাজা,
আমার দাড়ি ছাড়াবে যে পাবে সে এই সাজা।'

মজার ম্যাজিক

যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার

অনেক সময় আমরা খুব সহজ কায়দায় মজার মজার ম্যাজিক দেখিয়ে থাকি। এবারে তেমনি একটা খেলার কৌশল প্রকাশ করছি। সেবার আমরা নিউইয়র্কে খেলা শেষ করে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে হার্টফোর্ড সহরে খেলা দেখাতে গিয়েছি। ওখানকার সুপ্রসিদ্ধ বুসনেল মেমোরিয়াল থিয়েটারে (Bushnell Memorial Theatre) আমাদের খেলা দেখান হবে। নানাভাবে খেলার কথা প্রচার করা হয়েছে, রেডিওতে বক্তৃতা দিয়েছি, খবরের কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে অনেক খবরের কাগজে ফটোসহ সংবাদও ছাপা হয়েছে।

একদিন একজন সাংবাদিক সোজা হোটেলে এসে আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরে বসলেন, খেলা দেখাতে হবে। সবাইকার ধারণা পি. সি. সরকারকে বললেই একটা খেলা দেখা যাবে। কিন্তু উপযুক্ত মালমসলা না হলে খেলা হবে কি করে! আমার টন কয়েক যন্ত্রপাতি রয়ে গেছে ঐ থিয়েটার হলে। হোটেলে আমার কাছে এক প্যাকেট তাস, রুমাল এই জাতীয় টুকিটাকি জিনিস আছে মাত্র। তবুও দেখাতে হবে—কারণ, ওরা খবরের কাগজের লোক, ওদেরকে খুশী রাখতেই হবে; বিশেষ করে বিদেশে, আমেরিকাতে। আমি যদি ভাল খেলা না দেখাই তবে শুধু আমার দুর্নাম নয়, আমার দেশেরও দুর্নাম হবে। আমার সাফল্যে আমার শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, আমার দেশের সাফল্য। কারণ, দেশের গণ্ডীর বাইরে চলে গেলে আমাদের আলাদা অস্তিত্ব থাকে না; আমরা ভারতীয়, এই তখন আমাদের পরিচয়। আমরা যদি সুনাম পাই সেটা আমার দেশেরই সুনাম, আর আমাদের দুর্নাম হলে সেটা আমাদের দেশেরই দুর্নাম।

আমি সাংবাদিক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি জাতীয় খেলা দেখতে ইচ্ছুক। তিনি উত্তর দিলেন, যান্ত্রিক কোনও খেলা দেখতে চাই না; মালপত্তরের ঝঞ্ঝাটপূর্ণ খেলাও চাই না; বিনা রঙ্গমঞ্চে, বিনা আলোকসজ্জা, দৃশ্য-সজ্জায়, এই এখনকার এই পরিবেশে, খালি হাতে যদি কোনও মনস্তাত্ত্বিক খেলা হয় তাই দেখতে চাই। আমি তখনই এই "মজার ম্যাজিক"টা দেখিয়ে দিলাম।

আমি বললাম, আমি একটা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বপূর্ণ (Mental) ম্যাজিক দেখাবো। আমার এই সহকারী হোটেলের পাঁচতলার ঘরে বসে থাকুক আর আমরা নীচতলার ঐ খাবার ঘরে বসে থাকছি। খাবার ঘরের টেবিলের উপর থেকে আপনি যে কোনও একটা জিনিস মনে মনে বেছে নিয়ে সেটাকে এই টেবিলের উপর টুপী চাপা দিয়ে রাখুন। তারপর আপনার কোনও বিশ্বস্ত লোক আমার সহকারীর কাছে গিয়ে ঐ পাঁচতলায় জিজ্ঞাসা করুক আপনি কোন্ জিনিস মনে মনে ধরে আছেন! আমার সহকারী নির্ভুলভাবে সেটি লিখে দেবে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। আমার সহকারী পাঁচতলার বসবার ঘরে গিয়ে বসে আছে—হোটেলের কয়েকজন উৎসুক লোক তাকে পাহারা দিচ্ছে। আর আমরা তিনজন (সাংবাদিক স্বয়ং, তাঁর ফটোগ্রাফার ও আমি) নীচতলায় খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম। ভদ্রলোককে তখন বলা হল আপনার যা ইচ্ছা বেছে নিন। খাবার টেবিলের উপর লবণের শিশি, গোলমরিচ গুঁড়োর শিশি, সিগারেট, ছাইদান, জলের গেলাস, জলের জগ এই সব জিনিস ছিল। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর অনেক চিন্তা করে জলের গ্লাসটা মনে মনে ধরে সেইটাই টুপী দিয়ে চাপা দিলেন। আমি একটা সাদা কাগজের টুকরো আর একটা পেন্সিল ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললাম, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনি নিজেই গিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর চাইতে পারেন। ভদ্রলোক তখন তাঁর বিশ্বস্তলোক ঐ স্টাফ ফটোগ্রাফারকেই লিফ্টযোগে উপরে পাঠালেন। তিনি ঐ কাগজ আর পেন্সিল আমার সহকারীর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বলুন তো, আমরা কোন্ জিনিস মনে মনে ধরেছি?

আমার সহকারী ধ্যানস্থ অবস্থায় টেবিলের কাছে বসে আছে—কারো সঙ্গে কথা বলছে না। গভীর মনঃসংযোগ, চিন্তাপাঠ প্রভৃতি নিয়েই যেন ব্যস্ত। সে আস্তে আস্তে কাগজে লিখে দিল—'ভদ্রলোক যে জিনিসটা ধরেছেন সেটা কাঁচের তৈরী, টুপীর নীচে আঁটতে চাইছে না। ওতে করে লোকেরা পানীয় খায়—ওটা একটা কাঁচের গ্লাস।' সবাই অবাক, এ কি করে সম্ভব হল! ভদ্রলোক নীচে
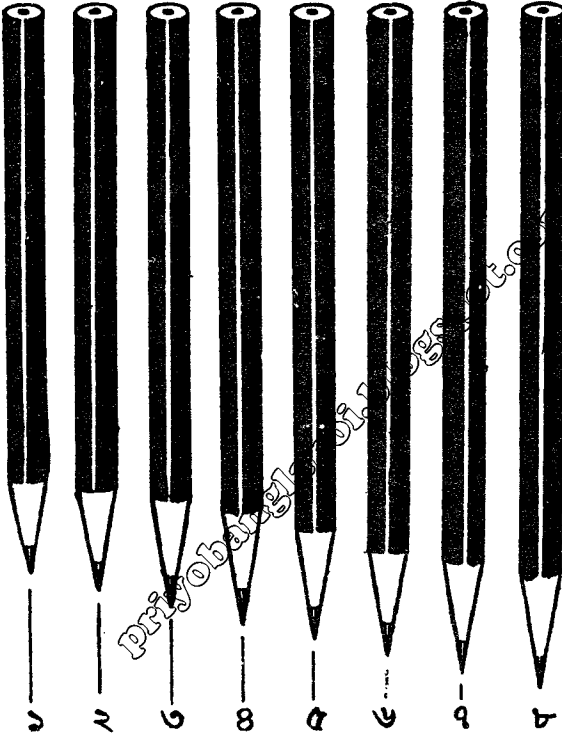
আমাকে পাহারা দিচ্ছেন। কি জানি, কোনও রেডিও-সংবাদ পাঠাচ্ছি কি না, কোনও তারের সংযোগ, সূতা বা টেলিফোনের যোগাযোগ আছে কি না, সব দেখতে ব্যস্ত। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না, আমিও চুপ করে চোখ বুজে বসে আছি।

স্টাফ ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। চোখে-মুখে তাঁর বিস্ময়ের ভাব সুস্পষ্ট। কারণ, এমন অসম্ভব খেলা তিনি জীবনে দেখেননি। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক নিজেও জানতেন না যে কোন্ জিনিস ঠিক মনে মনে ধরা হয়েছিল। আমি জয় জয় রবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। সকলে বুঝে নিল যে, আমাদের নানারকম ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে, যা দিয়ে সব কিছু জানতে আর বুঝতে পারি, ইত্যাদি।

এবারে আমার মজার ম্যাজিকের কৌশলটা বলেই দিচ্ছি। এই খেলাটা আমি ঐদিন সকালেই ঠিক করে অভ্যাস করছিলাম, আর তখুনিই এই ভদ্রলোক এসেছিলেন। কাজেই কোন অসুবিধা হয়নি। আমার পকেটে একই রংয়ের ৮টি পেন্সিল ছিল। পকেটে হাত দিলেই ইচ্ছামত ঐগুলির যেটিকে ইচ্ছা বের করতে পারতাম। পেন্সিলগুলির আকৃতি সবগুলি সমান নয়, আর ঠিকমত সাজালে এই ছবির মত ছোট থেকে বড় বা ১ থেকে ৮-এর মত দেখাবে। সহকারীকে এমনভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যাতে সে ঐ পেন্সিল হাতে নিলেই বুঝতে পারে ঐটি কত নম্বর-এর পেন্সিল। নিজের হাতে মাপ ঠিক রাখলেই ওটা হিসাব করা কঠিন নয়।

এদিকে খাবার ঘরে যত জিনিস আছে তার একটা নম্বর দেওয়া হল। যেমন সিগারেটের টিন—১, দিয়াশালাই—২, জলের গ্লাস—৩, লবণের শিশি—৪, মরিচের শিশি—৫, কাঁটা—৬, চামচ—৭, জলের জাগ—৮ ইত্যাদি। সাংবাদিক যেটাকে মনে করে ঐ টুপী চাপা দেবেন সেইটির সাংকেতিক নম্বর অনুযায়ী পেন্সিলটা আর এক টুকরো কাগজ পাঠিয়ে দিলেই হল। আমার সহকারী পেন্সিল দেখেই বুঝতে পেরেছে—তারপর তার উত্তরটা কায়দা করে একটু জাঁকালো করে লিখে পাঠাল। খেলার ঐ অংশের নাম Showmanship ও Presentation, যাকে আমরা সহজ কথায় বলে থাকি “প্রদর্শনভঙ্গি”। উপযুক্ত প্রদর্শনভঙ্গি দিয়ে খেলা করলে অনেক ছোট জিনিস দিয়েও খুব বড় বড় খেলা দেখান যায়—আমার মজার ম্যাজিক তারই একটা ছোট দৃষ্টান্ত মাত্র।
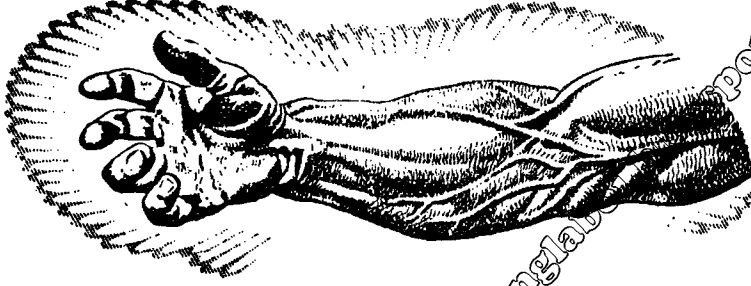
ভিড় করো না কেউ

শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ

সুন্দর পৃথিবীতে আমরা মানুষের মত বাঁচতে এসেছি, শুধু ভিড় করতে আসিনি; অর্থাৎ এক কথায় শুধু ব্যারামে ভুগবার জন্য বা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই মরে যাবার জন্য আমাদের জন্ম নয়। কিন্তু মানুষের মত বাঁচতে হলে আমাদের চাই—পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ। তাই কোন্ আদিম যুগে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি মানুষের দরকার হয়ে আসছে অর্থ, পুষ্টিকর খাদ্য ও বাসস্থানের সাধনা। সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে এই কাজগুলো আনন্দের সঙ্গে মাথায় তুলে নিয়েছে।

কিন্তু কাজ যাঁরাই করুন, শরীর যদি তাঁদের ভেঙ্গে যায়, তা হলে তাঁরা আর পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকবেন কদিন? কাজেই সব-কিছুরই মূলে হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষা।

এই কথাটা একেবারেই নতুন নয়; বরং বিষয়টি এত পুরানো ও নানাভাবে এত বেশী আলোচিত হয়েছে যে, সাধারণ ইস্কুলের নীচু শ্রেণীর একটি ছাত্রও হয়তো এ সম্বন্ধে এক বিরাট বক্তৃতা দিয়ে ফেলতে পারে!

তবু কারো কারো মনে খুব একটা ভুল ধারণা রয়ে গেছে। তাদের বিশ্বাস, যে সকল লোক—তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন,—অর্থোপার্জ্জনের জন্য অথবা গৃহস্থালীর কাজের জন্য সারাদিন কঠিন কায়িক পরিশ্রম করেন, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁদের আর কোন ব্যায়ামের প্রয়োজন নেই; কিন্তু তাঁদের এই ধারণা যে কত বড় ভুল, একটু বিচার করে দেখলেই তা বুঝতে পারা যায়।

কায়িক পরিশ্রম যাঁরা করেন, ভাল করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সারাদিন সেই কাজ করার ফলে তাঁদের কতকগুলি পেশীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অত্যধিক পরিশ্রম হয়, তাই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে; কিন্তু কতকগুলি পেশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আদৌ কোন পরিশ্রম হয় না, সেইজন্য তারা একেবারেই বিকশিত হবার সুযোগ পায় না।

মোট কথা, ফল দুদিকেই হয় খারাপ। কতকগুলি পেশী অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য হয়ে পড়ে ক্লান্ত, আবার কতকগুলি বা চির-বিশ্রামের জন্য একেবারেই অপুষ্ট থেকে যায়।

পাথর-ভাঙ্গা কুলী শুধু পাথর ভেঙ্গে যাচ্ছে, আবার কারখানায় কামার দিনরাত শুধু হাতুড়ী পিটছে ঠক্‌ঠক্! পরিশ্রম তারা খুবই করে; কিন্তু তার ফলে বাহুর মাংসপেশী দৃঢ় হলেও যেন ক্লান্তিতে এলিয়ে থাকে!

একজন টাইপিস্টের খাটুনিও কম নয়; টেলিগ্রাফ-মাষ্টারের কাজেও পরিশ্রম খুব বেশী; কিন্তু সেই পরিশ্রমকে কখনো কি ব্যায়ামের পর্য্যায়ে ফেলা যায়? না। তাতে অঙ্গ-বিশেষের পরিশ্রম হয় বটে, কিন্তু ব্যায়াম হয় না। ব্যায়ামের সঙ্গে দেহ-চর্চ্চার একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষাও জড়ানো

এর নামও ব্যায়াম নয়

একে ব্যায়াম বলা চলে কি?

থাকে। কিন্তু পাথর-ভাঙ্গা কুলীর পরিশ্রমে, কামারের পরিশ্রমে, টাইপিষ্টের পরিশ্রমে বা টেলিগ্রাফ-মাষ্টারের পরিশ্রমে কি দেহ-চর্চ্চার কোন আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ থাকে? তা থাকে না বলেই তাদের ব্যক্তিগত কাজে পরিশ্রম হলেও ব্যায়াম হয় না। কাজেই দেখা যায়, সে সব কাজে কখনো শরীরের পুষ্টি হয় না। যদিও পেশীগুলি অনেক সময় দেখতে শক্তিশালী বলে মনে হয়, তবু তাতে জীবনীশক্তি খুব কমই থাকে; অর্থাৎ তাদের পরিশ্রমের ফলে পেশীগুলি কমনীয় ও সুন্দর হয়ে ওঠে না, সেগুলি হয়ে পড়ে ক্লান্ত। একজন ব্যায়াম-বীরের সঙ্গে এইটুকুই তাদের তফাৎ!

ব্যায়াম মানে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানারূপ চালনা দ্বারা শরীরে ক্লান্তি আনা ও খানিকটা ঘাম বার করা হতো—যা সাধারণ লোকের ধারণা,—তা হলে যাঁরা সারাদিন কঠিন কায়িক পরিশ্রম করেন, তাঁদের আর ব্যায়ামের প্রয়োজন হতো না; কিন্তু ব্যায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরে জীবনী শক্তি বাড়ানো, ক্লান্ত অবসন্ন পেশীগুলির অবসাদ দূর করা, অলস পেশীগুলিকেও পরিশ্রম করানো, আর রুগ্ন অথবা অপরিপুষ্ট আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদিকে সুস্থ ও কর্ম্মপটু হতে সহায়তা করা। ব্যায়ামের উদ্দেশ্য যদি এই হয়, তা হলে কয়জন বলতে পারেন যে আমার ব্যায়াম করার প্রয়োজন নাই? আর কোন রকম ব্যায়াম না করে পরম নিশ্চিন্ত ভাবেই বা থাকতে পারবেন কয়জন?

অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, ব্যায়াম মানেই হচ্ছে ডাম্বেল্ ভাঁজা, না হয় কুস্তি করা, না হয় জিমন্যাস্টিক করা, ইত্যাদি। শুধু হাতে বা সাধারণ একখানি চেয়ার নিয়েও যে কত রকম ব্যায়াম করা যায়, তা বুঝিয়ে দেবার জন্য কয়েকখানি ছবি দেওয়া হলো।

এত কথার পরেও ব্যায়াম করার জন্য কেউ যদি সময় না পান, তা হলে তিনি ধনী কি নির্ধন—কায়িক পরিশ্রমকারী কুলী-মজুর, কি শুধু মস্তিষ্কের চালনাকারী আইন-ব্যবসায়ী, শিক্ষক অথবা শেয়ার-বাজারের ব্যবসায়ী, যাই হোন না কেন,—শীঘ্রই তাঁকে শত-সহস্র বিশেষ কাজ থাকতেও, সব কাজ ফেলে পৃথিবী থেকে অসময়ে চলে যাবার সময় দিতে হবেই।

কোন ওজর, কোন আপত্তি, সেদিন আর তাঁর চলবে না...চলবে না। স্বাধীন ভারতের আবহাওয়ায় এরকম লোকের ভিড় করবার কোন সার্থকতাও নেই, যত শীগ্‌গির হয়, এসব ব্যারামের ডিপো মহাপুরুষদের দেশ থেকে বিদায় নেওয়া খুব সঙ্গত।
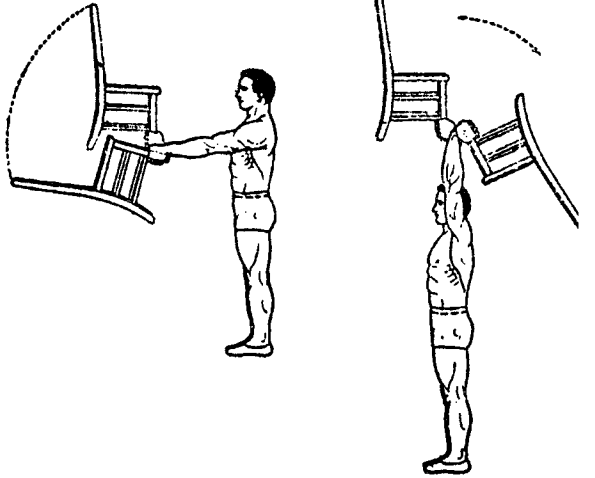
কেবল চেয়ার দিয়েও ব্যায়াম করা চলে।

"প্রিয় বাংলা বই"
না কিনলে...